নারায়ণ রাও

অড়িবি বাপিরাজু

অনুবাদ

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

লীলা মজুমদার



সাহিত্য অকাদেমি

নয়া দিল্লী

Narayan Rao : A Telugu novel by Aḍivi Bapiraju, translated in Bengali by Sri Bommana Viswanatham and Sm. Leela Majumdar. Sahitya Akademi, New Delhi.

Price Rs. 10·00

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়া দিল্লী ১

ব্লক ৫ বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা ২৯

২১, হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ ৬

১৭২, নইগাঁও ক্রস রোড, বোম্বাই ১৪

মূল্য ১০·০০ টাকা

শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র কর্তৃক বোধি প্রেস, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ও

সাহিত্য অকাদেমি নয়া দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত

উপন্যাসে চিত্রিত পাত্রপাত্রী কাল্পনিক

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীবালুস্থুলাপালেম সুন্দর রামা রাও-কে

॥ প্রথম খণ্ড ॥

১। তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে ?

"এ বিশ্বসংসার উর্ধ্বশ্বাসে কোথায় ছুটে চলেছে অবিরাম বিদ্যুৎগতিতে ? মুদিত নয়নে মনে হয় এর গতি যেন পশ্চাদমুখী। এ কি সত্যিসত্যিই অগ্রসর হচ্ছে ? রেলগাড়িটা এহেন প্রচণ্ড বেগে যখন এগিয়ে চলেছে, ওই গাছগাছালির জঙ্গলগুলো কেন তখন পেছনে সরে সরে যাচ্ছে ? আর সদাসঞ্চরমান অসংখ্য নক্ষত্র ও মেঘ থাকা সত্ত্বেও আকাশটা কেন নিশ্চল ! এই সমস্ত কিছুকে ভ্রম মনে করে হাসব, না সত্যি মনে করে আশ্চর্য হব ?

পৃথিবীর বুকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের মতো বিচরণশীল মানুষের সামনে হাজার যোজন দূরবর্তী দীপাবলীর আলোকমালার তুল্য ওই নক্ষত্ররাজি কি মশাল তুলে ধরেছে ? সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আর তাদের প্রদক্ষিণরত গ্রহরাজি এভাবে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ? বেদরচয়িতা মহর্ষিরা এই পরমসত্যকে কেমন সুন্দর সুন্দর গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

ঐ নক্ষত্ররাও নাকি গান গায় ! কোন্ মহান আদর্শের গান ওরা গায় ? বিঠোভেন, ত্যাগরাজ ইত্যাদি গীতিকাররাও কি ঐ মহান আদর্শের কথাই প্রতিধ্বনিত করেছেন নিজেদের গানে ?"

এই রকম আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে নারায়ণ রাও জানলা থেকে মাথা সরিয়ে আবিষ্টনয়নে তাকাল সহযাত্রী বন্ধুদের দিকে। মেল ট্রেনখানি প্রবল বেগে কৃষ্ণানদীর সেতু পেরিয়ে বেজওয়াড়া স্টেশনের নিকটতর হচ্ছিল।

"ওরে কুম্ভকর্ণের দল ওঠ্। বেজওয়াড়া এসে গেছে। আর কত ঘুমুবি ? ওঠ্।" নারায়ণ রাও বন্ধুদের জাগিয়ে তোলে। পরমেশ্বর মূর্তি চোখ রগড়াতে রগড়াতে মুখে হাসি মেখে উঠে পড়ল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে আড় মোড়া ভেঙে সে বলল, "ও ডাক্তার সাহেব, উঠুন। ঘুমের চিকিৎসার জন্যে পাঁচন আর ইড্‌লির গুলি সেবন করুন।"

রাজা রাও উঠে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে, "তবে রে খেংরা কাঠির উপর আলুর দম !" এই বলে কাঁধে ধরে আবার তাকে বিছানার উপর বসিয়ে দিল।

পাশে শুয়ে ছিল রাজেশ্বর রাও। "আরে! এ তো আচ্ছা কাণ্ড দেখছি! দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার!" এই কথা বলতে বলতে সে উঠে রাজা রাওকে ঠেলে সবেগে দরজার কাছে নিয়ে গেল।

"আরে নারায়ণ! চেন টান্, চেন টান্! মেরে ফেলল! পুলিস, পুলিস!" চিৎকার করতে করতে লক্ষ্মীপতি চেন টানার অভিনয় করল।

"তোমরা সব দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে থাকো, আমি ততক্ষণে প্রাতঃকৃত্য সেরে আসি।" নারায়ণ রাও হাসতে হাসতে চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল ওপাশে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে আর এক বন্ধু। "এই যে মোহম্মদ ইবন আলম সুলতান আব্দুল রজ্জাক বাদশাহ্! উঠুন আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য কোনো বৈতালিক তো এখানে নেই! অথচ রাজ্যপাট যে একেবারে জাহান্নামে যাচ্ছে, জাহাঁপনা!"

উঠতে উঠতে আলম বলল, "এত তাড়াহুড়ো কিসের? এমন সুন্দর আরামের ঘুমটা দিলি তো মাটি করে!" নারায়ণ রাও এবার বিনা বাক্যব্যয়ে হাতমুখ ধুতে চলে গেল। তরুণদল নিজের নিজের বিছানাপত্র গুটিয়ে জিনিস গুছিয়ে বসতে না বসতেই নারায়ণ রাও ফিরে এসে বলল, "ইড্লির গোলা, কফি, পুরী, আলু, সব তোমাদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছে, সেবার জন্য ভক্তরা সব প্রস্তুত তো!" খাবারগুলো সব এক এক করে সিটের উপর রাখতে লাগল সে।

লক্ষ্মীপতি—আমার জন্য টী এনেছো?

রাজেশ্বর—না 'ছি' এনেছে।

আলম—আমি মুসলমান, আমারই যখন 'চা'-এর প্রয়োজন নেই তখন লক্ষ্মীরই বা কী দরকার? তুমি কি চীনা আদমি নাকি?

"মেল এখানে আধ ঘণ্টা দাঁড়াবে, গভর্নর সাহেবের স্পেশাল ট্রেন চিন্নপট্টনম্ যাচ্ছে।"—সহযাত্রীদের কথা শুনে নারায়ণ রাও বলল, "ওরে বাবা! ততক্ষণে এখানে যে বীজ পুঁতলে গাছ গজাবে।" টিফিন সেরে থ্রি ক্যাসেলের কৌটা থেকে সিগরেট বের করে ধূমপান করতে লাগল।

"খানকয়েক বই কিনে আনি" বলে নারায়ণ রাও হিগিনবথামসের বুকস্টলের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

গভর্নর সাহেবের আগমন উপলক্ষে স্টেশনে সারিবদ্ধ সুশস্ত্র পুলিস

মোতায়েন হয়েছে। বিশ্রামাগারের সামনে তিনি নাকি নামবেন। তাই পুলিস কাউকে সেদিকে যেতে দিচ্ছে না। গভর্নর সাহেবকে স্বাগত জানাবেন বলে কৃষ্ণা জিলার কালেক্টর, পৌরপ্রধানরা এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা ফুলের মালা আর মানপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

এসব দেখে নারায়ণ রাও কী যেন ভাবতে ভাবতে বুকস্টলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নারায়ণ রাও স্বাস্থ্যবান যুবক। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নাক মুখ ঠোঁট কান সত্যিই নিখুঁত। চেহরায় বুদ্ধির দীপ্তি। মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্যময় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সমস্তটা দেখে মনে হয় যেন স্রষ্টার অবকাশমুহূর্তের একটি সৃষ্টি নারায়ণ রাও। বাঁ হাতের তর্জনীর ওপর থুতনি রেখে মাথা উচুঁ করে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে।

হঠাৎ মনে হল একটি লোক যেন তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। ভদ্রলোক একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে। মনে মনে হাসি পেল। বইয়ের দোকানের দিকে পা বাড়াতেই ভদ্রলোকটি হাত তুলে তাকে বললেন 'দাঁড়ান'। সোনার কাজ করা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে নারায়ণ রাওয়ের আরও কাছে এসে বললেন,

—আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

—নারায়ণ রাও।

—আপনার পদবী ?

—তটওয়ার্তী।

—আপনার গোত্র ?

—কৌণ্ডিন্যাস।

—আপনি কি বিবাহিত ?

দুজনের কথাবার্তা ইংরেজিতেই চলছিল।

"দেখুন নারায়ণ বাবু, আপনি হয়তো ভাবছেন আপনাকে অহেতুক এইসব প্রশ্ন করছি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন বলল যে আপনার বিয়ে হয় নি। সেইজন্যই আমি এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছি। আপনি হয়তো মনে মনে বলছেন, কে এই লোকটা। গভর্নর সাহেবকে স্বাগত জানাবার জন্যে যেসব ভদ্রলোক এখানে সমবেত হয়েছেন

আমি তাঁদের মধ্যে একজন। নাম তল্লাপ্রগড়া লক্ষ্মীসুন্দর প্রসাদ রাও। কই আমার শেষ প্রশ্নের জবাব দিলেন না তো? আমার ধারণা সত্যি কিনা যাচাই করার কৌতূহল হচ্ছে।"

"এখনও আমার বিয়ে হয়নি।" নারায়ণ রাও মিষ্টি হেসে জবাব দিয়ে মনে মনে ভাবল—ইনিই কি বিশালপুরমের জমিদার?···শাসনসভার স্বরাজ্য পার্টির সদস্য?

"গভর্নর সাহেবের গাড়ী পনেরো মিনিটের মধ্যে আসবে না। এখন কোত্থেকে আসছেন?" জমিদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"মাদ্রাজ থেকে সবান্ধবে আসছি।" তারপর সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণ রাও বুকস্টলের দিকে চলে গেল।

বন্ধুরা প্ল্যাটফরমের উপর ঘোরাঘুরি করছে। নারায়ণ রাও ভাবল, গভর্নরকে দেখার সুযোগ এর আগে হয়নি নাকি? ইনি তো শাসনসভায় স্বরাজ্য পার্টির প্রতিনিধি হয়ে ঢুকে, সরকারের সঙ্গে কূটনীতির মধ্য দিয়ে স্বকীয় পদ্ধতিতে দেশসেবা করছেন। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, শাসনসভার সদস্য হয়ে করারই বা আছে কি? আশ্চর্য! এতবড় একজন রাজনীতিজ্ঞ হয়ে কিরকম শিশুসুলভ প্রশ্ন করলেন। এইসব ভাবতে ভাবতে নারায়ণ রাও উপন্যাস ও অন্য খানকয়েক বই কিনে নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

কেউ সেখানে ছিল না। নারায়ণ রাওয়ের মন বইয়ে বসছে না। বার বার তার চোখের সামনে ভাসছে জমিদারের আশাভরা চোখ আর তার কানে বাজছে শেষের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নটি। নারায়ণ ভাবছে, ভদ্র লোক চতুর রাজনীতিজ্ঞ। অনেকের মতো নিজের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে লোকের কাছে উপহাসের পাত্র না হয়ে, মাঝে মাঝে দেশের ডাকে সাড়া দেন। স্বদেশীদের ইন্ধন যুগিয়ে যান।

"কোথায় যে গেল নারায়ণ রাও!. . .আরে এই যে এখানে।" বলে নারায়ণ রাওয়ের বন্ধুরা এসে কামরায় উঠল।

২। রেলগাড়ীও তথাস্তু বলল

"আরে, ও নারান তুমি ছিলে কোথায় ? আমরা সব তো গভর্নর সাহেবকে মানপত্র ভেট পাঠিয়েছি। তুমি আবার স্বদেশী, দেশপ্রেমিক, গভর্নরকে দর্শন দেবে না ! আমরা একথা ভুলেই গিয়েছিলাম. . ." বলতে বলতে রাজেশ্বর রাও নারায়ণের হাতের বইটা কেড়ে নিয়ে তার নাম পড়তে পড়তে বলল, "ভালো কথা, আমাদের জমিদারমশাই এখানে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। শুনলাম তুমি নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ ?"

হঠাৎ পরমেশ্বর বলল, "হ্যাঁরে, তোর বিষয়ে ভদ্রলোক অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন বল্ তো ?"

নারায়ণ মুচকে হেসে বলল, "আমাকে কি তোমরা সাধারণ মানুষ ভাবছ নাকি ? হ্যাঁ, আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি।"

রাজা—তুমি আবার সাধারণ মানুষ হতে যাবে কেন ?

রাজেশ্বর—তোর গোত্রও জিজ্ঞেস করছিল কেন রে ?

নারায়ণ—হয়তো ভেবেছেন যে বড় বড় নামজাদা লোকের গোত্রই থাকে না।

রাজেশ্বর—লক্ষ্মীপতি জানিয়ে দিয়েছে যে তোর কোণ্ডিন্যাস গোত্র।

আলম—নারে ভাই, আমার তো মনে হচ্ছে ও তোকে নিকে করাবে।

নারায়ণ—তোর মুণ্ডু ! ও তো মুসলমান নয় যে নিকে করাবে।

রাজেশ্বর—তা ঠিক, ওঁর একটি মেয়ে আছে, এখনও তার বিয়ে হয় নি।

পরমেশ্বর—তা হলে আর দেখে কে—নারানের তো পোয়া বারো।

রাজেশ্বর—শুধু নারানই নয়, আমিও হিজ হাইনেস বিশালপুরমের জমিদার-সাহেবের স্টেট ডাক্তার হব।

রাজেশ্বর—নারান, আরে আমাকেও মনে রাখিস, শ্বশুরমহাশয়ের সুপারিশে আমাকে একটা ইঞ্জিনিয়ারের পদ দিস্।

নারায়ণ—থাম দিকি তোরা, পাগল হয়েছিস নাকি ! এখনও তো তোরা কেউ পরীক্ষা দিতেই বসিস নি, এর মধ্যেই চাকরি চাই ! শ্বশুরের জমিদারিতে তোমাদের পা রাখতেও দেব না। একমাত্র পরমেশ্বরকে সভাকবি বানিয়ে দেব।

রাজা—আরে, এই পরমেশ্বর, হাঁ করে দেখছিস কী, রাজজামাতা সম্পর্কে একটা কবিতা শুনিয়ে দে।

পরমেশ্বর গলা ঝেড়ে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই রাজেশ্বর রাও বলল, "থাম থাম, পরমেশ্বর, সব ভুল হচ্ছে, কনের নামে ঢুঁ ঢুঁ—সে এখনও কপ্পুর হয়ে রইল, তাকে বাদ দিয়ে গাঁইয়া গোঁয়ার এই নারানকে নিয়ে তোমাকে কোনো কাব্য করতে দেওয়া হবে না। প্রথমে কনের প্রশস্তি হোক!"

"বেশ আপনাদের যো আজ্ঞা।"

পরমেশ্বর গান ধরল—

এক্কির মতো মেয়ে নেই গো, নেই
এক্কি আসবে না, আমার দিকে আসবে না [১]

কিন্তু গান ধরতে না ধরতেই রাজা রাও বাধা দিয়ে বলল, "আরে থাক থাক, ঐ অলুক্ষণে গান আর গাইতে হবে না।"

পরমেশ্বর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গাইতে লাগল—

তোমার সঙ্গেই আমি থাকবো গো, নায়ুড়ু বাওয়া,
তোমার কথাই শুনব গো, নায়ুড়ু বাওয়া। [২]

"বা বা, কথায় বলে 'মঙ্গলান্তানি কাব্যানি', আহা, বল না সবাই মিলে একবার, 'তথাস্তু'।"

মনে হল যেন, ট্রেনও বাঁশি বাজিয়ে ওদের সুরে তথাস্তু বলে স্বর মেলাল। ঠিক সেই সময়ে জমিদারও ছুটতে ছুটতে এসে কামরায় উঠলেন।

হৈ-হল্লায় জমে যাওয়া বন্ধুরা হকচকিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। রাজেশ্বর রাও দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন, বসুন!" সে তাঁকে বসার জায়গা করে দিল। জমিদার বসতে বসতে বললেন, "আপনাদের মতো নওজোয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে আমার মতো বুড়োরা জড়পদার্থ হয়ে যাবে। আপনাদের সবাইকে দেখে আমিও যেন নিজের যৌবন ফিরে পেলাম। আপনারা সবাই একসঙ্গে বেরিয়েছেন নাকি? রাজেশ্বর রাও তো আমারই গ্রামের ছেলে, আর আপনারা সব কি রাজমহেন্দ্রবরম যাচ্ছেন, না আরও দূরে?"

১ অন্ধ্রের প্রসিদ্ধ এক্কিপাটালুর একটি চরণ।

২ আর একটি প্রচলিত গান।

রাজেশ্বর বলল, "আজ্ঞে না, আমরা সব আলাদা আলাদা জায়গায় যাচ্ছি। আলাদা আলাদা কলেজে পড়ি। এর নাম নারায়ণ, এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছে, আর আলম সাহেবও ঐ পরীক্ষা দিয়েছেন। ওর নাম রাজারাও, বেমুরী পরিবারের। কাকিনাড়ায় এম. বি. বি. এস. পড়ছে। ফোর্থ ইয়ার। আর ও হল পরমেশ্বর মূর্তি। বাণ্ডেয়দের ছোট ছেলে। গ্র্যাজুয়েট, কবি, চিত্রকার এবং গায়কও। যার সঙ্গে এক্ষুনি আপনার দেখা হয়েছে তার নাম লক্ষ্মীপতি, নিডমুরুতে বাড়ি। ওর পদবীও নিডমুর। ও আমাদের নারায়ণের পিসতুতো ভাই। প্রাইভেটে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। লক্ষ্মীপতি বাদে আমরা সবাই রাজমহেন্দ্রবরমে ইণ্টারমিডিয়েট পড়েছিলাম!"

লক্ষ্মীপতি—রাজেশ্বর রাও তো আপনার চেনা জানা লোক। বি. ই. পরীক্ষা দিয়েছে। ধনী ঘরানার। বেশ রসিক।

জমিদার—তাতো বটেই। আমি ওকে ছেলে বেলা থেকে জানি। কলেজ বন্ধ হওয়ার অনেক দিন পরে যেন আপনারা ঘর মুখো হচ্ছেন মনে হচ্ছে!

আলম—রাজারাওয়ের পরীক্ষা সবে কাল-পরশু শেষ হল। ওর জন্যেই আমরা পাঁচ-দশদিন অপেক্ষা করেছিলাম। সিনেমা টিনেমা দেখেশুনে ফিরছি।

জমিদার—অন্যান্যদের পরীক্ষা যাই হোক না কেন, ল' কলেজওলাদেরই পোয়া বারো।

রাজেশ্বর—নারায়ণের মতে আইন হচ্ছে আত্মবিকাশের পরম শত্রু।

জমিদার—তাহলে নারায়ণ রাও মশাই, আপনি কি গান্ধীবাদী?

বলিয়ে-কইয়ে হলেও নারারণ রাও মিতভাষী। মনের মতো প্রশ্ন হলে যুক্তি দিয়ে, গম্ভীরভাবে কবিতার মতো, গানের মতো করে বোঝাতে পারে সে। প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার বেলায় সহজাত বিনয়টুকুও তার থাকে না। বক্তব্য চালিয়ে যায় সে চাবুকের মতো। জলন্ত শ্লেষ থাকে তার মধ্যে। সব বিষয়ে তার ধ্যানধারণাকে সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে বোঝাতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধদের সঙ্গে কোনো দিন সে তর্ক করে না।

লক্ষ্মীপতি—আমার ভায়ের হয়ে আমাকে দু'কথা বলতে দিন। অবশ্য এ ব্যাপারে তার মতটাই জানাচ্ছি। তার মতে আজকাল যে কানুন দেশে প্রচলিত তার মধ্যে ধর্মের নামগন্ধ নেই। সত্য তার কাছ থেকে দূরে থাকে।

অসত্যের ভেজাল ছাড়া সত্যও আজকাল টিঁকছে না। সাধারণভাবে সত্য আজ অচল বললেই চলে। বর্তমান সাক্ষী সংক্রান্ত আইনে বা কনট্রাক্টের কানুনে অনেক ভুল আছে এবং সে ভুলগুলোর মূল ওই কানুনের মধ্যেই রয়েছে। এ যতদিন থাকবে ততদিন সত্য এবং আইনের মধ্যে ফারাক থাকবে হাজার মাইল।

জমিদারও বুঝলেন যে নারায়ণ রাও এই আলোচনায় লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করছে। তিনি তাই ঐ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্যান্য বহু বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন।

মেল বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেন এলুরু পৌঁছুল। নামার সময় জমিদারবাবু বললেন যে তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে তারা তাঁর অশেষ উপকার করছে, "আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আমার গ্রামে নেমে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

আলম—আমি তো সানন্দে যেতাম, আমি এলুরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার অপেক্ষায় আমার ভাইবোনরা আছে, মাও অপেক্ষা করছেন হয়তো বা। আমাকে ক্ষমা করবেন।

জমিদার—আমি জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে চাই না। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি আসতে চান তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। আপনারা এ ব্যাপারে কী ঠিক করলেন তা আমাকে দয়া করে গোদাবরী স্টেশনে জানিয়ে দেবেন।

জমিদার যাওয়ার জন্য উঠে নমস্কার জানিয়ে লক্ষ্মীপতিকে বললেন, "কিছুক্ষণের জন্য আপনি আমার সঙ্গে একটু যাবেন? আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।"

"আজ্ঞে চলুন" বলে লক্ষ্মীপতি তাঁকে অনুসরণ করল। যেতে যেতে জমিদার গার্ডকে বললেন, "গার্ড সাহেব, এই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে যাবেন। ট্রাভেলিঙ টিকিট চেকারকে বলে একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিন। আচ্ছা, নমস্কার।"

হাত ধরে লক্ষ্মীপতিকে তিনি নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন।

৩। জমিদার

বিশালপুরমের লক্ষ্মী প্রসাদের আরুওয়েলু নিয়োগী পরিবার একটি নামী ঘরানা। হায়দ্রাবাদ নবাবের শাসনাধীন রাজমহেন্দ্রবরম সরকারের কাছ থেকে তল্ল প্রগঢ় নন্নয় নায়নির পৌত্ররা স্বর্ণ মণ্ডিত ছড়ি, পঁচিশটি গ্রাম এবং অনেক মূল্যবান জিনিস পেয়েছিলেন। নিঃশঙ্ক, মহাশঙ্ক সিংহমান সকল বিদ্বৎজন সংস্থিত উপাধিও তাঁরা পেয়েছিলেন। পঁচিশ গ্রামের জমিদারি আস্তে আস্তে বেড়ে গিয়েছিল।

তাঁরা নবাবকে নিয়মিত কর দিতেন, রাজকার্যে তাঁদের নিপুণতা, জমিদারির সুদক্ষ পরিচালনা এবং ঐশ্বর্যের জলুস দেখে খুশি হয়ে নবাব-বাহাদুর তাঁদের মণিমুক্তা-খচিত কোষবদ্ধ তলোয়ার, শ্বেতছত্র, সোনার পালকি এবং খেতাব প্রভৃতি উপহার দিয়েছিলেন। আর একশো ঘোড়-সোওয়ারের সর্দারও করে দিয়েছিলেন।

যখন বিশালপুরমের জমিদারি তাঁদের হাতে এল তখন নন্নয় মন্ত্রীর বংশজ তল্লাপ্রগড়া জগপতি রাজ মঙ্গল তুররদের মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার করলেন।

কলিদিণ্ডের মহাপ্রভু জগপতি রাজ্যের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মহামন্ত্রী রাজবংশোদ্দীপক উপাধি এবং দুটি গ্রাম দান করেছিলেন।

এহেন উচ্চবংশে জন্ম হয়েছিল লক্ষ্মীসুন্দর প্রসাদ রাওয়ের। সৌজন্যে ও আধুনিক জ্ঞানের আলোকে তাঁর মন ছিল আলোকিত। পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। সংস্কৃতে বি.এ.পাশ করেছিলেন তিনি। নামকরা পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাঁর জমিদারিতে কৃষকদের কোনো কষ্ট ছিল না। ওদের কল্যাণ ব্যতিরেকে ভাবী ভারতের সৌভাগ্যসূর্য উঠবে না একথা মনে রেখে পুরানো শাসনসভা এবং নতুন বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে, তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জনসাধারণের প্রতিনিধি। সরকারের বুকের উপর উদ্যত ছুরিকার মতো। তিনি ছিলেন ন্যায়পতি সুব্বারাও পান্তুলুর রাজনৈতিক শিষ্য এবং মোচর্ল রামচন্দ্র রাওয়ের প্রিয়বন্ধু। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে

পড়বে একথা তিনি স্বীকার করতেন না। সেইজন্য শাসকসভায় দেশদ্রোহীদের স্থান না দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি নিজের সামর্থ্য অনুসারে দেশসেবার এই পদ্ধতিকে বেছে নিলেন।

লক্ষ্মীসুন্দর রাওয়ের সঙ্গে গঞ্জাম জেলার নারিকেল ওয়ালাসার জমিদার ক্রোওইড়ি বীরবসবরাজ বরদেশ্বর লিঙ্গম মশাই তাঁর প্রথম কন্যা বরদ কামেশ্বরী দেবীর বিবাহ দিয়েছিলেন। দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে হয়েছিল তাঁদের। প্রথম কন্যা শকুন্তলা দেবীর বিবাহ হয়েছিল নেল্লুর জেলার এক ছোট জমিদার ভাবনারায়ণের ছেলে বিশ্বেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে।

কুমার বিশ্বেশ্বর রাওয়ের খুব দেমাক ছিল। ইংলণ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ডের এম. এ. পাশের পর দেশে ফিরে এসে প্রথম প্রথম তিনি ডেপুটি তহশীলদারের চাকরি করেন। তারপর খোশামোদ তোষামোদ ধরাধরি করে ডেপুটি কালেক্টর হন। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি একজন জমিদার। তাই নিজের উর্ধ্বতন অফিসারদের তোষামোদ করে চলতেন। তাঁর ভয় ছিল ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেলে এখানে একটি পোকা-মাকড়ও বেঁচে থাকবে না ; ধনধান্যে পুষ্পেভরা এমন সুন্দর শ্যামল আমাদের ভারতবর্ষের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হবে। কবর স্থানে পরিণত হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্বেশ্বর রাও শ্বশুরকে প্রায়ই বলতেন যে ভারতে সভ্যতা বলে কিছু ছিল না। বিদেশীদের আগমনের আগে ভারতের মানুষ আফ্রিকার নিগ্রোদের মতোই পরস্পরকে কেটে খেয়ে জীবনধারণ করত।

কোর্টেও তিনি আগুন ছোটাতেন। উকিল এবং মক্কেলদের তুলো ধুনে ছাড়তেন। নিপুণ উকিলদের দলিল উনি বুঝতে পারতেন না আর রায় দেওয়ার সময় তাদের পরোয়াও করতেন না তিনি। ভুল রায় দিতেন। সেইজন্য বড়কর্তাদের মৃদু তিরস্কারও শুনতে হত মাঝে মাঝে। বাড়ির চাকর চাকরাণীরা সব সময় কাজ করত বুক ঢিপ্ ঢিপ্ নিয়ে।

বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও বনিবনা ছিল না। ছোট খাটো ব্যাপারে ঝগড়া হত। এমনকি দু-চার দিন কথা বলাবলি পর্যন্ত বন্ধ থাকত। জমিদারিসুলভ তাঁর দাম্ভিক মনটি পারিবারিক জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল।

ছেলেমেয়েরাও হল তাঁরই ছাঁচে গড়া। সব সময় বাবা মা চাকর বাকরদের সঙ্গে খিটিমিটি লাগিয়ে রাখত তারা।

তাদের বাড়িটা যেন একটি কলহনিবাস। নিন্দামান্দা এবং অনেক সুর ও স্বরের তাণ্ডবনৃত্য চলত তাদের বাড়িতে।

জামাই যে একটি মাকাল ফল বিশেষ, একথা বুঝতে পেরে লক্ষ্মী সুন্দর প্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন।

শকুন্তলা দেবীকে সংগীত ও সাহিত্যে পারদর্শী করে তোলা হয়েছিল। রাজমহেন্দ্রবরমে এক আমেরিকান মিশনারির স্ত্রী তাঁকে ইংরেজী পড়িয়ে-ছিলেন।

এর ফলে তাঁর মধ্যেও কিছুটা দাম্ভিকতা এসেছিল। স্বামীটি তাঁর আদৌ কলারসিক ছিলেন না। জিলা জজ এবং কালেক্টরের বউদের সামনে গান গাওয়ার জন্যই তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করতেন।

দ্বিতীয় মেয়ে শারদা আশৈশব শান্ত প্রকৃতির। মৌনতা তার যেন প্রকৃতিগত। বড় বড় চোখে প্রত্যেকটি জিনিসকে সে পরখ করে দেখত। কোনো জিনিস কোনো দিন ভুলত না সে। তার মধুক্ষরা কণ্ঠ থেকে বুদ্ধিদীপ্ত কথা নিঃসৃত হত। বীণার ঝংকার, কোকিলের কুহুতান, ঝরণার কলধ্বনি, বৃক্ষের মর্মর আর সুন্দর সংগীতের মতো তার কণ্ঠ থেকে বাণী ঝরে পড়ত। গায়নমূর্তি শ্রীরামায়ার কাছে গান শিখেছিল সে।

শ্রীরামায়া গান আর বেহালায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর চেয়ে বেশী নাম কেউ করতে পারেন নি। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার শারদাকে দিয়েছিলেন। বহু বিনিদ্র রজনীর সাধনায় সীতারামের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে ত্যাগরাজ যেসব কীর্তন রচনা করেছিলেন, তার ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সেগুলি চমৎকারভাবে তিনি শারদাকে শিখিয়েছিলেন। এক বিশেষজ্ঞের কাছে বীণাও শিখেছিল শারদা।

শারদা তার বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করত। ভাইটি তাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারত না। শারদা মায়ের আদল পেয়েছিল। জমিদারও তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। শারদার জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন। শারদার এগারো বছর বয়সেই তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে সংগীতসভার

আয়োজন করে তার গান শুনিয়েছিলেন। বৃদ্ধ, শান্ত তেজস্বী ভাস্করমূর্তি বি. এ. এল. টি. তাঁকে চারটি ভাষা এবং ছাপ্পান্নটি বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

এখন শারদার বয়স চোদ্দ। খুব সুন্দরী। সর্বগুণসম্পন্না। তার তপস্যার উপযুক্ত ফল স্বরূপ একটি কল্পবৃক্ষ সংগ্রহ করাই এখন আশু সমস্যা।

জমিদারমশাই নিজে একজন সমাজ সংস্কারক হওয়া সত্বেও এবং শারদাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাতে সচেষ্ট হলেও ঐ পরিবারে যে বয়সে মেয়েদের বিবাহ পুরুষানুক্রমে হয়ে এসেছে, সেই বয়সেই শারদার বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনি একটি যোগ্য পাত্রের সন্ধানে উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

কোনো জমিদার বংশের পাত্রের সঙ্গেই মেয়ের বিবাহ দেওরার ইচ্ছা প্রথম প্রথম তাঁর ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। উল্টে এই শপথই তিনি করেছিলেন যে জমিদার পরিবারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ তিনি কোনো মতেই দেবেন না। কোনো জমিদারের সঙ্গেই নয়।

স্ত্রী বরদকামেশ্বরী দেবী চাইতেন যে শারদার বিবাহ তাঁর ভাইপো কোওয়াডি বসবরাজেশ্বর জগমোহন রাওয়ের সঙ্গে হোক। তাঁর ভাই অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর আনন্দ সর্বেশ্বর লিঙ্গম বিজয়নগরমের পতিতাদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে ধার কর্জে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর জমিদারি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস বাঁচিয়ে দেয়। ধারকর্জ মিটে গিয়ে দু'লাখ টাকা সঞ্চিত হলে পর জমিদারিটি তাঁর ২২ বছরের ছেলে জগমোহন রাওয়ের হাতে সমর্পিত হয়েছে।

এই ছোট্ট জমিদারিকে নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে নানান কথা রটেছিল।

বউ এ ব্যাপারে কথা পাড়লেই লক্ষ্মীসুন্দর প্রসাদরাও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলতেন, "মেয়েটাকে আর নরকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ঐ ছেলের সঙ্গেই তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকে তো রোসো, আগে মনটাকে পাথর বানিয়ে নিই।"

তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দেবার জন্য তিনি সমগ্র অন্ধ্রে জাল ফেলে বেড়াতে লাগলেন। তিনি খোঁজ করছিলেন এমন এক জামাইয়ের, খাওয়া পরার যার অভাব নেই। যে বুদ্ধিমান, সুন্দর এবং গুণবান। লেখাপড়া জানা। প্রসিদ্ধ নিয়োগী [ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক অংশ] পরিবারগুলি তন্ন তন্ন করে

খুঁজলেন তিনি। ঐসব পরিবারের একটি তালিকা এই উদ্দেশ্যে তিনি বানিয়েছিলেন।

অনেক ছেলেই বুদ্ধিমান কিন্তু অর্থ নেই তাদের। আর যাদের কাছে টাকা আছে, তাদের অনেকের কাছে আবার ক-অক্ষর গো-মাংস। আর যার কাছে দুটোই আছে, তাকে আবার দেখতে শুনতে ভালো নয়। এবং যার কাছে এই তিনটেই আছে, সে আবার ঘড়া ঘড়া জহরত চায়। খুঁজতে খুঁজতে জমিদারমশাই হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। নিরাশ হয়ে মাঝে মাঝে তিনি ভাবতেন উপযুক্ত পাত্র হয়তো বা পাওয়াই যাবে না। তাঁর পছন্দসই সর্বগুণসম্পন্ন পাত্র বাদে অন্য কারো সঙ্গে তাঁর আদরের মেয়ের বিবাহ হোক এটা তিনি কিছুতেই ভাবতে পারতেন না।

৪। নারায়ণ

বেজওয়াড়ার প্ল্যাটফর্মে নারায়ণ রাওকে দেখে না জানি কেন তাঁর মন আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠল। হৃদয়ের কোনো অস্পষ্ট ধ্বনি নিঃশব্দ সংগীতের মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে বলতে লাগল, "এই হয়তো শারদার উপযুক্ত হবে।" জমিদার আজও ভেবে পান নি যে কেন সে দিন তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল যে নারায়ণ রাওয়ের বিবাহ হয়নি।

যে ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে কারো সঙ্গে কথা বলেন না, যেটুকু বলেন তাও সমবয়স্কদের সঙ্গেই, নারায়ণ রাওকে দেখে সেই ব্যক্তিই হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "আপনার বিয়ে হয়ে গেছে ?"

তারপর পরিচিত রাজেশ্বর রাওয়ের কাছে নারায়ণ রাও সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ও জেনে নিলেন।

সে যখন বইয়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে বই কিনছিল তখন তার সেই সুলক্ষণযুক্ত দেহ দেখে পৌরুষের মূর্ত প্রতীক বলে তাকে যেন মনে হয়ে গেল তাঁর।

তার প্রতিটি অঙ্গ থেকে, চোখ ও ঠোঁটের ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে দিয়ে এবং

সুন্দর কান ও তীক্ষ্ণ সুগঠিত নাক থেকে নারী সুলভ সৌন্দর্য জ্যোৎস্না ধারার মতো ঝরে পড়েছিল। হাতের আঙুলগুলি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। মনে হয় যেন মুঠি দিয়ে থাম ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে। করপল্লব কিন্তু সুকোমল, ললাট প্রশস্ত। চিকন কালো চুল যেন তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে ঘিরে রেখেছে।

নারায়ণ রাওয়ের যৌবন আর দেহের কান্তির প্রবাহে জমিদার তাঁর বহু কালের পিপাসা মেটালেন। আরও খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে তাঁরই গ্রামের পাশে এই পুরুষরত্নের সঙ্গে ভাগ্যের জোরে দেখা হয়ে গেল।

লক্ষ্মীপতি নারায়ণ রাওয়ের তৃতীয় বোনের স্বামী। আর তার পিসীরা ছেলেও হল বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান। ভাইবোনের স্নেহ ভালোবাস কাকে বলে জানত না সে। সেইজন্য মনটা তার সব সময় পড়ে থাকত শ্বশুর-বাড়িতেই, নারায়ণ রাওকে সে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসত।

প্রথম শ্রেণীর মোলায়েম গদিতে বসে মুখে চুরুট গুঁজে ধূমপান করতে করতে নারায়ণ রাও সম্পর্কে এলুর থেকে তাড়েপল্লিরওড়েম[১] পর্যন্ত লক্ষ্মীপতি যা বলল তা কান পেতে একমনে শুনছিলেন জমিদারমশাই।

"নারায়ণ রাওয়ের মনটা খুবই নরম। কারো কষ্ট সে দেখতে পারে না। ছোট বেলায় কাউকে কাঁদতে দেখলেই নিজে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলত। নিজের কাছে যা থাকত তাই দিয়ে তাকে চুপ করাতে চেষ্টা করত। অনেকগুলো চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও দাদার ছেলেমেয়েদের সে নিজেই কোলে করে বেড়ায়, ওদের খাওয়ায়। আর বাচ্চারাও তাকে পেলে আর ছাড়তে চায় না। মা-বাবাকে ফেলে তার কাছে ছুটে যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুও শুধু দুধ খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময় নারায়ণের কাছেই থাকে। এমনকি তার বিছানাতেই ঘুমোয়। তার কণ্ঠস্বরে রয়েছে ললিত মাধুর্য আর বিদ্যুতের গাম্ভীর্য। সে যখন গান গায় আমার চোখ ছলছল করে। যখন আমাকেও গান শেখাতে বলি, সে বলে আমার মন নাকি সংগীত শেখার মতো পবিত্র নয়।

ছাত্রাবস্থায়ও কারো কোনো অভাব সে দেখতে পারত না। বই, খাবার-দাবার, ছবি প্রভৃতি সব কিছু সে নিজের সহপাঠীদের বিলিয়ে দিত।"

১ দক্ষিণপূর্ব রেলের দুটি স্টেশন।

তাড়েপল্লি থেকে নিডদবোল[১] পর্যন্ত লক্ষ্মীপতি নারায়ণ রাওয়ের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে গল্প করল।

কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় সে ফেল করে নি। প্রত্যেক শ্রেণীতেই প্রথম হয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েটে তিনটি বিষয়ে সে প্রথম হয়েছে। সোনার পদক পেয়েছে। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে আন্দোলন শুরু হতেই কলেজ ছেড়ে সে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেলেও যেতে হয়েছে। ছ'মাস সেখানে কাটিয়েছে। জেল থেকে ফিরে এসে স্বরাজ্য পার্টি তার পছন্দ হল না। ছেড়ে দিল বি. এস. সি. অনার্স পাশ করল। দ্বিতীয় স্থান পেল। ল-প্রিভিয়াসেও নিশ্চয় সে প্রথম স্থান অধিকায় করবে।

নিডদবোল পেরুনোর পর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ রাওয়ের জমিজমা সম্পর্কে বলতে শুরু করল। "দু' ভাই ওরা। ৩২০ একর চাষের জমি আছে। আর বাগান টাগান একর তিরিশেকের বেশি হবে। তেজারতির কারবারে এক লাখ ষাট হাজার টাকা খাটে, বার্ষিক আয় কম করে বিশ হাজার। আমার শ্বশুর সুব্বারাও ভালো লোক, আমার শ্বাশুড়ী জানকাম্মা যেন পার্বতী। চারটি মেয়ের প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ভালো পরিবারেই বিয়ে হয়েছে।"

জমিদার—তোমার সম্বন্ধী তো দেখছি সর্বগুণসম্পন্ন। কপালের জোর থাকলে আমি আর আমার মেয়ে দুজনই ধন্য হব।

লক্ষ্মীপতি—তাতে কী আছে, আপনি বড়লোক, আপনি ইচ্ছে করলে বড় কোনো জমিদার পরিবারের ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন।

জমিদার—জমিদারদের কথা বাদ দিন। আমাদের নিয়োগীদের মধ্যে একটা ভালো সম্বন্ধের কথা বলুন। আপনি বয়সে ছোট, পড়ছেন, একটা ভালো সম্বন্ধ বাছাই করে বলুন।

হাস্যোজ্জ্বল মুখে লক্ষ্মীপতি বলল, "ওসব ব্যাপারে আমি আর কী বলি বলুন।"

জমিদার—আমি তো জানতামই না যে আমার এত কাছে মহারাজাদের উপযুক্ত সম্বন্ধ রয়েছে। যাক্ ভগবানের কৃপায় দেখাটা তো হল। নতুবা সারাজীবন পস্তাতে হত।

লক্ষ্মীপতি—মন যখন চায় সব কিছুই তখন ভালো লাগে। ও যদি

১ দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের স্টেশন।

আপনার জামাই হয় তাহলে আমি সত্যিই খুব খুশি হব। আমাদের গ্রামের ছেলে তো।

জমিদার চোখ বুঁজে কী যেন ভাবতে লাগলেন :

একটি সুন্দরী নারী, সন্তানের জননী, নারায়ণ রাওয়েরই মতো যার মুখের আদল, তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে সে গোদাবরীর জলের দিকে তাকাচ্ছে। সে যেন প্রেমের প্রতিমা। স্বামীর দিকে সে যেন হাজার চোখে চায়, হাজার হাতে যেন তার সেবা করে। এই গোদাবরীর জলের সঙ্গে তার মনের কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। হিন্দু রমণী, স্বামীর জন্য যাঁরা সব কিছু বিলিয়ে দেন, নিঃসন্দেহে পূজনীয়া তাঁরা। গোদাবরীর জলে যেন নিজের ছোট্ট প্রিয় পুত্রের মুখ দেখল। মুখে যেন তার গোধূলির আবির ছড়িয়ে পড়েছে, সে হাসছে।

গোদাবরী পেরিয়ে ট্রেন থামল স্টেশনে। জমিদার এবং লক্ষ্মীপতি নামল ট্রেন থেকে।

"আচ্ছা এবার তাহলে আমাকে যাবার আজ্ঞা দিন। নমস্কার।" লক্ষ্মীপতি বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। আলম এলুরেই নেমে গিয়েছিল। কুলিরা দু-চার মিনিটের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। রাজেশ্বর রাও, নারায়ণ রাও এবং লক্ষ্মীপতি—পরমেশ্বর মূর্তি আর রাজা রাওয়ের পিঠ চাপড়াল। তাঁদের সঙ্গে সস্নেহে হাত মিলিয়ে, টিকিট নিয়ে তারা গেটের কাছে গেল। ইতিমধ্যে আরেকজন লোককে নিয়ে জমিদারমশাই এসে পড়লেন। সঙ্গে চার-পাঁচ জন চাপরাসী এবং তিনজন কর্মচারী।

জমিদার—ইনি আমার বাল্যবন্ধু। এঁর নাম ওয়েলা শ্রীনিবাস। এই শহরের একজন বড় উকিল।

শ্রীনিবাস—আপনাদের মতো তরুণ দলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জমিদারমশাইয়ের কাছে এই একটু আগেই শুনলাম যে আপনারাই ভবিষ্যৎ অন্ধ্রের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী।

জমিদার—এঁর নাম লক্ষ্মীপতি। আর ইনি ওঁর শ্যালক নারায়ণ রাও।

জমিদার কষ্ট করে তৃতীয় জনের নাম মনে করার চেষ্টা করছেন দেখে লক্ষ্মীপতি বলল, "আর এর নাম রাজেশ্বর রাও নাইডু।"

শ্রীনিবাস—ভারি খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে। আপনাদের সবাইকে আজ আমার অতিথি হতে হবে। লক্ষ্মীপতিবাবু, আপনি আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে মনে দুঃখ দিয়েছেন এই অভিযোগে এক নম্বর ঠুকে দেব।

লক্ষ্মীপতি একটু ভেবে জবাব দিল, "রাজেশ্বর রাও সম্পর্কে বলতে পারি না। তবে আমরা দুজনে নিশ্চয় যাব।"

রাজেশ্বর—আমি বাড়ি গিয়ে ফিরে আসব।

শ্রীনিবাস—অবশ্যই আসবেন কিন্তু, না এলে ঠিক কেস করে বসব।

রাজেশ্বর—আপনাকে তিন পয়সার ডিক্রি দিয়ে দেব। বলেন তো এখনই দিয়ে দিই।

শ্রীনিবাস—রাজেশ্বর রাও মশাই, আপনার বাবা আমার পুরোনো বন্ধু। আমার একটা কথা না হয় একদিন রাখলেন।

রাজেশ্বর—না, না, ঠিক আছে। দশটার সময় আসব।

সবাই স্টেশনের বাইরে এল। জিনিসপত্র জমিদারের ঘোড়ার গাড়িতে চাপানো হল। শ্রীনিবাস তাঁর মোটরে দুই অতিথিকে বসালেন। আর জমিদার নিজের গাড়িতে গেলেন।

৫। শারদা

গৌতমী নদীর স্পর্শশীতল প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধ বাতাস বাগানে লুকোচুরি খেলছে। বসন্তের সুরভিতে আমোদিত চতুর্দিক। রজনীগন্ধা, গোলাপ, চাঁপা, চামেলী প্রভৃতি রঙ্‌বেরঙের ফুলেভরা জমিদারের বাগানে, মুগ্ধ বনলক্ষ্মীর মতো শারদা ফুল তুলছিল। শারদা ফুল বড় ভালোবাসে—আর কোন মেয়েই বা বাসে না? ফুলের ইতিহাস যে জানে, ফুলের নাম আর ওদের ভাষাও সে বোঝে।

কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে কী ফুল ফোটে সে কথা বলতে গিয়ে শারদা উল্লসিত হয়ে উঠত। কুমারী শারদা মূর্তিমতী সৌন্দর্য। চোখদুটি কখনো তার পূর্ণপ্রস্ফুটিত কখনো বা অর্দ্ধনিমীলিত। মনকে মেলে ধরে জীবনের

বৈচিত্র্য অনুভবের মধ্য দিয়ে কখনো বা সে বিস্ময়ান্বিত হয়। তার চোখের কালো তারা দুটিকে গভীর রাত্রের নীলাকাশের মতো দেখায়। তার গায়ের রঙ দেখলে মনে হয়, যেন খাঁটি সোনার সঙ্গে পদ্ম রঙের মিল হয়েছে। নবযৌবনের প্রথম কান্তি যেন তার মাথা নাক কপোল ঠোঁট চিবুক আর কানে নৃত্যপর। ভ্রূদু'টি তার চাঁদের মতো অর্ধবৃত্তে কানের কাছে এসে বিলীন হয়ে গেছে। সোনার বরণ তীক্ষ্ম উজ্জ্বল নাক। সুন্দর চিবুক। নদীর ঢেউয়ের মতো আলোঝলমল নৃত্যদোদুল, চন্দনরঙ রেশমী ঘাগরা তার পরনে। গায়ের গোলাপী জ্যাকেট ভেদ করে উন্মেষোন্মুখ যৌবন যেন উঁকি মারছে।

মাথার এক পাশে সিঁথি। রেশমী কালো দীর্ঘ এক গোছা চুল কোমর ছাড়িয়ে গেছে, পায়ে লুধিয়ানার জরির কাজ করা মোলায়েম মখমলের চটি। কানে কানবালা। নাকে নথ। গলায় হীরে মুক্তোর কাজ করা হার। ডিঙি মেরে সে ফল পাড়ছিল। এমন সময় হাঁক দিয়ে কে যেন বলল, "বাবা এসেছেন।"

সে যে জমিদারনন্দিনী এ সম্বন্ধে শারদা ছিল বেশ সচেতন। বংশধারা থেকে পেন্না পর্যন্ত সমগ্র অন্ধ্রে খ্যাত জমিদারিণী সারদাম্বার নাতনী সে। তার মধ্যে যেন সারদাম্বার গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে।

"মা, সারদাম্বা, এই দীপ তুমিই জেলেছ। এই সন্তান তোমারই দেওয়া। এই বংশকে তুমি উদ্ধার করেছ।" এই ভাবে আজও জমিদারের মাকে অনেকে স্মরণ করে। জমিদারের বাবার আমলে, তিনি বড় হবার পর, জমিদারির কাজ সামলেও সারদাম্বা আজীবন অহোরাত্র সকল জাতি ধর্মের লোককে অন্নদান করতেন। হরিজনদেরও রান্না করিয়ে খাওয়াতেন তিনি। বহু জনের বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি নিজে। সংগীতজ্ঞ সাহিত্যিক সাধু প্রভৃতি বহু লোকে বার্ষিক দান পেতেন তাঁর কাছ থেকে। হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত কোটিপতি ব্যবসায়ী গঙ্গারাজ সুজনরঞ্জনের একমাত্র কন্যা ছিলেন তিনি। সদগুণ-সম্পদ তাঁর মধ্যে গঙ্গাযমুনার মতো মিলিত হয়েছিল।

বাবা এসেছেন শুনে শারদা অত্যন্ত আনন্দিত হল। ছোট্ট ঝাঁপিতে ফুল ঢেলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল সে। তারপর আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে

চুল ঠিক করে নিয়ে, চুলে ফুল গুঁজে, ভেঙ্কায়াম্মার কাছে জেনে নিল বাবা কোন ঘরে রয়েছেন।

জমিদার পড়ার ঘরের সোফায় বসে ছিলেন। শারদার মা বরদকামেশ্বরী দেবী এক গদিওয়ালা চেয়ারে বসে স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। জমিদারের দিদি সুন্দর বর্ধনাম্মাও ছিলেন সেখানে। তিনিই বললেন, "কী ভাই, কী ব্যাপার? ডাকলেন কেন?"

সুন্দর বর্ধনাম্মা বিধবা। তাঁর স্বামী বিশ্বনাথম হাইকোর্টের জজ ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন। বেদবেদান্ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ঔৎসুক্য তাঁর কম ছিল না। সব সময় পাটের অথবা রেশমী কাপড় পরতেন। তাঁর ছেলেও বাবারই মতো মাদ্রাজেই ওকালতি করে অনেক টাকা রোজগার করছে। সংসার ভালোই চলছে। জমিজমা করেছে। ছেলের ঘরে বংশের চিরাচরিত সদাচার পূজাপাঠ, ব্রত উপবাস সবকিছু ঠিকমতো রক্ষা করা যাবে না বলে ভদ্রমহিলা ভায়ের বাড়িতে রয়েছেন। এ পরিবারে তাঁর মতামতের গুরুত্ব যথেষ্ট।

জমিদার—আজ ছোট মেয়েটার জন্য এক পাত্র আসবে।

বর্ধনাম্মা আর বরদকামেশ্বরী দুজনেই এক সঙ্গে বললেন, "কোত্থেকে, কে?"

জমিদার—নতুন সম্বন্ধ।

বর্ধনাম্মা—আমাদেরই আশেপাশের তো? সারা তল্লাট তো আগেই খোঁজ হয়েছে। এখন যারা আসছে তাদের তো আগেই আমরা বাতিল করেছি।

বরদকামেশ্বরী—জমিদারঘরের ছেলে তো?

জমিদার হেসে জবাব দিলেন, "আমাকে বলতে দাও। পাত্র আমাদের এই অঞ্চলেরই। জমিদার ঘরের না হলেও খাঁটি ব্রাহ্মণ ওঁরা। প্রচুর বিষয় সম্পত্তি আছে।"—স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "জমিদারদের টাকা ধরে দেওয়ার মতো শক্তি তাঁদের আছে।"

বর্ধনাম্মা—গ্রামে আমাদের জাতের অনেক পরিবার রয়েছে, যারা লঙ্কাবাটা ভাত খায়। বেনেদের মতো টাকা জমায়। এই ধরনের কোনো পরিবারের ছেলে নয়তো?

বরদকামেশ্বরী—ভালো বললে তুমি!

জমিদার—আমাদের চেয়েও ওঁরা অনেক গুণে ভালো। চাল চলন, মানমর্যাদার দিক দিয়ে এত উচুঁতে যে ওসব ব্যাপারে আমাদের শিখিয়ে দিতে পারেন অনেক কিছু।

বর্ধনাম্মা—পাত্রকে দেখতে শুনতে কেমন?

জমিদার—এই তো এল বলে। নিজের চোখেই দেখে নিও। গায়ে যা জোর আছে একটা তাগড়াই ষাঁড়ও তার সঙ্গে পারবে না।

বর্ধনাম্মা—ভালো কথা—ভুলে গিয়েছিলাম, পড়াশুনা কতদূর?

জমিদার—পাত্রটি রূপে কামদেব। রোগা ফ্যাকাশে জড় পদার্থ মার্কা জমিদার তনয়দের চেয়ে এ পাত্রটি তোমার হাজার গুণে ভালো। অর্জুনের মতো সুন্দর। আর ভীমের মতো বলবান। এই পাত্রের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেলে মনে করব আমাদের শারদা সত্যি সত্যিই ভাগ্যবতী।

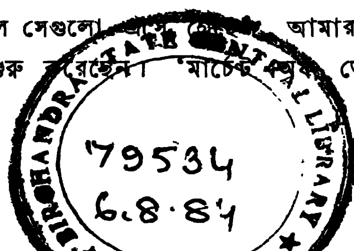
বর্ধনাম্মা—অর্থাৎ আপনি আমার ছেলেকে অপছন্দ করছেন। কেন, তার মধ্যে কিসের ঘাটতি রয়েছে? কোন বিষয়ে সে কম শুনি? আমাকে বলেননি কেন? একটু বেশি খরচে এই যা। সেই জন্যই তো যখন তখন বকুনিও খায়।

বরদকামেশ্বরী—যাক, শারদা এখন বড় হয়েছে, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার সে কী চায়। আপনি নিজেও তো সমাজ সংস্কারক বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলুর বন্ধু ছিলেন। মেয়ের পছন্দসই পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া উচিত নয়কি?

বর্ধনাম্মা—ও, তাহলে তোমার মতে স্বয়ংম্বরসভা হোক, শারদা নিজেই পাত্র বাছাই করে নিক।

ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ গতিতে শারদা ঘরে ঢুকল। বাবা হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পগুচ্ছের মতো এসে তাঁর কোলে বসল। তাকে সোফায় নিজের পাশে বসিয়ে তার চুলের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বাবা বললেন, "মা শারদা, কোথায় ছিলে তুমি?"

শারদা—ফুল তুলতে বাগানে গিয়েছিলাম। আর একটু দেখছিলাম সব গাছে জল পড়েছে কিনা। বাবা, যে বইগুলোর জন্য তুমি মাদ্রাজে চিঠি লিখেছিলে সেগুলো এসে গেছে। আমার ইংরাজী টিচার কালকে শেকসপীয়র শুরু করেছেন। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', বইগুলোর মধ্যে



ওটাও আছে। ছবিগুলোও চমৎকার। কিন্তু আমার যে দরকার ভেরিটি এডিশন্। ওটা আনাও না বাবা।

জমিদার—তোর বয়সে আমি শেকসপীয়রের নামই শুনিনি। ভালো শিক্ষয়িত্রী পেয়েছিস। আমার কাছে আর্ডেন এডিশন রয়েছে। ভেরিটি এডিশনের চেয়েও ওটা অনেক বেশি ভালো।

ওদের মধ্যে ইংরাজীতেই কথা হচ্ছিল। বাবা মেয়ের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে ইংরাজীতে বললেন, "শারদা, জগৎমোহন রাও সম্বন্ধে তো তোকে আগেই বলেছি। আজ এমন এক পাত্রকে ডেকে পাঠিয়েছি যে সবদিক দিয়ে তোর যোগ্য। লেখা পড়ায় সে অগ্রগণ্যদের মধ্যে অগ্রণী। দেখতে শুধু সুন্দরই নয় শরীরে শক্তিও আছে। বিষয়সম্পত্তির দিক দিয়ে আমাদের অর্ধেক নিশ্চয়ই রয়েছে। ল' প্রিভিয়াস পরীক্ষা দিয়েছে। প্রথমস্থান অধিকার করতে পারে। স্কুল কলেজ আর খেলায় এতকাল এত মেডেল সে পেয়েছে, যে তা দিয়েই একটা বড় দোকান খোলা যায়।"

শারদার লজ্জা পেল। হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল সে। বর্ধনাম্মা ভাইকে বললেন, আপনাকে বলতে হয়তো লজ্জা পাচ্ছে।"

"ওরা সব মেয়ে দেখতে সন্ধ্যের সময় আসবে।" বলে জমিদার স্নান করতে চলে গেলেন।

৬। কোত্তপেট

সুব্বারায় রসিক পুরুষ। চমৎকার কথা বলেন। কথা বলার ঢঙ যেমন সুন্দর, মিষ্টিও ঠিক তেমনি। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুব স্বচ্ছ ও গভীর। বড় বড় উকিলও তাঁর কথা কান পেতে শুনতেন। মহাজনি লেনদেনের ব্যাপার বাদে সব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। দক্ষ বিচারকের মতো বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখতেন তিনি। কোনো বিষয়ে বিচার করার সময় তাঁর মন পক্ষপাত দুষ্ট হত না। পড়াশুনা চালিয়ে গেলে তিনিও বড় উকিল হতে পারতেন। হিন্দু ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি অগাধ পড়াশুনা করেছিলেন। তারই ভিত্তিতে একবার তিনি একটি দত্তক সম্বন্ধীয় অ্যাডপশনের কেস

জিতে ছিলেন। ঐ মামলার রায়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আইনেরও যথাযথ পরিবর্তন ঘটেছিল। ওঁর সম্বন্ধে এই কাহিনীটি প্রচলিত রয়েছে।

রঙ ফরসা। বলিষ্ঠ চেহেরা। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। দাড়ি গোঁফ তাঁর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিশাল বক্ষ, পেশীপুষ্ট হাত, বড় বড় চোখ। সুউচ্চ কপাল, পরিচ্ছন্ন উপবীত প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে তাঁকে যেন দ্রোণাচার্যের মতো দেখায়।

অনেক গল্প জানতেন তিনি। বড় বড় পণ্ডিতও তাঁর গল্প একাগ্র চিত্তে শুনতেন। বহু ভাষার নামকরা গ্রন্থ তাঁর পড়া ছিল। প্রয়োজন বোধে বহু গল্প তিনি মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। আর একবার যা মুখস্থ করতেন তা কোনোদিন ভুলতেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি কাশী মজিলীর অদৃষ্টদীপের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, তাঁর মেয়ে হুঁ হাঁ করে শুনে যাচ্ছিল। ছেলে এবং তার দুই পুত্র, পুত্রবধূ, মেয়ে, কয়েকজন কৃষক জনকয়েক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ বন্ধু এবং একজন ধোপা তাঁর কাহিনী শুনছিল। ঠিক সেই সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল।

নারায়ণ রাও এল। “দাদা এসেছে, মা দাদা এসেছে” বলতে বলতে সূর্যকান্তম উঠে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেল। নারায়ণ তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। “কাকা, কাকা” বলতে বলতে নারায়ণ রাওয়ের দুই ভাইপো, ভাইঝি ছুটে এল। তিনজনকেই নারায়ণ রাও একসঙ্গে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিল। একটিকে বসাল কাঁধে, একটিকে কোলে, আর একটিকে হাতে। কোচওয়ান, নাপিত এবং ধোপা গাড়ি থেকে সব জিনিস বয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে রাখল। নারায়ণ রাও একটা বড় বাক্স বারান্দায় রাখল। বাক্সের তালা খুলে নানান রকম জাপানী খেলনা, তামা, রূপো ও হাতির দাঁতের কাজ করা জিনিস, চন্দন কাঠের রকমারি জিনিস, রেশমী খদ্দরের শাড়ি, জামা, ঘাগরা, গায়ের চাদর, আরও অনেক কিছু বের করে নিচে রাখল। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মা, বৌদি, বাচ্চারা আর দাদা। “ঘোলাগালি আমি নেব।” দাদার ছোটছেলেরা আধো আধোস্বরে বলল। “কাকু, আমার মোতর গাড়ি ওর ঘোলাগালির চেয়েও ভালো না?” দাদার বড ছেলেটি বলল। “আমার চাঁদির খেলনার কাছে তোমাদের ওসব কিছুই না,” মেয়ে বলল।

সূর্যকান্তম রঙ-বেরঙের জরির কাজ করা উত্তরীয় ও চন্দন কাঠের জিনিস দেখে বেজায় খুশি হল।

"নারায়ণ এ সবের জন্য হয়তো একশো টাকা খরচ করেছে। হাতে টাকা থাকলে রক্ষে নেই, জলের মতো খরচ করে," দাদা শ্রীরামমূর্তি মন্তব্য করল।

নারায়ণ রাওয়ের দাদা শ্রীরামমূর্তি নারায়ণ রাওকে যে মনে মনে কত ভালোবাসত তা একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানত না। মা, বাবা, শ্রীরামমূর্তির বউ বরলক্ষ্মী আম্মা প্রভৃতি তার কিছুটা আঁচ পেত। শ্রীরামমূর্তি সুব্বারায় এবং জানকী আম্মার বড় ছেলে। বয়স তিরিশ বছর হবে। বি. এ. পাশ করে ওকালতি পড়া শেষ করে এখন সে আমলাপুরে প্র্যাকটিস করছে। প্রচুর রোজগার তার। সবাই তাকে সমঝদার এবং চতুর মনে করে। কোর্ট বাড়ি, বউ ছেলেমেয়ে মা বাবা ভাইবোন এবং বউয়ের নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই তার দুনিয়া সীমিত। সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না সে। নারায়ণ রাওয়ের মাসিমার মতোই সেও শ্যামবর্ণ, মোটাসোটা। লম্বায় পাঁচফুট সাত ইঞ্চি হলেও নারায়ণ রাও এবং বাবার কাছে চেহারার দিক থেকে খাটো মনে হত।

"দাদা, তোমার জন্য এই চন্দন কাঠের বাক্সটা এনেছি। এর ভেতর কাগজ-পত্র রাখতে পারবে। ভালো দেখতে, না? একবার দেখো এর কারু-কার্য। ঢাকনার ওপরে গোবর্ধনধারণের দৃশ্য। আর ভিতরে রাবণের কৈলাস পর্বত তুলে ধরার দৃশ্য। নিচে রাম হরিণের পেছনে ছুটছেন, পাশে একদিকে সীতা অশোক বনে বসে আছেন। অন্য দিকে বৃন্দাবনে গোপিনীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ। এর দাম পঁচাত্তর টাকা।"

"এইটুকু একটা জিনিসের এত দাম।"

"কী সুন্দর কারুকার্য দেখেছো!"

"বউদি, তোমার জন্য এনেছি পোন্দুরের শাড়ি।"

"পোন্দুরের শাড়ি আনতে গেলে কেন? সাত আট টাকা দিলে মিহি খদ্দরের শাড়ি পাওয়া যেত।" দাদা বলল।

"না দাদা। বউদি সব সময় মোটামোটা শাড়ি পরে। এমনিতেই

বউদি একটু মোটা, তার উপর ওগুলো পরলে দ্বিগুণ মোটা দেখায়। তাই তিনটি সুতী আর একটি রেশমী শাড়ি কিনে এনেছি। মা'র জন্যেও চারটে এনেছি। আর তোমার জন্য এনেছি দুটো জরির কাজ করা উড়ুনি, একটি পোন্দুরের অন্যটি সেলমের। বন্দর শহর থেকে বাবার জন্য এনেছি চারখানি ধুতি আরও ছোটখাটো দু-একটি জিনিস। বোনের জন্য, বাচ্চাদের জন্য তোমার জন্য সকলের জন্য এনেছি।"

শ্রীরামমূর্তির মুখে আনন্দমধুর হাসি। দিনে কম করে দু-তিন বার পরের কাছে ভাইয়ের প্রশংসা করে, "আমার ভায়ের কথা আর বোলো না। শরীরটা যেন পাথরের মতো। অথচ মন যেন মাখন। বাবার চেহারাকে যদি তোমরা দশমীর চাঁদ বলো, তবে ভায়ের চেহারাকে বলতে হবে পূর্ণিমার চাঁদ। দেশ কোনোদিন স্বাধীন হলে মুখ্য মন্ত্রিত্ব নিশ্চয়ই আমার ভায়ের পাওয়া উচিত। কী তীক্ষ্ণ মেধা, নৌরোজী, সি. আর. দাস, নেহেরু, রাধাকৃষ্ণান, পট্টভী, আর হল্ডেনের মতোই।"

নিজে কঞ্জুস প্রকৃতির লোক হলেও ভাই বাজে খরচ করলে কিছু বলে না সে। নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন সে নারায়ণ রাওয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে দেখেছে।

নারায়ণ রাও সে কথা ভালো ভাবেই জানত। বন্ধুরা মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলত, "এমন লোভী-কিপ্টে পাথুরে মনের দাদাকে নারায়ণরাও কী করে যে এত শ্রদ্ধা করে ভেবে পাই না।"

'হ্যাঁ বাবা, তোমার বাবা যে পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিল তা খরচ হয়ে গেছে?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ মা, শুধু তাই নয়, এখনও একটা শ' দেড়েক টাকার ভি. পি. আসছে।"

"ছেলে আসা পর্যন্ত শুধু তার তদ্বিরই করা হচ্ছে। বলি, আমাকে কি খেতে দেবেনা?" সুব্বারায় হাসতে হাসতে বললেন। লক্ষ্মীপতির সঙ্গে তখনই তিনি ঘরের ভিতরে পা রাখলেন।

হাসি-ঠাট্টায় সুব্বারায় অদ্বিতীয়। তিনি সব সময় হাসি-খুশি থাকায় বউও খোশ মেজাজে থাকে।

"বোন রান্না করছে। অন্যান্য দিন আটটা বেজে গেলেও ওঠার নাম

করে না। ন'টার আগে কোনদিনই বা খেতে বসেছ! হাজার বার খোশামোদ করলেও আসার সময় হয় না। আর আজ ছেলে ফিরেছে বলে এত তাড়াতাড়ি পেটে ইঁদুর ডন মারতে শুরু করেছে?"

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন জানকী আম্মার বোন লক্ষ্মীনরসাম্মা। আড়ালে দাঁড়িয়ে জিনিসগুলো দেখছিলেন তিনি। "আমার জামাইবাবুর কাছে কি ওগুলো নতুন! তোমাদের পেটে এক কথা আর মুখে আর এক কথা কেন?"

"এইরে, বোনে বোনে লেগেছে! মেয়েরা একবার দক্ষযজ্ঞ শুরু করলে পুরুষদের লুকোনোর আর জায়গা থাকে না।" সুব্বারায় হাসতে হাসতে বললেন।

৭। পরমেশ্বরমূর্তি

পরমেশ্বর মূর্তি রাজা রাওকে সামর্লকোটায় কাকিনাড়ার গাড়ীতে তুলে নিজে আবার মেলে চড়ে বসল। পরমেশ্বর মূর্তির চেহারা ছিপছিপে। ভারি সুন্দর চোখ, গায়ের রঙ যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথা সুগঠিত। পাতলা ঠোঁট। মাত্র কয়েক গাছা চুলের তৈরী এক জোড়া গোঁফ। গোনা যায়। ছোট কান। লম্বা গ্রীবা। উঁচু কাঁধ। কৃশ কিন্তু সুগোল বাহু। প্রতি অঙ্গে যেন তার নারীত্বের প্রকাশ! সাঁতার কাটায় প্রথম পুরস্কার না পেলে তাকে হয়তো পুরুষের মধ্যেই কেউ ধরত না।

কণ্ঠস্বর মিষ্ট। ভালো গান গায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ এবং মন যেন নতুন নতুন রূপে রসে ভরে যায়।

প্রকৃতি যেন তার মা। তার চিন্তাশক্তির উন্মেষকারিণী। প্রাকৃতিক দৃশ্য তার হৃদয়কে প্রভাবিত করে। স্রষ্টার প্রত্যেকটি সৃষ্টি তার কাছে মেরু-পর্বতের মতো বিস্ময়ের বস্তু।

দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে পরমেশ্বরের আগ্রহ নেই। নিজের সাধারণ জ্ঞানের জোরেই যখন পরীক্ষায় সে সফল হয় তখন তার আশ্চর্য লাগে।

পরম সুহৃদ্ নারায়ণ রাওয়ের মতোই সে সৌন্দর্যপিপাসু। একদিন সে এক

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তার সুসজ্জিত ঘরখানিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল। সাদা দেয়ালে ভারতের বড় বড় চিত্রকারদের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি ঝোলানো। দরজা এবং জানলায় খদ্দরের পর্দা টাঙানো। তার উপর ছাপার সুদৃশ্য কাজ করা কিন্তু ঐ সুসজ্জিত ঘরের এককোণে একটা নোংরা ক্যালেণ্ডার দেখে পরমেশ্বর শিউরে উঠল। মনে হল তার চোখে কেউ যেন কয়লার গুঁড়ো ঢেলে দিয়েছে। কিম্বা তার দাঁতের মধ্যে যেন পাথরের টুকরো পড়েছে।

পরমেশ্বর মূর্তির বিবাহ অল্প বয়সেই হয়েছিল। সে নিজে রসিক প্রকৃতির মানুষ। তার বউয়ের কিন্তু একেবারে রসজ্ঞান ছিল না। সুন্দর কাকে বলে সে জানত না। সাজগোজের ব্যাপারে তার জ্ঞানগম্যি একেবারেই নেই। নিছক সংসারী সে। ঘরের কাজ সে খুব যত্নের সঙ্গে করত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মৌমাছির মতো সব সময় কিছু না কিছু করতেই থাকত। বাসন মাজা, তরকারি কোটা, চাল বাছা থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ সে নিজে করত। তার উপর বোন কিম্বা অন্য কেউ এলে তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার কাজও সে নিজেই করত।

দেখতে শুনতে এমন কিছু সুন্দর না হলেও তার শরীরে একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল। চোখে মোলায়েম স্নিগ্ধতা। শান্ত সরল অকপট মনটি প্রতিফলিত হত তার চোখে।

আজেবাজে কথা বলে অথবা সেজেগুজে স্বামীর মন ভোলানোর চেষ্টা কোনোদিন সে করে নি। পরমেশ্বর মূর্তির ইচ্ছা বউ একপাশে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াক বা বোম্বাইয়ের মেয়েদের মতো মাঝখানে সিঁথি কেটে দুপাশে বেণী ঝুলিয়ে চুল বাঁধুক। মুখে পাউডার লাগানোর বা পরিচ্ছন্ন শাড়ি পরার কথা বলে বলে সে হয়রান হয়ে গেছে। শাদা শাড়িতে রাত্রে মেয়েদের সৌন্দর্য যে উপচে পড়ে একথা সে তার বউকে বোঝাবার চেষ্টা করেনি।

এসব কথা শুনে রুক্মিণী শুধু হাসে। তার ধারণা বেশ্যাসুলভ অমন সাজগোজের কোনো প্রয়োজনই ঘরের গৃহিণীদের নেই। পরমেশ্বর পিথাপুরম স্টেশনে নেমে বাড়ি পৌঁছলে তাকে দেখে রুক্মিণীর আনন্দ আর ধরে না।

ঘরে ঢুকে পরমেশ্বর মূর্তি বউকে আলিঙ্গন করল। চুম্বনে চুম্বনে তার দু'গাল ভরে দিল। ঘরে অন্য কেউ না থাকলেও রুক্মিণী লজ্জা পেয়ে বলল, "অসভ্য। সব সময় খালি এই।"

"আর কত সংযত থাকি বল? আচ্ছা তুমি কী! আটখানা চিঠির জবাবে তুমি দিলে কিনা মাত্র দুটো। উঃ কী শক্ত তোমার মনটা, রুক্মিণী। এই তিন-তিনটে মাস আমার কীভাবে যে কেটেছে তা তোমাকে বোঝাব কী করে। শুধু তোমার ফটো দেখে কি আর আশা মেটে। বছরের পর বছর তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমার কোনো পরিবর্তন নেই। তুমি সেই সেকেলে সনাতন বউদের মতোই থেকে গেলে।"

"বারে, আমি কী করব। মা যদি জানতে পারে। ঐ দুটো চিঠিও ভয়ে ভয়ে চাকরানীকে দিয়ে লুকিয়ে আনিয়ে তোমাকে দিয়েছি।"

"আর চিঠির ভাষার কী ছিরি। লেখার সময় কি মনে ছিল না কাকে লিখছ। দু-চার লাইন লিখে ফেললেই কি আর চিঠি হয়ে গেল।"

করুণ মুখে রুক্মিণী স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আচ্ছা, যাক সে কথা। এ কী, ঘরের এ কী অবস্থা করে রেখেছ। কতবার বলেছি না ঘর সাজানো জীবন সাজানোরই সমান। এসব এরকম অগোছাল ভাবে পড়ে আছে—ছি-ছি-ছি, তুমি কী, অ্যাঁ?"

"তুমিই যখন নেই, এ ঘর সাজিয়ে কী লাভ? অত সাজিয়েগুছিয়ে কোন আনন্দে এ ঘরে একা বসব।"

"যাক সে কথা।" পরমেশ্বর মূর্তি বউকে আলিঙ্গন করে বলল, "একটা চুমো দাও।"

সলজ্জ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বামীর ঠোঁটের উপর সে ঠোঁট রাখল এবং সেই মুহূর্তেই "আর নয়" বলে চলে গেল।

পরমেশ্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনির আলো আঁধারী খেলার কথা ভাবছে। ধ্বনির সঙ্গেই থাকে প্রতিধ্বনি। সুন্দর রমণীকে ভালোবাসতে চাইলে বা আদর করতে চাইলে, হয় সে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, নয় তো পাথুরে মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ জগতে হয়তো পূর্ণতা নেই।

বাপ মায়ের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে, বাপের বাড়িতে আসা বোনের সঙ্গে দু-চার কথা বলে, সে তার ভাগ্নেভাগ্নীদের আদর করল। মাদ্রাজ থেকে আনা জিনিসগুলো সব বিলি করল সে। তারপর স্নান খাওয়া ঘুম সেরে ঘর সাজাতে লেগে গেল।

পরদিন নারায়ণ রাওয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি এল।

"পরম, শোনো কবিবর, শোনো বন্ধু শোনো, ঐ মেয়েটির রূপলাবণ্য সরস্বতীর মধ্যেও নেই। আমাকে, আমার হৃদয়কে, আমার আত্মাকে সে জয় করে নিয়েছে। আমায় একাত্ম করে ফেলেছে, তোমার কোনো চিত্রকর বন্ধু তার ছবি আঁকার জন্য তুলি ধরতেও পারবে না। চামেলীর কুঁড়ির মতো তার চোখে কত কথা।

জমিদারের সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, সেই শ্রীনিবাস রাও ঐ শহরের নাম করা উকিল। তাঁর বাড়ি থেকে আমরা জমিদারের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মেয়ে পছন্দ হয়েছে?' পরম, তোমাকে কি বলব, তখন কি আমার মুখ ফুটে কোনো কথা বলার অবস্থা ছিল। ঐ সোনার প্রতিমার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার কী আছে? তুমি নিশ্চয় ট্রেনেই জমিদারের মতলব ঠাহর করতে পেরেছিলে। বুঝেও ছিলে সবকিছু। আমিও মিনিট কয়েকের কথাবার্তায় বুঝেছিলাম। তখন থেকে আমার যা লজ্জা পাচ্ছিল। আমার মতো এক কঠোরহৃদয় মানুষের কাছে বলি দেওয়ার জন্যই কি উনি এতদিন ওঁর অমন সুন্দর মেয়ের বিয়ে দেন নি!

মনে হচ্ছে ওখানেই আমাকে নোঙর ফেলতে হবে, বউসহ তোমাকে আমার বিয়েতে আসতেই হবে। আর যদি বাবা, মা, ভাই বোন সবাইকে নিয়ে আসতে পার তাহলে আমি যে কী খুশি হবো সে আর কী বলব।

আমার চোখের পাতায় ঐ মেয়েটির ছবি যেন লেগে আছে। বিচিত্র এক আনন্দানুভূতিতে আমি বিভোর হয়ে আছি।

তবে একটা খটকা মনে রয়ে গেল। সবদিক ঠিক আছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পরিবার মোটামুটি সচ্ছল হলেও কনে যে পুরো দস্তুর একটি জমিদার পরিবারের সুখ আর সমৃদ্ধির মধ্যে মানুষ। ধনসম্পত্তির আলো বাতাসে সে এত বড় হয়েছে। আমার খট্‌কা হল যদি ওর জীবনে জীবনযোগ না হয়। যদি আমরা পরস্পরের মধ্যে খাপ খাওয়াতে না পারি তাহলে তো আমাদের গোটা জীবনকাহিনীই হবে বিয়োগান্তক।

অর্থাৎ এই বিয়ের ফলে আমাকে যদি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে অন্যভাবে থাকতে হয় তাহলে সে দুঃখের বোঝা আমাকে সইতে হবে সারা জীবন।

ধরো, আমাকেও যদি দাদার মতো অর্থোপার্জনের জন্যে চাকরি করতে দূরে যেতে হয় তাহলে কিছুটা যে দুঃখ পাব না তা নয়। তবে তার চেয়েও বেশি দুঃখ পাব যদি সে জমিদারি ঝামেলা পোয়াতে গিয়ে আমার দেখাশুনার সুযোগ না পায়। আমার যা প্রাপ্য তা যদি সে না দেয় তাহলে তো আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। পরম, আমি সেদিনের কথা ভাবতে পারছি না।

এই মাথামুণ্ডহীন চিঠি পড়ে তুমি হয়তো আমাকে পাগল ভাববে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে এখন পাশে না পেয়ে মনে হচ্ছে যেন আমার সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এতদিন পরে সবে তুমি বউয়ের কাছে গেছ। কী করে বলি যে ওকে ছেড়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে আমার কাছে চলে এসো। যা হোক, ভেবে চিন্তে জবাব দিও। কাকিনাড়াতেও একটা চিঠি দিয়েছি। তোমরা দুজনেই তো আমার ডানহাত ও বামহাত।

আমি জানতাম যে ভালোবাসা মানুষের জীবনে আসে। সেটা যে শুধু পুঁথিগত ব্যাপার নয় তাও আমি জানতাম। কিন্তু সে যে আমাকে, আমার হৃদয়কে এতখানি জয় করে বসবে তা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল যেন ওকে বিয়ে করতে না পারলে আমার গোটা জীবন মরুময় হয়ে যাবে। ওকে দেখার আগে ভেবেছিলাম ও রোগা ছিপছিপে হবে, দেখতে শুনতে মনে হবে যেন একটি নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ। জোর করে হয়তো দু-একটি গান শিখেছে বিয়ের বাজার পার হওয়ার জন্যে, হয়তো দু-একটি ইংরেজী, তেলুগু এবং সংস্কৃত ভাষার বাণী কপচাতে পারে। শরীরটা আনাড়ি হবে। চোখ মুখ নাক চিবুক কোনোটাই মানানসই হবে না। কিন্তু তাকে দেখে থ' বনে গেলাম। সে যেন মন্মথের সৃষ্টি স্বয়ং সরস্বতী।

কণ্ঠ সংগীতে ও যন্ত্র সংগীত নিপুণ, চারুশিল্পের সে-ই যেন স্রষ্টা। তার ভায়োলিন বাজনা শুনেই বুঝেছিলাম যে শ্রীরামাইয়ার শিষ্যা।

আমার ভগ্নীপতি বিভিন্ন ভাষা এবং পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরে ওকে পরখ করে দেখেছে।

ওকে দেখে আমি তন্ময় হয়েছিলাম। যতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েছিলাম ততক্ষণ আমার অন্য কোনো কিছুর খেয়াল ছিল না। মাঝে একবার নিজে ভায়োলিন বাজালাম। আর ও গান ধরল ভেঙ্কটস্বামী, নাইডু, চেডাম্মা,

গোবিন্দস্বামী পিল্লাই প্রমুখের। সেদিন আমিও খুব সেজেগুজে গিয়েছিলাম। আন্দাজ করো দেখি কোন পোশাকে গিয়েছিলাম।

মনে হল যেন সে আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে, আমার ভগ্নীপতিরও তাই ধারণা। উত্তরের ব্যাগ্র প্রতীক্ষায় আছি। আজ তোমাকে যদি এখন পাশে পেতাম।"

ইতি—তোমার নারান।

৮। হাঁ অথবা না

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীপতির স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নামল গাড়ি থেকে।

"দাদা এসে গেছ? কতক্ষণ এসেছ? মন্দপল্লী ভেঙ্কটরাম মামার বাড়িতে পাঁচ রকম কথা বলতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বাবুকে একটু খাইয়ে এলাম। মামী কিছুতেই ছাড়তে চায় না।"

"আমি আর লক্ষ্মীপতি এসেছি একথা মামিমাকে জানাতে কি ভয় করছিল? তোমার জন্যে কখন থেকে লক্ষ্মীপতি পথের দিকে তাকিয়ে আছে।"

"নারায়ণবাবু, আপনারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিনা তা নিশ্চয়ই তোমার মন জানে।"

"কই, খোকনকে একটু দাও তো, আমার দিকে কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে, আমি যেন নতুন লোক। কিরকম কান্না-কান্না মুখ করছে দেখো। আরে এই তোর বাবা এসেছে। সুরি, খোকনের জন্য ঐ খেলনাটা নিয়ে আয় তো। নে, ধর। দেখলে! ঘুষ দিতে তবে এল। মনে হচ্ছে ছেলেটা বড় হলে ওভারসীয়ার হবে। খুব চালু দেখছি! আচ্ছা ঐ বাঁশিটা দেখাও, দেখি তোমার কাছে যায় কিনা। দেখলে তো, চলে গেল তোমার কাছে। না, এ ব্যাটা বড় হলে পয়লা নম্বরের ঘুষখোর হবে।"

খোকন চিৎকার করতে লাগল। বাবার কোলে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। লক্ষ্মীপতি আদর করে চুপ করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সূর্য-কান্তমের কোলে দিয়ে দিল তাকে।

"পিসিমা, খোকনকে আমার কোলে দাও।" শ্রীরামমূর্তির মেয়ে জানকী তাকে কোলে নিল।

ধোপা এবং চাকরানী স্নানের জল এনে রাখল। সুব্বারায়, লক্ষ্মীপতি, শ্রীরামমূর্তি এবং নারায়ণরাও স্নান করতে গেল। সূর্যকান্তম দাদাদের আর লক্ষ্মীপতির গায়ে সাবান মাখিয়ে দিল। নাপিত গা ডলে দিল। রামনাইয়ার দেওয়া গামছায় গা মুছে তিনজনেই নতুন কাপড় পরে খাবার ঘরে গেল।

সুব্বারায় স্ত্রীর হাত থেকে গামছা নিয়ে গা মুছে নতুন ধুতি পরে সন্ধ্যা করতে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা সেরে উঠে খাবার দিতে ইশারা করলেন। জানকাম্মার বোন পরিবেশন করল। সবাই এক সারিতে বসলেন। খেতে খেতে সুব্বারায় জামাইকে বললেন, "তোমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। রাস্তায় কিছু হয়েছিল নাকি?"

লক্ষ্মীপতি শ্বশুরকে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয় করে। শ্বশুরও জামাইকে গভীর-ভাবে ভালোবাসেন।

"না, অঘটন কিছু ঘটে নি। বিশালপুরমের জমিদার তল্লবঙ্গর লক্ষ্মীপ্রসাদ রাও রাজমহেন্দ্রবরমে থাকেন—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভদ্রলোকের বিষয়ে অমিও শুনেছি বটে। আইনসভায় উনি নাকি সব সময় কৃষকদের পক্ষে কথা বলেন। গান্ধীজীর আমলে অন্ধ্রের জনপ্রিয় নেতাদের মধ্যে ওঁকেও গণ্য করা হত। আমি ওঁকে চিনি, ভালো করেই জানি। নিয়োগী জমিদারদের মধ্যে একমাত্র উনিই সম্মানিত জীবনযাপন করেছেন।"

"ওঁর পরিবারে বিবাহযোগ্যা একটি মেয়ে আছে।"

"অ।"

জানকী আম্মা এতক্ষণ বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে বসে ছিলেন। কথাটা কানে যেতেই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলেন।

"ওঁর মেয়ের বিয়ে উনি আমাদের নারানের সঙ্গে দিতে চান। বেজওয়াড়া স্টেশনে ওঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। কে জানে কী করে ভদ্রলোক নারান সম্পর্কে অনেক খবরই নিয়ে বসে আছেন! উনিই তো আমাদের জোর করে রাজমহেন্দ্রবরমে নামালেন।"

"নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন ?" জানকী আম্মা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন জামাইয়ের দিকে।

"এখন থেকেই এত প্রশ্ন! জমিদারের কথা উঠতেই দেখি ঘরে একেবারে ঝড়ের মতো দৌড়ে এল।" সুব্বারায় বললেন।

"থামো তো, সব সময় ঠাট্টা। খুব যে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সে দিনের কথা ভুলে গেছ বুঝি। গাদিরাজুর বিয়ের কথা পাড়ার সময় পণ নিয়ে দর কষাকষি, আর চটে যাওয়া, আর ওদের মুখের উপর যা-তা বলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার সেই ঘটনাটা!"

"ওদের ঐ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলার ঢং আমার ভালো লাগে না। তাই সোজা মুখের উপর যা বলবার আমি তাই বলেছি। নিজেরা তো কিছু বলবে না। সব তো তখন মুখে তালা দিয়ে বসে ছিলেন। কী দিদি, আমি ভুল করেছি ?"

"তুমি ভুল করবে কেন ? আমার কথা হল জমিদার পরিবারে বিয়ের কথা হচ্ছে—কারো যেন চোখ না টাটায়। আগ্রহ তোমার।"

সুব্বারায় হেসে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামমূর্তি, জানকী আম্মা এবং কনক আম্মাও হাসলেন।

রামমূর্তি—কই, বললে না তো রাজমহেন্দ্রবরমে তোমরা কাদের বাড়িতে উঠেছিলে ?

লক্ষ্মীপতি—শ্রীনিবাস রাওয়ের বাড়িতে।

শ্রীরাম—ওই প্লীডার শ্রীনিবাস রাও ? জমিদারের সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব।

সুব্বারাও—তাই নাকি ?

জানকী—আবার কথার ফাঁকে কথা ?

সুব্বারায়—আচ্ছা বলে যাও কী হল তারপর।

জানকী—বলি এখন তো নিজেই সব কথা শোনার জন্যে কান খাড়া করে রয়েছ।

শ্রীরাম—আ—থামো না। লক্ষ্মীপতিকে সব কথা বলতে দাও।

লক্ষ্মীপতি—নারান এবং আমি গিয়ে মেয়ে দেখেছি। ভারি সুন্দর মেয়ে।

রঙ ফরসা। নাক চোখ মুখ চমৎকার। খুব পড়াশুনা করেছে। সংগীতে সম্রাজ্ঞী বলা চলে।

জানকী—আমাদের নারানও তো গান খুব ভালোবাসে।

লক্ষ্মীপতি—নারান তো ওখানে ভায়োলিন বাজিয়েছে।

আড়চোখে লক্ষ্মীপতি নারানের দিকে তাকাল। এতক্ষণ তার মনে হয়েছিল যে নারান মনে মনে খুব খুশি হচ্ছে, কিন্তু এখন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সে কেমন যেন নাক সিঁটকে বসে আছে।

লক্ষ্মীপতি—ভালো দিন দেখে ওরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। নারানকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। জমিদার পরিবারের প্রত্যেকটি মহিলাই জানলা দিয়ে, পর্দার আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে নারানকে দেখেছে। মেয়ের সঙ্গে নারান ইংরেজিতেই সরাসরি কথা বলেছে। মেয়েটির শুধু ভাষাতেই নয়, সাহিত্যেও দেখলাম দখল আছে।

লক্ষ্মীপতির কথা সবাই যেন গিলছিল। তারপর সবাই যে যার নিজের মতো চিন্তা করতে লাগল।

বৈঠকখানা ঘরে সুব্বারায় শ্রীরামমূর্তির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে ঠিক করলেন যে ঐ পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ করা অনুচিত হবে। লক্ষ্মীপতি নিজের ঘরে গিয়ে বসল আর নারান মা'র কাছে বসে জমিদারের বিষয় গল্প করতে লাগল। তারপর খানিক বাদে নারান পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

চারদিন পরে পরমেশ্বর মূর্তি এবং কাকিনাড়ার রাজারাওয়ের কাছ থেকে চিঠি এল।

"আমি কবিতা লিখি না। কিন্তু তুমি তো জানো যে কবিতা আমার ভালো লাগে। তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। কবি হলে আমি ঐ চিঠির ওপরেই একটি কবিতা লিখে বসে থাকতাম। নিতান্তই গণিতশাস্ত্রের ছাত্র, তাই সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য পেশ করছি :

১। জমিদার পরিবারের সঙ্গে তোমাদের পরিবারের মিল হবে না আশঙ্কা হচ্ছে।

২। জমিদার পরিবারে অকপট এবং নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিরল।

৩। মেয়ের পক্ষেও তোমাকে ভালোবাসা কঠিন।

৪। এত বড় পরিবারে ভোগবিলাসের সমস্ত সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও কারো স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। তোমার মতন স্বাস্থ্যবান পুরুষের পক্ষে একটি দুর্বল চিররুগ্না তন্বীর সঙ্গে গোটা জীবন অতিবাহিত করা শক্ত।

তবে এসবের বিপক্ষেও যে কিছু বলার নেই তা নয়! এবং সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যথা:

১। জমিদারের খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে। অন্যেরা কী করবে জানি না তবে এক জমিদারবাবুই উভয় পরিবারের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তোমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি হবে না।

২। তুমি দেখতে খুব সুন্দর। তোমাকে দেখেই যে কোনো লোক বলবে তুমি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছেলে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই তোমার চেহারা দেখে বড় বড় রাজপরিবারের উচ্চশিক্ষিত মেয়েরাও মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন হবে।

৩। তোমার চিঠি পড়ে মনে হল মেয়েটির স্বাস্থ্য ভালোই। জমিদার-বাবুর ব্যবহারও চমৎকার।

তাই তোমার বিয়ের ব্যাপারে আমি খুব খুশি। তেমন মন্দ কিছু দেখছি না। খুব প্রয়োজনীয় কথা বাদে আজেবাজে কথা আমি লিখতে পারি না। অলঙ্কার আমার হাতে আসে না। আমার কথা হয়তো তোমার কাছে কর্কশ লাগবে। দিন ছয়েকের মধ্যে তোমার ওখানে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে জমিদার পরিবার সম্পর্কে খবরাখবর নেব।

তোমার প্রিয়
রাজা রাও”

দ্বিতীয় চিঠি

“আমি প্রথমেই বলতে চাই যে তোমার পায়ে সর্বস্ব উৎসর্গ করার লোক মিললেও তোমার যোগ্য কনে এ পৃথিবীতে নেই।

আমি ছোটবেলা থেকেই নিজের মধ্যে মশগুল হয়েছিলাম। আজীবন আমি সৌন্দর্য-পিপাসু। কিন্তু আমার নিজের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারি নি। আমার পৌরুষ, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যবোধ, জীবনের কোনো এক মুহূর্তে কোনো একজন নারীর হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম। এখন

খতিয়ে দেখছি যে ইচ্ছার একাংশও সার্থক হয়নি। আমার চারিদিকে ধূ ধূ মরুভূমি। আমার ভিতরের শিল্পী মন দিনকে দিন মরে যাচ্ছে।

সুন্দরী রমণীকে স্ত্রী হিসাবে পাবার কল্পনা আমার মনেও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু ঐ কল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়নি। পাশাপাশি তুমি নিজের ভাগ্যের কথা একবার ভেবে দেখো। তুমি নিজের পছন্দসই মেয়ের প্রতীক্ষায় থাকতে পারো। তোমার মধ্যে সাহস থাকলে তোমার উচিত ছিল গান্ধীজীর উপদেশ মতো কোনো বিধবা যুবতীকে বিয়ে করা। লেখাপড়া জানা বহু বিধবা মেয়ে রয়েছে। কিন্তু তোমার সে হিম্মত নেই। যাই হোক, আজ তুমি স্ত্রী হিসেবে এক সুন্দরী বিদুষী কলাকোবিদ কন্যাকে পাচ্ছ। তোমার চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? আর ভেবেচিন্তে বেশি সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ওখানেই নোঙর ফেলো, কথা পাকা করে নাও। এ সময়ে আমি ওখানে থাকলে ভালোই হত।

শেলীকে যে কারণে বহিষ্কৃত হতে হল, কীটস্ যে ফললাভের জন্য আজীবন অনুতাপের তুষানলে পুড়ে মরলেন, দান্তে যে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যবোধকে কাব্যে রূপ দিলেন, সেই মহান প্রেম আজ তুমি না চাইতে পেলে। এখন আর তোমার হ্যামলেটের মতো 'টু বি অর নট্ টু বি' করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

যাক, আমি তো মহারানীকে নিয়ে আসবই। ছেড়ে থাকা মুশকিল। কাকার অনুমতি নিয়েই যাচ্ছি এবং তোমার বিয়েও শেখার ইচ্ছে। সুরি, কন্নতল্লী প্রভৃতি তুমি এসেছ জেনে নিঃসন্দেহে খুব খুসি হয়েছে।

ইতি—

তোমার পরম।"

৯। কথাবার্তা

ডেপুটি কালেক্টর, তহশীলদার, রাজমহেন্দ্রবরমের একজন বড় উকিল, মাদ্রাজ থেকে আগত জমিদারের বোনপো আনন্দরাও এবং কয়েকজন চাকর সুব্বা-রায়ের বাড়িতে এল। ওদের আসার খবর পেয়ে সুব্বারাও আগে থেকেই

একটা ঘর খালি করিয়ে রেখেছিলেন। সেই ঘরে সবাই বসল। কোত্তপেটের ডেপুটি তহশীলদার বললেন, "সুব্বারায় মশায়, কালেক্টর, তহশীলদার প্রভৃতি আপনার কাছে এসেছে জরুরী একটি কাজে। আপনি আমাদের সকলের একটা কথা যদি রাখেন তাহলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব।"

সুব্বারায়—সে কথা আবার বলতে হয়, আপনাদের অনুরোধ আমি রক্ষা না করে পারি?

ডেপুটি কালেক্টর—অবশ্য তাড়াহুড়ো করে জানাতে বলছি না। কারণ একবার মত দিয়ে দিলে পরে আর গররাজী হলে ছাড়ব না।

সুব্বারায়—ঠিক আছে, বলুন।

তহশীলদার—আনন্দরাও মশাই, আপনিই বলুন। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি হলেন জমিদারবাবুর ভাগ্নে। মাদ্রাজের নামকরা উকিল।

সুব্বারায়—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি।

আনন্দ—শ্রীরামমূর্তি তো আমার পুরানো বন্ধু। একসঙ্গেই আমাদের আপীল করতে হয়। মাদ্রাজ গেলে আমার সঙ্গে দেখা না করে কোনোদিন উনি ফেরেন নি।

শ্রীরাম—আনন্দরাও এবং আমি ল' কলেজের সহপাঠী। এতদিন পরে আপনাদের সবাইকে অতিথি হিসেবে পেয়ে আমি সত্যি বড় খুশি হয়েছি।

ডেপুটি তহশীলদার—ওসব কথা বলবেন না। এবার সে ব্যবস্থা কিন্তু আমার বাড়িতেই হয়েছে। এখন আতিথ্য গ্রহণে বাধা আছে।

ইতিমধ্যে গ্রামের দু-চারজন মাতব্বর গোছের লোক এসে বসল।

আনন্দ—আমার মামার ইচ্ছা তাঁর মেজ মেয়ের বিয়ে আপনার মেজ ছেলের সঙ্গে দেন। এই প্রস্তাবই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আমরা আশা করছি আপনি এই শুভ কাজে সানন্দে সম্মতি দেবেন। এটাই আমাদের আবেদন।

সুব্বারায়—এ এক আশ্চর্য আবেদন করলেন আপনারা। উনি হলেন অত বড় জমিদার আর আমি সাধারণ একজন গৃহস্থ। উনি হয়তো ওঁর মেয়েকে দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু সব জেনেশুনে আমি কী করে এই প্রস্তাবে রাজি হই?

আনন্দ—ওকথা বলবেন না। বিষয় সম্পত্তি আর ঐশ্বর্যের প্রশ্ন ওঠে না

এখানে। ওঁর কাছে যা আছে তা ওঁর নিজের ; আর আপনার কাছে যা আছে তা আপনার।

ডেপুটি তহশীলদার—ওনার কাছে অতিরিক্ত একটি খেতাব রয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমাদের জমিদারবাবুর চেয়ে আপনি কম নন।

সুব্বারায়—না ওকথা ঠিক নয়। বিষয়সম্পত্তি আমাদের এমন কী আছে ? তবে হ্যাঁ, দুবেলা খেয়েপরে চলে যাচ্ছে। তাই বলছি, আমার এমন শক্তি নেই যা দিয়ে আমি জমিদারবাবুর মেয়েকে ঘরে এনে তুলতে পারি।

ডেপুটি তহশীলদার—আপনি একজন সাধারণ লোক, একথা মেনে নেওয়া মানে নিজেদের বোকা বানানো। আপনি এই যে বিনয় প্রকাশ করছেন এর ফলে এক দিক দিয়ে কিন্তু আপনি যে জমিদার বাবুর চেয়েও মহৎ তাই প্রমাণিত হচ্ছে। অবশ্য একথাতেও আপনি আপত্তি জানাবেন। কথা-প্রসঙ্গে বলছি শুধু। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার মতো দক্ষতা পর্যন্ত আমাদের নেই। শুধু একটি কথা না বলে পারছি না। আপনি কেন ভাবছেন যে উনি একজন বড় জমিদার। আপনি তো জানেন প্রজারা তাঁকে কত ভালোবাসে। তিনি সাধারণ মানুষকে কত ভালোবাসেন। কাজেই আপনার কথা যদি সত্যি বলেই ধরে নিই, একটি সাধারণ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের ইচ্ছাটা তাঁর মতো লোকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইচ্ছাটা যে আন্তরিক তাতেও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমরা সর্বান্তঃকরণে চাই তাঁর এই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হোক। আমরা এখনও আশা করছি যে আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা না করে পারবেন না।

গ্রামের 'কর্ণ' ভেঙ্কটরাজু বলল, "সুব্বারায় মশায়, আপনি আর ইতস্তত করবেন না। আপনাদের উভয় পরিবারের মধ্যে এই সম্বন্ধের ফল সত্যিই ভালো হবে। আপনার বন্ধু হিসেবে আপনাকে এ-প্রস্তাবে রাজী হতে অনুরোধ করছি। জমিদারবাবু সমুদ্রের মতো বিরাট হতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই রত্নাকর সমুদ্র আপনার কাছে এসেছেন। আপনার এখন গররাজী হওয়া অনুচিত। শুধু তাই নয়, কালেক্টর এবং তহশীলদার মশাইদের কথাও আপনি হেলাফেলা করতে পারেন না।"

সুব্বারায় ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না ওদের কাছে তাঁর বক্তব্যটি কোন

ভাষার প্রকাশ করবেন। তাই কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "আমি তো ওঁদের প্রস্তাবে গররাজী হচ্ছি না। শুধু ভাবছি নিজের দৈন্যের কথা"। ছেলের দিকে সুব্বারায় তাকালেন।

তাঁর কথার পিঠেই তহশীলদার বলল, "আপনার দৈন্যের কথা চিন্তা করার ভার আমাদের দিয়ে দিন। বিশালপুরমের উনি জমিদার বটে কিন্তু আসলে তাঁর আচার-ব্যবহার, মেলামেশা কোনোটাতেই জমিদারী আভিজাত্য নেই। আপনি তাঁর সমকক্ষ কিনা, এ-কথা আপনার মনে আনাই উচিত নয়। তা ছাড়া আপনি তো দেবার মালিক নন, পাবার মালিক। তাই এক্ষেত্রে দৈন্য বা প্রাচুর্যের কোনো কথাই ওঠে না।"

সুব্বারায়—কোনো কিছু নেবার যোগ্যতাও তো থাকা চাই। উনি যদি হাতী ঘোড়া, চাকর-চাকরানী দেন, তাহলে তো ওগুলো রাখার অবস্থাই আমার নেই।—অতশত আমার কোথায়।

ভেঙ্কট—জামাইবাবু, ওসব কথা বাদ দাও। এখন আর কথা না বাড়িয়ে অন্তত মাথা নেড়ে সম্মতি জানাও। আমি বোনকে বলে আসছি।

"ওঠো জামাই" বলে তিনি শ্রীরামমূর্তিকে নিয়ে জানকী আম্মার কাছে চলে গেলেন। এদিকে সুব্বারায় ঠিক করতে পারছেন না কী বলবেন। তবুও বাধো বাধো স্বরে বলতে থাকেন তিনি, "আপনারা বড় বড় সম্মানী লোক সব, আমার বাড়িতে এসেছেন একটা প্রস্তাব নিয়ে, আপনাদের ঐ প্রস্তাব এক কথায় আমি গ্রহণ করতে পারছি না। অথচ কোন ভাষায় যে অসম্মতি জানাব তাও বুঝে উঠতে পারছি না। জমিদারবাবুর নিজের মেয়েকে দেবার প্রস্তাব, আর সেই প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের মতো বড়-বড়-দের আসা, এ সবই যেন আমার সপ্তর্ষির কাছে পৌঁছনোর মতো মনে হচ্ছে। আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগলেও হয়তো ওদের ভাগ্যে তাই আছে। এবং সেজন্যই আপনাদের আমার কাছে আসতে হল।"

কথা শেষ হতে না হতেই ভেঙ্কটরাজু এসে বললেন, "ওদিকে ছেলের মা রাজী আছে। ছেলে নিজেও রাজী। এখন খালি ভগ্নীপতি কী বলেন তারই অপেক্ষা। এ-বিয়ে দেখছি হবেই।"

সুব্বারায়—তথাস্তু, উভয় পক্ষেরই মাতব্বররা যখন রাজী আছেন, তখন আপনাদের বিরোধিতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

সুব্বারায়ের মত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই একবাক্যে একশব্দে 'শুভম্-শুভম্' বলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ সীতারামজ্জনেয় সোময়েজী আশীর্বাদ করলেন। উপস্থিত পুরুতঠাকুররাও আশীর্বাদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

ভেঙ্কটরাজু ডেপুটি কালেক্টরকে বললেন, "হুজুর আর কী বাকি আছে? এবার একটি ভালো দিনক্ষণ দেখে বিবাহমুহূর্ত ঠিক করার জন্যে রাজ-মহেন্দ্রবরমে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকছে না।"

শ্রীনিবাস রাও কথার ফাঁকেই বলে উঠলেন, "এর জন্য আর একদিনের অপেক্ষায় থাকার কী আছে? আজকেই তো হতে পারে। পণ্ডিত পুরোহিত সবাই এখানে বসে আছেন। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম। নারায়ণ রাও রাজমহেন্দ্রবরমে যেদিন গিয়েছিলেন সেদিনই আমি তার জন্মতিথি জানার চেষ্টা করাতে উনি আমাকে তাঁর ঠিকুজি-কুষ্ঠী দিয়ে ছিলেন। আমার জ্যোতিষীর মতানুযায়ী কন্যা এবং পাত্রের কোষ্ঠীর ফলাফল ভালোই হবে। মেয়ের কোষ্ঠীর সঙ্গে তার খুবই মিল। দুজনের তাই ঠিকুজি মিলিয়ে দিন স্থির করে নিলেই হয়। কী পণ্ডিত মশায়, আপনি কী বলেন?"

পণ্ডিত—আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি দিনক্ষণ দেখে রেখেছি। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসেই শুভ মুহূর্ত রয়েছে। সপ্তম-শুদ্ধি। বৃহস্পতি এবং শুক্রের ভালো প্রভাব রয়েছে। কেউ কারো বিরোধিতা করছে না। সবদিক দিয়ে শুভ। খুব আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিয়ে হবে। পাত্র-কন্যার জুটি খুব ভালো। যেন শিব-পার্বতী।

আনন্দ—আপনার বড় পুর্নাইয়ার (বড় পণ্ডিত) মতটা শুনতে চাই। কারণ সব ঠিকঠাক করার পরে হয়তো দেখা যাবে দিকসিদ্ধি হয় নি। তখন সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

রাজমহেন্দ্রবরমের উকিল মৃত্যুঞ্জয় রাও বলল, "দিকসিদ্ধির নির্ণয়ের মূল বস্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা জ্ঞাত তথ্যাবলী পশ্চিমী-গ্রন্থেই পাওয়া যায় নাকি? এখন হেপিরিয়াননী, প্লুটো প্রভৃতি নতুন নতুন গ্রহ ধরা পড়েছে। বহু প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর মিলছে। আবার ঋষিদের দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত-গুলিকেও আজকের মানুষ বদলাচ্ছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এই পণ্ডিত পুরোহিতদের রেহাই দেবার উপায় নাই।"

তহশীলদার—আমিও আজকাল একটু আধটু জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা

করছি। আমাদের প্রাচীন তত্ত্বগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, সংস্কার এবং ঐতিহ্য পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশাল মাঠে ছাড়া গোরুর মতো।

মৃত্যুঞ্জয়—আপনি ঠিকই বলছেন—জ্যোতিষশাস্ত্র তো একথা কোনোদিন বলে নি যে পৃথিবী এবং আকাশের যে নিরন্তর পরিবর্তন চলেছে, সেটাকে অধ্যয়ন না করে কলুর-বলদের মতো চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরতে হবে। হাজার বছর আগেকার সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছে। কেন? তার কারণ তারা যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে, আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, যা গ্রহণীয় তা গ্রহণ করে যা বর্জনীয় তা বর্জন করে। অবশ্য প্রতি মুহূর্তেই তাদের সিদ্ধান্তগুলো যে বদলাচ্ছে এমন কথা বলা যায় না। আমাদের ঋষিরা দিব্যদৃষ্টিতে বহু তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করছেন। তার মধ্যে কিছু বর্জন এবং কিছু গ্রহণ করার আমাদের কী অধিকার আছে?

শ্রীনিবাস—এখন দেখছি সবাই পণ্ডিত। আমার প্রশ্ন আলাদা। গ্রহ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে যা জানার তা জেনেছি। রাশিফলও জানা দরকার। আপনি বলছেন শুক্র স্ত্রী গ্রহ। কিন্তু পুরাণে তো পাই শুক্র পুরুষ। চন্দ্রের অবস্থাও তাই। আমার কাছে এসব একটু অদ্ভুত ঠেকে।

ডে. কালেক্টর—শ্রীনিবাস রাও মশায়, আমরা যে কাজের জন্য এসেছি সেটা আগে পাকাপাকি হয়ে যাক। পরে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

আনন্দ—আমারও সেই মত।

সুব্বারায়—আমাদের পুরুতঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়েছি।

শ্রীরাম—উনি আবার গোপালপুরমে গেছেন। দুপুরে খাবার সময় ফিরবেন।

সুব্বারায়—তাহলে ভালোই হল। আপনারাও সবাই আমার অতিথি হয়ে থাকুন। আমার এই আমন্ত্রণ আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে। আমি ধন্য হব তাতে। অন্য কোনো অবস্থায় তো আপনাদের কাছে পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয় না।

ডেপুটি তহশীলদার—না, না, আমি আগেই আমার ওখানে সকলের ব্যবস্থা করেছি। আজ এঁদের ছেড়ে দিন।

সুব্বারায়ের কাছে বিদায় নিয়ে সবাই তহশীলদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

১০। পরদেশে

রামচন্দ্র রাও কাকিনাড়া থেকে রেঙ্গুন চলে গেছে খবর পেয়ে সুব্বারায়ের বাড়ির সবাই অবাক হল। সূর্যকান্তাম্মা এবং জানকী আম্মা কেঁদে চলেছেন। সুব্বারায় ওঁদের বকলেন। সেইদিনই লক্ষ্মীপতি এবং নারায়ণ রাও কাকিনাড়া গেল।

কাকিনাড়ায় গিয়ে সবকিছু জানা গেল। রামচন্দ্র রাও সূর্যকান্তমের স্বামী। খবরের কাগজে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল। নিজের নম্বরটি কাগজে না থাকায় অকৃতকার্য হয়েছে জেনে পাগলের মতো হয়ে গেল রামচন্দ্র রাও। বিজ্ঞানে সে ভালো ছাত্র হলেও ইংরাজী এখনো তার আয়ত্তের বাইরে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে একাশি থেকে নব্বুই পর্যন্ত নম্বর পেলেও ইংরাজীতে টেনে-টুনে তিরিশের বেশি ওঠে নি। তেলুগুতে খুব ভালো না হলেও বিয়াল্লিশ নম্বর উঠেছিল। ফেল করলেও ভালো নম্বর পেয়েছে সে। কিন্তু দু'তরফা পাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

ব্যাপারটা লক্ষ্মীপতির কাছে শুনেই নারায়ণ রাও মন্তব্য করেছিল, "তাহলে বিজ্ঞানে ফার্স্ট হয়ে সে বোধ হয় ইংরেজীতে ফেল করেছে।" হয়েছিলও তাই।

রামচন্দ্র রাও বাবার নামে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল।

"পরমপূজনীয় বাবা,

আমাদের দেশে সত্যিকারের শিক্ষার কোনো দাম নেই। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেরাণী তৈরি করা। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠ্যতালিকা তৈরি হয়। ইংরাজীতে সেইজন্যই এত কড়াকড়ি। বর্তমানে আমার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ইংরাজীতে পাকা হতে হলে আমাকে বিজ্ঞান ছাড়তে হবে।

পাশ্চাত্ত্যে আমি যে খ্যাতি পেয়েছি তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনি আমাকে বিদেশে পাঠাতে চান না, মত দেবেন না, তাই আপনার বাক্স থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে আপনাকে না জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। এই চুরির জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন! আমি যে-কোনোভাবে আমেরিকায় গিয়ে হার্ভার্ডে পড়ব। সেখানে যদি আপনি টাকা পাঠান তাহলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। আর তা না হলে নিজেই চাকরি করে পড়াশুনা চালিয়ে যাব। যা করছি তা অনেক ভেবেচিন্তেই করছি। কাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই মার পায়ে প্রণাম জানিয়েছি। আপনাদের দুজনের আশীর্বাদ থাকলে জগতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমার পথরোধ করতে পারে। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি আপনার প্রণত

রামচন্দ্র রাও”

চিঠিটা পড়ার সময় ভীমরাজুর চোখ ছলছল করে উঠল। রামচন্দ্রের মা শয্যাশায়ী, আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

নারায়ণ রাও, লক্ষ্মীপতি এবং ভীমরাজু তাঁকে সান্ত্বনা দিতে বসল।

নারায়ণ—আপনি এতটা নিরাশ হচ্ছেন কেন? শহরে রয়েছেন। আজকালকার রীতিনীতি সব তো জানেন, আপনি তো সরোজিনী দেবীর বহু বক্তৃতা শুনেছেন। অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য আপনি। আমাদের দেশ থেকে কত লোক পাশ্চাত্ত্য দেশে যায়। আপনার নিজেরই তো বলা উচিত ছিল, ‘বিদেশে যদি যেতে চাস তো যা। ঘুরে আয়।’

লক্ষ্মীপতি—আমার ভাই সেখানে সম্মান অর্জনের জন্যই গেছে।

ভীমরাজু স্ত্রীর ছলছল চোখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “বড়দের বাণী বিপদের সময় স্মরণ করতে হয়। সাহস করে যখন গেছে তখন নিশ্চয় সে সফল হয়েই ফিরবে।”

রামচন্দ্র রাওয়ের মা দুর্গমাম্বা বললেন, “বাবা নারান, লক্ষ্মীপতি, বলতে পারো এখন আমি কী করব? ওই তো আমার এক ছেলে। গর্ব করে পাঁচ জনকে বলতাম আমার ছেলে অনেক বড় হবে। সেইটেই তো ছিল আমার একমাত্র আনন্দ। কী করি বলো। আমাকে মাস-দুয়েক আগে বলেছিল বিদেশ যাবার কথা। আমি বলেছিলাম, উচ্চ শিক্ষার

জন্য বিদেশ কি যেতেই হয়। গান্ধীজী যে বলেছেন, 'পাশ্চাত্য-শিক্ষা আত্মবিকাশের প্রতিবন্ধক। রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করলে উনি বহুগুণে বড় ঋষি হতে পারতেন!' সব কথা শুনে ছেলে আমার বলল, 'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ, কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো, বিজ্ঞানে আমি নতুন কিছু আবিষ্কার করলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ইংরেজী জানছি ততক্ষণ আমাকে জাতে তুলবে না। তাই ভাবছি জার্মান অথবা আমেরিকায় যাব।"

ভীম—এখন ওসব কথা ভেবে লাভটা কী? যা হবার হয়েছে। এবার ভবিষ্যতে কী করতে হবে তাই ঠিক করা উচিত।

তারপর সবাই দোতলায় চলে গেল।

যেসব পরিবার কাকিনাড়ায় ব্যবসা করে স্ফীত হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে বৃদ্ধ বরুপু ভীমরাজুর পরিবার অন্যতম। ব্যবসায়ের জন্য যতটুকু লেখাপড়া দরকার ঠিক ততটুকুই ভীমরাজু করেছিলেন। ব্যাবসার ক্ষেত্রে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার প্রশংসা শহরের সকলের কাছে শোনা যেত। 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ' বলে তিনি পরিচিত।

তাঁর একমাত্র ছেলেটি প্রখর বুদ্ধি রাখে কিন্তু ব্যাবসায়ের দিকে প্রবণতা নেই তার। ফলে ব্যাবসাতে লাখতিনেক টাকা ক্ষতি হতেই ভীমরাজু ব্যাবসা গুটিয়ে সব টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা রাখলেন। ঐ টাকার সুদেই আরামে দিনগুলো তাঁর কেটে যাচ্ছিল। জমির ওপর তাঁর কোনো ভরসা ছিল না। শুধু নিজের জন্য এবং কোম্পানির বড় বড় অফিসারদের কাছে আম সাপ্লাইয়ের জন্য একটি আমবাগান পিথাপুরমের কাছে কিনেছিলেন।

ভীমরাজুর ঐ ছেলের সঙ্গে চার হাজার টাকার পণ এবং দু' হাজার টাকার জিনিসপত্তর দিয়ে বিবাহ হয়েছিল নারায়ণ রাওয়ের চতুর্থ বোনের। ভীমরাজু এবং সুব্বারায়ের মধ্যে সদ্‌ভাব ছিল।

তিনজন অনেকক্ষণ চিন্তা করে ঠিক করলেন, রেঙ্গুনে ভীমরাজুর এক বন্ধুর কাছে টেলিগ্রাম করা হবে।

ছেলে বিদেশে গিয়ে খ্যাতি অর্জন করুক তাতে ভীমরাজুর আপত্তি ছিল না। কিন্তু বারবার একটি কথা তাঁর মনে পড়ছিল। এত ধনসম্পত্তি

থাকতে খ্যাতির কী প্রয়োজন? একমাত্র ছেলে। বিদেশে তার কেই বা দেখাশুনা করবে? ছেলেকে কদ্দিন নাগালের বাইরে রাখা যায়? একদিন একটু অসুখ করলেই মা-বাবা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। আর সেই ছেলে আজ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ভীমরাজু বিড়বিড় করে বকতে থাকেন, 'কী লাভ বিদেশে গিয়ে। ওখানে এমন কিসের পড়াশুনো? কত রকমের ঝামেলা পোহাতে হবে কে জানে? এমনিতেই তার সর্দি-কাশির ধাত। সাধাসাধি না করলে খায় না। আর সবচেয়ে ভয় বিদেশী মেয়েদের।'

নারায়ণ রাওয়ের বুকটা ধ্বক করে উঠল। সে জানে বিদেশে গৌরাঙ্গী সুন্দরীদের পাল্লায় পড়ে কত ভারতীয় যুবক নিজের সবকিছু খুইয়েছে। ওদের পায়ে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। একবার যে ওদের পাল্লায় পড়ে তার কাছে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে রাক্ষসী মনে হয়। কত ভারতীয় যুবক ফতুর হয়ে গেছে ওদের জন্য। রামচন্দ্র রাওয়েরও বয়স এমন কিছু নয়। আর টাকার অভাবও নেই। তার ধারণা, বিদেশী ছেলেদের হাত করবার জন্য এক ধরনের মেয়েরা সেখানে ওত পেতে থাকে। নারায়ণ রাও লক্ষ্মীপতিকে বলল, "কী করে বলব, কার ভাগ্যে কী লেখা আছে!" সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে রাত গভীর হলো। কিন্তু ওদের কারো চোখে ঘুম নেই।

লক্ষ্মীপতি—এত ভয় পাবার কী আছে বুঝিনা। সবাই কি আর খারাপ হয়?

নারায়ণ—সে কথা নয়। কিন্তু তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে মানুষ পরিবেশের দাস। যদি খারাপ পরিবেশে পড়ে—

লক্ষ্মীপতি—আচ্ছা এই তোমার কথাই ধরো না কেন। তুমি তো একাই মাদ্রাজে ছিলে। ছেলেদের বিগড়ে দেবার পক্ষে মাদ্রাজের পরিবেশটাই যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও তুমি বিগড়ে যাওনি।

নারায়ণ—তোমার যুক্তি অস্বীকার করছি না। তুমি দেখো ভারতে প্রত্যেক বিষয়ে সত্যরক্ষার একটা চেষ্টা থাকে। জীবনের মুখ্য আদর্শ মোটামুটিভাবে সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই সভ্যতা আজো এখানে বহাল আছে। ভারতীয় সভ্যতাই আমাদের রক্ষা করছে।

লক্ষ্মীপতি—তোমার কথা মেনে নিয়েই বলছি, যারা বিদেশে যায় তাদের

সকলের কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? বিদেশে যারা যায় তাদের মোটামুটিভাবে তিন ভাগ করা যেতে পারে। কিছু লোক যায় যাদের অঢেল টাকা আছে। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার স্বাদগ্রহণই তাদের বিদেশ যাবার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐসব রাজামহারাজারা নিছক আনন্দলাভের জন্যই যায়। এদের আমরা প্রথম শ্রেণীতে ফেলতে পারি।

নারায়ণ—এরা বিদেশে গিয়ে কী করে? ভারতের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট করে আসে। আমাদের গরিব দেশ। পাশ্চাত্য দেশ—বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ধনী। ভোগবিলাসের মধ্যে দিয়েই জীবন কাটানো ওদের প্রধান উদ্দেশ্য। ওরা কতরকমের জিনিস এই ভোগ-বিলাসের জন্য তৈরি করে। আমাদের কত বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয় সেগুলোকে। কিন্তু বিদেশীরা আমাদের দেশে কত সস্তায় জিনিস পায়।

লক্ষ্মীপতি—এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের কথা বলি। এরা পড়াশুনো করার জন্যই যায়। বিদ্যাশিক্ষাই এদের উদ্দেশ্য। আর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে যারা অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে যায়।

নারায়ণ—তুমি কি মনে করো খারাপ মেয়েদের পাল্লায় পড়ে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না?

লক্ষ্মীপতি—কেউ যদি ঐ কারণে বিগড়ে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে জ্ঞানার্জনের জন্য যায়নি।

নারায়ণ—ভেবো না যে তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। ধরে নিচ্ছি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য যারা বিদেশে গেছে তারা সত্যিই ভালো লোক। আমাদের রামচন্দ্র রাওও সেই মহতী উদ্দেশ্যে গেছে। অল্প বয়সেই বিদেশে যাওয়া উচিত। যৌবনে অনেক সময় কামনা-বাসনার তাড়নায় জীবনটা বিপর্যস্ত হয়। বড় বড় লোকও কামনালোলুপ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অল্প বয়সে এই জ্বালা অত থাকে না। কাজের দিকেই ঝোঁকটা থাকে বেশি। এই বয়সে বিভিন্ন দিক থেকে যে আহ্বান আসে তা এড়িয়ে যাওয়া অনেকখানি সম্ভব হয় না। কিন্তু যুক্তি দিয়ে আমরা যত কথাই বলি না কেন, বেশ বুঝতে পারছি বোনটির মন হাহাকার করে উঠছে। ওর করুণ মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে।

লক্ষ্মীপতি—পাগল কোথাকার! এইসব কথা তোমার মুখে মানায় না।

১১। ছেলেবেলা

সেদিন সারারাত নারায়ণ রাও ঘুমোতে পারে নি। সূর্যরাওপেটায় ভীমরাজুর বাড়ির ছাদের ওপর শুয়ে সে অশ্বিনীদেবতা, অনুরাধা, তুলা-বৃশ্চিক প্রভৃতি নক্ষত্র দেখতে লাগল। আকাশের বুকে তার শৈশবের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠছে। দেশ-বিদেশে সে বেড়াতে চাইত। পাশ্চাত্ত্য-দেশ তার কাছে মনে হত যেন বন্ধুর গ্রাম। তার কল্পনা ছিল বিদেশেও রাজারাণী আছে। ওদের বাড়িগুলো সোনার। রাজমহেন্দ্রবরমের পাহাড়ের ওপারে বুঝিবা বিদেশ। সেখানে পথেই হয়তো পড়ে রয়েছে টাকা-পয়সা, আনি-দুয়ানি, আধুলি-সিকি। নিজে যা ভাবত তা সে তার কিশোর বন্ধুদের কাছেও বলত।

শৈশবের সেই স্মৃতিগুলো কেমন যেন রূপকথা—উপকথা মেশানো। নারায়ণের ধারণা ছিল সেও একদিন পুষ্পক রথে বসে কোথাও যাবে। রাজকুমার, রাক্ষস আর রাজারাণী ছাড়া অন্য কারও কথা যেন মনেই পড়ত না। শখ হত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে একবার "জয়পরমেশ্বর" বলবে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা বিদ্যুৎবেগে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যাবে তাকে। আর সেই ঐন্দ্রজালিক খড়মটা যদি একবার পেত তাহলে তাতে চড়ে বাবা যে রাজকুমারদের গল্প করেছেন তাদের মতো নিজেও তলোয়ার উঁচিয়ে রাক্ষসদের মেরে ফেলে রাজকুমারীকে বিয়ে করত।

বয়স তখন আট বছর হবে। সেই প্রথম শুনেছিল দেশ আর স্বরাজ এই দুটি শব্দ। সাহেবরা আমাদের দেশ থেকে ধনদৌলত লুটে নিয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হত বিরাট ভয়ঙ্কর একটা বোমা তৈরি করে ভারত বাদে আর সব দেশকেই উড়িয়ে দিতে।

একদিন সে কপালে বন্দেমাতরম্ লিখে সদল বলে স্কুলে গিয়েছিল। সেদিন শিক্ষক মশাই ওদের সবাইকে বেঞ্চির ওপর অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন লেখাগুলো মুছে ফেলতে।

নারায়ণ রাও তার উত্তরে বলেছিল, "আমাকে ফাঁসি দিলেও এটা আমি মুছব না।" সব শিক্ষকদের স্নেহের পাত্র ছিল সে। কিন্তু সেদিন তার ওই

জবাব শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শিক্ষকমশাই বলেছিলেন, "মুখের ওপর জবাব দেওয়া বন্ধ করে ওটা মোছো, নাহলে পিঠের চামড়া তুলে নেব।"

"ইংরেজদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব রয়েছে দেখছি। আমরা স্বরাজ চাই। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে এটা আমি কিছুতেই মুছব না।" গর্জে উঠেছিল নারায়ণ রাও।

শিক্ষকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।" তারপর নারায়ণ রাওয়ের পিঠে কয়েক ঘা পড়েও ছিল। সেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চি থেকে নেমে এসে শিক্ষকের হাত থেকে বেতটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছিল। ছাত্রদের মধ্যে নারায়ণ রাও ছিল সেরা স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিমান ছেলে। তার ঐ বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে শিক্ষক থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, ছাত্ররাও বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ছিল ঘটনার পরিণতি দেখার আগ্রহে।

নারায়ণ রাও চিৎকার করে উঠেছিল, "বন্দেমাতরম্"। তারপরই ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররাও তাকে অনুসরণ করেছিল।

সেদিন রাত্রে সুব্বারায় ছেলেকে ডেকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে, একটু বকুনি দিলেন। শিক্ষক নারায়ণ রাওয়ের কাছে এসে পরে বলেছিলেন, "বাবা, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করছি। আমি জানি না কে তোমাকে এসব কাজ করতে উস্কিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি আমার হয়ত চাকরি আর থাকবে না। আর এই মাষ্টারী গেলে অভাবের তাড়নায় হয়তো আমাকে ভিক্ষেই করতে হবে।" শিক্ষকের চোখ ছলছল করে উঠল। নারায়ণ রাও-এর চোখে জল। তারপর থেকে পাঠশালায় সে আর কিছু করেনি।

নারায়ণ রাও ফার্ষ্ট ফর্মে (পঞ্চম শ্রেণীতে) পড়ার সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। নারায়ণের কোমল মন সে সময় ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সহপাঠীদের সে বলল, "আজ ওরা বেচারা বিপদে পড়েছে। ওদের কত শিশু অনাথ হয়ে যাবে। আমাদের উচিত ওদের এখন সাহায্য করা।" পনেরো টাকা চাঁদাও তুলেছিল সে আর মা'র কাছ থেকে নিয়ে

নিজে দিয়েছিল দশ টাকা। তারপর কোত্তাপেটায় কালেক্টর এলে নারায়ণ রাও নির্ভয়ে তার কাছে ঐ টাকা দিয়ে বলেছিল, "যুদ্ধের সময় আমাদের এই দান ; এই চাঁদা দিচ্ছি।" ইংরেজ কালেক্টর সেদিন তাঁর সেই কথা শুনে বলেছিলেন, "ভারতের রাজভক্তি যে অসাধারণ অসামান্য, শিশুদের এই দান থেকেই তা আরেকবার প্রমাণিত হল।" খুশি হয়ে তিনি নিজের রচনাসংগ্রহের একটি গ্রন্থ তাকে উপহার দিয়েছিলেন যার নাম 'এলিয়া'।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরে শুয়ে লক্ষ্মীপতিকে নাক ডেকে ঘুমোতে দেখে আশ্চর্য হয়ে নারায়ণ রাও ভাবল, এ কী করে সম্ভব! একজনের যখন সর্বনাশ আর একজন তখন কী করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে! একজনের দুঃখ-যন্ত্রণা আর একজনকে প্রভাবিত করে না কেন? কী করে একজনের সর্বনাশ অন্যের কাছে স্বস্তির বিষয় হতে পারে! কোনো ঘটনায় ঘাবড়ে যাবার পাত্র সে নয়। কিন্তু রামচন্দ্র রাওয়ের অন্তর্ধানের খবর শুনে সত্যিই সে বিচলিত হয়েছিল। গভীর দুঃখও পেয়েছিল। তাই ভাবছিল ভায়রাভাই চলে যাওয়ার ঘটনায় একটুও বিচলিত না হয়ে লক্ষ্মীপতি কত আরামে ঘুমোচ্ছে। অবাক হয়ে সে ভাবছিল মানুষের মন অত নির্বিকার হয় কী করে। একবার লক্ষ্মীপতিকে জাগাতে গিয়ে আবার সে নিরস্ত হলো। নানান রঙের বিচিত্র স্বপ্নময় ঘটনাবিন্যস্ত এই জীবন যেন একটা চলচ্চিত্র বিশেষ।

সেই জন্যই হয়তো প্রকৃতির পটভূমিকায় কলার সৃষ্টি। প্রকৃতির অনুকরণে পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন কলার বিকাশ হয়েছে, কিন্তু অননুকরণীয় প্রকৃতির সৌন্দর্য কত মনোরম, কী বিচিত্র!

বিছানাটা ঠাণ্ডা লাগছে। শিশির পড়ছে। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের চোখে ঘুম নেই। ঘুমে কি মানসিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়? উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের জন্য ঘুম কিছুতেই আসে না। রামচন্দ্র রাও হয়তো বিদেশে গিয়ে সম্মানজনক একটা কিছু করবে। এর জন্যে অত চিন্তার কী আছে? সূর্য-কান্তমের সঙ্গে তার খুব ভালোবাসা ছিল। তাই তার দুর্দিনে দুঃখের ভাগী হবার জন্যই হয়তো মন ছটফট করছে।

আহা, এই নিস্তব্ধ পৃথিবীর উপর নির্মল আকাশের বুকে নক্ষত্ররা গান গাইছে। এই নীরবতার মধ্যে ওদের গান কত মধুর। এই নৈঃশব্দ্যের

বেহাগ, আকাশ থেকে মাটির বুকে পড়া উল্কার আলো, রাস্তায় গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ, চাঁদের আলো প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে একজন সুন্দরী বালিকার প্রশ্নময় দৃষ্টি তার চোখে আসছে,—তার করুণ কান্না বারে বারে কানে ধাক্কা দিচ্ছে।

নারায়ণ রাওয়ের মন হঠাৎ এই বিশ্বপ্রকৃতির লীলাখেলার বৈচিত্র্যে ভরে গেল। নীল আকাশ; নিশ্চল নক্ষত্র। তার মনের সঙ্গে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেদিনের সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল ভাবী জীবন-সঙ্গিনী শারদার কথা। সেও যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল চাঁদের স্নিগ্ধতা মাখা শারদার মুখ। লক্ষ্মীপতি সূর্যকান্তম রামচন্দ্র রাও আর তার মা—সকলের মুখ। তারা সবাই যেন আকাশ থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে যেন কার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিজেকে চাঁদের সৌন্দর্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে।

ঘরের ভেতর থেকে দেয়াল-ঘড়ির ঢং ঢং করে দুটো শব্দ শোনা গেল। নারায়ণ রাও ঠিক সেই ভাবেই শুয়ে আছে।

১২। বিয়ে

রাজমহেন্দ্রবরমে খুব ঘটা করে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে শারদার বিয়ে হল।

শহরে জমিদারের প্রত্যেকটি বাড়ি সুন্দর করে সাজানো হল। রাস্তায় অনেক তোরণ উঠল, একটা বড় প্যাণ্ডেল বাঁধা হল। জমিদারের বাড়ির পাশেই দুটো বড় হলঘরে বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। কলাগাছ আর নারকেলের পাতা দিয়ে সজ্জিত প্যাণ্ডেলটিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার মাথায় নারকেলের পাতাগুলি পতপত করে উড়ছিল।

জমিদারবাড়ির এক বিশাল ঘরে সভাস্থল আর বিবাহবেদী রচিত হল। বিবাহমঞ্চ রুচিসম্মত সজ্জায় অলংকৃত। সমগ্র মণ্ডপ বন্ধু-বান্ধব ও অতিথি-অভ্যাগতে পূর্ণ। উকিল, জজ, কালেক্টর, জমিদার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তথা শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। অন্ধ্রের সমস্ত নামকরা

লোকের সমাবেশ হয়েছিল সেখানে। সকলের জন্য ব্যবস্থাও হয়েছিল চমৎকার।

পোতুস্বামীর পার্টি সানাই বাজাচ্ছে। মঙ্গলবাদ্যের তুমুল নিনাদের মধ্যে পুরুতঠাকুরের কণ্ঠস্বর, 'অয়ং মুহূর্তস্য মুহূর্তাস্ত' মন্ত্রটি শোনা যাচ্ছে। সভায় অসংখ্য চন্দনপাত্র রয়েছে আর রয়েছে গোলাপজলে ভরা সোনার পাত্র। কারুকার্যময় হাতির দাঁতের ধূপদানিতে জ্বলছে অসংখ্য ধূপকাঠি। সমগ্র বিবাহমঞ্চ সুগন্ধে ভুর ভুর করছে। পণ্ডিতরা সুর করে বেদ পাঠ করছেন। মহিলাদের জন্যে ঐ মণ্ডপেরই এক ধারে আলাদাভাবে বসার সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে।

সর্বভূষণে অলংকৃতা দুগ্ধসাগরজাতা লক্ষ্মীতুল্য কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে আনা হল। পীতবস্ত্র ধারণ করে নারায়ণ রাও নান্দী শ্রাদ্ধের জন্য ভিতরে এল। তারপর জমিদার এবং তাঁর গৃহিণী কন্যাদান করার পরে নতুন কাপড় পরে বর-কনের পাশাপাশি এসে বসতেই মঙ্গলবাদ্য যেন আরও প্রচণ্ড জোরে বেজে উঠল। নারায়ণ রাও যখন শারদার গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধছিল তখন সে দৃশ্যে জানকীআম্মার এবং উপস্থিত আত্মীয় বন্ধুদের আনন্দের সীমা ছিল না।

বিয়ে উপলক্ষ্যে জমিদার অনেকগুলি দানের কথা ঘোষণা করলেন। রাজমহেন্দ্রবরমের বিধবা-বিবাহমণ্ডলীকে এগারোশো ষোল টাকা দানও ছিল তার মধ্যে।

জমিদারের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কনেকে রুপোর ঘটি, কফির পেয়ালা, রুপোর সাবানদানি ও হাতির দাঁতের বহু জিনিস উপহার দিলেন।

কনের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সবাই শহরের, অন্ধ্রের অভিজাত পরিবারের লোক। পুরুষদের প্রত্যেকেরই পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, মুখে স্নো-মাখা, জামাকাপড় থেকে সেন্টের গন্ধ, তাঁরা কোনোদিন বিয়ের মিছিলে যোগ দেন নি। অত ভিড়ে ভরা সভাস্থলে উপস্থিত হতে তাঁরা অভ্যস্ত ন'ন। ওঁদের সঙ্গে চাকর চাকরাণীও কম আসে নি। মহিলাদের মধ্যে কেউ ছেলেপিলেদের নিজের হাতে দুধ খাওয়াতে পর্যন্ত অভ্যস্ত ন'ন। তাঁদের মখমলের জুতো খুলে রাখাটাই একটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই রেওয়াজ অনুযায়ী ওদের পায়ে হলুদ লাগানো সম্ভব হয় নি।

কন্যাপক্ষের ভদ্রলোকেরা একসারিতে বসে খাওয়া পছন্দ করেন নি। সংগীতানুষ্ঠানও তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে নি। ব্রাহ্মণরা তাঁদের আলাদা এক ভোজনাগারে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে দিলেন। ঐ সব অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সময় কাটে পত্রপত্রিকা আর উপন্যাস পড়ে, ধূমপান করে এবং আড্ডা মেরে।

বরযাত্রীরা সব গ্রামের মানুষ। স্ত্রী-আচারগুলি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সে বিষয়ে তারা যথেষ্ট যত্নশীল। বিয়ের মিছিলের জন্য তারা ব্যগ্র। দামী দামী বেনারসী শাড়ি, সোনার গহনা পরে, পায়ে হলুদ লাগিয়ে বিয়ের গান গাইতে বরপক্ষের মেয়েরা মসগুল করে তুলেছে বিবাহবাসর। চিরাগত কোনো আচার অনুষ্ঠানের প্রতি যাতে কোনোমতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়ে না পড়ে, তাই এসবের প্রতি একটা বিরক্তি পোষণ করলেও ওদের সঙ্গে না থেকে উপায় ছিল না বরদকামেশ্বরী দেবীর।

বরযাত্রীদের মধ্যে পুরুষ যারা ছিল তাদের অনেকেই বিয়ের গান গাইতে পারে। তারা হাততালি দিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গান গাইছে দেখে কন্যাপক্ষের লোকেরা হতভম্ব! বরপক্ষের ভারি অলঙ্কার পরিহিতা এবং হলুদ লাগানো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কন্যাপক্ষের শহুরে মেয়েরা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

"বাবা, স্বপ্নেও ভাবি নি, এরা এত গেঁয়ো! একেবারে ভোঁতা! কোত্থেকে জোগাড় করলে এমন সম্বন্ধ?"—নিকটাত্মীয়া সরোজিনী বরদ-কামেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করল।

"না, তোমরা যে একেবারে শারদাকে বনে পাঠিয়ে দিচ্ছ।" নাক উঁচু করে শকুন্তলা বলে।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো একটা পাত্র জোগাড় করেছ, তাই দেখার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলাম। তোমার এই জামাইয়ের চেয়ে আমার চাকরগুলোও যে সুন্দর," জগন্মোহন রাওয়ের মা শিবকামসুন্দরী দেবী মন্তব্য করলেন।

"আমি অবশ্য শুনেছি পাত্র নাকি নিজের কাপড় নিজেই ধোয়, এমনকি রুটিও বানাতে পারে, জল বইতে পারে, ক্ষেতে গিয়ে ঘাসও কাটতে পারে। বাঃ! যোগ্যপাত্র বলতে হবে," জমিদারের ভাগ্না ললিতকুমারী বক্রোক্তি করল।

"ওর হাতে সঁপে দেবার জন্য অত গয়নাগাঁটির প্রয়োজন ছিল কী! ওই গর্দভটিকে কোথা থেকে যে জোগাড় করেছে, তাই ভাবি," নাক উঁচু করে একজন মহিলা মন্তব্য করলেন। এক একজন মন্তব্য করেন আর অন্যরা হো হো করে হাসেন। জানকীআম্মাকেও দু-চার কথা না শুনিয়ে তাঁরা ছাড়লেন না।

"ঐ নাকি শাশুড়ী! ওমা, আমরা ভেবেছিলাম ও বুঝি বরপক্ষের আত্মীয়া!" হাইকোর্টের উকিল আনন্দরাওয়ের স্ত্রী বলল।

"যাক্, আমার শারদার ভাগ্যে যা আছে তাই হয়েছে।" চোখের জল মুছতে মুছতে বরদকামেশ্বরী বললেন।

শারদা পাশেই একটি সোফায় বসেছিল। ওদের কথা শুনে তার মনে যেন ঝড় বইছিল।

তাদের মধ্যে কিন্তু শারদার এক বান্ধবীর নারায়ণ রাওকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। তার বিয়ে দিন কয়েক আগে হয়ে গেছে। স্বামী বড়লোক এবং বিদ্বান। নারায়ণ রাওয়ের চেহারা, হাবভাব, চালচলন তার খুব ভাল লেগেছিল। শারদার কাকার মেয়ে সে, নাম নিরুপমা। তার স্বামী মাদ্রাজের উকিল, সে বলল, "শারদা, তোমার স্বামী ইংরেজীতে খুব দক্ষ।"

"তুমি কী করে জানলে?"

আজকালকার কনেদের নাকি অত লজ্জা পেতে নেই। লাজুক মেয়েদের নাকি গেঁয়ো মেয়েদের মতো দেখায়।

শারদা সলজ্জভাবে মাথা নিচু করে মনে মনে ভাবছে, এ-পাত্র বাবা খুঁজে এনেছেন। বাবা নিজে নানানভাবে পাত্রকে যাচাইও করেছেন, এত যাচাইয়ের পরও বাবা কী করে পারলেন একজন গেঁয়ো ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করতে! বাবা আমাকে এত ভালবাসেন, অথচ এই ধরনের ভুল করলেন কেন?

"কী রে শারদা। মনে মনে যেন হাসছিস?" নিরুপমা প্রশ্ন করল।

"না, এমনি।"

"এমনি এমনি কেউ হাসে নাকি?"

"না, সত্যি বলছি এমনি একটা প্রশ্ন মনে জেগেছিল তাই।"

"কী প্রশ্ন? তোর স্বামী সম্পর্কেই কিছু একটা ভাবছিলি তো?"

"আমার স্বামী? ওভাবে ঠাট্টা করছ কেন? আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা কি ভুলে গেছ?"

"তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও—"

নিরুপমা নারায়ণ রাওয়ের প্রশংসা সব সময় করত। মেয়েদের স্কুলে সে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু সব সময় ইংরেজীতেই কথা বলে।

শারদা এসব দেখে একটু অস্বস্তিবোধ করছিল। নিরুপমা বলল, "তোর স্বামী খুব বুদ্ধিমান। যে প্রশ্নই করবি, তার বিস্তারিত উত্তর দিতে পারেন। কত ভাল ভাল গল্প জানেন, আর সেই গল্পগুলোকে এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন যে একবার শুনতে বসলে উঠতে ইচ্ছে করে না। স্কুলের মাষ্টার যখন বোঝাতেন আমার ঘুম পেত, বাড়ির মাষ্টার যখন বোঝাতেন আমার মগজে ঢুকত না। কিন্তু তোমার স্বামী যে দু-চারদিন বুঝিয়েছেন, মনে একেবারে গেঁথে রয়েছে।"

"মাদ্রাজেই তো থাক, ওখানে সব শিখে নিও।"

"ও, বাবা! এখন থেকেই অত টান! তাহলে আর আমার ভাগ্যে সুযোগ হবে না। বাবাকে জানিয়ে দেব। তোর স্বামী তো ভাল গানও জানেন। শুনলাম তোকে দেখতে আসার দিনে ভায়োলিন বাজিয়ে উনি গানও গেয়ে ছিলেন। চোর কোথাকার, এসব বলিসনি কেন তুই। শুধু কি তাই, খোঁজ নিয়ে জানলাম ছবিও আঁকতে পারেন।"

"আমি কী করে জানব, নিরুপমা! পারলে তুমি ওঁর কাছে শিখে নিও।"

সারাদিন বিভিন্ন লোকের কাছে এবং নিরুপমার কাছে যা শুনল সে সম্বন্ধে ভাবতে লাগল শারদা। তা হলে উনি কি সত্যিসত্যিই গেঁয়ো নন, সে তো আজ চোখের সামনে সব দেখছে। ওঃ! আর ভাবতে পারছে না শারদা। নিরুপমা শহুরে মেয়ে, সবকিছু বোঝে, জানে—নিরুপমা কী সব উল্টো কথা বলল। কিন্তু সেদিন সত্যি উনি খুব ভাল বাজিয়েছিলেন।

পরের দিন জগন্মোহন রাও এসে শারদার কাছে সোফায় বসল। শারদা খুব সুন্দরী। দেখে মনে হয় যেন চলচ্চিত্রের নায়িকা। জগন্মোহন ভাবছে তার নিজের বউ হওয়ার কথা যে মেয়ের, সে আজ কত পর। কে এই নারায়ণ রাও? কে ঠিক করেছে এই বিয়ে! একটা শুয়োরের সঙ্গে যেন লক্ষ্মীর গাঁটছড়া!

"শারদা, অত গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন? ষাঁড়ের মতো বিপুল দেহের স্বামী পেয়েছ সেই গর্বেই নাকি? কোত্থেকে তোমার জন্যে এই স্বামী জোগাড় হয়েছে বলো দেখি? ঐ মেড়ার সঙ্গে তোমাকে এভাবে বেঁধে না দিলে কি হত না? তোমার বাবা কী করে পছন্দ করতে পারলেন ওটাকে? শুনলাম তোমার মা'র পছন্দ নয় এপাত্র। তোমার মতো পাখিকে কী করে পারলেন একটা রাক্ষসের হাতে তুলে দিতে!"

শারদা চুপ করে বসে ছিল। তার বুক ধকধক করে কাঁপছিল।

"কথা বলছ না কেন? আচ্ছা সত্যি বলো তো দেখি, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার ঘৃণা হয় নি? একটু লেখাপড়া জানলে আর জমিজায়গা থাকলেই কি পাত্র অভিজাত পরিবারের হয়ে যায়? কোনো রুচি আছে ওর! একবার ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছ!"

শারদার চোখ ফেটে জল এল, উঠে তাড়াতাড়ি সে উপরের ঘরে চলে গেল।

১৩। গল্পসল্প

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের ঐ চারদিন সুব্বারায়, ভেঙ্কটস্বামী, নায়ডু, নাটায়গর বরদাচারী, চোড়াইয়া, বলরামাইয়া, হরিনাগভূষণ প্রমুখ বড় বড় সংগীতজ্ঞকে আনিয়েছিলেন। কন্যা-পক্ষের ওঁরা সঞ্জীবরাও সদমেশ্বর শাস্ত্রীকে দিয়ে বীণা বাজিয়ে শোনালেন। প্রখ্যাত হরিকথাগায়ক রাত্রে বরযাত্রীদের চিত্ত-বিনোদন করলেন।

অন্ধ্রের বহু ধর্মশাস্ত্রকোবিদ তার্কিক ও মহাপণ্ডিত এই বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুব্বারায় পণ্ডিতদের এগার টাকা করে প্রণামী দিলেন। জমিদারও অঢেল দান-দক্ষিণায় খরচ করলেন। এত ঘটা করে বিয়ে হল যে আশেপাশের সমস্ত অঞ্চল বিয়ের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

আড়াইশো ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হয়েছিল রান্না ও পরিবেশনের জন্যে। বিখ্যাত ঠাকুর সুব্বাইয়ার তত্ত্বাবধানে রান্নার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা ভাবে বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকটি ঘর দইয়ের হাঁড়িতে ভর্তি। কয়েকটি ঘর ভর্তি তরিতরকারীতে। পান সাজার জন্যেও বাছাইকরা লোক নিয়োগ করা হয়েছিল।

পুরো পাঁচটি দিন দুবেলা ঘটা করে খাওয়ানো হল আর দিনে তিন-চার বার জলযোগ।

বিয়ের ব্যাপারে নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ থেকে শুরু করে অভ্যাগত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের প্রত্যেকের সুখসুবিধার দিকে জমিদার যেন হাজার চোখে তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

চতুর্থদিন রাত্রে সমস্ত শহর পরিক্রমার জন্য বরকনেসহ বিরাট মিছিল বেরুল। সোনার অলংকার দিয়ে সাজানো হাতির পিঠে বরকনেকে বসিয়ে মিছিল—তার পিছন পিছন সুসজ্জিত বহু হাতি, উট, ঘোড়া, মোটরগাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন চলল। সে-মিছিলে এছাড়া পাঁচশো গ্যাসবাতি ছিল। আরও কত কী ছিল। বরপক্ষের প্রত্যেকেই গাড়ীতে বসেছিল। কন্যা-পক্ষের কেউ মিছিলে বেরোয় নি। বিয়েতে নারায়ণ রাওয়ের সব বন্ধুরা এসেছিল। অনেক বন্ধুর যাতায়াতের খরচ নারায়ণ রাও নিজেই দিয়েছে। যুবকেরা ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে তাস খেলছে, সিগারেট টানছে, তর্কাতর্কি করছে। নতুন নতুন কবিতা শুনছে, শোনাচ্ছে। এক-একটা দিন কিভাবে যে কত আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে তা নিজেরাই টের পাচ্ছে না। জমিদার নিজে দেখাশুনো করছেন তাদের। যখন যা প্রয়োজন তা মেটানোর জন্য অনেকগুলি ঝি-চাকর সবসময় প্রস্তুত। এছাড়া পরমেশ্বর মূর্তিকে নারায়ণ শ'খানেক টাকা দিয়ে রেখেছে যাতে হঠাৎ কোনো বন্ধুর কিছু দরকার পড়লে অসুবিধা না হয়। পরমেশ্বর সে টাকা কার জন্য খরচ করবে ভেবে পাচ্ছে না। পরমেশ্বর, আলম্‌, রাজারাও সকলেই গোটা পরিবারকে নিয়ে এসেছে। বন্ধুদের দেখাশোনার ভার নারায়ণ রাও দিয়ে রেখেছে লক্ষ্মীপতির উপর। লক্ষ্মীপতি বড় সুন্দর ভাবে তত্ত্বাবধান করছে। নারায়ণ রাও এবং লক্ষ্মীপতি এ দুজনকে দরজার কাছেই পাচ্ছেন অভ্যাগত বন্ধুরা। জনৈক বন্ধু—"কনে যে একেবারে অপ্সরা!"

অন্যজন—শুনেছি খুব গুণবতী। ইংরেজী, সংস্কৃত তেলুগু ভাষায় নাকি

দখল আছে। তাছাড়া ভায়োলিন-বীণা বাজাতেও পারে আর গান গায় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী।

রাজা—নারায়ণ রাওয়ের ভাগ্যের জোর আছে বলতে হবে তাহলে।

পরমেশ্বর—আমি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করতে পারি যে নারায়ণ রাও অতিশয় ভাগ্যবান পুরুষ! আপনাদের সকলের অনুমতি পেলে তা আমি খবরের কাগজেও ছাপিয়ে দিতে পারি।

লক্ষ্মীপতি—জমিদারবাবু খুব তৎপরতার সঙ্গে করণীয় কাজগুলো সারলেন।

আলম—ভাই লক্ষ্মীপতি, জমিদারবাবুকে আমরা যখন সেই প্রথম দেখি প্ল্যাটফরমে, তখন আমাদের মধ্যে কি কেউ ভেবেছিলাম ভদ্রলোক এতখানি সজ্জন!

রাজেশ্বর—হ্যাঁরে, নারান! তোর শ্বশুরমশায় যে একেবারে তোর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছেন। চোখের দিকে দেখলে মনে হয় যেন সবসময় উনি তোকে খুঁজছেন।

আরেক বন্ধু—মনে হয় যেন প্রথম দর্শনেই গভীর ভালবাসায় পড়ে গেছেন।

অন্য এক বন্ধু—শাসনসভায় জমিদার মশায় সবসময় স্বরাজ পার্টির পক্ষেই কথা বলেন। কিন্তু আবার সত্যাগ্রহ পছন্দ করেন না।

লক্ষ্মীপতি—পছন্দ করবেন না কেন? জেল না খাটলেও উনিশশো বাইশ সালে যখন অনেকেই জেলে গেল তখন তো উনি রাজবন্দীদের পক্ষে শাসন সভায় প্রায়ই প্রশ্ন তুলতেন। হ্যাঁরে, রাজেশ্বর, তোর জাস্টিস্ পার্টির সঙ্গে তো ওনার আদায় কাঁচকলায়, পান্থলমশায়ের ওপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন।

নারায়ণ—পান্থলের সঙ্গে সুর মেলানোর মতো লোক এখন পর্যন্ত জন্মায় নি, আদৌ জন্মাবে কিনা সন্দেহ। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজধানী সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা গভীর। অন্ধ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে ওঁর। উনি নিজে কোনো পার্টির লোক নন, বাইরের দিক থেকে যাই হোন না কেন মনে মনে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণদের ভেদ উনি স্বীকার করেন না।

রাজেশ্বর—জয় নারায়ণ রাওয়ের জয়। নাঃ, তুই আমাদের পার্টির মান বাঁচিয়ে দিলি।

নারায়ণ—সত্যি কথা বলতে, স্বরাজ পার্টি করেছেই বা কী?

পরমেশ্বর—আমি এসব স্বীকার করব না। দেশপ্রেমিকরা যখন জেলে পচে মরছিল, তখন গভর্ণমেণ্টের এইসব পোষ্যপুত্র দেশোদ্রোহীরা বড় বড়, চাকরির জন্য উপরমহলে দৌড়াদৌড়ি করছিল। এঁরাই তো তারা যারা কংগ্রেসকে গালাগাল দিয়েছেন।

নারায়ণ—আমি বলছি না যে তোমার কথা সত্যি নয়। কিন্তু এই ভাবেই স্বরাজ পার্টিকেও তোমা৺ বিচার করতে হবে। তুমি তো জান যে ওরা শাসনসভায় তেমন কিছু করেনি। কয়েকটা প্রশ্ন শাসকদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া আর কী করেছে? এমন কিছু ফলও হয় নি তাতে। কংগ্রেসে থেকে জেলে যেতেও পারবেন না, কোনো ঝড়ঝাপটারও সম্মুখীন হতে পারবেন না। শাসনসভায় বক্তৃতাবাজী ছাড়া আর কীই বা করার আছে। সঠিক পথে চলার জন্য যে মহাত্মা নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে ধাক্কা মেরে একদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলতে পারি না বলেই তাঁর ভুল ধরি। শাসনসভায় বাক্‌বিতণ্ডা ঝগড়াঝাটি করেই ওঁরা শেষ হবেন। জনতার মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টিও এঁরা করেন না। একপথে চলতে চলতে আজকাল বহুপথ ধরেছেন। যে যার নিজের রাস্তা ধরেছে—এই তো স্বরাজ পার্টির অবস্থা।

পরমেশ্বর—তুই তো ভাল তার্কিক। তুই বল না, তোর মতো লোকই বা কী করেছে? জেল থেকে বেরিয়ে কোন মুখে কলেজে ভর্তি হলি?

নারায়ণ—আমি তো একথা বলি নি যে আমি যা করেছি তাই ঠিক। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন।

পরমেশ্বর—সে তুই যাই বলিস্ না কেন, স্বরাজ পার্টির ভালভাল কাজের স্বীকৃতি না দিলে অন্যায় হবে।

নারায়ণ—তার চেয়ে বল্ না কেন, তারা কিছুই করে নি। ওরাই তো সমানে প্রচার করেছিল যে বরদৌলী প্রস্তাব ভুল, গান্ধীজী নির্বোধ। যেটুকু কাজ কংগ্রেস করেছিল তার সবটুকুই একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এরা। আমি স্পষ্ট বলব যে এরা দেশবাসীর মুখে বিষপাত্র তুলে ধরেছে।

ওদের তর্কবিতর্ক কয়েকজন বন্ধু শুনছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিরক্ত হয়ে দূরে সরে গিয়ে তাস খেলতে বসে গেল। বাকী যে কয়জন রইল তারা বিতর্কে যোগ দিল।

পাঁচদিন পরে বন্ধুরা চলে গেল। পরমেশ্বর মূর্তি 'গৃহপ্রবেশের' জন্য কোত্তাপেটা পর্যন্ত এল। অন্যান্য বন্ধুরা রাজমহেন্দ্রবরম থেকে বিদায় নিল।

জানকীআম্মা খুব খুশী। তার বড় মেয়ের শাশুড়ী বললেন, "আয়েসে থাকার জন্যেই তো বড় দেখে বউ নিয়ে এসেছ, দেখে তো মনে হচ্ছে আজ বাদে কাল সোমত্ত হবে।"

"প্রথম বউ ঘরে এসেই বা কী সুখ দিয়েছে যে এ দেবে। স্বামীস্ত্রীতে ওরা সুখে থাক এতেই আমি সুখী।" জানকীআম্মা বললেন।

জনৈক মহিলা—বউ তো তোমার জমিদারঘরের মেয়ে। বাড়ির কাজ করবে কেন? ওসব বউদের কি তোমার কাজ করতে হয়েছে কখনো?

অন্য এক মহিলা—কন্যাপক্ষের লোক অতি আধুনিক, যেন মাটিতে পা পড়ে না। কারো সঙ্গে কথাও বলে না। হ্যাঁগা, অত দেমাক কিসের? আমাদের দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকায়, মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

জানকীআম্মা—সেই জন্যই তো উনি এঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চান নি। কিন্তু যে ভাবে ধরাধরি আর জোরজুলুম করল তাতে না করে আর উপায় ছিল না!

নারায়ণ রাওয়ের দিদি এবং শ্রীরামমূর্তির ছোট বোন ভেঙ্কায়াম্মা বলল, "মা, তুমি কী বলছ! এখানে যে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে সে তো ভাল কথা, আর তাছাড়া ভায়ের আমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে। মেয়েকে দেখেশুনে যাচাই করে তারপর বিয়ে করেছে।"

নারায়ণ রাওয়ের অন্য এক দিদি বলল, "স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে যদি গভীর-ভাবে ভাল না বাসে তাহলে সে জীবন বৃথা, নরকতুল্য।"

ভেঙ্কায়াম্মা—তোমার মত সকলের কপাল তো আর পোড়া নয়। জগতের সব বিয়ে পরস্পরকে দেখে শুনে হয় না।

জানকীআম্মা—যে স্ত্রীর জন্যে স্বামী গর্ববোধ করে না, প্রচুর ধনদৌলত থাকলেও স্বামী যদি তাকে পোষা জানোয়ারের মতো দেখে, তাহলে তার চেয়ে জঘন্য জীবন আর হতে পারে না!

নারায়ণের ছোটবোন সত্যবতীর স্বামী রাগী লোক, সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করতে চায় না সে। ভাশুরের দিকে তাকিয়েছে বলে, কিংবা ঠাকুরপোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেছে বলে বউকে বকুনি

দেয়। একদিন সে মাকে বলল, "একে খেতে দিও না।" সারাদিন তাকে একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল। সত্যবতী ছুটি মেয়ে এবং একটি ছেলের মা। একটি মেয়ে শৈশবেই মারা গেছে।

সত্যবতী সুন্দরী। সোনার পাতের মতো ঢলঢল করছে তার গায়ের রঙ। চিকন চেহারা তবু বীরভদ্ররাও কথায় কথায় তাকে মারধোর করে। সুব্বারায় এবং জানকীআম্মাকে সত্যবতীর জীবন যন্ত্রণা বারে বারে পীড়িত করে। এই মেয়েটার জন্যে জানকীআম্মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছেন।

নারায়ণ রাওয়ের অন্য বোন সূর্যকান্তম বলল, "দিদি, আমি আর ছোটদি কাল সারাদিন বউদির কাছে ছিলাম। প্রথম প্রথম তো বৌদি কথাই বলতে চান নি। তারপর কত কাণ্ড করার পরে যাও বা মুখ খুললেন তাও নিজের পড়া, স্নান এইসব কথা বলতেই ব্যস্ত।"

নারায়ণ রাওয়ের কোলের বোনটি বলল, "আমার সঙ্গে তো বড় জোর ছু-একটি কথা বলেছেন। সুরীর সঙ্গেই তো আগাগোড়া কথা হয়েছে। ওদের ছুজনার মধ্যে বেশ মিশ খেয়েছে।"

ভেঙ্কায়াম্মা—সুরী (সূর্যকান্তম), কী কথা হল তোমাদের ?

এর মাঝখানে সত্যবতীর শাশুড়ি এবং ভেঙ্কায়াম্মার শাশুড়ি জানকী আম্মাকে বলল, "এখনও চুল বাঁধার জন্যে বউকে ডাক নি, গাঁয়ের মেয়েরা যে ফুল খেলার জন্যে ডাকছে। আমরা তো সব তৈরী, আর তুমি এখনও মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছ।"

জানকীআম্মা—বড় মেয়ে আর সুরী বউমাকে ডেকে আনবে। সত্যবতী, মানিক্যম আর তুমি সবাইকে ডাকতে যাও। বন্ধুরা চায় সাবিত্রী গান গাক।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় ছাপানো কার্ডে শুধু মহিলাদেরই নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা নারায়ণ রাও, লক্ষ্মীপতি এবং পরমেশ্বরমূর্তির। তিনটি মোটর গাড়ীতে করে জানকীআম্মা, রামমূর্তির স্ত্রী, সূর্যকান্তম, মানিক্যম শ্রীরামমূর্তির শাশুড়ি এবং ভেঙ্কায়াম্মা আমন্ত্রিত মহিলাদের নিয়ে আসতে বেরুলো।

পরমেশ্বর মূর্তি হলঘরটাকে সুন্দর করে সাজাল। আমন্ত্রিত মহিলাদের বসার জায়গাটি চমৎকার দেখাচ্ছিল। হলঘরে কয়েকজন দাসীও নিযুক্ত হল বাতাস করার জন্য।

বিভিন্ন ঘরে অতিথিদের জন্য ফলফুল সাজানো ছিল। প্রত্যেক মহিলাকে পানসুপারী কর্পূরের মালা, খদ্দরের ব্লাউজ এবং রুপার একটি পাত্র এই উপলক্ষ্যে দেওয়া হল। আমন্ত্রিতদের মধ্যে জজসাহেবের স্ত্রী, ইংরেজ সাব-কালেক্টরের গৃহিণী ইত্যাদি এলেন। নারায়ণ রাওয়ের বিবাহ-উৎসবকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই উপলক্ষে কন্যাপক্ষের মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সবাইকেও নানান উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। সাবিত্রী চমৎকার গান গেয়েছিল সেদিন। তার কণ্ঠে যেন বীণার তার ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। তার সুমধুর সংগীতে বরবধূ মুগ্ধ হয়ে গেল। আর বরকনেকে মুগ্ধ হতে দেখে সাবিত্রীও হল তন্ময়।

১৪। অন্যদিন

বিবাহসূত্রে কী জানি কী আছে যার ফলে সাগরের নুন আর বনের আমলকীর মতো অসম দুটি জীবন এক নবরসায়নে মিলিত হয়, দুটি নদীপ্রবাহ যেন বিবাহ-বেদীর সংগমে এসে মেলে। নারায়ণ রাও আশ্চর্য হয়ে এসব কথা ভাবছিল।

তাকে যখন বরের সাজে সাজানো হয়েছিল, মঙ্গলস্নান করানো হয়েছিল, বাসন্তী রঙের রেশমী কাপড় পরিয়ে যখন বিবাহ বেদীতে বসানো হয়েছিল আর শারদার গলায় মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তখন যেন কোন এক বিচিত্র ভাবসমুদ্রে সে ডুবে ছিল। শারদার সামনে বসে মনে তার প্রেমতরঙ্গ উথালপাথাল করছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন সন্তানবৎসলা মা আর শারদা তার সন্তান—যেন সে জন্মজন্মান্তরের সুহৃদ,—শারদা যেন মহারাণী আর সে যেন তার সেবক, তারা যেন নীল আকাশের ভাসমান একাত্ম দুটি মেঘের টুকরো, বুঝিবা দুটি যমজ সন্তান। শারদা আর সে, পুরুষ আর প্রকৃতি। সে যেন পুরুষোত্তম আর শারদা যেন মহান সৃষ্টি।

বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে শারদার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু স্থানকালপাত্রের কথা চিন্তা করে লজ্জা পেয়েছিল। ভিতরে তার এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল শারদাকে এই মুহূর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল।

নারায়ণ রাও বলল, "আচ্ছা পরম, প্রত্যেক বরের মনেই কি বিয়ের সময় আমার মতো বিচিত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়? শারদা এবং আমার মনের মধ্যেকার সুদৃঢ় বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করার মতো শক্তি পৃথিবীর কারও নেই। বিয়ের মন্ত্রগুলির কী মাহাত্ম্য। সেগুলোর অর্থ কিছু কিছু বুঝেছি। আমার মনে হল যেন মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে একটি মনকে অপর একটি মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর মন্ত্রোচ্চারণকারী পুরোহিতদের দেখে মনে পড়ল জটাবল্কলধারী সেই প্রাচীন ঋষিদের কথা। উদ্যানের দক্ষ মালির মতো সে যেন জীবনের দুটি শাখাকে কলমের মাধ্যমে একীভূত করছে।"

পরমেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, প্রেম করে বিয়ে করার চেয়ে বিয়ে করার পর যে প্রেম হয় তার স্থায়িত্ব বেশী। অন্যদের কথা নাই-বা ধরলাম, নিজের কথাই যদি বলি, বিয়ের সময় আমার বয়স হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের আগে আমি আমার বউকে দেখি নি। ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে অনেকে তাদের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে এসেছে, আমিও তাদের দেখতে গেছি। বহু মেয়ে দেখবার পর একটিকে আমার খুব পছন্দ হল, ভারি সুন্দর দেখতে তাকে। সে যেন তিলোত্তমা। শুধু সুন্দরীই নয়, গানের সুরে সে পাথরও গলিয়ে দিতে পারত। তাকে দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, মনে হল, তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমার জীবন সার্থক হবে। কিন্তু কন্যাপক্ষ বেশী পণ দিতে রাজী ছিল না আর বাবা চাইছিলেন অনেক। বিয়ে হল না। মাকে দিয়ে, বাবার বন্ধুদের দিয়ে, মেয়েকে আমার পছন্দ, একথা বাবাকে জানালাম, কিন্তু কোনো ফল হল না। আমার মন ভেঙে গেল। আমি যে স্বপ্নসৌধ রচনা করেছিলাম তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারপর যে মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছিল সে অতটা সুন্দরী না হলেও সংগীতনিপুণা, তারা কিন্তু তলে তলে আরও বড় শিকারের সন্ধানে ছিল। সেখানে দরে না বনলে, তবেই আমাদের সঙ্গে সওদা করবে এই ছিল তাদের মনোগত ইচ্ছা। মেয়েটি আমার মনে সংগীতের সুর তুলে দিয়েছিল—খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আমার চোখ। মেয়েটির বিয়ে অন্যত্রই স্থির হল। আমিও ঠিক করলাম আর কোনো মেয়েকে দেখতে যাব না। বাবা মা যাকে ঠিক করবে তাকেই চোখ বুজে বিয়ে করে নেব। হলোও তাই, মঙ্গলসূত্র বাঁধার সময় দেখলাম যাকে বিয়ে করছি সে তত সুন্দরী নয়। চোখে ভাসল ঐ দুটি মেয়ের মুখ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু

জানি না মঙ্গলসূত্রে এমন কী মহিমা আছে যার ফলে যতই দিন যায় বউকে আমার তত বেশী করে ভাল লাগে।"

পরমেশ্বর নারায়ণ রাওয়ের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হল। মুখ ঘুরিয়ে নিল, তারপর অন্য কথা পেড়ে বসল, "যাই বল নারান, আমাদের এবং মুসলমানদের বিয়ের মধ্যে, একটা পার্থক্য রয়েছে, তার কারণ ওদের বিয়ে একটা ধর্মানুষ্ঠান নয়—ওদের যেন একটা কন্‌ট্রাক্ট। যখন ইচ্ছে ভাঙা যায়।"

—খাঁটি কথা, মুস্লিম বিবাহ—সত্যিই একটা কন্‌ট্রাক্ট। ক্রীশ্চানদের গীর্জার বিয়ের মধ্যেও ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে, আমাদের সমাজের বিয়ে পুরোপুরি ধর্মীয় বিধিসম্মত। স্বামীস্ত্রীর মধ্যেকার এই পবিত্র সম্পর্ক সৃষ্টি হতে না জানি কত যুগ লেগেছে। অরণ্যচারী পশু জীবন থেকে বিবর্তিত হয়ে আজকের এই পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে পবিত্র বিবাহ বিধির মধ্যে দিয়েই।

—সত্যি, স্বামী যাই হোক না কেন, স্ত্রীও সেইভাবে বদলে যায়। স্বামী উকিল হলে বউয়ের মুখেও আইনকানুন, মক্কেল আর বিচারকদের কথা। ডাক্তারের স্ত্রীর মুখে শুনতে পাই রোগী, রোগ আর ওষুধ—ইন্‌জেক্‌শনের কথা। বহুবার একটা প্রশ্ন আমি ভেবেছি, কিন্তু সঠিক জবাব খুঁজে বের করতে পারি নি, সে প্রশ্ন হল স্বামী স্ত্রীকে বেশী প্রভাবিত করে না স্ত্রী স্বামীকে।

—ভাল প্রশ্ন। দেখো, আমার মতে স্ত্রীর জীবন স্বচ্ছ। পতির জীবনের বর্ণচ্ছটা তার ওপর পড়লেই সে তৃপ্ত হয়। ঘর সংসারের ব্যাপারে অবিশ্যি স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবই বেশী তাই কোনো বাড়ির রূপসজ্জা দেখেই বলা যায় স্ত্রী কেমন মেয়ে আর স্বামী নরম স্বভাবের হলে অনেক সময় দেখা যায় তার জীবনে স্ত্রীর প্রভাব পড়ে বেশী।

সুব্বারায় মেজছেলের বিয়ের পর থেকেই গভীরভাবে ভাবছেন তার সম্পর্কে। এর আগে চার মেয়ে এবং বড় ছেলের বিয়ে ভাল ঘরেই দিয়েছেন তিনি। তারা এখন সুখী এবং সম্পন্ন, বিয়েও তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের উদ্যোগেই হয়েছে। আজ পর্যন্ত যতগুলি বিয়ে হয়েছে যেন একদিকে আর অন্য দিকে নারায়ণ রাওয়ের বিয়ে। প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে এ বিয়েতে। আরো খরচ হলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অপরপক্ষে জমিদারেরও হাজার

হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। দুই হাতে টাকা খরচ করেছেন তিনি। ওপক্ষ জমিদার বলে দমে যাওয়ার কী আছে। তাই সুব্বারায়ও রাজামহারাজাদের মতো সাড়ম্বরে বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন। কনের মা চমৎকার মহিলা। কন্যাপক্ষের কয়েকজন মহিলা দু-একটি অনুযোগ করলে তিনি শান্তভাবে তার সমাধান করলেন। নতুন সম্পর্ক যতই দিন যেতে থাকবে তত গভীর এবং নিবিড় হবে।

সুব্বারায় ভাবছেন, বড়লোকের মেয়ে শারদা ; আমার বাড়িতে তার হয়তো কষ্ট হবে। ছেলে কোথাও হয়তো চাকরি বা ওকালতি জুটিয়ে নেবে। আর তা না জুটলেও ভগবানের দয়ায় তার খাওয়াপরার অভাব কোনোদিন হবে না। নারায়ণ অমিতব্যয়ী নয়, প্রয়োজন হলে দু-একজন চাকরও রাখতে পারবে। ছেলে আমার বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। পরিশ্রম করে নিশ্চয়ই সে পরিবারের মানমর্যাদা, যশপ্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলবে। সুতরাং সে নিষ্কর্মা থাকবে একথা ভাবাই যায় না। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণদের পক্ষে চাকরি জোগাড় করা শক্ত হলেও টাকা রোজগারের জন্য চাকরি ছাড়া অন্য পন্থাও রয়েছে। মাদ্রাজে ওকালতি করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করা যায়। আইনকানুনের ব্যাপারে অবশ্য ছেলের আমার আগাগোড়াই একটা অশ্রদ্ধা রয়েছে, তবুও আমার বলাকওয়াতে ল' কলেজে ভর্তি হয়েছিল। যাই হোক, এ নিয়ে অত ভাববার কী আছে। নারান আমার গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। সে জানে যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। ভাবনা শুধু শারদাকে নিয়ে। জানি না মেয়েটি কেমন। সাধারণত জমিদার পরিবারের লোকদের মধ্যে বড় বেশী অহংকার দেখা যায়, ও সব বংশের সন্তানদের পক্ষে আমাদের মতো পরিবারে খাপ খাওয়ানো মুশকিল। ডাঙায় তোলা মাছের মতো ছটফট করবে না তো শারদা ? বুদ্ধিমতী মেয়ে, ওর মত না নিয়েই কী জমিদার মশাই বিয়ের কথা পাকা করেছেন ? বৌমার নিশ্চয়ই আমার নারানকে পছন্দ হয়েছে। আর ছেলেও আমার জানে অন্যের মন কী করে পরখ করতে হয়। চেহারাটিও এমনই সুন্দর যে ওকে বিয়ে করতে পারলে যে কোনো মেয়েই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতে বাধ্য। তবু এখানে বিয়ে দিয়ে ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সবই তাঁর ইচ্ছে, কার ভাগ্যে যে কী লেখা আছে কে জানে। ঈশ্বরের

লীলার কথা কেই বা বলতে পারে? আজ পর্যন্ত আমি যে বিষয়ে হাত দিয়েছি তাই হয়েছে সোনা, কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে কে জানে?

সুব্বারায় গম্ভীর এবং ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ। মাঝদরিয়ায় ডুবুডুবু পরিবারতরীকে তিনিই সামলে কিনারে এনেছেন। কারো কোনো ক্ষতি না করে নিজের পরিশ্রমে পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি বহুগুণ বাড়িয়েছেন। এত বাড়িয়েছেন যে তাঁকে ছোটখাটো জমিদারও বলা যায়। জেলার লোকের মুখে মুখে একটি কথা, 'সুব্বারায়ের পণ ভীষ্মের পণ'। তহবিল থেকে ছেলের বিয়েতে উনি পঁচিশ হাজার টাকা তুলেছেন, ঘুণাক্ষরেও এ প্রশ্ন মনে জাগে নি যে বড় ছেলে কী বলবে।

শ্রীরামমূর্তির ইচ্ছা নয় এত টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেও ইতস্তত করে নি। চার বোনের বিয়ে এবং তিন বোনের পুনরাগমনের সময় অজস্র টাকা খরচ হয়েছিল তাতেও রামমূর্তি কিছুই বলে নি। বরং কেনা কাটায় কিছু ভুল হয়ে গেলে মনে করিয়ে দিয়েছে সে বাবাকে।

সুব্বারাও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনো দাবি নেই, কোনো পণ তিনি নেবেন না। কিন্তু জমিদার মশাই জামাইকে তনকু তালুকে নিজের গ্রামের কাছে প্রচুর জমি দিয়ে দিলেন, অসংখ্য জিনিস উপহার দিয়েছিলেন তিনি। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলেন মেয়ের নামে।

বড় বউয়ের মতো-ছোট বউয়ের জন্যও দশ হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন সুব্বারায়।

১৫। গৃহপ্রবেশ

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শারদার সঙ্গে গেল শকুন্তলা দেবী, জমিদারের ভাগ্নী ললিতা, বরদকামেশ্বরীর আত্মীয়া সরোজিনী, আর জমিদারের ছেলে কেশবচন্দ্র। সুব্বারায় সবাইকে চৌদ্দ দিনের উৎসবানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বললেন। সুব্বারায় স্বজনবৎসল মানুষ, আদর অভ্যর্থনার ব্যাপারে জনকতুল্য তিনি। জানকীআম্মার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়ে সমেত তিনশ জন বিয়ে উপলক্ষে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজমহেন্দ্রবরম

থেকে চলে গেলেন। বাকী কজন কোত্তাপেটায় এলেন। কোত্তাপেটায় আটজন তেলুগু ব্রাহ্মণ ও দুজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণের উপর রান্নার সব ভার দেওয়া ছিল। সুব্বারায় বরবধূর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানটিকেও বিবাহ অনুষ্ঠানের সমতুল্য জমকালো করে তুললেন।

বরপক্ষ বিয়ের সময় খদ্দরের পোশাকই ব্যবহার করেছিল। স্বদেশী বা রেশমী বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়েছিল। কন্যাপক্ষও বর এবং তার আত্মীয় স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের খদ্দরের বস্ত্রই দিয়েছিলেন। মহিলাদের যথোপযুক্ত শাড়ি ব্লাউজ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল।

শারদার কাছে শ্বশুরবাড়ি বিচিত্র লাগে। বাপের বাড়িতে যত আসবাব ও জিনিসপত্র তত এ-বাড়িতে অবশ্যই নেই। বাপের বাড়ির দোরগোড়ায় আর দেয়ালে ছবি টাঙানো, মেঝেতে চেয়ার টেবিল আলমারি। আলমারির ভিতর রুপো-পিতল আর তামার জিনিস, চীন, বর্মা, আগ্রা, আজমীর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নানান জায়গা থেকে আনা। বাবা, ঠাকুরদা, মা, মাসিদের ছবিও আছে। এ-বাড়িতে শারদার স্বামীর ঘরটাই যা একটু সাজানো। সূর্যকান্তম ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। তাঞ্জোরের কয়েকটি খেলনা, মামুলি কয়েকটি চেয়ার-টেবিল। বেতের চেয়ার দু-একটি শারদার নজরে পড়ল। বাপের বাড়িতে এতদিন বৈদ্যুতিক আলোতে বড় হয়েছে কিন্তু এখানে হ্যারিকেন এবং পেট্রোম্যাক্স ছাড়া আর কিছু নেই। ছিঃ, এ আবার একটা বাড়ি নাকি!

শকুন্তলাদেবী বোনকে বলল, "আমার শ্বশুরবাড়িতে, আমাদের বাড়িতে যত জিনিস আছে তত না থাকলেও তবু যা আছে হঠাৎ দেখলে মনে হবে জমিদারবাড়ি। কিন্তু তুমি একেবারে গেঁয়ো ঘরে পড়ে গেলে। কয়েক গণ্ডা খাট-পালঙ্ক থাকলেই কি আর জমিদারি ভাব আনা যায়! এ তুমি কেমন জায়গায় এসে পড়লে বোন, শুনেছি এদের অনেক টাকা আছে, জমি আছে। কিন্তু তা দিয়ে কি ধুয়ে খাবে! আভিজাত্য বলে কিছুই নেই। এসব তো আর শিখে হয় না, এসব হল জন্মগত একটা ইয়ে,—এদের জীবনযাপন আর চালচলন সব কিছুই দেখছি বিচিত্র।"

—তোমার স্বামীর বড় বোনটি সবসময় বকবক করছেই। আমাকে, ললিতাকে আর সরোজিনীকে বসিয়ে সে বেদান্তপাঠ শোনাবেই,—

নাছোড়বান্দা। আর তাছাড়া আমার কাছে আমার আত্মীয়স্বজনের খুঁটিনাটি পরিচয় জানতে চায়। কথায় কথায় দাঁত বের করে হাসা ওর আরেকটা বদভ্যাস।"

ললিতা বলল, "আমি তো কিছুক্ষণ পরেই এমনভাবে ঝট করে উঠে এসেছি যাতে সে অপমান বোধ করে।"

সরোজিনী বলল, "অত হালকাভাবে ওদের দেখ কেন। ওরাও আমাদেরই মতো সম্মানী লোক, ওদেরও আভিজাত্য আছে। পৃথিবীতে সবাই তো আর জমিদার হয় না। সাত রাজ্য ঘুরলে দশটা জমিদার মেলে কিনা সন্দেহ। তোমরা যদি দশ বোন হও, তাহলে প্রত্যেকের জন্য জমিদারের ছেলে তোমার বাবা এনে দেবে কোত্থেকে!"

ইতিমধ্যে সূর্যকান্তম সেখানে পৌঁছে গেল, ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথা গেল থেমে। নারায়ণের প্রতি সূর্যকান্তমের টান খুব বেশী। বাড়িতে মা-বাবা, ভাইবোন যারাই থাকুক না কেন, নারায়ণকে না দেখতে পেলে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ছোটবেলা থেকে নারায়ণ রাওই তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। সামান্য একটা আঘাত পেলে 'দাদা' বলে চিৎকার করে ছুটে আসে নারায়ণের কাছে। দাদার বিছানাতেই ঘুমায়। একসঙ্গে খায়। মুখে সবসময় 'দাদা' শব্দটি লেগেই আছে। ওর দাদা যখন লেখাপড়ার জন্য কমলাপুরম, রাজমহেন্দ্রবরম আর মাদ্রাজে ছিল, এবং যখন জেলে গেল তখন সে প্রায় প্রত্যেক দিনই কাঁদত। রাজমহেন্দ্রবরম জেলে দেখা করতে গেলে জেলারের অনুমতি নিয়ে বোনকে কাছে ডেকে নারায়ণ তার কানে কানে দেশপ্রেমের কথা শোনাত: "তুমি যদি এভাবে কাঁদ তাহলে গান্ধীজী দুঃখ পাবেন। তুমি যদি এভাবে কাঁদ তাহলে আমারও দুঃখ হবে, কান্না পাবে, জেলে একমুহূর্তও থাকতে পারব না। লোকে সব বলাবলি করবে, 'ওর বোন দেশদ্রোহী, তাই ভাইকে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে বলছে।'—ইত্যাদি।" সূর্যকান্তম ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আর পরক্ষণেই হেসে ফেলে দাদার সামনে। চোখমুখের দুঃখের ভাব যেন কিছুটা কেটে যায় তার। আকাশের কালো মেঘ যেন সরে যায়। সুন্দর নীলাকাশ দেখা যায়।

সেইজন্যে বৌদিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সে আর ছাড়তে চায় না।

বৌদিকে তার খুব ভাল লেগেছে। একমুহূর্ত তাকে চোখের আড়াল করতে ভাল লাগে না। বৌদির চুল বেঁধে দেয়। ফুল গুঁজে দেয়। তার গয়না-গাঁটিগুলো ঠিক করে পরিয়ে দেয়, গায়ের কাপড় গুছিয়ে দেয়। আর সব সময় পাশে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই বলে, "বৌদি, তুমি সত্যিই সুন্দর।" শারদা প্রথমে ভেবেছিল মেয়েটি বোকা বা চপল, কিন্তু মেয়েটির ব্যবহার দেখে বুঝল সে তাকে আন্তরিকভাবেই ভালবাসে। নারায়ণের বন্ধুদেরও সূর্যকান্তমের ব্যবহার খুব ভাল লেগেছিল।

সূর্যকান্তম বউদির হাত ধরে বলল, "বলেছিলাম না, আমাদের লাল গোরুটা দেখাব, একবার দেখলে আর ছাড়তে ইচ্ছা করবে না। এক্ষুনি ক্ষেত থেকে আমাদের গোরু-মোষ-বলদ সব ফিরেছে। বাঁধা হয়ে গেছে। আসবে এখন একবার আমার সঙ্গে ?"

সেদিন সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বাড়ির কাছে বাতাসে মিশে আছে গোলাপের সৌরভ। কালকেই সূর্যকান্তম বাড়ির পেছনের ফুলবাগান দেখিয়েছে। বাগানে চামেলী চম্পা-গোলাপ রজনীগন্ধা, গাঁদা—নানা রঙের নানা ঢঙের ফুল বাগানকে মাতোয়ারা করে তুলেছে। নারায়ণ রাও খুব যত্ন নেয় ঐ বাগানের। ছুটি পেলেই চারদিক থেকে নানান ফুলের চারা এনে বাগানে লাগায়। বন্ধুরা ওর ঐ পুষ্পোদ্যানপ্রীতিকে কটাক্ষ করে ওর নাম রেখেছে মালী।

নারায়ণের হাতের ছোঁয়ায় গাছগুলো যেন পুলকিত হয়। বন্ধুদের সে বলত, "জগদীশ বোস যা বলেছেন তার মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নেই।"

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যতরকমের ফুল আছে, তার যত দামই হোক না কেন, সেগুলো সে সংগ্রহ করত। বাগানে বিদেশী ফুলগাছও কম ছিল না।

সূর্যকান্তমের ভাল লাগে দাদার এই শখ। সেও প্রশংসা করে দাদার রুচির। দাদার অনুপস্থিতিতে সেই মালীর কাজ দেখাশোনা করে। প্রত্যেকটি ফুলগাছের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। দাদার এই ফুলবাগান সযত্নে সুরক্ষিত করা তারই যেন দায়িত্ব। সে যেন ঐ উদ্যানের বনদেবী।

শারদা পুষ্পোদ্যানটিকে দেখে আশ্চর্য হয়, কিছুটা ঈর্ষাও বোধ করে।

ওদের দুজনকে বাগানে পায়চারি করতে দেখে নারায়ণ রাওয়ের চোখ জুড়িয়ে যায়। এতদিনের শ্রম যেন সার্থক হল। ইচ্ছে করল দুজনকেই সাদর

অভ্যর্থনা জানিয়ে আলিঙ্গন করে। সেই মুহূর্তে সারা বিশ্ব তার কাছে মনে হল প্রেমময়, অমৃতময়।

আস্তে আস্তে নারায়ণ রাও ওদের কাছে গিয়ে বলল, "সুরী, বাগান দেখছিস বুঝি?"

প্রশ্ন করেই কেমন যেন সংকোচ বোধ করে সে। শারদার সঙ্গে কথা বলতে তার দারুণ ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন যে এই বৃথা সংকোচ তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ এই তো সেই মানুষ যে হাজার মানুষের সামনে ভাষণ দিতে পারে, কিন্তু আজ শারদার কাছে তার কেমন যেন সংকোচ! গত কাল সুসজ্জিত মিছিল বেরুনোর আগে হঠাৎ শারদাকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কলেজে পড়বে?"

শারদা চমকে উঠেছিল। বরবধূদের প্রথম কথা বলার ঢং সে এর আগে দেখেছে। সেও কী যেন একটা উত্তর দিতে চাইল, কিন্তু লজ্জায় তার মুখে কথা সরল না। স্বামী যে আজকে হঠাৎ এভাবে কথা বলবে তা সে কল্পনা করতে পারে নি। প্রথম যেদিন নারায়ণ রাও তাকে দেখতে আসে সেদিন কিন্তু এসব ভয়-লজ্জা কিছুই ছিল না তার। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল সে। ভায়োলিন বাজানোর সময় তাকে আরও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কিন্তু যেদিন ওর সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেল সেদিন থেকেই ওর মা বরদকামেশ্বরী ওর সামনেই কান্নাকাটি শুরু করলেন। এই পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বান্ধবীদের মধ্যে দু-তিনজন বাদে আর সবাই বরদকামেশ্বরীর কথায় সায় দেন, তারই মতো দুঃখ প্রকাশ করেন, আর নিন্দা করেন।

ওঁদের কথা শুনে শারদা ব্যথা পায়। তার মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এইরকম একটা মানসিক অবস্থায় নারায়ণ রাওয়ের এই কথা বলার আগ্রহ তার কাছে আরও বিস্ময়জনক মনে হল।

সেদিন সে স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। নারায়ণ ভাবল শারদা লজ্জা পেয়েছে। তাই সে বলল, "শারদা, তুমি তো ইংরেজী খুব ভাল জান। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা এ ধরনের লজ্জা পায় না। শুনলাম এবারের স্কুলফাইনেল পরীক্ষায় তোমার বসার কথা

ছিল। আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা কিসের?" নারায়ণ রাও ইংরেজীতে এসব প্রশ্ন করল।

শারদা কোনো জবাব দেয় নি। সে নীরব।

"তোমার ইংরেজী শিক্ষয়িত্রী বলেছেন, তোমার নাকি ইংরেজীতে ফার্স্ট ডিভিশন মার্কস থাকবে। তাঁর কাছে শুনলাম, তথাকথিত সংকোচ লজ্জা এসব তোমার নেই, আজ তোমার এত লজ্জা তাহলে কেন? তোমার শিক্ষয়িত্রীর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি নীরব কেন?" নারায়ণ রাও আবার ইংরেজীতেই কথা বলল।

শারদা কেমন যেন একটা উত্তেজনা বোধ করছিল। সেও ইংরেজীতে বলল, "মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করা হয়েছে প্রাইভেট স্কুল-ফাইনেল দেবার জন্যে। এখানে স্কুল-ফাইনেল দিলে তো প্রত্যেক দিন স্কুলে যেতে হবে।"

—এই তো কথা ফুটল। এভাবে কথার জবাব দেবে। ভালকথা, তোমার ভায়োলিন শুনতে ভাল লাগে, না বীণা?

—দুটোই।

—তবু এ দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী ভাল লাগে?

—দুটোই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ— তাই দুটোই ভাল লাগে।

—তা বললে চলবে কেন, বীণাতে যে সুর ও ঝংকার তোলা যায় তা কি ভায়োলিনে হয়! আবার ভায়োলিনে যে ধ্বনিসুষমার সৃষ্টি হয় তা তো বীণায় হয় না। একটাতে যা আছে অন্যটাতে নেই।

—আমিও তো বলছিলাম দুটোরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

—কোনোদিন সঙ্গমাইয়ার বাজনা শুনেছ?

—উনি প্রত্যেক বছর একনাগাড়ে পনেরো দিন আমাদের বাড়িতে থাকেন। বাজিয়ে শোনান, আর আমাকে শেখান।

—তাহলে কি তুমি সঙ্গমাইয়ার ছাত্রী? তোমার সৌভাগ্য দেখে আমার হিংসা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে সুসজ্জিত মিছিল বাড়ির কাছে এসে গেল। তাই ওদের কথাবার্তাও গেল থেমে।

দু-তিনবার বউয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নারায়ণ রাও কেমন যেন কথা বলার জন্যে আরও ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

সূর্যকান্তমকে ওভাবে প্রশ্ন করাটা শারদার কাছে খারাপ লেগেছে। নারায়ণ রাও বুঝতে পারে যে শারদা বিরক্ত হয়েছে। এটা সূর্যকান্তমের নজর এড়ায় নি। তাই ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্যই হয়তো হঠাৎ কথায় মোড় ঘুরিয়ে সূর্যকান্তম দুজনের হাত ধরে টানতে টানতে বলে, "চলো বউদি, গোরু দেখিয়ে আনি।"

১৬। গার্হস্থ্য

সুব্বারায়ের বাড়ির পেছনে পূর্বীয়া বেলমার বাড়ি। দুটি গরীব কাপুদের বাড়ি আর পাঁচটি পূর্বীয়া গোয়ালাদের। তারা সবাই সুব্বারায়ের চাকর। কাপুদের মধ্যে কুকটল সোমাইয়া প্রধান ভৃত্য। সুব্বারায় চাকরদের জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় বাড়ি করেছিলেন। সোমাইয়ার বাড়িটা অন্যগুলির তুলনায় বড়। তার পরিবারের লোকসংখ্যাও বেশী, তার বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও বাড়ির কাজ থেকে শুরু করে, ক্ষেতখামারের কাজ পর্যন্ত সবকিছু সে নিজে করায় এবং করে। সোমাইয়ার বাবা সুব্বারায়ের বাবার কৃষাণ ছিল। অত্যন্ত গরীব ছিল সে, দিন গুজরান করাটাই ছিল তার কাছে দুর্বহ। সোমাইয়ার বাবা বীরাইয়া সুব্বারায়ের বাবা শ্রীরামমূর্তির শরণাপন্ন হয়। তারপর নিজের কর্মক্ষমতা দেখিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির বড় চাকরের কাজ পায়। তখন সোমাইয়াও একটু বড় হয়েছে। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। বাবাকে সে সাহায্য করত কাজকর্মে, তাকেও শ্রীরামমূর্তি মাইনে দিতেন।

বীরাইয়া প্রথম প্রথম বছরে আঠারো বস্তা ধান পেত। তারপর পঁচিশ বস্তা ধান ও পঞ্চাশ টাকা করে পেতে লাগল। পঞ্চান্ন বছর বয়সে সে মারা যায়। তার মৃত্যুর পর সোমাইয়া হয় ঐ বাড়ির প্রধান ভৃত্য। সুব্বারায় কিন্তু তার সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করেন না। বাড়ির কেরানীদের মতোই ব্যবহার পায় সে। মাসিক এক বস্তা ধান সহ পনেরো টাকা বেতন সে পায়। অন্যান্য চাকররাও মন্দ মাইনে পায় না। সে ছাড়া আরও অনেক চাকর ছিল ঐ বাড়িতে। কেউ বাসন মাজে, কেউ জল টানে, কেউ রান্না করে। চাকরদের বৌ-ঝিদের দিয়েও কাজ করানো হত। তারাও মাইনে পেত।

সোমাইয়ার বউ ও-বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করত, চাল বেছে দিত, কাপড় কেচে দিত। গোয়ালা বৌদের মধ্যে আচ্চাম্মা খুব বিশ্বাসী। তার মা বাবাও সুব্বারায়ের বাড়িতে কাজ করে গেছে। মা থুত্থুড়ে বুড়ি। কোনোরকমে নিজের ঘরের কাজ করে। আচ্চাম্মা বিয়ে করে স্বামীকে বাপের বাড়িতেই রেখেছে। ওর ছোট বোনদুটিও তাই করেছে। ওরাও সুব্বারায়ের বাড়ির চাকরাণী, ওদের ছেলেরা গোরু চরায়। বলতে গেলে ওরা সুব্বারায়ের বাড়ির আশ্রিত।

সুব্বারায়ের বাড়ির পেছনের অন্য এক বাড়িতে সোমাইয়ার জামাই থাকে। সোমাইয়ার তিন মেয়ে, চার ছেলে। প্রত্যেকটি ছেলেই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। সোমাইয়া নিজের জামাইকেও সুব্বারায়ের বাড়িতে একটি চাকরি পাইয়ে দিয়েছে। তার জন্যে ঘরের পাশে একটি ঘর তুলে দিয়েছে। ওর বাকী দুই মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। একটি টোরিপটলে, অন্যটি গোপালপুরমে। তারা সবাই ছেলেপুলে নিয়ে সুখে আছে। পর পর পিঠোপিঠি মেয়ে হওয়ায় বড় মেয়েটিকে সোমাইয়া ভাল দেখে একজন গরীব ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রেখেছে। সোমাইয়ার ছেলের বয়স এখন বাইশ। ছোটবেলায় সে ছিল নারায়ণ রাওয়ের খেলার সাথী। নারায়ণ রাও রাজকুমার সাজত। আর সত্তাইয়া সাজত দফেদার বা মনসবদার।

পূর্বীয়া বেলম্মা দশ বছর আগে সুব্বারায়ের বাড়িতে কাজ শুরু করে। ফুলবাগানের কাজে সে দক্ষ। তাই সুব্বারায় তাকে নিজের ফুলবাগানের দেখাশোনার ভার সম্পূর্ণ দিয়ে দেন। আগে যে পরিবারের লোকেরা আমবাগান দেখাশুনা করত সুব্বারায় তাদের উপর ভার দিয়েছেন নিজের তিরিশ একর বিস্তৃত আমবাগান দেখাশোনার।

ঐ পাঁচটি গোয়ালা পরিবারের মধ্যে একটির উপর ভার ছিল সুব্বারায়ের বাড়ির গোরু মোষ বলদ ইত্যাদি দেখাশোনার। সুব্বারায় বাড়ির গোরু মোষের যথেষ্ট যত্ন নিতেন। মানুষের চেয়েও বেশী যত্ন নেওয়ার জন্য চাকরদের উপদেশ দিতেন। প্রত্যেকটি গোরুবাছুরের নাম রেখেছিলেন। ঐ নাম ধরে ডাকলেই তারা ছুটে আসত। তাঁর ডাক শুনলে আর রক্ষে নেই, ছুটে আসবেই আসবে।

এ ছাড়া আটজোড়া বলদ ছিল। পাঁচটা ওঙ্গোলের, দুটো মহীশূরের

আর একজোড়া সিন্ধী। সিন্ধী জোড়া গাড়ী টানার কাজ করত। (বাড়িতে সুব্বারায়কে সর্বদা চার পাঁচটি বাছুর-পরিবৃত অবস্থায় দেখা যেত।) মানুষ উপোসী থাকলেও ক্ষতি নেই, বাছুরদের সবসময় পেটভরা খাদ্য চাই,—এই হল সুব্বারায়ের মত। প্রচুর পরিমাণে ঘাস, ভুসি, খোল সুব্বারায়ের বাড়িতে জমা থাকে। সব সময় সবুজ ঘাস তারা যাতে পায় তার জন্যে দশ একর জমি নির্দিষ্ট করা রয়েছে। গোচারণভূমিও আছে, ফলে পশুখাদ্যের অনটন আদৌ ছিল না।

সুব্বারায়ের কাছে অনেকগুলো গাইগোরু আর মোষও ছিল। ওঙ্গোল জাতের দশটি আর দেশী গোরু বারোটি। পাঁচটা বড় বড় মোষ, তার কয়েকটি দুধ দিচ্ছে, বাকী কটি দিচ্ছে না। বারো মাস বাড়িতে দুধ থাকে। এ-ছাড়া গুম্মাড়িপাণ্ডু (কুমড়ো) জাতের কয়েকটি ছিল। ওগুলো সুব্বারায়ের ঠাকুরদা কোত্থেকে কিনে এনেছিলেন। আড়াই ফুট উঁচু, ছোট মাথা, হরিণের চোখ, যেন দুগ্ধসাগর কামধেনু।

বনলক্ষ্মীর মতো সুন্দরী শারদা এবং সুর্যকান্তমের সঙ্গে নারায়ণ রাও ফুলবাগান দেখে পশুশালায় এল। এককোণে বাঁধা ছিল মৃগনয়ন ঐ গোরুগুলি। তার মধ্যে একটি এখনও দুধ দিচ্ছে। নারায়ণ রাওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গোরুটির বাছুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। নারায়ণ রাও তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। শারদা পশুশালায় ঢোকার আগেই রুমালে নাকচাপা দিয়েছিল, তার উপর স্বামীর এই বাছুর-প্রীতি তার অসহ্য মনে হল। সূর্যকান্তমকে "চলো, ফিরে যাই।" বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। স্বামীর এই গেঁয়ো অভ্যাসের বিষয় ভাবতে ভাবতে পা চালাল সে। সূর্যকান্তম তাড়াতাড়ি পথ আগলে বলল, "কী হল বৌদি? বাছুরটাকে না দেখে চলে যাচ্ছ যে?"

শারদা বলল, "দেখেছি তো।"

নারায়ণ রাও আগে থেকেই অন্যমনস্ক ছিল। শারদাকে চলে যেতে দেখে তার মন আরও যেন দমে গেল। বউকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে সূর্য-কান্তমকে বলল, "দেখো সুরী, এদিকে এসো। বাছুরটা কী সুন্দর কথা বলছে দেখো। বাবা এর নাম রেখেছেন বড়বালা।" সে একবার বৌদির দিকে আর একবার দাদার দিকে তাকাল। দাদার কাছে গেল। শারদা

কী ভাবল কে জানে। ওখানে দাঁড়িয়েই বলল, "ঐ সাদা বাছুরটাকে এদিকে নিয়ে এসো তো।" সূর্যকান্তম একথা শুনে আশ্চর্য হল। সে হাতির দাঁত রঙের বাছুরটাকে দুইহাতে তুলে ধরে বৌদির কাছে নিয়ে গেল। নারায়ণ রাও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেখান থেকে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সুব্বারায়ের বাগান দেখার জন্যে বিয়ে উপলক্ষে সমাগত অতিথিরা মোটরে করে বেরোলেন। সূর্যকান্তম, সত্যবতী আর পরমেশ্বর-মূর্তির স্ত্রী রুক্মিনীও তাদের সঙ্গে ছিল।

বাগানে আম জাম সুপারী নারকেল কালোজাম সবেদা বাতাবিনেবু নারাঙ্গী-প্রভৃতি নানা রকম ফলের গাছ ছিল। ঐ বাগানের মধ্যেই মালীদের দু-তিনটি ঘর রয়েছে। সমগ্র বাগানে একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গাছের চারা অনেক দূর থেকে নারায়ণ রাও-এর নিজের কিনে আনা। মালী কয়েকটি ফল পেড়ে এনে দিল অতিথিদের। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল অতিথিরা।

মনের মধ্যে অব্যক্ত একটা ব্যথা, অজানা একটা আশঙ্কা নারায়ণ রাওকে অস্থির করে তুলল। শারদার ঐ তুচ্ছ একটি ব্যবহার সম্পর্কে সে বারবার ভাবতে লাগল। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে ভারতীয় নারীর পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক, একেই বলে লজ্জাপ্রসূত ব্যবহার।

নারায়ণ—আমাদের দেশের মেয়েরা যতই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাক আর ওদের আদবকায়দা অনুকরণ করুক না কেন, তবুও ভারতীয় তথাকথিত সংস্কারের একটা ছাপ তাদের চরিত্রে থাকবেই।

পরম—হঠাৎ, একথা ভাবছ কেন? কোনো উচ্চশিক্ষিতার সঙ্গে আলাপ হল বুঝি? তার মাথায় কি ভারতীয় সংস্কারের বোঝা দেখলে?

নারায়ণ—একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে কখন যে তার থেকে অন্য চিন্তা এসে যায়-টের পাওয়া যায় না।

পরম—এই এলোমেলো চিন্তার উৎসটা কী?

নারায়ণ—কিছুই না, আবার অনেক কিছুই। এই মামুলী কয়েকটা কথা ভাবছি।

পরম—আমিও মনোবৈজ্ঞানিক, বিশ্লেষণ করার জন্য জিজ্ঞেস করছি।

নারায়ণ—কেন, আমি যে প্রশ্ন করেছি তা কি মিথ্যা না অবান্তর?

লক্ষ্মীপতি এসে বলল, "হঠাৎ তর্ক বাধল কী নিয়ে?"

পরম—দেখ না, আজকে নারায়ণ এক মস্ত বড় সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে আর আমার উপর সেই সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দিয়েছে। এইমাত্র আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম হঠাৎ আসা এই সিদ্ধান্তের উৎস কোথায়।

লক্ষ্মী—আগে সিদ্ধান্তটাই বা কী শুনতে দাও।

পরম—আজকালকার মেয়েরা যতই পড়াশুনা করুক না কেন, ওদের মন থেকে নাকি তথাকথিত ভারতীয় সংস্কারের ভূত নামে নি।

লক্ষ্মী—একথা তো নারায়ণের মুখে বহুবার শুনেছি।

পরম—তুমি তো গান্ধীজীর প্রত্যেকটা কথা একেবারে সত্য এবং মহান বলে বিশ্বাস কর। তিনি বলেছেন, "রামমোহন রায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যদি না পেতেন তাহলে আরও বড় হতে পারতেন।" তাঁর এই মন্তব্যে মডার্ন রিভ্যু প্রভৃতি পত্রিকাগুলো দারুণ চটেছে। এই ধরনের কথা বলার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে লক্ষ্মীপতি? একথার উদ্দেশ্য কী এই যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রাপ্তির ফলে ভারতীয় সভ্যতা নষ্ট হচ্ছে?

লক্ষ্মী—ঠিক তাই।

নারায়ণ—পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার কথা বাদ দিলেও মহাত্মাজীর মতে ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে আমি যা বলেছি তাই প্রযোজ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুঝেসুঝে আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই না বুঝে আমাদের দেশের মেয়েরা কতকগুলো সংস্কারকে পুষে রাখছে এবং বাড়িয়ে তুলছে।

পরম—কোনটাকে বাড়িয়ে তুলছে? গয়নাগাঁটি, সিনেমা দেখা, ফ্যাশান বাড়ানো, তালাক দেওয়া?

নারায়ণ—তোমার কথা মানছি। মাত্র একটা জিনিসের অনুকরণেই কি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পূর্ণ অনুকরণ শেষ হয়ে যায়?

পরম—এতদূর যখন এগিয়েছে তখন পূর্ণ হতেও আর বেশিদিন নেই। একটু অপেক্ষা করো।

নারায়ণ—হয়তো হবে দূর ভবিষ্যতে। তবে আমি ভাবছি বর্তমানের কথা।

লক্ষ্মী—দুজনেই এককথা বলছ। চলো এবার যাওয়া যাক।

১৭। তিন রাত্রি

জমিদারের গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠির উত্তরে এবং তাঁর প্রেরিত গঙ্গারাজু দেশমুখের নিবিড় আগ্রহে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে তার চারটি বোন, বড়দি এবং সূর্যকান্তমের শাশুড়ীও গিয়েছিল। দেশমুখ হলেন জমিদারের আত্মীয়।

সুব্বারায় কনের সঙ্গে আগত আত্মীয়স্বজনদের এবং রঙ্গরাও দেশমুখকে বস্ত্র, রজতপাত্র, ফল, আলু ইত্যাদি উপহার দিলেন। ওদের সঙ্গে আসা চাকর-চাকরাণীরাও উপহার পেল।

জামাইকে দেখে জমিদার অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠেন। হলঘরের মাঝখানে শ্রীনিবাস রাও, মৃত্যুঞ্জয় রাও, সীতারামাঞ্জনেয়, সোময়াজুলু, আনন্দরাও, ভাস্করমূর্তি শাস্ত্রী, বাসবরাজুরাজেশ্বর, শ্রীজগন্মোহন রাও জমিদার, নারায়ণ রাওয়ের মেজ-ভগ্নীপতি, বীরভদ্ররাও এবং আরো অনেকে সোফায় বসে গল্প করছেন। নারায়ণ রাও নীরবে ওঁদের কথা শুনছিল। শ্রীনিবাস রাও মাঝে মাঝে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে দু-একটি প্রশ্ন করলেন। চিন্তাগম্ভীর গলায় সে তার উত্তর দিল। নারায়ণ রাওয়ের বন্ধু রাজেশ্বর রাও এসে সবাইকে নমস্কার করে ওঁদের মধ্যে বসল।

আলোচনা চলছিল রেলবিভাগ সম্পর্কে। শ্রীনিবাস রাও নারায়ণ রাওয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কী বলেন নারায়ণ রাও মশাই, আমাদের দেশে কোনো কোম্পানির রেল পরিচালনা করা উচিত না সরকারের?"

নারায়ণ—সরকার চালালেই দেশের লাভ।

শ্রীনিবাস—আপনি কি মনে করেন কোম্পানির মধ্যে যে মুনাফা বাড়ানোর লোভ রয়েছে তা সরকারের হাতে চলে গেলে থাকবে না?

নারায়ণ—মুনাফা বাড়ানোর মনোবৃত্তির কথা নয়। বাৎসরিক যা লাভ হবে তা সরকার অন্য খাতে খরচ করতে পারবেন।

মৃত্যুঞ্জয়—আপনি কি চান যে রেল সরকারের একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্ট হোক? আর তা লালফিতার বর্তমান নিয়মে পরিচালিত হোক—তাহলেই লাভ হবে!

জমিদার—আবগারী ডিপার্টমেণ্টে কোনো লাভ হচ্ছে না।

শ্রীনিবাস—দেখুন, রেল যদি সরকারই নিয়ে নেয় তাহলে তার বড় বড় পদ সব ইংরেজদের দিয়ে দেওয়া হবে এবং ওরাই পাবে মোটা মাইনে। আর সেই টাকা আই. সি. এস. দের, টাকার মতোই ইংলণ্ডে পাচার হবে।

রাজেশ্বর—কোম্পানির হাতে থাকা অবস্থাতেও তো তাই হচ্ছে।

নারায়ণ—ওঁর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হল রেলের উপর ইংরেজদের কোনও রকম অধিকার যেন না থাকে। বরং ভারতীয় কোনো কোম্পানির হাতে থাক।

শ্রীনিবাস—ঠিক তাই।

নারায়ণ—কিন্তু যতদিন ভারতে ইংরেজ শাসন রয়েছে ততদিন কোনো মতেই ভারতীয় কোনো কোম্পানির হাতে রেল বিভাগ তুলে দিতে তারা চাইবে না। তাছাড়া ভারতে অত টাকাওয়ালা কোন পুঁজিপতিও নেই যে সারাভারতের রেল কিনে নিতে পারে। তাছাড়া আইন-কানুন অনুযায়ী রেল একদিন না একদিন সরকারের হাতে আসবেই, কিছুটা এসেও গেছে।

জমিদার—রেলসম্পর্কিত আইন-কানুনের কাগজপত্র সবকিছুই আমার কাছে আছে। এখন পর্যন্ত যত রেলওয়ে হয়েছে তাতে কোম্পানি এবং ব্রিটিশ সরকারের সুদ ইত্যাদির জন্য ক্ষতি বই লাভ হয় নি।

নারায়ণ রাওয়ের দিকে তাকিয়ে জমিদার আরও বললেন, "আমার কাছে নথিপত্র আছে, ইচ্ছে করলে আমার পড়ার ঘরে গিয়ে দেখে আসতে পার।"

নারায়ণ—আমিও ঐ নথিপত্র একটু দেখে আসতে চাই।

জমিদার—অক্সওয়ার্থ কমিশনের ব্যাপারটা তো জানই।

নারায়ণ—সে রিপোর্ট আমি পড়েছি।

মৃত্যুঞ্জয়—সে কমিশনের ব্যাপারটা কী?

জমিদার—সেখানে একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে রেল কোম্পানির হাতে থাকলে বেশী লাভ হবে, না সরকারের হাতে থাকলে?

নারায়ণ—অন্যান্য দেশ কিছুটা অবস্থাসম্পন্ন, কিন্তু আমাদের দেশ গরীব। অনেক দেশেই আন্দোলন চলছে রেলবিভাগকে সরকারের করায়ত্ত করার জন্যে।

শ্রীনিবাস—সরকারের হাতে এসে গেলে মুনাফা সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলার নেই।

নারায়ণ—অর্থাৎ আমরা যদি মেনে নিই যে রেলে লাভ হচ্ছে—আমি এখন সেই বিষয়ই কিছু বলতে চাই।

শ্রীনিবাস—সম্প্রতি আমারও মনে হয় রেলে লাভ হচ্ছে।

নারায়ণ—রেলে যত টাকা লাভ হচ্ছে তা যদি সরকারের হাতে আসে তাহলে অন্যান্য দু-একটা ট্যাক্স কমানো যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সরকার কি তা করবে? কারণ বর্তমান ইংরেজ সরকার নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। তাই সরকার ট্যাক্স কমাবে না। আজ বাদে কাল যদি কানাডার মতো ভারতও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তাহলে সেই লভ্যাংশ থেকে দেশের মানুষ কিছুটা পাবে।

শ্রীনিবাস—ইংরেজরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে রেল তৈরি করেছে তার লভ্যাংশ কি আমাদের দেশের জনসাধারণকে দিয়ে দেবার জন্য!

নারায়ণ—ওরা যে টাকা ঢেলেছে তা অনেক বছর আগেই উঠে গেছে। তার উপর লভ্যাংশ যা উঠেছে তাও কোটি কোটি টাকা। এখন রেলে আমাদের দেশের মানুষ ভাগ বসালে অন্যায় হবে কেন?

জমিদার—সরকারের কাছ থেকে কেউ রেল নিতে চাইলে তাকে রেলের সবকিছুর জন্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না কি? কিন্তু তা দেবার মতো অত টাকা কোথায় আমাদের কাছে? ইংলণ্ডকে আবার টাকা দিতে হবে?

নারায়ণ—পঁচাত্তর সালে তো চুক্তি হয়েছিল যে কিস্তিতে টাকা মেটানো হবে।

জমিদার—তা অবিশ্যি হয়েছিল। হস্তগত করার তিনবছর পূর্বেকার লাভ কোম্পানির অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন অর্থাৎ বাজারে প্রচলিত দামে একশো টাকার শেয়ার একশো কুড়ি টাকা করে দেওয়া আর একশো টাকার বাৎসরিক সুদ সাড়ে চারটাকা হিসেবে প্রত্যেক কিস্তিতে পঁয়ত্রিশ টাকা করে মেটানো—এ ধরনের কী যেন একটা হয়েছিল।

জগন্মোহন—আমাদের দেশের লোকরা কি রেল ঠিকমত চালাতে পারবে? আর চালালেও দিনে দু-চারবার ধাক্কা খাবে কিংবা অ্যাক্সিডেণ্ট করে বসে থাকবে।

ভাস্কর—এ আপনি কী বলছেন? রেল তো আমাদের দেশেরই হাজার

হাজার ইঞ্জিনিয়ার গার্ড-ড্রাইভার স্টেশন মাস্টার চালাচ্ছে। শুধু মোটা মাইনের কয়েকটি চেয়ার আটকে বসে রয়েছে ইংরেজরা।

জগন্মোহন—পৃথিবীতে ইংরেজদের সমকক্ষ জাতি একমাত্র ইউরেশিয়ান —অর্থাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা।

ভাস্কর—ওরাও তো পর নয়, আমাদের হাতে রেল এলে কি আর ওদের বরখাস্ত করে দেওয়া হবে?

সীতা—ঐ একটি বিচিত্র জাত! না কালো, না ফর্সা। নিজেদের কী মনে করে কে জানে। এদের কাছে ইংরেজরা ভাল, ওদের মতে ইংরেজদের সঙ্গে মোকাবিলা করা শক্ত।

আনন্দ—আপনি ঠিকই বলেছেন শাস্ত্রীমশাই। কিন্তু ওরাও আজ বদলাচ্ছে। ওরাও বুঝতে পেরেছে এদেশে থাকতে হলে আমাদের সঙ্গেই ওদের মরা-বাঁচার সম্পর্ক জড়িত হবে।

সীতা—ওদের কি ইংরেজরা থাকতে দেবে?

মৃত্যুঞ্জয়—ইংরেজরা ওদের বেশ কুদৃষ্টিতেই দেখে। ইংরেজদের কাছে অ-পাংক্তেয় ওরা। আর আমরা বলি ওরা আমাদের নয়।

নারায়ণ—ওকথা ঠিক নয়। ভারতীয়রা সব সময় ওদের আপন করে নিতে চেয়েছে। কিন্তু ওরা সব সময় মনে করে নিজেদের 'হোম' ইংলণ্ডে। ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার জন্য গান্ধীজী ওদের বারবার আহ্বান করেছেন।

সীতা—তাহলে বাদুড়ের মত ঝুলন্ত অবস্থা ওদের?

জগন্মোহন—কী বলছেন আপনি! কোনো জিনিস না জানা থাকলে চুপ করে থাকাই ভালো। ইউরেশীয়ান তরুণীদের মধ্যে যে সৌন্দর্য রয়েছে তা কি ইংরেজদের মধ্যে আছে, আপনার ব্রাহ্মণপরিবারের কোনো মেয়ের মধ্যেও কি তা দেখতে পারেন?—যাক্ সেকথা।

নারায়ণ—এখন সৌন্দর্য সম্পর্কে কথা উঠছে না।

শ্রীনিবাস—চটে গেলেন? সোময়াজুলু না হয় সাদাসিধে ব্রাহ্মণ মানুষ —উনি চটতে পারেন। কিন্তু আপনি তো দুনিয়ার হালচাল জানেন। আপনার পক্ষে একথায় চটে যাওয়া—।

জমিদার—উনি হয়ত কথাটাতে অতটা গুরুত্ব দিয়ে বলেন নি।

সীতা—হঁ্যা, তা তো বটেই।

ইতিমধ্যে জলযোগের জন্য ডাক পড়ল। জমিদার মশাই শাস্ত্রীকে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিলেন। আর সকলে ঐ খানেই বসে ফলাহার করলেন। ঘিয়ে-ভাজা কাজুবাদাম, দইবড়া, জিলিপী, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতির সঙ্গে কফি আর চা পরিবেশন হল।

নারায়ণ রাও রাজেশ্বর রাওকে নিয়ে উপরের ঘরে গেল। সেখানে দুই বন্ধুতে গল্পগুজব করে সময়টা কাটিয়ে দিল।

গাঁয়ের মানুষ নারায়ণ রাওয়ের বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌পটুতায় অসূয়া বোধ করল জগন্মোহন রাও। "জমিদার পরিবারে জন্মালে নারায়ণ রাও না জানি আরো কতখানি তেজ দেখাত। ওর কথা শুনে নিশ্চয়ই একজনও খুসি হতে পারেনি। কথা বলার সময় এমন একটা ভাব দেখায় যেন কারো আনন্দ বা দুঃখ পাবার ব্যাপারে তার কিছু এসে যায় না। শারদা নিশ্চয়ই ওর এই ধরনের ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু ইউরেশিয়ান মেয়েদের সম্পর্কে আমি যে মন্তব্য করেছি তা সে দরজার আড়াল থেকে শোনে নি তো?"

১৮। বীণা

বেড়িয়ে এসে নারায়ণ রাও শ্বশুর-বাড়ির কাছে পৌঁছেই শুনতে পেল বাড়ির ভেতর থেকে দিব্যি এক নারী কণ্ঠের স্বর ভেসে আসছে। গান শুনে রাজেশ্বর রাও বলল, "এমন সুন্দর কে গাইছে বলো তো? আর বাজনাও কী অপূর্ব।"

—আজ শ্রীরামাইয়া এসেছেন। নিজে ভায়োলিন বাজাচ্ছেন আর ওঁর ছাত্রী গাইছে।

—তোমার বউ নাকি?

—তাও ধরতে পারলে না! এখন আলাপ হচ্ছে। কথা বোলো না। চুপ করে শোনো।

—শুনতে-টুনতে পারব না। গানের নাম শুনলে আমার মাথা ধরে।

—এ যে একেবারে সেকেলে কথা বলছ!

তারপর ওরা বারান্দার আলো নিভিয়ে আরাম-কেদারাতেই বসে পড়ল। সুমধুর সুললিত কণ্ঠের গান ইথারে ভেসে তাদের কানে ঢুকছে—শান্তামলেকা সাউখ্যামুলেত্নু (শান্তি বিনা সুখ না আসিবে)।

তখনকার সেই আলো নেভানো অন্ধকার। অদৃশ্য ফুলের সুগন্ধে সুরভিত বাতাস আর সেই গানের মীড় ও মূর্চ্ছনা—এসবের সঙ্গে তুলনা করার মতো বিশ্বসংসারে আর কিছু আছে বলে মনে হল না নারায়ণ রাওয়ের। নির্ঝরিণীর বেহাগ, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতান—কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। নারায়ণ রাওয়ের হৃদয় মন গভীর সুমধুর আনন্দে ভরে গেল। গায়িকা ইতিমধ্যে আর একটি গান ধরেছে—নানুপালিম্পা নড়চিতচ্চিতিবো (আমাকে বাঁচানোর জন্য পায়ে হেঁটে নিয়ে এলে)! সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ রাওয়ের চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠল সোনার তীর-ধনুক, হাতে শিশু রামচন্দ্র। চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। গায়িকার কণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্র যেন ভর করেছেন। শ্রীরামাইয়ার গলায়ও রাক্ষসসংহারক সাক্ষাৎ দণ্ডপানি রাম আর ভাই লক্ষ্মণ যেন যুগপৎ প্রকাশমান।

দীনদরিদ্রের রক্ষক শ্রীরামচন্দ্র ; আবার তাঁকে অন্যরূপে দেখতে পাই মেঘমালায়, শস্যশ্যামলা ক্ষেতে, প্রকৃতির সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপে, নতুন চেতনার উন্মেষদ্বারে। ভক্তরা রামনাম জপে। আর রামচন্দ্রের কাজ তাদের রক্ষা করা—নারায়ণ রাওয়ের মগজে এসব কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। রাজেশ্বর রাও বন্ধুর দিকে ঘুরে বলল, "বুঝলে নারায়ণ, আমি এতদিন বিয়ে করতে রাজী হইনি, তার কারণ আমার বিশ্বাস হয় না যে বাবা-মা পছন্দ করে যে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন, তাকে আমি ভালবাসতে পারব, তাই নানান অজুহাতে বারেবারে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করেছি। বাবা চলে যাওয়ার পর আজও মা কত করে বলেন, কিন্তু আমি রাজী হইনি। অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর 'পরে দেখা যাবে' বলে দিয়েছি।" রাজেশ্বর রাও ভারী গলায় কথাগুলি বলল।

রাজেশ্বর রাওয়ের গায়ের রঙ তেলুগু ব্রাহ্মণদের মতো ফর্সা। কিন্তু সে তেলেঙ্গা জাতের ছেলে। কথায়বার্তায়, চালচলনে বুঝবার উপায় নেই যে সে ব্রাহ্মণ নয়। বলিষ্ঠ চেহারা, টিকলো নাক, প্রশস্ত বুক, আয়ত আকর্ষণীয় চোখ, ছাঁটা গোঁফ। চুলগুলো তুলে আঁচড়ানো। মোটের

উপর মুখে একটা অভিজাত-গাম্ভীর্য রয়েছে। সাধারণত সে রেশ্‌মী জামা এবং সাদা প্যাণ্ট পরে, পায়ে দামী চটিজুতা।

একবার আপাদমস্তক তার দিকে এবং পরক্ষণেই নিজের খদ্দরের পোশাকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হেসে নারায়ণ রাও বলল, "একদিনও তো তোকে দেখি না যেদিন তুই সাধারণ পোশাকে থাকিস······সেজেগুজে সব সময় থাকিস কী করে?"

—না, ঘরে সাধারণ পোশাকেই থাকি।

—সেগুলোও নিশ্চয়ই রেশমের?

—হ্যাঁ।

—আমার মনে হয় ঘুমন্ত অবস্থাতেও তুই সেজেগুজে ঘুমোস।

—ধ্যুৎ, তা কেন!

—দেখি তোর হাতটা।

—আমাকে নিয়ে একটা রচনা লেখ······তা না হলে গল্প।

—শুধু তোকে নিয়ে, না ওকেও?

—সাবাস্‌! দুজনকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারলে তো হয়েই গেল।

—তোমার দশ অবতারের মধ্যে বর্তমানের অবতার কোনটি?

—আমার তো দশ—তোমার যে একেবারে তেরো। কখন যে প্রলয় হবে কে জানে!

—কার জন্যে? নায়কের জন্যেও হতে পারে। আর তা না হলে সেই পুওর ক্রীচারের জন্যে। কেন, তুই তো বলেছিলি ওর স্বামী তোকে ঠেকানো দূরের কথা, তোকে দেখে আরও খুসি হন। তোর সেদিনের কথাতে এখন পর্যন্ত আমি শিউরে উঠি।

—ও-ব্যাপারে আর কিছু হবে না। আর ও-প্রসঙ্গ কোনোদিন তুলব না ঠিক করেছি।

—ভাল করেছ। সেই জন্যেই তো বলেছিলাম ওর কথা একেবারে ভুলে যেতে। কারণ এখন যখন বিয়ের কথা উঠেছে, তখন আর ওসব ফালতু সম্পর্ক রাখার কোন মানেই হয় না। নিজের বিয়ের সম্পর্কে চিন্তা করাই ভাল।

—দেখ নারান, তোর ওই বাপ-ঠাকুরদার মতো উপদেশ দেওয়া আমার

পছন্দ হয় না। সেই ইক্ষ্বাকুবংশের পদ্ধতিতে এই বিংশ শতাব্দীতেও বিয়ে করে ঝুলে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য। একথা কেন ভুলে যাচ্ছিস যে পৃথিবীতে এমন এক সময় ছিল যখন বিয়ে একেবারে হত না। এখন যদি ঐসবের পুনরাবৃত্তি ঘটে মন্দ কী, ক্ষতিই বা কিসের? স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার মধ্যে সাতরাজ্যের এত ঝামেলা কেন?

—তুই বললি, 'এমন এক সময় ছিল যখন বিয়ে একেবারেই হত না।' তুই যে-যুগের কথা বলছিস—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে মানুষ যখন জন্তুর পর্যায়ে ছিল তখনই ঐ রকম ছিল। আজ আমরা যদি জন্তুজানোয়ারদের জীবন-ধারা লক্ষ্য করি তাহলেই বুঝতে পারব।

—তাহলে তুমি আমার কথাতেই আসছ।

—অত ব্যস্ত হয়ো না। তোর বক্তব্য তো এই, যখন কামেচ্ছা জাগবে, তখন ঐ কামতৃষ্ণা মেটানোর জন্যই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে, কোনো বাধা থাকবে না। এই ধরনের পাশবিকতা কিন্তু পশুদের মধ্যেও নেই। পশুদের মধ্যে অনেক কিছুই নেই যা মানুষের মধ্যে রয়েছে। তবু ভগবানের দয়াতেই হোক অথবা প্রকৃতির দানেই হোক instinct-এর জন্য পশুরা যা ইচ্ছে তাই করে না। যখন-তখন যা-তা করতে পারে না। শরীর রক্ষার জন্য খায়, এবং বংশবৃদ্ধির জন্য মৈথুনে মিলিত হয়। Instinct-এর জন্য যখন-তখন যা-তা করলে যে ধ্বংস হতে হবে, একথা ওরা বোঝে। বাঁদর-গরিলা-বাঘ-ভেড়া-ভালুক—সমস্ত জন্তুজানোয়ারেরই একটা ঋতু আছে, সেই ঋতুই ওদের বিয়ের সময়।

—অনেক কিছুর নামইতো বললি, কিন্তু গরু এবং কুকুরের নাম তো মুখে আনলিনা। গোরুদের মধ্যে তো কোনো ঋতু নেই, আর কুকুরও তো একাধিক কুকুরীর পেছনে দৌড়ায়। গাধা এবং শুয়রের কথা না হয় বাদই দিলাম।

—তোর নিজের বক্তব্যের মধ্যেই তোর কথার উত্তর রয়েছে। তবে আরেকটু বলি নাহলে বুঝতে পারবি না। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে যে সমস্ত জন্তুজানোয়ার জড়িত যেমন কুকুর-গাধা-বিড়াল-গরু তাদের instinct অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের মতো ওদের মন নেই, তবে তারাও একটি ঋতু পালন করে। করে কিনা বল?

—তা তো করেই। যাক্ গে, এখন বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল তাই হোক।

—মনোবলে মানুষ পশুর চেয়ে অনেক উপরে উঠতে পেরেছে। মনোবলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার instinct হারিয়েছে। খাওয়া, ঘুম এবং সংগম বাদে সে আরও অনেক ধরনের ইচ্ছাই পূরণ করতে শিখেছে।

কলা-ললিতকলা, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ, রাজ্যশাসন এই ধরনের আরও বহু জিনিসের মধ্যে দিয়ে তার ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হচ্ছে। এ সমস্ত ইচ্ছা-পূরণের সাধনাই সৃষ্টি করেছে আজকের সভ্যতা। খাওয়া, ঘুম এবং মৈথুন ছাড়া আর কিছু যার জীবনে নেই, তাকে আমরা পশুর পর্যায়ভুক্ত করে রাখতে পারি, জীবনকে যারা সার্থক করে তুলতে চায় তারা এই তিনটির অতিরিক্ত আরো অনেক কিছুই করে, আর যারা তা চায় না তারা থাকে উদরপূর্তি ও কামনানিবৃত্তি নিয়ে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যারা একান্ত চিত্তে কোনো কাজে লিপ্ত থাকে স্বপ্নেও তাদের মনে কামচিন্তা আসে না। তবে সামাজিক বন্ধনকে সুস্থ ও সবল করার জন্যে প্রত্যেক পুরুষের বিয়ে করা উচিত, এটুকুই বলতে পারি।

—বিয়ে করা মানে তো একটি মেয়েকে নিয়ে ঘর করা। তার জন্য অত ঘটার কী দরকার।

—এতক্ষণে পথে এসেছ। কেউ যদি বুঝে থাকে যে সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে একজন পুরুষের একটি নারীকে নিয়ে ঘর করা উচিত, তাহলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সংস্কার গড়ে উঠেছে সেগুলোকে বর্জন করলে আমার কোন আপত্তি নেই।

—এত সংস্কারের কী দরকার?……কোনো প্রয়োজন আছে কি? এটা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন। বিয়ে যাদের কাছে ধর্ম এবং মোক্ষলাভের অঙ্গ, তারাই অতগুলো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

আত্মাভিমানীরা নিজের চারদিকে দুর্গ সৃষ্টি করে তার ভিতর ঘর বাঁধে, তারপর ক্রমশঃ জাগতিক সম্পর্ক থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কালযাপন করে। তুই হয়তো এটাকে বলবি দর্শন…আমি ও-ব্যাপারে কিছুই বলব না।

—তুই যদি মেনে নিস যে বিবাহসংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে আর কোনো ঝামেলাই রইল না।

—আছে বৈকি! তোর মতো লোক তো মনে করে না যে একজন পুরুষ শুধু একটি নারীকেই ভালবাসবে। তোর বক্তব্যের মূল সুর হচ্ছে কামবাসনা নিবৃত্ত করে যে যার নিজের পথ ধরুক।

—মেয়েরাও যদি স্বাধীনতা পায়, তাহলে আমরা যা করছি ওরাও তাই করবে।

—ওই ধরনের আচরণের নাম স্ত্রীস্বাধীনতা হোক বা না হোক, এটা সত্যি কথা যে ওতে সমাজের অধঃপতন হবে। জর্জ লিণ্ডসে আমেরিকা সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা কি তুই পড়িস নি? রাশিয়ায় বিবাহবিচ্ছেদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্বেও আমেরিকার চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা সেখানে কম। এ খবর কি রাখিস? তাই স্বাধীনতারও যদি সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন না থাকে তাহলে যে প্রেম ভালবাসাগুলোকে আমরা খুঁজছি, তা কোনদিন পাব না। অবিশ্যি যারা এ বিষয়ে মন ঠিক করে ফেলেছে যে খাওয়া ঘুম মৈথুন ছাড়া আর কিছু নেই, তাদের কাছে এ সব কথার মূল্য হয়তো নেই। দেশের সবাই যদি তাই চাইত, তাহলে আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠত না। আর আমরা স্বপ্নও দেখতাম না।

—নারান তুই এবার ওকালতি ছেড়ে মঠ স্থাপন কর। রাজেশ্বর রাও নারায়ণ রাওয়ের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল।

১৯। মুক্ত প্রেম

অল্প বয়স থেকেই রাজেশ্বর রাও তিরুপতি রাওয়ের অন্যতম শিষ্য। তিরুপতি রাও সমাজ-সংস্কারের জন্য কয়েকটি বাণী প্রচার করেছিলেন।—স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে আদর্শস্থানীয়। এ-সম্পর্কের মধ্যে কোনো কপটতা থাকবে না। নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রচার তিনি চালাচ্ছিলেন। বিরোধীরাও তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্রত লক্ষ্য করে প্রশংসা না করে পারে নি। রাজেশ্বর রাও অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিরুপতি রাওয়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত শিষ্য হয়ে উঠেছিল।

বাবা-মা সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করে যতবার তার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছেন, ততবারই কোনো না কোনো অজুহাতে সে ঐ প্রস্তাব নাকচ করেছে। তিরুপতি রাও তাকে বারবার উপদেশ দিতেন, মিথ্যা কথা বলা খারাপ। সত্যকথনের চেয়েও উৎকৃষ্ট কথন আর নেই।

রাজমহেন্দ্রবরমে পড়তে এসে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে আলাপ হল তার। নারায়ণ রাও বহুবার তাকে অনুরোধ করেছিল তিরুপতি রাওয়ের শিষ্যত্ব বর্জন করতে। পরমেশ্বর রাও অবিশ্যি নারায়ণ রাওকে বহুবার বলেছে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে তিরুপতি রাওয়ের বাণী রাজপথের কাজ করতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও রাজেশ্বর রাওয়ের উচিত নয় সে পথের পথিক হওয়া। নারায়ণ রাও বলত, "আমরা যখন জানি, বুঝি যে সেটা আত্মবিনাশের পথ, তখন জেনেশুনে সে-পথ মাড়ানো নরকের দ্বারে পা-রাখার সামিল।"

মাঝে মাঝে নারায়ণ রাও চটে গিয়ে বলত, "তিরুপতি রাওয়ের সঙ্গ না ছাড়লে আমি আর তোর মুখ দেখব না।" উত্তরে রাজেশ্বর রাও বলত, "অত চটে যাস্ কেন! একবার আমাদের দলে ভিড়ে দেখ্ না। এখন হয়তো তুই ব্রহ্মচারী লোক একবার দলে ঢুকে ভালমন্দের বিচার করেই দেখ না।" তিরুপতি রাওয়ের শিষ্যবর্গের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বিদগ্ধ-জনও ছিল। একজনের স্ত্রীর কাছে আর একজনের গতায়াতের ছিল স্বাধীনতা। স্ত্রীস্বাধীনতা, পরস্ত্রীগমনের দণ্ডবিধান রদ করা, গর্ভপাত আর বিবাহবিচ্ছেদ এবং সম্পত্তিতে ভাইবোনের সমান অধিকার প্রভৃতি ছিল তিরুপতি রাওয়ের মত।

এ হেন সঙ্ঘে যার যাতায়াত সেই রাজেশ্বর রাও যে পবিত্র নয় তা কে বলবে? এমন একটি সংগঠনের প্রতি মেয়েরাও যে কিছু কিছু আকৃষ্ট হবে তাতেই বা বিস্ময়ের কী আছে?

উপরন্তু এই সংস্থায় এমন বহু নারীপুরুষ ছিল যারা বছরের পর বছর পরস্পরকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে ভালবাসত। সেই সঙ্ঘভুক্ত বহুজনের মধ্যে তিরুপতি রাও নিজেও প্রাচীন রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাহিতদের অন্যতম। তাঁর স্ত্রী বিদুষী এবং পতিব্রতা। স্বামীর উপদেশ, সমাজ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা—তাঁর দৃষ্টিতে যা মানবধর্ম, তা নিজে বিশ্বাস না করলেও স্বামীর

বিরোধিতা কোনোদিন তিনি করেন নি। উপরন্তু বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও স্বামী তাঁকে যখন যার কাছে যেতে বলতেন তিনি যেতেন।

তিরুপতি রাওয়ের কাছে 'বনিতামান অপহরণ' একটি পবিত্র মন্ত্র। তাঁর মতে জগতে নারীদের সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের উপভোগের জন্য। সৃষ্টির বিচিত্র প্রাণী হচ্ছে নারী। তার চোখে কাজলঘন মেঘ, অধরে মধু, আর বুকে রয়েছে আকাশের মত বিশাল গভীর প্রেম। তার দেহ আলিঙ্গনের জন্য তৃষিত . . . ইত্যাদি।

সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক বন্ধুর স্ত্রী রাজেশ্বর রাওকে আকৃষ্ট করল। বন্ধুর নাম সুব্বাইয়া শাস্ত্রী! রাজেন্দ্রবরমে ওকালতি করে। বয়স চল্লিশ। বত্রিশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। বিয়ের দুমাস পর থেকেই স্ত্রী তার সঙ্গেই আছে। বউয়ের বয়স এখন বাইশ। বিয়ের আগে তার নাম ছিল পুল্লাম্মা। সুব্বাইয়া তার নাম রেখেছে পুষ্পশীলা। সেই সুন্দরী তরুণী রাজেন্দ্রবরম শহরেরই মেয়ে। বীরেশলিঙ্গম্ পান্তুলুর (পণ্ডিত) পাঠশালায় পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার বিয়ে হয়েছে। সেই সময় তার বাবা-মা বলেছিলেন, ওর এখন বিয়ের বয়স হয় নি। বিয়ের কয়েক দিন পরেই মেয়ে রজস্বলা হয়েছে বলে ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হল। তারপর সব আচার অনুষ্ঠান সেরে বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই পুল্লাম্মা স্বামীর ঘর করতে এল।

পুষ্পশীলা সত্যিই ফুলের মতো। তার সৌন্দর্য তড়িৎবৎ মসৃণ—নাগের মতো—চিতাবাঘের মতো। রেশম-কালো চুল নিতম্ব স্পর্শ করছে। তার নীল নয়নে সম্মোহন। তীক্ষ্ণ নাসিকার ভঙ্গী বুঝিবা একটু বঙ্কিম আর তারই আকর্ষণ পাগল করে তুলত কামুককুলকে। কামুক সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর মতো লোকের পক্ষে তিরুপতি রাওয়ের স্বেচ্ছাচারী সঙ্ঘের সভ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে ভ্রমরের মতো ঐ সঙ্ঘের বনিতা-উদ্যানে উড়ে বেড়ায়। চেহারায় সে সুন্দর না হলেও, উকিল হিসেবে নাম-যশ আছে। হয়তো সেই কারণেই, কয়েকটি তন্বী যে তার প্রতি আকৃষ্ট না হত তা নয়।

বহু স্বেচ্ছাচারীও আবার সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর অতিথি হয়ে তার বাড়িতে যেত। বাড়িতে কিন্তু লোকটির রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। নিজের বউকে যাতে কেউ না দেখতে পায় তার জন্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করত সে। তাই সেই সঙ্ঘের মেয়েরা মাঝে মাঝে সুব্বাইয়াকে ঠাট্টা করে বলত, "বউটিকে

তো একেবারে অসূর্যম্পশ্যা করে রেখেছেন, বাইরের হাওয়া লাগলে বুঝি পুষ্পশীলা খারাপ হয়ে যাবে ?"

রাজেশ্বর রাওয়ের মিষ্টিমিষ্টি কথা এবং কোমল স্বভাবের জন্য সুব্বাইয়া শাস্ত্রী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। প্রায়ই রাজেশ্বর রাওকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। বহুবার গেছে বলেই রাজেশ্বর রাওয়ের সৌভাগ্য হয়েছে পর্দানশীন পুষ্পশীলাকে দু-একবার দেখার। লোকের মুখে অবশ্য আগেই শুনেছে সে বড় সুন্দরী কিন্তু তবু নিজের চোখে দেখে অবাক্ হল—এত সুন্দরীও পৃথিবীতে আছে! দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে তার যেন একটা সুমধুর সংগীতের গুঞ্জন উঠল, অবশ্য তার এই মনের অনুরণনের কথা সুব্বাইয়া শাস্ত্রী যাতে একটুও না টের পায় সে বিষয়েও সে সতর্ক ছিল।

সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর বৃদ্ধা মাতা বউমাটিকে হাজার চোখে আগলে রাখতেন। তিনি থাকতে পর্দা একটু সরে যাওয়ার উপায় ছিল না। অন্দর মহলে যাবার অধিকার একমাত্র মেয়েদেরই ছিল। কখনও বউকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলে মোটরগাড়িটা পর্দায় ঘিরে নিয়ে যেতেন তিনি। ড্রাইভারও ছিল সেকেলে। তার কাছে নিজের মোটরগাড়ি বাদে পৃথিবীতে আর কোনো আকর্ষণ নেই। পুষ্পশীলার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করত দুনিয়াটিকে একবার চোখ মেলে দেখতে, ইচ্ছে করত নিজের সৌন্দর্য আর গহনাগুলো পুরুষদের দেখাতে। ছাদে উঠে সে কতবার দেখেছে। কিন্তু সে দেখা তো দেখা নয়, অতদূর থেকে আর কীইবা দেখা যায়, আর তাকে তো বাইরের কেউ দেখতে পায় না।

বুঝি পুষ্পশীলার পুণ্যবলেই সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর বৃদ্ধা মা কৃষ্ণনাম জপতে জপতে একদিন ইহলোক ত্যাগ করলেন। শাস্ত্রীর মনে হল নিজের ডান-হাতখানাই যেন খসে গেছে। তার বউকে এখন পাহারা দেবে কে? তার দুঃখের আসল কারণটা এই। কিন্তু পুষ্পশীলার মনে হল সে যেন বন্দীশালা থেকে ছাড়া পেয়েছে। সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর কাছে নিজের বাড়ির প্রত্যেকটি দরজা জানলা খোলা মনে হল। এতবড় বাড়ি, যুবতী স্ত্রী, আদালতের কাজ—সব কথা একসঙ্গে ভেবে কেমন যেন সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকলেও তাকে ঘৃণা করত না পুষ্পশীলা। আর পাঁচজনের মতো সেও স্বামীর ঘর করেছে আজ সাত বছর

ধরে। কিন্তু আজ মনে হল কেউ যেন তার মাথা থেকে মস্ত বড় একটা বোঝা নামিয়ে দিয়েছে, চোখের ঠুলি যেন খুলে দিয়েছে কেউ।

সুব্বাইয়া শাস্ত্রী বউকে রাখত একেবারে চোখেচোখে। তাকে কোনো কথা দিলে সে কথা রাখত। আজ পর্যন্ত পুষ্পশীলার কোনো অনুরোধ সে রক্ষা করেনি এমন ঘটনা বিরল। বউই ছিল তার ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র স্থান। বাইরের মেয়েরা ছিল তার জলযোগের সামগ্রী।

পুষ্পশীলা নিঃসন্তান। তার কামতৃষ্ণা এখনও মেটে নি। মনে মনে সেও এমন একজনকে খুঁজছিল যে তার এই তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।

মাদ্রাজ থেকে ফেরার পর রাজেশ্বর রাওয়ের পুষ্পশীলাকে দেখার ইচ্ছা হাজার গুণ বেড়ে গেল। কতবার সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর বাড়িতে গেল কিন্তু দেখা হল না, কারণ আজকাল সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর দূর সম্পর্কের কোন এক পিসির উপর ভার পড়েছে বউকে পাহারা দেবার। একদিন পিসির জ্বর হল। রাজেশ্বর রবিবার সন্ধ্যায় সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে দেখে রাজেশ্বর চা খাচ্ছে। শাস্ত্রী জানাল যে পিসির জ্বর, তাই সে চিন্তিত। রাজেশ্বর বলল যে জ্বর সারানোর অব্যর্থ ওষুধ তার কাছে আছে। দু-তিনবার খেলেই জ্বর বাপবাপ বলে ছেড়ে যাবে। তারপর সাইকেলে করে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এল সে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত রাজেশ্বর রাও সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেছিল। এমন সময় দাসী এসে বলল, "উনি খুব ঘামছেন।"

তৎক্ষণাৎ দুজনে ভিতরে গেল। পুষ্পশীলা পরিষ্কার একটি ন্যাকড়া দিয়ে তাঁর গা মুছিয়ে দিচ্ছিল। মাথা তুলে রাজেশ্বর রাওকে দেখল সে, রাজেশ্বর রাওয়ের চোখও পুষ্পশীলার চোখে নিবদ্ধ হল। শাস্ত্রীর পিসির জ্বর ছেড়ে গেছে।

এই ঘটনার পর থেকে রাজেশ্বর রাও দু'চোখের দেখা পুষ্পশীলাকে আর ভুলতে পারে না। সেই সৌন্দর্যময়ী নারীমূর্তিকে চোখের সামনে থেকে আর সরাতে পারে না সে। স্নান-খাওয়া ঘুম শিকেয় উঠল। পড়াশুনায় একটুও মন বসে না। বন্ধুদের সঙ্গেও মিশতে, কথা বলতে ভাল লাগে না।

রাজেশ্বর রাওকে দেখে পুষ্পশীলা যেন তৃষ্ণার জলের সন্ধান পেল। তার চালচলন আর পৌরুষদীপ্ত স্বাস্থ্য দেখে সে মুগ্ধ হল।

তারপর থেকে কোনো না কোনো অজুহাতে রাজেশ্বর রাও কতবার শাস্ত্রীর বাড়িতে এসেছে। সকলের অলক্ষ্যে এক ফাঁকে পুষ্পশীলাকে দেখেছে। পরস্পরকে দেখে ওরা সামান্য উত্তাপ পায়।

স্বামী আদালতে চলে যাওয়ার পর একদিন রাজেশ্বর রাওয়ের কাছে একটা চিরকুট পাঠাল পুষ্পশীলা। তাতে লেখা ছিল, বুড়ির আবার জ্বর হয়েছে, কাজেই সে যেন তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে আসে। রাজেশ্বর রাও ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকতেই দেখে সুব্বাইয়া শাস্ত্রীও এসে গেছে। সেদিন রাজেশ্বর রাও মনে মনে সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর হাজার বার মুণ্ডপাত করেছিল।

২০। বেদান্ত

রাজারাও তাড়াতাড়ি গিয়ে কলেজে ভর্তি হবে ঠিক করল। সে-বছর সে ভিক্টোরিয়া হোটেলে ছিল, তার পরে থাকা সম্ভব হল না। নিরুপায় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত একটি ঘরে থাকতে হল তাকে। এই বছরই তার পড়াশুনা শেষ হবার কথা। রাজারাও পুরানো ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পুরো ব্রাহ্মণ, অল্প বয়সেই তার বাবা বাসুদেব শাস্ত্রী তাকে সন্ধ্যা আহ্নিক আদি নিত্যকর্মপদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, বেদের অনেক স্তোত্রও তার কণ্ঠস্থ কিন্তু ঐ ধরনের শিক্ষা আদৌ তার মনঃপূত ছিল না। একদিন সে বাবাকে না জানিয়েই মেড়করু থেকে কাকিনাড়া পালিয়ে গেল। এক-এক বন্ধুর বাড়িতে এক-একদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিল। এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে বিজ্ঞানবারিধি ভগবতভক্ত ব্রাহ্ম সমাজের নেতা আচার্য শ্রীভেঙ্কটরত্ন নায়ডুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল সে।

অনেক দিন ছেলের খোঁজখবর না পেয়ে তার বাবা-মা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। মা তো প্রায় পাগল হবার উপক্রম, প্রায়ই মূর্ছা যান, অনেকদিন পরে রাজারাও একটি চিঠি লিখল বাবা-মার কাছে। তাতে জানিয়ে দিল সে থার্ডফরমে ভর্তি হয়েছে। পড়াশুনায় মনোযোগ দিয়েছে। পত্রপাঠ

বাবা-মা কাকিনাড়ায় ছুটে এলেন তাকে দেখার জন্য। তাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না বলেই তাঁরা ছেলের কাছেই রয়ে গেলেন।

রাজারাওয়ের লেখাপড়ায় তত মাথা নেই তবে খেটেখুটে পড়ে পাশটা করে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাজের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। কাকিনাড়ায় ওর বাবা ছোটখাটো একটা ব্যবসা করতেন আর সুদে টাকা খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ছেলেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে দেখে তাঁর খুবই আনন্দ হল। স্কুল-ফাইনেলে পড়ার সময়েই একটি ভাল পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ঘটা করে রাজারাওয়ের বিয়ে হয়। ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ই বধূবরণের কাল পূর্ণ হওয়াতে মেডিকেল কলেজে প্রথম বার্ষিক ছাত্রাবস্থাতেই তার একটি মেয়ে হয়।

নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে রাজারাওয়ের বন্ধুত্ব মাদ্রাজেই হয়েছিল। বাল্য-বয়সের সেই রাজেন্দ্র শাস্ত্রী এবং আজকের রাজারাওয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। আগে তার মধ্যে ছিল একটা অত্যন্ত সলজ্জ ভাব। দশজনের মধ্যে কথা বলতে পারত না। অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোনো দিন গায়ে পড়ে কথা বলত না। অল্প বয়সে সে অবাক হয়ে ভাবত, বন্ধুরা কী করে বড়দের সঙ্গে কথা বলে। তার বন্ধু নারায়ণ রাও চিন্তাশীলতার গাম্ভীর্য নিয়ে সভায় সমাবেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত, বক্তৃতা দিত। আর রাজারাও মুখ খুলতে পারত না চারজনের মধ্যে।

'কোমল-বিলাস' কফি হোটেলে নারায়ণ রাও একদিন রাজারাওকে দেখল। আলাপ পরিচয় হবার পর থেকে নারায়ণ রাও বহু বার তার বাড়ি যাতায়াত করেছে। সিনেমাও দেখিয়েছে, আর বন্ধুদের টি-পার্টিতেও রাজারাও বাদ পড়েনি।

রাজারাও আধুনিক তেলুগু কবিতা মোটেই পছন্দ করত না। নিজে অবশ্য কোনোদিন লেখে নি কিছু। পুরাণ পাঠ করতে ভাল লাগত তার। দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পড়াশুনা করার ইচ্ছা ছিল। বিবেকানন্দ, রামতীর্থ, শ্রীঅরবিন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখের গ্রন্থ তার পড়া হয়ে গেছে। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, হরনাথ বাবা, রাধাস্বামী-প্রমুখের জীবনী এবং উপদেশ অধ্যয়ন করেছে।

দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের দিকে নারায়ণ রাওয়ের একটি বিশেষ ঝোঁক ছিল। পুরাণ বাদে বেদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, বিচারসাগর বৃত্তিপ্রভাকর প্রভৃতি পড়েছে সে। এ ছাড়া যোগবাশিষ্ঠ জ্ঞানবাশিষ্ঠ সীতারামাঞ্জনেয়সংবাদ, আধ্যাত্ম-রামায়ণ, উপনিষদ, শঙ্করভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের সারবস্তু সে জেনেছে। বুদ্ধপিঠক, জাতককথা, কর্মপথও বাদ পড়ে নি। এ ছাড়া জেন্দাবেস্তা, কোরাণ, বাইবেল আর আধুনিক কালের কার্লমার্ক্স, সোপেনহাওয়ার, বার্কলি, এমার্সন, বেকন, হলডেন, কার্পেনটার, টলস্টয়, রোমাঁরোলা, বার্নার্ডশ', আইনস্টাইন, এডিনষ্টাইন এবং প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের রচনাবলীও অধ্যয়ন করেছে।

রাজারাওয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে আনন্দ পায় নারায়ণ রাও। নারায়ণের সঙ্গে আলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত রাজারাওয়ের কাছে শুভমুহূর্তস্বরূপ। তাই সে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

—"আমাদের আর্যবিজ্ঞানের কাছে ডারউইনের থিয়োরি বাল্যশিক্ষা বিশেষ। তাঁর বিকাশবাদ নির্ভেজাল মেটিরিয়ালিস্টিক। প্রথমে এমন সব কীটের সৃষ্টি হয়েছিল যাদের দেখার বা শোনার কোনো ক্ষমতা ছিল না, তারপর আস্তে আস্তে এসেছে দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তির অধিকারী সরীসৃপ। এর পর স্তন্যপায়ী জীব। অল্পবুদ্ধি বানরের উৎপত্তি হল। তারপর, এবং সবার শেষে এসেছে মানুষ। জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে এই বিকাশের অবস্থাটা বেশ বোঝা যায়। এরই জন্যে এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন একজন দ্রষ্টা।" রাজারাও বলে।

—সত্যি কথা, তবে সৃষ্টির এই অনন্ত বিকাশের কার্যকারণের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখানো অত সহজ নয়। এ বিষয়ে চোখকান বুজে পুরাণে বিশ্বাস করার চেয়েও প্রমাণসিদ্ধ তথ্যে আস্থা রাখাই ভালো। ঋষিরা যে সত্যকে দিব্য দৃষ্টিতে অনুভব করেছেন তার সত্যকে প্রমাণের মধ্যে দিয়েই তাঁরা নির্ধারিত করেছেন।—এই হচ্ছে নারায়ণ রাওয়ের বক্তব্য।

রাজারাও—প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে কত দূরই বা অগ্রসর হওয়া যায়?

নারায়ণ—একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যেই সন্দেহের নিরসন হয়। আবার এ-ও সত্যি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েও পরিশোধনপর্ব শেষ হয়ে যায় না।

—বুঝলাম প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য—সেই জন্যেই বুঝতে পারি। কিন্তু বুদ্ধি তো আর খুব বেশী এগোতে পারছে না। যেখানে বুদ্ধি পৌঁছায় না সেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মতটা কী!

—"প্রত্যক্ষ প্রমাণকে যারা স্বীকার করে না তাদের খেতখামারে কাজ করা উচিত। নিরন্তর অন্বেষণের ফলেই মানুষ অ্যাটম্ আবিষ্কার করেছে। তারপর অ্যাটম্‌কে ভেঙে পেয়েছে ইলেকট্রন। তুমি হয়তো বলবে ইলেকট্রনও তো অনিশ্চিত। ঐটাই তো শেষ কথা নয়, অনিত্যকে নিয়ে নিত্যের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না—এই হল তোমার যুক্তি। তারা বুদ্ধি দিয়ে যতদূর অগ্রসর হতে পারবে এগোবে, তারপর না হয় আমাদের পথের পথিক হবে। কিন্তু পরমাত্মার সাধনায় তারাও নিত্যনতুন অনুভূতির সন্ধান পাচ্ছে। ওরাও বুঝতে আরম্ভ করেছে যে সব কিছু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। তারাও দূরের কোনো অখণ্ড জ্যোতি দর্শন করেছে। আইনস্টাইন'ও তো এইপথে এসেই গেছেন। অতীতে আমাদের ঋষিরাই যোগসাধনার ফলে সেই নিত্যমার্গের সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু সে পথ আমাদের কাছে আজ অন্ধকারময়। এখন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বিজ্ঞানের আলোকে সেই পথের দিশা পাচ্ছেন। 'আমাদের পূর্বপুরুষরা সব দ্রষ্টা ছিলেন' এই বলে আমরা যদি এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাব।

এই ধরনের বিতর্ক প্রায়ই নারায়ণ রাও ও রাজারাওয়ের মধ্যে হত।

রাজারাও মিশুকে নয়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে তার ভাল লাগে না। একা থাকতে সে ভালবাসে। সহপাঠিনীদের দিকে সে মুখ তুলে তাকায় না। তার বেশভূষাও সেকেলে। বন্ধুরা তাকে গেঁয়ো বলে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। রাজারাও ওসব গায়ে মাখে না। নিজের পথে সে অবিচল! ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কিন্তু তার এই সহজ সরল অকপট বিনয়মধুর স্বভাবের প্রশংসা করে।

২১। নৌকাবিহার

নারায়ণ শ্বশুরবাড়িতে আছে আজ তিন দিন। তিন দিনের দিন তার চিঠি পেয়ে রাজারাও, পরমেশ্বর মূর্তি এবং লক্ষ্মীপতি এসে পৌঁছল। সেদিন ট্রেনে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই তরুণদলকে আমন্ত্রণ করেছিলেন জমিদার নিজে এবং নারায়ণ রাওকেও তাদের একটা চিঠি লেখার জন্য বলেছিলেন।

রাজেশ্বর রাও সারাদিন ওখানেই ছিল। পরমেশ্বর মূর্তি চিত্রকলার পাঠ শেষ করে বেকার বসে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা সে তাদের দেখাল: "যারা পেটের জন্য নিজেদের বেচে বসে, কলা-সরস্বতীর সাক্ষাৎ লাভ তাদের ঘটে না। শিল্প-কলার উপর আস্থা থাকলে না খেয়ে মরার মতো ঘটনা ঘটে না। নিজের কষ্ট আর যন্ত্রণাকে কলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারলে, তবেই তুমি সত্যিকারের কলাকার হয়ে উঠবে। চাকরি পাও নি বলে চিন্তা কোরো না। তুমি সৌভাগ্যবান, সেইজন্যেই শিল্পচর্চার জন্য এতখানি অবকাশ পেয়েছ। কলা-সৃষ্টির এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। চিত্রকলার সাধনা করে জনসাধারণের প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠো।

তুমি তো জানই, সাহায্য করতে পারলে আমি অবশ্যই করব, একবার দেশ পর্যটন করে প্রকৃতির বাহ্যিক এবং অন্তরের সৌন্দর্য অধ্যয়ন করো। প্রকৃতির চেয়ে বড় গুরু কোথাও পাবে না। বিশ্বকর্তার সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির তুলনা করে দেখো, যা বললাম তাই করো, দুঃখ কোরো না। ধৈর্য ধারণ করো। যে দুটো ছবি আমার কাছে তুমি রেখে গিয়েছিলে, বন্ধুরা সেগুলোর প্রশংসা করে কিনে নিয়েছে। ওদের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

এই চিঠি পড়ে নারায়ণ রাও কিছুক্ষণ নীরব রইল। ভাবল ললিতকলাকারদের উৎসাহিত করে তোলার মতো অবস্থা অন্ধ্রে এখন আর নেই। কলাপোষক অন্ধ্রের রাজামহারাজা চক্রবর্তীরা যেদিন শেষ হয়ে গেছেন, সেদিন থেকেই অন্ধ্রের কলানৈপুণ্যের প্রতিভা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

রাজেশ্বর রাও—আচ্ছা পরম, তুমি আমাদের বন্ধু। তুমি একট কিছু করছ, তাই এ-ব্যাপারে তোমার কথাই স্বীকার করছি। তোমার ছবিগুলোর বিষয়বস্তু কিন্তু সব সময় বোধগম্য হয় না। তোমার দু-একটা ছবিতে ঐ যে মরামানুষেয় মতো চোখ আর মানুষের ছবিগুলো ট্যারাবাঁকা কেমন-কেমন যেন। আর উল্টোপাল্টা রঙগুলোই বা কী—এটাই কি বাঙলার ঐতিহ্য।

পরম—তোমার মতে ছবিগুলো কী ধরনের হওয়া উচিত বলো তো।

রাজেশ্বর—প্রত্যেকটা ছবি হবে প্রকৃতির অনুকরণে।

নারায়ণ—মানে? একটু পরিষ্কার করে বলো।

রাজেশ্বর—রবি বর্মার ছবিই ধরা যাক। তাঁর আঁকা মানুষগুলো ঠিক আমাদেরই মতো দেখতে।

লক্ষ্মীপতি—কলা আসলে সৃষ্টি না অনুকরণ এ বিষয়েই তো তোমরা দু'জন তর্ক করছ।

নারায়ণ—ভালকথা, রবি বর্মা তো বিষ্ণু এবং শিবের চারটে করে হাত এঁকেছেন। প্রকৃতিতে এই ধরনের কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে কি? নিশ্চয়ই নেই। তাহলে উনি সেভাবে আঁকলেন কেন? পাশ্চাত্ত্য চিত্রকরদের কথাই ধরা যাক। রাফেল মনুষ্যাকৃতি ঠাকুরদেবতার ছবি এঁকেছেন পাখ্না সহ। মানুষের কি পাখা আছে?

পরম—শুধু তাই নয়। রবি বর্মার অঙ্কিত কৃষ্ণ, গাছ, পাথর, যমুনা এগুলোও প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র নয়।

রাজেশ্বর রাও—ওগুলো না হয় উনি কল্পনা করে এঁকেছেন।

লক্ষ্মীপতি—আরে পাগল, তাকেই বলে সৃষ্টি।

রাজেশ্বর—এমন কয়েকজন চিত্রকর আছেন যাঁরা দৃশ্য আঁকেন। গোদাবরী, কৃষ্ণা নদীকে দেখে তার ছবি আঁকা। ওসব কি অনুকরণ না সৃষ্টি?

পরম—কোনোটাই নয়।

নারায়ণ—কারণ গোদাবরীর মাঝখানে নৌকায় দাঁড়ালে চারদিকে দেখতে পাবে জল আর জল। তাই ছবিতে চিত্রকরও আঁকেন শুধু জলই। ঠিক তেমনি তিনি যদি কোনো পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামনের পাহাড়টিকে আঁকেন, তাহলেই কি সেটা সত্যিকারের পাহাড় হয়! হয় না

তো, আমি বলতে চাই, প্রত্যেকটা ছবির একটা পটভূমিকা চাই। যা-দেখে দেশকাল বোঝা যায়।

রাজেশ্বর—ছবি আঁকার জন্য চিত্রকর কী করেন?

নারায়ণ—যে কোনো ছবিই তিনি আঁকুন না কেন, তা কিছুটা ভাবপ্রধান হওয়া চাই।

পরম—এবং সে ভাবটি সুন্দর হওয়া চাই।

লক্ষ্মীপতি—সেইজন্যেই কি কীট্স বলেছেন, সৌন্দর্যই আনন্দ।

রাজেশ্বর রাও—তুমি থামো তো। ওরা এখন অন্য একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে আর কথাগুলোও একেবারে শাস্ত্রসম্মত ধারায় হচ্ছে।

লক্ষ্মীপতি—এসব তো ফালতু কথা হচ্ছে।

রাজেশ্বর—তোমাকে কতবার বলেছি আমার জীবনটা অত সস্তা নয়।

লক্ষ্মীপতি—দেখ, রাজেশ্বর, আমি জীবনকে অবাস্তব কিছু বলছি না। জীবনকে আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখি। কিন্তু জীবনের মতো জীবন তো কই আমার চোখে পড়ে না।

রাজেশ্বর—তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের সঙ্ঘের সভ্য হয়ে যাও।

নারায়ণ—তোমাদের সঙ্ঘ তো একটা বৌদ্ধসঙ্ঘারামের মতো। ভিক্ষু ভিক্ষুণী জীবন, আনন্দ—সব কিছুই সেখানে।

রাজেশ্বর—তোমাদের দুজনার কেউই কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

পরম—ইংরেজীতে কলার অর্থাৎ আর্টের অর্থ 'মানুষের সৃষ্টি'। তাই না?

রাজেশ্বর—তাই।

ঠিক সেই সময় জমিদারবাবু সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ওদের সবাইকে নিজের লঞ্চে চড়ে গোদাবরীতে নৌকাবিহারের জন্য নিয়ে গেলেন। তারপর চলল অন্ধ্রদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের আলোচনা।

রাজেশ্বর রাও এবং লক্ষ্মীপতির মতে অন্ধ্রদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য হওয়া উচিত। রাজারাও তাদের সমর্থন করল।

নারায়ণ—এমন কোনো আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি না যা সমগ্র দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শুধু অন্ধ্ররাজ্য গঠনের

উদ্দেশ্যেই রচিত। দেশের শাসনভার আমাদের হাতে এসে গেলে তখন আমরা ব্যক্তিগত চিন্তার ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনো ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করতে পারব। এমনিতেই আজকাল ঘাটতি যাচ্ছে, তার উপর আবার এর সঙ্গে নতুন অঞ্চল যুক্ত হলে ঘাটতির আর সীমা থাকবে না। এই ভাগাভাগি যদি চলে তাহলে সব অঞ্চলই দেউলে হয়ে যাবে। কী লাভ হবে তাতে?

জমিদার—স্বাধীনতা বলতে তুমি নিশ্চয়ই পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলছ?

নারায়ণ—যাই হোক, একটা হলেই হল, পূর্ণ না হলেও কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসই হোক—আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এদেশের আয়-ব্যয়ের ভার এদেশের মানুষের হাতে এলে দেশ-গঠন আর প্রান্তবিভাগের কাজ অনায়াসেই করা যাবে।

জমিদার—কিন্তু তুমি কি কোনো দিন ভেবেছ যে আমাদের প্রতি কী ধরনের অবিচার করা হচ্ছে? চাকরির ক্ষেত্রে যত বড় বড় পদ সবই তো তামিলদের ভাগ্যে জোটে। টাকাপয়সা যা কিছু খরচ হয় সব তামিলনাদের জন্যই, অন্ধ্রের ভাগে কানাকড়িও পড়ে না।

নারায়ণ—কিন্তু রামনায়নমগারু ইত্যাদি তো অন্ধ্রেরই মন্ত্রী। আস্তে আস্তে বড় বড় পদে আমাদের লোককে নিয়োগ করা হচ্ছে বৈকি। বছর দশেক আমরা যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমার মূল বক্তব্য।

জমিদার—আমার বক্তব্য হল এক্ষুনি আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে পারি না। আর পেলেও তা আমাদের পক্ষে হানিকর হবে। আর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের কথা যদি ওঠে, তাহলে সেদিক থেকেও আমাদের আলাদা প্রদেশ গঠনের আন্দোলন সার্থক হবে। যাই হোক, যারা গান্ধীজীর মতে চলতে চায় তারা ঐ প্রশস্ত পথে চলুক। তবে আমাদের কথা হল আমরা গোখলের পথের পথিক। আমাদের মত এবং পথ হয়তো তোমার পছন্দ হবে না। সেক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়। আমাদের আন্দোলন এইভাবেই চলবে।

নারায়ণ—ভাল কথা।

লক্ষ্মীপতি—আমরা চাই আলাদা অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হোক, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্র হাইকোর্ট হোক। অন্ধ্রপ্রতিভা, অন্ধ্রপৌরুষ আর অন্ধ্র

বিজ্ঞানের কথা ভেবে কার না আনন্দ হয়? অন্ধ্রের মানুষ যদ্দিন অন্ধ্রে থাকে তদ্দিন কোন ক্ষেত্রেই সে সাফল্য লাভ করতে পারে না। নিজদেশে পরবাসী হওয়ার চেয়ে আর বড় দুর্ভাগ্য নেই। এইটেই সবচেয়ে বেশী কাঁটার মত বেঁধে।

পরম—অন্ধ্রের উপর শনিগ্রহের প্রভাব পড়েছে। তা নাহলে যে দেশে যুগে যুগে কোটিপতিদের বাস ছিল, সেখানে আজকাল একটা লক্ষপতিও খুঁজে পাওয়া ভার। এমন দিনকাল পড়েছে যে রাজামহারাজাদের পক্ষে কবি বা কবিতাপ্রীতি তো দূরের কথা, কবিতার নামে সব নাক সিঁটকায়। অমরাবতী, নাগার্জুন পর্বত, বরঙ্গল এবং হাম্পির শিল্পভাস্কর্য নামকেওয়াস্তে রয়ে গেছে। যারাই এখানে সামান্য একটু নাম করছে, তারাই এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যেমন বিশ্বদাতা নাগেশ্বর রাও, আচার্য রাধাকৃষ্ণন, যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি, বোম্বাইয়ের কমাথি, রেঙ্গুনের গোড় রেডিল, নাগপুরের নায়ডু। যারাই একটু নাম করেছে তারাই এই তেলুগুভূমি ছেড়ে চলে গেছে।

রাজেশ্বর—জিড্ডু রামকৃষ্ণের নাম করলে না?

পরম—উনি তো জগৎবিখ্যাত মহাজ্ঞানী।

রাজেশ্বর—আর পি. বঙ্গলশিবরাম, মুখ্য বিশ্বেশ্বররাইয়া দেওয়ান এবং নাগমাইয়া প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

পরম—তাই তো দেখছি, অনেক সাধারণ লোকও বাইরে গিয়ে নাম করতে পারে, যেমন দামর্লো রামারাও।

লক্ষ্মীপতি—এদেশ ছাড়লেই যেন লোকগুলো তামিলগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে অমনি সাফল্য লাভ করে।

জমিদার—পরমেশ্বর মূর্তি, তোমার কথা আমার কাছে মন্দ লাগে নি। যশ প্রাপ্তির জন্য শুধু অন্ধ্রই নয়, মাদ্রাজও ছেড়ে যেতে হয়। ভাল কথা, কলকাতায় গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের কাছে ক'বছর চিত্রকলা শিখেছ?

পরম—কলকাতায় তো গিয়েছিলাম বি. এ. পড়তে। পালি এবং সংস্কৃত পড়ে আর্কিওলজিতে যাব ভেবেছিলাম। তখনো আমি দামর্লো রামারাওয়ের ছবির ভক্ত। আই. এ. পড়ার সময়ে দুবছর তাঁর কাছে ছবি আঁকা শিখলাম। দুটো ছবি বোম্বাই আর একটা মাদ্রাজে বিক্রি হয়ে গেছে। তারপর কলকাতায় বি. এ পড়তে পড়তে অবনীন্দ্রনাথের কাছে বছর দুয়েক চিত্রকলা শিখেছি।

লক্ষ্মীপতি—তখনকার আঁকা এঁর দুটো ছবি ইংলণ্ডের চিত্রপ্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে—একটা ছবি গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। আর অনেকগুলো ছবি কলকাতায় বিক্রি হয়েছে।”

জমিদার—সম্প্রতি কোনো ছবি এঁকে থাকলে আমাকে দিও। আমি কিনব। আমার পড়ার ঘরে দু-চারটে ছবি রাখতে চাই। কোন্ ছবি আমাকে দেবে তা তুমি আর নারায়ণ রাও ঠিক করে পাঠিয়ে দিও।

রাজেশ্বর—নারায়ণ রাও পরমেশ্বরের কাছ থেকে চারটে ছবি কিনেছে। ওর কাছে বড় বড় শিল্পীর কুড়িখানি ছবি রয়েছে।

ঠিক সেই সময় গোমস্তা এসে জানাল, হুজুর সাতটা বেজে গেছে, লঞ্চটা এইবার ফিরানো দরকার।

“সত্যি গোদাবরীর বাতাস আর ঢেউগুলো কী সুন্দর!” বলে রাজেশ্বর রাও তার পাদু টো জলে নামিয়ে দিল।

২২। গোদাবরী

না জানি কেন গোদাবরী তার কাছে মায়ের মতো, বোনের মতো আর প্রেয়সী স্ত্রীর মতো স্নিগ্ধ, অনুরক্ত বলে মনে হল। নির্মল জলে ঝাঁপ দিয়ে দুই হাতে সেই জলকে আলিঙ্গন করে, জলে ভক্তি সহকারে ডুব দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কেটে কতই না আনন্দ পাচ্ছে সে। ঢেউগুলোর সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা করতে ইচ্ছে করছে তার। সামান্য একটু ডুব দিয়ে চোখ খুলে গোদাবরীতে সূর্যের কিরণরাজি কেমন দেখায় তা সে দেখল। গাছের একডাল থেকে আর-একডালে যাওয়ার মতো হাতগুলোকে লম্বা লম্বা করে প্রশস্ত বুকটাকে ভাসিয়ে দিল। মায়ের বক্ষসুধা পানের উৎসাহ নিয়ে কতবার নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢোকে ঢোকে জল খেল সে। গোদাবরীর ঢেউ আর বাতাসের আনন্দ যেন তার দেহমনে সঞ্চারিত হয়েছে।

নারায়ণ রাও চোখ বুজে হাজারো চিন্তায় মগ্ন। ইতিমধ্যে তাদের লঞ্চ কবুরু দ্বীপের কাছে এসে পড়েছে। ওরা সবাই নেমে পাথরের উপর বসল।

নারায়ণ রাও তাড়াতাড়ি জামাটা বের করে চাকরের হাতে দিয়ে দেবী গোদাবরীর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দিল। "এখানে কিন্তু গভীর জল, সাবধান" জমিদারবাবু বললেন। প্রত্যুত্তরে নারায়ণ রাওয়ের বন্ধুরা বলল, "ও আমাদের বড় সাঁতারু।" তারপর বন্ধুরাও নেমে গেল একে একে। একমাত্র রাজারাও সাঁতার কাটতে জানে না। ছোট ছেলের মতো ঘাটে বসে হাত-পাগুলো জলে ডুবিয়ে ছপ্ ছপ্ করতে লাগল সে।

গোদাবরীতে এখনও বান ডাকে নি। সে এখন মস্তবড একটা নীল নির্মল ঝিলের মতো নিস্তরঙ্গ। দূরের পানী পাহাড়ে সূর্যদেবের শেষ রশ্মিছটা পড়ছে। কখনও তা মনে হচ্ছে লাল কখনও বা হলদে। পশ্চিম দিকের অরুণাভ নীল আকাশের সৌন্দর্য কি মনোহর। বিদায়ী সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গোদাবরীর জলে, তার ছোটছোট তরঙ্গগুলোতে।

পরমেশ্বর মূর্তি আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে রাজারাওয়ের কাছে এসে বলল,—"এই বোকা ছেলে, ওই দ্যাখ্ প্রকৃতির সৌন্দর্য, তাই দেখে নিজের ঘুমন্ত প্রতিভাকে জাগা। এই সৌন্দর্যে নিজেকে লীন করে দে। ওই দ্যাখ্ ওদিকে নারান জলে যেন নাচছে।

জমিদারের চোখ নিজের জামাইয়ের শরীরের উপর নিবদ্ধ। বিশাল প্রশস্ত বুক, গা-মোছার সময় নারায়ণের স্বাস্থ্য দেখে তিনি আরেকবার যেন মুগ্ধ হলেন। যে দুচার ফোঁটা জল গায়ে এখনও লেগে রয়েছে তার উপর প্রতিফলিত হচ্ছে লাল টুকটুকে সূর্যের আলো। জমিদারের মনে হল তাঁর জামাই স্বয়ং একজন অবতার। এই যেন সেই পুরুষ যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল যমুনাতট বৃন্দাবনে—এই সেই শ্যামসুন্দর!

রাত আটটার সময় তারা বাড়ি ফিরল।

বাড়ি পৌঁছে দেখে একটা সোফার উপর বসে গল্প করছে জগন্মোহন রাও এবং শারদা। শারদা খিলখিলিয়ে হাসছে, জগন্মোহনের কণ্ঠে চাপা হাসি। ওদের আসার সঙ্গে সঙ্গে শারদা ভেতরে চলে গেল। জগন্মোহনেরও কেমন যেন হতচকিত ভাব। শারদার ও-ভাবে চলে যাওয়া শুধুমাত্র জমিদার এবং নারায়ণ রাওয়ের নজরে পড়ল। জমিদারের মনে কেমন একটা ঘৃণা জাগল। বিদ্যুৎগতিতে চমকপ্রদভাবে চলমানা শারদার ভঙ্গিমা দেখে নারায়ণ রাওয়ের মন যেন সংগীতমুখর হয়ে উঠল।

দিনকে দিন শারদার প্রতি নারায়ণ রাওয়ের ভালবাসা গভীর এবং নিবিড় হতে লাগল। গোদাবরীর গতিশীল তরঙ্গের মতোই সব সময় তা চঞ্চল, জীবন্ত। ওর গান আর দেহভঙ্গিমা তাকে আনন্দ দেয়।

যৌবনে নারী-পুরুষের মনে যে প্রেমের ভাব জাগে তাকে ব্যক্ত করার মতো ভাষা পাওয়া যায় না। শৈশবে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার মধ্যে কি ভালবাসা থাকে না? সেই যে অব্যক্ত সরল মধুর ভালবাসা সেও বিয়োগ-ব্যাথা সহ্য করতে পারে না? সেই বয়সেও একসাথে সব সময় খেলাধূলা করতে ইচ্ছা করে। পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বেড়াতে ইচ্ছে করে। পরস্পরকে 'তুই' সম্বোধন করতে ইচ্ছে করে। সে বয়সে সাজগোজের কোন বালাই থাকে না। তারাই যখন তারুণ্য লাভ করে তখন তাদের সেই স্নেহ কী জানি কীভাবে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আশৈশব নিবিড়ভাবে আবদ্ধ জীবন, যৌবনে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সে দুর্বিষহ ও দুঃখময় হয়ে ওঠে।

শৈশবের ভালবাসার মধ্যে কামের স্থান আছে কি? স্বাভাবিক কামের উদ্বোধনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কি প্রয়োজন হয়? পারস্পরিক আকর্ষণের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যই যদি একমাত্র বস্তু হত তাহলে সুন্দরী নারীমাত্রকেই তো সব পুরুষ ভালবাসত। আমি তো জীবনে বহু সুন্দরী নারীকে দেখেছি কই তারা তো আমাকে আকৃষ্ট করতে পারল না! কিন্তু প্রথম দর্শনেই শারদার প্রতি ভালবাসায় আমার মন কেমন উদ্বেল হয়ে উঠল। অপরিচিতা, অজ্ঞাত এই শারদার মতো স্ত্রী পেয়ে আমার মন কেন এতখানি কল্লোলিত, আন্দোলিত হয়েছে! একে কি আমি দাম্পত্য প্রেম বলব? এর অস্তিত্ব কি জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী? এর সংযোগ এবং বিয়োগের সীমা কোথায়?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে লক্ষ্য করল শারদা খাওয়া-দাওয়া করে পান চিবোতে চিবোতে এক জায়গায় বসে আছে। তার কাছে গিয়ে সে বললে, "আমাকে একটা পান খাওয়াবে?" কথাটা শারদার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। বোবা দৃষ্টি মেলে স্বামীর দিকে সে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পান সাজতে চলে গেল। নারায়ণ রাও অনির্বচনীয় অনাবিল আনন্দে সেখানেই ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

না জানি কেন সেই মুহূর্তে শারদার কাছে নারায়ণ রাও আরও অনেক সুন্দর হয়ে দেখা দিল। আলোকমালার বিচ্ছুরিত দ্যুতিতে তার রূপ যেন

আরো খুলছে। অব্যক্ত মধুর নূতন অনুভূতির হিল্লোলে সলজ্জ, বিনম্র ভাবে তার কপোল আরো রক্তিম হয়ে উঠেছে। তার মুখে ঠোঁটে চাঁদের আলো পড়েছে। আনত মুখে আড়চোখে শারদা স্বামীর দিকে তাকাল। পাতলা ফর্সা জামার ভিতর দিয়ে স্বামীর প্রশস্ত বুক যেন তাকে ডাকছে। শারদার বুকে জাগল ঢেউ। মনের মতো করে সেজে-আনা পানের খিলিটি স্বামীর হাতে রেখে অননুভূতপূর্ব স্পর্শসুখ অনুভব করল সে। লজ্জাশীলার দেহে মনে লাগল রোমাঞ্চ।

নারায়ণ রাও শারদার কোমল নরম হাতখানি চেপে ধরে বলল, "দেখি তোমার হাত।" দেখল তার হাতের রেখা। গোলাপের পাপড়ির মতো নরম হাতের ওপর রেখাগুলো স্পষ্ট। নখগুলো গোধূলির পশ্চিম আকাশের মতো আরক্তিম। নিজের কনিষ্ঠা থেকে নীলাভ মণি-খচিত আংটিটি খুলে নিয়ে শারদার দ্বিতীয় আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে সে বলল, "দেখ তোমার এই আঙ্গুলেও এটা ঢিলে হয়।" আর তার ওই আঙ্গুলের আংটি বের করে নিজের কড়ে আঙ্গুলে পরতে পরতে বলল, "দেখছ কি রকম আঁটো।" পরক্ষণেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, "মাদ্রাজ থেকে একটা ছোট আংটি এনে তোমার এই আঙ্গুলে পরাব, কেমন?" শারদা ধীরে ধীরে নিজের হাত টেনে নিল। তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

—তোমার এই কোমল নরম আঙ্গুলগুলো বীণা বাজানোর পর ব্যাথা করে না?

তার হাত মুঠোর মধ্যে ধরে নারায়ণ রাও বলল, "ইস বাঁহাতের এ জায়গায় দেখছি কড়া পড়ে গেছে। আচ্ছা শারদা, ঠিক এইভাবে নিজেকে শিল্পসাধনায় নিয়োজিত না রাখলে বুঝি সফল হওয়া যায় না? দিনে ক'ঘণ্টা বাজাও বলো তো? এ আঙ্গুলগুলো না জানি কত মেহনত করে।" আঙ্গুলগুলোতে চুমো দিয়ে সেগুলো চোখের উপর রাখল। শারদা লজ্জা পেল। তারপর হাসিমাখা মুখে সে ঘরে চলে গেল। নারায়ণ রাও-ও বউকে অনুসরণ করল।

ঠিক সেই সময় চিন্তা-গম্ভীর জামাইয়ের কাঁধে হাত রাখলেন জমিদার-বাবু। নারায়ণ রাও চমকে উঠল।

"বোসো। তোমার বন্ধুরা হয়তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এখন তারা জগন্মোহনের সঙ্গে দেখছি ঠাট্টা-ইয়ারকি করছে। লোকটা এক দিক দিয়ে অদ্ভুত বোকা, দেমাকী আর খানিকটা দুষ্ট প্রকৃতির। তুমি ল-প্রিভিয়সে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছ শুনে আমি খুব খুসি হয়েছি। তোমার সঙ্গে আমিও মাদ্রাজ যাব। তুমি হোস্টেল ছেড়ে দাও। কিলপাকে আমার বাংলো আছে, ওখানেই থাকবে। এখন যে ভাড়াটে আছে তাকে ঘর খালি করার জন্য বলে দিয়েছি। জুলাই মাসে সে চলে যাবে। আর ভাল-কথা, পছন্দসই একটা গাড়ি দেখো তো। দেওয়ানকে বলে দেব কিনে রাখতে। ড্রাইভার অবশ্য আগেই রাখা হয়েছে, একখানি গাড়ি আমি তোমাকে দিতে চাই।

—আমি অনেক আগেই একটা ছোট গাড়ি কেনার ব্যবস্থা করে ফেলেছি যে—

—আমি তোমাকে একটা গাড়ি উপহার দিতে চাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারণ করলে শুনব না।

—শারদা!

পাশের ঘর থেকে শারদা সাড়া দিল, "কী বাবা ?"

—এদিকে এসো তো মা।

শারদা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

—নিচে গিয়ে একটু বাজাবে মা ? আমাদের বৈঠকখানা ঘরেই ?

—এখন কেমন যেন লাগছে বাবা, ভাল লাগছে না নিচে যেতে।

—তাহলে থাক।

—না, থাকবে কেন আমি এখানেই বাজাতে পারি।

—না বাজাতে ইচ্ছে করলে বাজিও না।

—না, বলছি তো বাজাব।

—বেশ।

শারদা চাকরানীকে ডেকে নিচের বৈঠকখানা ঘর থেকে বীণাটা আনিয়ে নিল। জমিদার নারায়ণ রাওকে বললেন, "নিচের জলসা ঘরটাকে কলকাতা থেকে লোক আনিয়ে আমি সাউণ্ড-প্রুফ করিয়েছি। ওই ঘরে গানটা একটু খোলে। পাঁচ-দশজন বসে শুনতে পারে। ভাল কথা, তুমি বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এস।"

নারায়ণ রাও "আনছি" বলে চলে গেল।

শারদা বীণা ঠিক করে গান শুরু করল।

নারায়ণ রাও আর তার বন্ধুরা আরামে বসে গান শুনছে। জগন্মোহন রাও শারদার ঘরে ঢুকে একটি গদিতে বসে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

জগন্মোহনের ঘরে ঢোকা দেখে রাজেশ্বর রাও নাক সিঁটকাল।

নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর মূর্তি সংগীত প্রবাহে তন্ময়।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

১। মঙ্গল গৌরী

শ্রাবণ মাস। গোদাবরীর বাতাস মৃদুমন্দ। আকাশে মেঘের আনাগোনা আর রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি পৃথিবীর উপর। মঙ্গলবার। মেয়েরা সুন্দর সুন্দর রেশমী শাড়ি পড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারে মেয়েদের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন নির্ধারিত হয়েছে কেন? বিয়ের পর পাঁচ বছর এই ব্রত পালিত হয়। এক বছর পালন করার পর ব্রতের অবসান ঘটানো যেতে পারে। বিয়ের পর সপ্তপদীর দিনে এই ব্রত হয়। বধূর গলায় মঙ্গলসূত্র বেঁধে পায়ে কড়া পরিয়ে, পায়ের আঙ্গুলে মিষ্টি রেখে ছাব্বিশটি লাড্ডু একটি পাত্রে রাখা হয়। তার উপর নতুন শাড়ি, হলুদ, কুমকুম প্রভৃতি সাজিয়ে ব্রতের অবসান করা হয়। শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারে স্নান সেরে ভেজাকাপড়েই মঙ্গলদেবীর পূজার পর তাঁর পাঁচালী পড়ে, মাথায় ধান দিয়ে, প্রদীপশিখায় তৈরী কাজল চোখে লাগিয়ে, সুসজ্জিত হয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিবাহিত মেয়েরা। দেবীর পায়ে হলুদ লাগিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে পান-সুপুরি দিতে হয়।

শ্রাবণ মাসের এই মঙ্গলবারেই মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যাপক সুযোগ পায়, পরস্পরের কুশল প্রশ্ন করে। গালগল্প পরচর্চা হয়। গয়নাগাটির প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সময় কাটে। রেশমী কাপড় আর অলংকার পরে দল বেঁধে মেয়েরা পথে বেরোয়। সেদিন পথঘাট দেখে মনে হয় যেন অপ্সরীরা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। শিশুরাও মায়েদের সঙ্গে থাকে। তরুণীদের উল্লাস দেখার জন্য একশ্রেণীর যুবকও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ বৃষ্টি এলে হুড় মুড় করে এক জায়গায় সবাই জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায় আর মাঝে মাঝে কখনো বা যুবক-যুবতী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে।

কোত্তাপটোয় সূর্যকান্তম এক বছরে ব্রত সেরেছে, সেইজন্য এ বছর মানিক্যম ব্রত শুরু করে দিয়েছে। ওদের বাড়িতে ব্রত পালিত হয় বলে সুব্বারায় জমিদারের কাছে লিখেছিলেন শারদাকে দিয়ে এ বছর ব্রত পালন করাতে।

পূর্ণিমার দিন শুক্রবারে যখন জমিদারের বাড়িতে বরলক্ষ্মীকে ব্রত দেওয়া হল তখন জানকী আম্মা বরলক্ষ্মীর মতই সেই উৎসবে উপস্থিত থাকবার জন্য এলেন। বউয়ের জন্য কুড়ি ভরি সোনা, জমিদারের পত্নীর জন্য দামী শাড়ি, প্রায় চারশো টাকার জিনিস 'শ্রাবণ পট্টি' হিসেবে তিনি নিয়ে এলেন। জমিদার বেয়ানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জামাইয়ের জন্য হাজার টাকার আষাঢ়-পট্টি পাঠালেন। জানকী আম্মা বউকে দিয়ে ব্রত করালেন। বউয়ের কাছ থেকে উনি চারুমা পাঁচালীও শুনলেন। সুন্দর বর্ধনাম্মার অনুরোধে তিনি ঐখানেই তিন সপ্তাহ থেকে গেলেন।

শারাদার সঙ্গে রাজমহেন্দ্রবরমের বড় বড় লোকের বাড়িতে তিনি ঘুরে এলেন।

মঙ্গল গৌরীর পাঁচালী শোনানোর পর শারদা নিজের পিসিমাকে ঐ পাঁচালীর অর্থ সবিস্তারে বুঝিয়ে বলতে বলল। নিঃসন্তান পতিপত্নীর তপস্যা, পার্বতী পরমেশ্বরের দর্শনদান, বৈধব্যপ্রাপ্ত কন্যার অথবা অল্পায়ু পুত্রের প্রশ্ন, সন্তান কামনা, শিশুর জন্ম-চতুর্দশদিবসে তাকে নিয়ে যাবার জন্য যমের চেষ্টা, সেই দিনের আগেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মামার সঙ্গে বিদেশ যাত্রা। এক নগরীর বাইরে উদ্যানে মেয়েদের ফুল পাড়া এবং রাজকুমারীর নিজের হাতে তোলা ফুলগুলোর আবার গাছে চলে যাওয়া দেখে, ঐ রাজকুমারীকে সম্মত করিয়ে ভাগ্নের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া, বাড়ি ফিরে গিয়ে ঐ ছেলের সঙ্গে সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করে আবার বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি সে পিসিমার কাছ থেকে জেনে নিল। মৃত্যুর দিন রাত্রে আদিশেষ যখন বালকটিকে ছোবল মারতে এল তখন তার স্ত্রী তার উদ্ধত ফণার সামনে একটি লাড্ডু রেখে দিল। সাপ সেই লাড্ডুর উপর ছোবল মারল, তারপর সেই মেয়েটি একটি পাত্র সামনে রাখাল। পরক্ষণেই সাপ সেই পাত্রে ঢুকে গেল। তারপর নিজের আঁচল ছিঁড়ে মেয়েটি পাত্রটির মুখ ভাল করে বেঁধে দিল। এরপর স্বামী দেশ-দেশান্তর পর্যটনে বেরোল। ফিরে এসে দেখে সেই সাপ সোনা হয়ে গেছে। সুসজ্জিতা সুন্দরী বধূকে দেখে জানকী আম্মা খুবই প্রসন্ন হলেন। ছেলে যেন মদন এবং ঐ মেয়েটি যেন রতি। একে উভয়কে পাওয়ার জন্যই বুঝি জন্মেছে এ পৃথিবীর বুকে। সেদিন জানকী আম্মা তাঁর বউমার উপর তুকতাক করে দেখলেন। শুকনো

লঙ্কা এবং লবণের ধুনো দিলেন। লঙ্কাগুলো ঠিকমত পোড়েনি। তাই জানকী আম্মার ধারণা হল হয়তো অনেকের নজর লেগেছে তা না হলে লঙ্কাগুলো পুড়ছে না কেন।

বরদ কামেশ্বরী দেবী এসব কাণ্ড দেখে হাসলেন।

শারদার কাছেও এসব বিচিত্র লাগছিল। শ্বশুরবাড়ির লোক আদ্দি কালের রীতিরেওয়াজ শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও পালন করে আসছে। বড় শাশুড়ী তো এসব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন। দিনে দশ বারোবার স্নান করেন। আচার-বিচারের ব্যাপারে তাঁর সতর্ক প্রহরা। রান্নার জন্য যত জল লাগত সব নিজেই বইতেন। অন্যদের জল বওয়ার কাজ একজন ব্রাহ্মণ করত।

পরের দিন জানকী আম্মা কোত্তাপেট চলে গেলেন। পুরনো আচার-বিচারের ততটা অনুগত না হলেও, নিঃসন্দেহে তিনি প্রাচীনপন্থী। রান্নাঘরে কোনো শিশুর প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁর নিজের খাবার ঘর ছিল আলাদা। তাঁর খাবার সেইখানেই রান্না হত।

লক্ষ্মীনরসাম্মা খেতে বসেই যে ঘটির জল খেতেন সেটা অন্য কারো ব্যবহারের উপায় ছিল না। রেশমী কাপড় পরে খেতে না এলে, তিনি পরিবেশনই করতেন না। খেতে বসার আগে ফোঁটা তিলক-কাটা চাই। যেকেউ হোক না কেন বিধিবিধান পালন করার কথা তিনি তাকে স্পষ্ট করে বলে দিতেন। শারদা যখন গৃহপ্রবেশের জন্য শ্বশুরবাড়ি গেল তখন উনি তাকে উপদেশমূলক অনেক কথা বলেছিলেন। একদিন শারদা পান চিবোতে চিবোতে হঠাৎ রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতেই নরসাম্মা বলে উঠলেন, "ওমা—এ কি করছ। যাও এখনই হাত ধুয়ে এসো। ঐ রুমালটা ঐ নোংরা কাপড়ের মধ্যে ফেলে রাখো। চাকরানী এলে ধুয়ে দেবে।" "এসব ব্যাপারে কবে যে তুমি একটু ঢিলা দেবে মা, তাই আমি ভাবি।" জানকী আম্মা প্রায়ই বলত, কিন্তু কোন লাভ হত না।

লক্ষ্মীনরসাম্মা ছিলেন দার্শনিকের মতো। সব সময় দর্শনগ্রন্থ পড়তেন। আশপাশের গ্রামে তাঁর বহু শিষ্যা রয়েছে। তাঁর গুরু যেদিন দর্শন দিতেন সেদিন তিনি তাঁকে প্রণাম করে ফল, টাকা আর রুপার পাত্র দক্ষিণা দিতেন এবং মন দিয়ে শুনতেন তাঁর বাণী। নিজেও আবার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন : জন্ম ভ্রান্তি বিশেষ, সর্পে রজ্জু ভ্রমের

মতোই। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হল মায়ামৃগদর্শনের মতো ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি হল মানুষের শত্রু। এগুলোকে পরাজিত করতে হবে। তা নাহলে গোটা জীবন অন্ধকারে পড়ে থাকতে হবে—এ আমার ছেলে, এ আমার স্বামী, এই আমার ঘর, এগুলো আমার সয় না। এ সব আমার বাড়ির জিনিসপত্র—এ সব মায়ার আবর্জনায় ডুবে থাকলে আসল তত্ত্ব কিছুতেই জানা যাবে না। মুক্তি দূরের বস্তুই থেকে যাবে। শুদ্ধ নির্গুণ এবং শাশ্বত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে। লক্ষ্মীনরসাম্মা এইসব কথাই বলে বেড়াতেন শিষ্যামহলে। 'সঙ্কীকরণ' তাঁর কণ্ঠস্থ। এছাড়া কাহিনী এবং কবিতা, গল্পও তিনি অজস্র জানতেন। 'সীতারামঞ্জনেয়ম' তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। মুখে সব সময় 'শুদ্ধ নির্গুণ তত্ত্ব কন্দার্থতিরউ' গানটি লেগেই থাকত। শারদার এ সমস্তকে কুসংস্কার বলে মনে হত। তার মা কোনোদিন এসব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। সে ভাবল শহুরে মানুষ কী করে গ্রামের এসব নিয়ম মেনে চলতে পারে। শ্বশুরবাড়ির সব কাণ্ড কারখানার গল্প শারদা মা-মাসিদের কাছে করত। তাঁরা শুনে হাসতেন। শাশুড়ীর চলে যাওয়ার পর চতুর্থ দিন শারদা 'রজস্বলা' হল। এই উপলক্ষে জমিদার বাড়িতে তিনদিন ধরে উৎসব চলল। প্রত্যেক দিন মেয়েরা মিষ্টি পাঠাল। বাজনাবাদ্যও এল। সূর্যকান্তম এবং মানক্যাম্বা দামী দামী ভেট রেশমী শাড়ি ইত্যাদি নিয়ে এল। শহরে বহু মেয়েপুরুষদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। লোকে কানাঘুষা করতে লাগল, বীরেশলিঙ্গমের প্রিয় শিষ্য জমিদারবাবু আজ গাঁয়ের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চান। শ্রীনিবাসরাও ব্রাহ্ম সমাজের লোক। উনি যজ্ঞ পইতাও ত্যাগ করেছিলেন। উনি বন্ধু জমিদারকে বললেন, "মেয়ের রজস্বলা হওয়ার অর্থ তার শরীরে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে অত ঢাকঢোল পেটানোর চেয়েও নিন্দনীয় আর কিছু হতে পারে না।"

"আমিও এসব পছন্দ করি না। কিন্তু ব্যাপারটা যে নিন্দনীয় সেটা তো আমরা জেনেছি পাশ্চাত্যের সাহচর্যে এসে। এখন আমরা পুরোনো রীতি পালন করাকে মূর্খতা বলে মনে করি। আগে যেগুলোকে আমরা নিন্দনীয় বলে ভাবতাম আজকাল সেগুলোই ভালোর তকমা পেয়েছে। নারীপুরুষ

সম্পর্কিত সবকিছু আজ খোলাখুলি ভাবে আমরা প্রকাশ করছি। আমিও তো তাই বলছি যে এসব ঠিক হচ্ছে না। আজকাল ইংরেজ যুবতীরা হাঁটুর উপর গাউন পরে বুকটা অর্ধনগ্ন রাখে। নেংটি পরে পুরুষদের সঙ্গে একসাথে সাঁতার কেটে স্নান করে আর আমাদের দেশবাসীও ওদের অনুকরণে মেতে গেছে। এসব এত খোলাখুলিভাবে হয় যে তাতে আমার মনে হয় পুরুষের কাছে নারীরহস্য কিছু গোপন থাকে না। ডাক্তারের কাছে মেয়েরা খোলাখুলি ভাবে সব কিছু বলে। এমন কি অনেক সময় পুরুষ ডাক্তারই প্রসব করায়। আর আমরা ? কোন মেয়ের বত্রিশ পাটি দাঁত দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ তাকে নিজেই সাবধান করি। মহিলা ডাক্তার ছাড়া মেয়েদের শারীরিক পরীক্ষা কিছু করানো হয় না। পরপুরুষদের কাছে ঘেষতে দেওয়া হয় না। গোদাবরীতেও পুরুষদের উপস্থিতিতে মেয়েরা স্নান করে না। আবার তারই পাশাপাশি অদ্ভুত বৈষম্য এই যে, গর্ভ ও রজস্বলা হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলোকে ঘটা করে জানিয়ে উৎসব অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। সমাজে সব কিছুই রয়েছে, কোনটা মন্দ আর কোনটা ভাল তার বিচার নির্ভর করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। তাই না শ্রীনিবাস ?"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই।"

২। আমেরিকা যাত্রা

রামচন্দ্র রাও জাপান পেঁাছাল। জাপানে একমাস থেকে সেখানকার দর্শনীয় বস্তু ও জায়গা দেখে নিয়ে আমেরিকার পথে পাড়ি দেবে ঠিক করল। রেঙ্গুনেই নারায়ণ রাওয়ের চেষ্টায় রেঙ্গুনবাসী অন্ধ্রদের মধ্যে প্রখ্যাত পুল্লম রেড্ডি তার আমেরিকা এবং জাপান যাবার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিলেন।

রামচন্দ্র রাওয়ের পিতৃবন্ধু আমীরচন্দ্র গিরধারীলাল তাকে স্বাগত জানাতে বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। গিরধারী লালের ব্যবসায়িক যোগা-যোগ ছিল আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, ইংলণ্ড, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে। এসব দেশ বহুবার ঘুরে এসেছেন তিনি।

এইসব কারণে তিনি রামচন্দ্র রাওকে স্বদেশে ফিরে যেতে বলতে পারলেন না। তবু বন্ধুত্বের দিকটা স্মরণ রেখে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি বললেন, "রামচন্দ্র, এখনো তোমার ঠিক গোঁফের রেখা ওঠেনি, খুব অল্প বয়স তোমার। এ এক নতুন দেশ, অনেক ঠকবাজ ধোঁকাবাজ এখানে আছে। উচ্চশিক্ষা তো তুমি বেনারস, লক্ষ্ণৌ অথবা কলকাতায়ও পেতে পারতে।"

—আপনি আমার বাবার বন্ধু হিসেবেই আমাকে একথা বলছেন। কিন্তু আমি যে ঠিক করে ফেলেছি যাবই, এখনতো আমি আর সে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারি না এবং বদলাতে চেষ্টা করব না। আপনি পিতৃতুল্য, আপনার কথা না শোনা অবিশ্যি অন্যায়।

—আচ্ছা ঠিক আছে, যেমন তোমার ইচ্ছে। আমি কিছু মনে করব না। আমার এক আত্মীয় লালচন্দ জীবনলাল নিউইয়র্কে থাকেন। আমি তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখে দেব। তোমার হাতেও একটা চিঠি দিচ্ছি।

—আপনার এ সাহায্যের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।

—তোমাকে দেবার জন্য তোমার বাবা কিছু টাকা পাঠিয়েছেন, সেটা তুমি নাও, আর দেখ, খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। যতই হোক এখনও তুমি ছেলেমানুষ।

—সাবধানে থাকবার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

পরদিন পুল্লম রেড্ডি অমৃতলালের বাড়িতে এসে রামচন্দ্র রাওয়ের কথা বললেন। ওঁদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব রয়েছে। ওঁরা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেন। পুল্লম রেড্ডি অমলাপুর তালুকের পরুব গ্রামের মানুষ। অতি অল্প বয়সে কুলির কাজ নিয়ে রেঙ্গুনে চলে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই কুলিদের সর্দার হয়ে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে নেন। তাঁর মালিক এক গুজরাতী ব্যবসাদার, ব্যবসারই কাজে তাঁকে সিঙ্গাপুর পাঠায়। সেখান থেকে ফেরার সময় দেখা গেল পুল্লমবাবুর পঁচিশ হাজার টাকা লাভের অঙ্ক জমেছে। এদিকে মালিকের কাজও করে দিয়েছিলেন তিনি। তখন থেকে নিরমার পুল্লানা, পুল্লম রেড্ডী নামে খ্যাত হলেন। গুজরাতী মালিক নিজের ব্যবসার এক আনা অংশ তাঁর নামে লিখে দিয়েছিলেন। তারপর দেখতে দেখতে চার লক্ষ টাকার মালিক হলেন পুল্লমবাবু। চল্লিশ বছর বয়সে, পুল্লমবাবু নিজের পুরানো মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে নিজেই ব্যবসার

পত্তন করলেন। বছর দশেকের মধ্যেই কুড়ি লক্ষ টাকার মালিক হন তিনি। রায়বাহাত্বর খেতাবও পেলেন। ইংরেজদের কাছে তিনি হচ্ছেন পালয়ন রেড্ডী। দানদাক্ষিণ্যের জন্যও রেঙ্গুনে ভদ্রলোকের বেশ নাম হয়েছে। এজন্য অনেকের কাছে 'নাগেশ্বর রাও' নামে তিনি খ্যাত।

রেঙ্গুনের প্রায় সব অন্ধ্রাই মজত্বরি করে দিন গুজরান করে। অফিস-আদালতের চাকরি খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। ব্যবসাদারের সংখ্যা আরো অনেক কম। অভিজাত পরিবারের লোক নেই বললেই চলে। কচিৎ ত্ব-একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় রেঙ্গুনে ও মেলিয়ন প্রভৃতি শহরে। দক্ষিণ বর্মায় এখানে সেখানে ত্ব-চারজন পাওয়া যায় অবিশ্যি। দূর দেশে ব্যবসা করার জন্য, ধর্মপ্রচারের জন্য, রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাচান অন্ধ্রদের ত্বঃসাহসিকতার পাশাপাশি আজকের দিনের এ লোকদের ভয়, আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তাকে রীতিমত লজ্জাজনক মনে হয়। আজকাল পেটের ধান্ধায় কুলিগিরি করার জন্য বর্মায়, আসামে, মালয়ে, নেপালে যেতে একমাত্র অন্ধ্রদেরই দেখা যায়। শোনা যায় বর্মায় নাকি তেলঙ্গ নামে এক জাতি আছে। তারা কোন পল্লব, চালুক্য অথবা কাকতীয় যুগে নাকি সেখানে গিয়েছিল। পুল্লম রেড্ডি অতি অল্প বয়সেই ঘরছাড়া হলেও, রামচন্দ্র রাওয়ের সাহস দেখে আজ তিনি বিস্মিত এবং আনন্দিত। রেড্ডি মশাই চল্লিশ বছর বয়সে একটু আধটু লেখাপড়া শিখেছেন, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্ধ্রদেশের ইতিহাস পড়ে শোনাবার জন্য একজন লোকও রেখেছেন।

নারায়ণ রাও ভগ্নিপতির জন্য ভেঙ্কটরত্ন নায়ডু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে রেড্ডিমশায়ের জন্য চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিল। রেঙ্গুনের এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক আওয়ার পল্লি নারায়ণ রাওয়ের নামেও কয়েকটি চিঠি লিখে পাঠাল সে।

রেড্ডি মশাই, অমরচন্দ্র এবং নারায়ণ রাওয়ের চেষ্টাচরিত্রের ফলে রামচন্দ্র রাওয়ের জাপান যাত্রা সম্ভব হল। সেখানে টোকিও, ইয়োকোহামা, ফুজী পর্বত প্রভৃতি দেখে। রাসবিহারী বসুর সাহায্যের ফলে জাপান বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখা হল। কল্‌কারখানা দেখার ইচ্ছাও সফল হল তাঁরই সাহায্যে। জাপান থেকে কত খেলনা, কাগজ, কাঁচের জিনিস, ছুরি, ছুঁচ, চিরুনি, কাপড়, খুর, ওষুধ, আরো কত কী ভারতে আসে!

রামচন্দ্র রাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাঝে মাঝে ভাবে। ভারত কবে আজকের এই দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এদেশের মতো উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। কয়েকটি তুলি এবং রঙ কিনে নারায়ণ রাওয়ের নামে পাঠিয়ে দিল সে।

রামচন্দ্র রাওয়ের আমেরিকা যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। রাসবিহারী বোসকে রাজনৈতিক কারণে ভারত ছাড়তে হয়েছিল। জাপানই এখন তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি। নিদ্রায় জাগরণে সব সময় গঙ্গা, কালী এবং হিমালয়ের স্মৃতি যেন তাঁকে ঘিরে থাকে। রামচন্দ্র রাওকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন, "জান ভাই, কালেভদ্রে যে দু-একজন ভারতবাসীকে এখানে দেখি তারাই আমার ভারতবর্ষ। তাদের সমগ্র অবয়বের মধ্যে আমি দেখি শ্যামলী বাঙলার খেত আর সুগন্ধ পাই শেফালী ফুলের, চোখে দেখি গঙ্গার শোভা। আর মাথায় দেখি যেন আদিগন্ত নীল আকাশ।

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।

তুমি বয়সে অনেক ছোট। আমার দেশের সুন্দর একটি ছেলে তুমি। রামচন্দ্র, চার বছর পরে আবার তুমি মাতৃভূমির কোলে ফিরতে পারবে। মাতৃভূমির মাটিতে বসে তাঁর দেওয়া খেলনা দিয়ে খেলা করতে পারবে। তাঁর পবিত্র বাতাস বুক ভরে নিতে পারবে। তোমার দেশমাতৃকার স্তনরূপী গোদাবরীর জলপান করতে পারবে। এসো ভাই, একবার তোমায় প্রাণভরে আলিঙ্গন করি। ফেরার পথে যদি একবার এদিকে আস তাহলে আমি অত্যন্ত খুসি হব। ভাল কথা, ওখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি দেবে।"

তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

টং টং শব্দ হল। তারপর বাঁশি বাজল, জাহাজ সশব্দে ইয়োকোহামা ছাড়ল। রাসবিহারী বসুর পরামর্শ অনুযায়ী রামচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটেছিল।

আমেরিকা গরিবদের চায় না। ধনীদের খুব খাতির করে। উচ্চ-শিক্ষার্থে যারা যায়, তাদেরও আমেরিকার যত্রতত্র বেড়ানোর অধিকার থাকে না, অনুমতি মেলে না। ভারতবর্ষের চেয়েও অনেকগুণ বড় দেশ, কিন্তু সব মিলিয়ে লোকসংখ্যা মাত্র দশ কোটি। কালা আদমিদের আমেরিকা

কুকুর বেড়াল ঘোড়ার চেয়ে দামী মনে করে না। নিগ্রো, চীনা, জাপানী, মোঙ্গল, রেড ইণ্ডিয়ন এবং নানা রঙের ভারতীয় বছরের পর বছর আমেরিকায় থাকলেও, তারা সে দেশের মানুষ হতে পারে না। মাত্র কয়েক বছর সেখানে থাকতে পারে। কোনো নিগ্রো অপরাধ করলে তাকে সব সময় আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় না। তার ওপর প্রকাশ্যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয় এবং পুড়িয়ে মারা হয়। মাঝে মাঝে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমেরিকানদের দৃষ্টিতে ভারত একটি আজব দেশ। তারা ভাবে ভারতীয়দের কোনো ধর্ম নেই। পাথরের মূর্তি পুজো করে যারা তাদের সংখ্যাই ভারতে বেশী। সেই জন্যই কোটিপতিদের ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে মিশনারিদের পাঠায়। ভারতের বড় বড় রাজা-মহারাজাদেরও অনেক সময় আমেরিকার বড় বড় হোটেলে স্থান দেওয়া হয় না। তাদের আমেরিকার পুলম্যান কামরায় সফর করতে দেওয়া হয় না।

উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এক পাঞ্জাবী নওজোয়ানের কথা ভাবতে ভাবতে রামচন্দ্র জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ কালকেই জাপানকে শতশত মাইল পেছনে ফেলে এসেছে। গতকাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। রাত বারোটা নাগাদ ঘুমের আমেজ এল। তন্দ্রার মধ্য দিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটার পর চারটের ঘণ্টা শুনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। প্রাতরাশ সেরে স্নানান্তে পরিচ্ছন্ন কাপড়জামা পরে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে জলের সূর্যোদয় দেখল।

যতদূর দৃষ্টি যায় জল আর জল, আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে। আকাশ চাঁদোয়ার মতো গোল হয়ে সমুদ্রকে যেন চুম্বন করছে। জাহাজের যান্ত্রিক শব্দ এবং যাত্রীদের কলরব জাহাজের সামনের চাকা এবং গম্ভীর শব্দ মিলিয়ে কী সুন্দর ছন্দোময় ঐকতানের সৃষ্টি করেছে।

স্বপ্নে, গল্পে, উপন্যাসে, পত্র-পত্রিকায় প্রাপ্ত বহু বিদেশী শব্দের গুঞ্জন যেন শুনতে পাচ্ছে রামচন্দ্র রাও। যে জিনিস কল্পনা করাও এক সময়ে তার পক্ষে কঠিন ছিল, আজ তাকে কত কাছে নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে সে। অদ্ভুত এক সুপ্ত চৈতন্য নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার একাগ্রতায় ছেদ পড়ল কারো হাতের স্পর্শে।

৩। জাপান

রামচন্দ্র রাও চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে অর্জুন সিং। জাপানে রাসবিহারী বোসের বাড়িতে তার সঙ্গে রামচন্দ্র রাওয়ের আলাপ হয়। সিংজীর পাশে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ও একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। "হ্যাঁ, এই ছেলেটি আমাদের দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা। কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। নাম বুদ্ধওয়ারুপু রামচন্দ্র রাও। আপনার দেশে উচ্চশিক্ষার্থে যাচ্ছেন। রামচন্দ্র রাও মশায়, ইনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত ডাঃ রোনাল্ডসন। বিরাট বড় ব্যবসায়ীরা এর দাসানুদাস। আর ইনি হলেন এঁর মেয়ে। হার্ভার্ড এ বি. এ. অনার্স পড়ছেন। এর নাম লিয়োনোরা।" "মিঃ রামচন্দ্র রাও, আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খুব খুসি হলাম। নমস্কার।"

রামচন্দ্র রাও লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল। দেশ ছেড়ে আসার পর থেকে সে কোনো বিদেশীর সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ পরিচয় করে নি। ইংরেজী বাদে অন্য কোনো বিদেশী ভাষা সে জানে না। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই বড়দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তার সংকোচ হয়, বাবার সঙ্গেও ভয়ে ভয়ে সে সসংকোচে কথা বলে। তাই এ ক্ষেত্রেও সে সংকোচ ভাঙ্গল না। প্রতি-নমস্কার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

অর্জুন সিং—রামচন্দ্র রাও এর মনটা বড় কোমল। এঁদের পরিবার আমাদের দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবারগুলির অন্যতম। এঁর ধারণা আমেরিকা দেশটা জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশেষ। তাই সেখান থেকে আকণ্ঠ জ্ঞানরস পান করে দেশে ফিরতে চান।

রোনাল্ড—মিস্টার রামচন্দ্র রাও, শুনেছি কোনো ব্রাহ্মণের পক্ষে বিদেশ যাত্রা নাকি আপনাদের দেশের নরকযাত্রার সমতুল্য? এই অবস্থায় আপনি এলেন কি করে?

রামচন্দ্র—আজকাল ওসব অন্ধ সংস্কার কেটে গেছে।

লিয়ো—জাতিভেদ তো জন্ম থেকেই শুরু হয়ে যায়। একে অন্যের ছোঁয়া খায় না। একজাতের লোক অন্য জাতের লোককে বিয়ে করে না।

রামচন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তবে—তবে—

রোনাল্ড—ভাল কথা মিঃ অর্জুন সিং, শিখরাও কি হিন্দু?

অর্জুন সিং—হিন্দুস্থানের ক্রীশ্চানরাও হিন্দু।

লিয়ো— কী করে?

অর্জুন সিং—আমেরিকায় যেমন মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক—সবাই আমেরিকান। ঠিক সেইরকমই হিন্দুস্থানে যারা আছে তারা সবাই হিন্দু।

রোনাল্ডসন সহাস্যে বললেন, "তাহলে এর অর্থ হল শিখ এবং ক্রিশ্চানরা হিন্দু নয়।"

অর্জুন সিং—আমাদের ধর্ম সর্বসম্মত। মায়ের মতোই হিন্দুধর্ম সমস্ত ধর্মকে নিজের বক্ষে ধারণ করেছে। হিন্দু ধর্মের ত্রুটি সংস্কারের জন্য গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বলা যেতে পারে আমাদের ধর্মের গোড়ার কথা হল সংস্কারসাধন। ঠিক এই ধরনের ধর্ম হচ্ছে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম। বর্তমানে এই ধরনের আরো সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্যসমাজ, সৎসঙ্গ প্রভৃতিকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি।

লিয়ো—এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যেও কি ব্রাহ্মণ আছে?

অর্জুন সিং—আজ্ঞে না। এদের মধ্যে জাতিভেদ নেই।

রোনাল্ড—একমতাবলম্বীর বিয়ে অন্য মতাবলম্বীর সঙ্গে হয়?

অর্জুন সিং—না খুব বেশী হয় না। তবে কেউ যদি অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েকে বিয়ে করে, সেটা কারও চোখে দোষের নয়।

লিয়ো—অন্ধ্র দেশটা ঠিক কোন্ জায়গায়? ঠিক কোন্ অঞ্চলে পড়ে?

অর্জুন সিং—ভারতে পনেরো ষোলটা মুখ্য ভাষা রয়েছে। তার মধ্যে অন্ধ্র বা তেলুগু একটি। তিন কোটির বেশী লোক এই ভাষায় কথা বলে।

লিয়ো—মিস্টার রামচন্দ্র রাও, আপনি কোন্ সাবজেক্টে উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা যাচ্ছেন?

রামচন্দ্র—আজ্ঞে, গণিত।

লিয়ো—কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন?

রামচন্দ্র—জাপানের বন্ধুরা ইয়েল অথবা হার্ভার্ডে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

লিয়ো—আপনার কাছে সুপারিশপত্র রয়েছ তো?

রামচন্দ্র—চার-পাঁচটা রয়েছে।

লিয়ো—হার্ভার্ডেই ভর্তি হোন। আমি এখন এম. এ. পড়ছি। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপারে রিসার্চ করতে চাই। কিছুদিন পড়ে বিদ্যুৎ শক্তির প্রসিদ্ধ বেত্তা মহান গবেষক এডিসনের রসায়নশালায় তাঁর অধীনে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে।

রামচন্দ্র—তবে তো খুব ভালই হল। আমিও তাহলে হার্ভার্ডেই ভর্তি হবো।

রোনাল্ড—শুনেছি আপনার দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভাল নয়।

রামচন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের মিশনারি পণ্ডিতরা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়ে অনেক পুঁথি রচনা করেছেন। আপনার মিশনারিরা না হলে আমাদের দেশ নিগ্রোদের দেশের মতো হয়ে যেত।

রামচন্দ্র রাওয়ের বিনয় এবং জিজ্ঞাসু মনোভাব রোনাল্ডসনের খুব ভাল লাগে। রামচন্দ্র রাও অশুদ্ধ ইংরেজীতে নিজের দেশবাসীর কথা, ধর্মের কথা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়ে অনেক কিছু জানাল। প্রসঙ্গত এও জানাল যে জনসাধারণ গান্ধীজীর বক্তব্য মন দিয়ে শোনে। গান্ধীজীর কথামত কাজকর্ম করে। বহু শিক্ষিত মানুষের মন থেকে চাকুরির মোহ এখনও কাটে নি।

ডাঃ রোনাল্ডসন আমেরিকায় যে পিলগ্রিম-ফাদার্সরা প্রথম গিয়েছিলেন তাদের বংশজ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। অগাধ পড়াশুনা। ডাক্তার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। আমেরিকার বড় বড় ডাক্তারদের মধ্যে তাঁকে ধরা হয়। বহু অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন। সহৃদয় ব্যক্তি তিনি, সেইসব ক্রীশ্চানদের দলভুক্ত যাঁরা আন্তরিকভাবে চান নিগ্রোদের জীবন থেকে সমস্ত দাসত্বের বন্ধন মুক্ত হোক। তাঁর মতে ক্রীশ্চান ধর্ম বিরাট এবং মহৎ, কিন্তু তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যভিচার অনাচার হয়েছে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত শক্তির চেয়েও প্রেমের শক্তি প্রবল। ভগবানেরই অন্যরূপ প্রেম। তিনি মনে করেন যে, সূর্য যেমন বরফ গলিয়ে দেয়, প্রেমও পারে পাষাণ হৃদয়কে দ্রবীভূত করতে। প্রেম যেন জগৎকে আলোকিত করার দিব্য জ্যোতি। প্রেম না থাকলে আসে ক্রোধ-হিংসা, স্বার্থপরায়ণতা, মান-অভিমান এবং অসত্য। তিনি বন্ধুদের বলতেন যুদ্ধের

উন্মাদনা, চুরি ডাকাতির ইচ্ছা, ব্যবসায়ে অসততা প্রভৃতি কু-কর্ম প্রেমহীন মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কোনো ব্যক্তি বা দল কোনো দেশের স্বাধীনতা হানির জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে বা বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য উদ্যোগী হলে রোনাল্ডসন সেই ব্যক্তি বা দলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে থাকেন। সগুরলেগু, হোলমস, বোরা প্রমুখ তাঁর বন্ধু।

রোনাল্ড—জানেন রামচন্দ্র রাও মশাই, আমেরিকানরা বড় খামখেয়ালী। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য যারা চেষ্টা করে তাদের সাফল্য কামনা করে আমেরিকানরা। তাদের সাফল্যে আনন্দিত হয়। কিন্তু আবার তারাই ফিলিপাইনের মানুষকে স্বাধীনতা দিতে চায় না। বিদেশে ক্রিশ্চান ধর্মের প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কিন্তু নিজেদের দেশে সেই খাতে কানা কড়িও খরচ করতে রাজি নয়। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু আবার ভরতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত যীশু-তুল্য গান্ধীজীর সম্পর্কে যা নয় তাই কুৎসা এখানে প্রকাশিত হয়। যতই বোঝান না কেন, যত বারই বলুন, প্রত্যেকটি শিক্ষিত আমেরিকানের কাছে ভারতবর্ষ একটি আজব দেশ। সেখানে যেন সবকিছুই সম্ভব। প্রত্যেক হিন্দু কবি যেন এক-একটি 'বেদান্ত' রচয়িতা। তাই প্রতি বছর বহু আমেরিকান ভারত-ভ্রমণে যায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে। গত বছর আমি এবং আমার মেয়ে এশিয়া ঘুরেছি। প্রথমে আমেরিকার মহাদ্বীপে ঘুরেছি। ইউরোপের কয়েকটি জায়গাতেও গেছি।

লিয়োনোরার মা ইটালিয়ান। তরুণ যুবক ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার রোনাল্ডসনের কাছে চিকিৎসা করার জন্য এসে, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি 'ম্যরিয়ানে' কাণ্টারবেলোরি ফিবিয়ানার মেয়ে, যিনি ওয়াশিংটনে ইটালির রাজদূত ছিলেন। মেয়ের হৃদ্‌রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি তাকে ডাঃ রোনাল্ডসনের কাছে নিয়ে আসেন। ধন্বন্তরী রোনল্ডসন দেহসম্পর্কিত হৃদয়ের রোগ সারিয়ে সেই হৃদয়ে মনসম্পর্কিত কাম রোগের উদ্ভব করান। ফেবিয়ানা দম্পতি তাদের ভালবাসার পূর্ণ সমর্থন জানান। রোনাল্ডসন দম্পতির চন্দ্রতুল্য সন্তান লিয়োনোরা।

লিয়োনোরা অপরূপা। স্বপ্নের মতো সুন্দরী। সুন্দর গান গায়। ল্যাটিন দেশবাসীর সৌন্দর্য সে পেয়েছিল। নর্ডিক জাতির লোকের মতো তার চুল।

তার চুলের রঙ সোনার মতো। নির্মল, স্নিগ্ধ, নীল চোখ তার। তৎকালীন আমেরিকান তরুণীদের মধ্যে সে অন্যতম সেরা সুন্দরী। আধ্যাত্মিক আলোচনায় অংশগ্রহণে তার প্রবল ইচ্ছে। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, বর্মা, জাভা, বালী, সিংহল প্রভৃতি দেশের ইতিহাস গল্প কবিতা পড়তে তার ভাল লাগে।

বাবা এবং মেয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে সর্বদা উদ্‌গ্রীব থাকতেন। ভারতের কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি আমেরিকায় গেলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানাতেন। রবীন্দ্রনাথ, মেহরবাবা, প্রেমানন্দ স্বামী, কৃষ্ণাজী তাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়ে ছিলেন। তারকনাথ, সুধীন্দ্র বোস, লাজপৎ রায় ইত্যাদি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে যেতেন।

ভারতের একটি সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে রামচন্দ্র রাও। তাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার এবং হার্ভার্ডে ভর্তি করে দেবার ইচ্ছা তিনি পোষণ করছিলেন।

৪। হার্ভার্ড

মহাসমুদ্রগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর অতি বিচিত্র। অত্যধিক দ্বীপ এতে আর সেই দ্বীপগুলোতে উৎপাদন হয় প্রচুর ফসল। পেঁপে, টম্যাটো, আলু, তামাক, আনারস, কাজুবাদাম ইত্যাদি। নির্মল আকাশের নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়ে সমুদ্রের জলে। সফেন সমুদ্রের জ্যোৎস্না করে খেলা। এদের জাহাজ ছুটে চলেছে।

ডাঃ রোনাল্ডসন রামচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর নিজের বন্ধুদের সঙ্গে। রামচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে তাঁরাও খুসি। প্রাণের কথার আদান-প্রদান হয় ওঁদের সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বোঝা গেল রামচন্দ্র দক্ষ। তাই লিয়োনোরা পরামর্শ দিয়েছিল বিদ্যুৎশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তার পক্ষে সেটাই নাকি সবচেয়ে ভাল হবে। উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে শুধু যে রামচন্দ্রের খ্যাতি বাড়বে তাই নয়, দেশেরও সম্মান বাড়বে।

জাহাজ থেকে রোনাল্ডসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও-সংবাদ পাঠিয়ে তাকে ভর্তি করবার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়ে গেলেন।

অর্জুন সিং এক চৈনিক কোটিপতির কর্মচারী। প্রশান্ত মহাসাগর সন্নিহিত দেশ সমূহে ব্যবসায়িক কারণে তার যাতায়াত ছিল। সেই সঙ্গে নিজের ব্যবসাও কিছু কিছু করত; থাকত সানফ্রান্সিসকোতে।

কিছুদিন পরে জাহাজ সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছাল। আমেরিকার পশ্চিম-দিকে এটি একটি বিখ্যাত বন্দর। পশ্চিমে অবস্থিত থাকায় সেখানে হাজার হাজার জাপানী এবং চৈনিক পরিবার বসবাস করত। প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজ এখানে আসে, এখান থেকে আবার পানামা হয়ে মেকসিকো এবং সেখান থেকে অ্যাটলান্টিকের পথ ধরে নিউইয়র্ক, বস্টন প্রভৃতি শহরে যায়।

রামচন্দ্র রাও, অর্জুন সিং, রোনাল্ডসন এবং তাঁর মেয়ে সবাই জাহাজ থেকে নেমে 'দি গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেল'-এ উঠল। হিন্দু এবং জাপানীদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আবার আমেরিকানদের সঙ্গে হিন্দু ও জাপানীদের পার্থক্য আরও বেশী। প্রতিটি পদক্ষেপে এই পার্থক্যের জন্য রামচন্দ্র অস্বস্তি বোধ করে। অর্জুন সিং রামচন্দ্রকে দুদিন হলিউড দেখিয়ে নিয়ে এল। সেখানে কতলোকের সঙ্গে দেখা। লক্ষ লক্ষ ডলার মাইনে পায় তারা। প্রতি বছর নতুন নতুন বিয়ে করে। বলিষ্ঠ সাহসী সুন্দর কলাশিল্পী আর হাস্যরসিকদের যেন মেলা বসে গেছে শহরের অলিতে-গলিতে উদ্যানে পথেঘাটে কারখানায়। মরুভূমি, মহাসমুদ্র, পাহাড়, নদী-নালা, তুফান, রৌদ্রছায়া, বরফের দেশ। হাজার হাজার বছরের পুরাতন কত কিছু প্রত্যহ সৃষ্টি হচ্ছে। আবার লয় পাচ্ছে। সৃষ্টির মায়া এখানে যেন প্রতিনিয়ত পরিদৃশ্যমান।

সেখান থেকে রেলযোগে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে ওরা এল নিউইয়র্ক শহরে। রামচন্দ্র তিনদিন রোনাল্ডসনের বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। লিয়োনোরার মা ইতিমধ্যে ইটালি থেকে ফিরে এসেছেন। লিয়োনোরা এবং তার মা সাগ্রহে রামচন্দ্রকে রোনাল্ডসনের চিকিৎসালয় এবং বাড়ি দেখিয়ে দিল। তাঁদের বাড়িতে একটি 'ভারতীয় মন্দির' রয়েছে। সেই মন্দিরে রয়েছে অসংখ্য ভারতীয় মূর্তি-প্রতিমা প্রভৃতি। এছাড়া সে বাড়িতে আছে চীনের, গ্রীসের এবং ঈজিপ্টের একটি করে বিভাগ। একটি

বিরাট ঘর ভরে রয়েছে বিচিত্র ছবি ও সুন্দর জিনিসপত্রের সংগ্রহ দিয়ে। নারায়ণ রাওয়ের কথামত শ্বশুরের পাঠানো দশ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রাপ্ত ডলার রোনাল্ডসন তার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন।

রামচন্দ্র রাওকে বি. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করে রোনাল্ডসন তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাসহ তাকে নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন।

বহু শিক্ষার্থী শুধু রাহা খরচ সংগ্রহ করে আমেরিকায় যায় এবং চাকরি করে লেখাপড়া শেখে। আমেরিকা অত্যন্ত ধনী দেশ। তাই সেখানকার জিনিসপত্রের দাম ইংলণ্ডের চেয়েও বেশী। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় জিনিসের দাম ইংলণ্ডে বেশী আবার ভারতের চেয়েও ইউরোপের বহুদেশে জিনিসের দাম বেশী। তাই বিদেশী শিক্ষার্থীরা সেখানে হোটেলে কাজ করে অথবা সিনেমার দর্শকদের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে কিছু রোজগার করে। আবার সুযোগ পেলে গ্রামে গিয়ে খেতখামারের কাজ করেও টাকা রোজগার করে। কিছু কিছু শিক্ষার্থী অবশ্য শ্রীরামতীর্থ এবং বিবেকানন্দ ছাত্রবৃত্তি পেয়ে থাকে। আমেরিকায় যেসব ভারতীয় শিক্ষার্থী থাকে, তারা আমেরিকানদের কাছ থেকে কিছুটা খাতির পায়, কিন্তু তারা আমেরিকার নাগরিক কিছুতেই হতে পারে না। ওদের দেশে ভারতীয় ব্যবসা করুক, ওদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরুক বা বক্তৃতা দিক তাতে ওদের কোনো আপত্তি নেই বরং তাতে খুসিই হয়।

আমেরিকা প্রবাসী তেলুগুদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বঙ্গল শিবরাম, রাজনীতিতে পি-এইচ. ডি. ওখানেই পেয়েছেন। পরবর্তীকালে উনি কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বাম্পিমিত্তু মশাই সেখানে কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ভারতে ফিরে এসে কৃষিসংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন।

এল্লাপ্রোগডা সুব্বারাওয়ের সাক্ষাৎ রামচন্দ্ররাও পেল হার্ভার্ডে। মাদ্রাজের এল. এম. এস. ডিগ্রী পেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে উনি হার্ভার্ডে এসেছিলেন। এখানে উনি আরও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অধ্যয়ন তাঁর কাছে ছিল ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়ের মতো। কে জানে কবে উনি ভারতে ফিরবেন। আচার্যের সহযোগিতায় তিনি বায়ো-কেমিস্ট্রির বহু নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটন করে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন করেছেন।

রামচন্দ্র রাওয়ের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতরা আশ্চর্য হলেন। গণিতশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত কমিংস পর্যন্ত রামচন্দ্র রাওয়ের প্রতিভার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

৫। গভীর বন্ধুত্ব

নারায়ণ রাও মাদ্রাজে বি. এল. শ্রেণীতে ভর্তি হল। টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেটের সে একজন ভাল খেলোয়াড়। ল কলেজের অন্ধ্র ছাত্ররা তাকে তাদের সংস্থার সম্পাদক নির্বাচন করল। নারায়ণ রাওয়ের অনুরোধে তার পরম বন্ধু পরমেশ্বরও মাদ্রাজে রয়ে গেল। আলমও সব সময় তাদের সঙ্গে থাকে।

চিত্রকলার সঙ্গে খাপ খায় এমন কোনো চাকরি পরমেশ্বর পেল না। তবে বিশ্বদাতা নাগেশ্বর রাও তাকে অন্ধ্র পত্রিকা অপিসে একটি কাজ দিলেন। ভারতী পত্রিকায় গল্প এবং কবিতা লিখতে আর প্রত্যেক দিন দু ঘণ্টা করে ছবি আঁকার চর্চা চালিয়ে যেতে নারায়ণ রাও তাকে পরামর্শ দিল। সবাই যেন রেষারেষি করে তাকে সাহায্য করতে এল। নারায়ণ রাও পরমেশ্বরের সঙ্গে মিশে অবকাশের মুহূর্তগুলিতে বড় সুন্দর ছবি আঁকতে লাগল।

পরমেশ্বর মূর্তির বাবা ভেঙ্কটরমন মূর্তি মুন্সেফী করে অবসর গ্রহণ করেছেন। বিরাট পরিবার। ফলে বেশি টাকা তিনি জমাতে পারেন নি। মেয়ের বিয়েতে ছ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। ঘুষের কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। আজ সরকারী পেনশন ছাড়া আয়ের অন্য কোনো পথ তাঁর নেই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তিনশো টাকা মাসিক আয়ের অঙ্কটা খাওয়াদাওয়া, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো এবং বুড়ি মায়ের চিকিৎসার পেছনেই খরচ হয়ে যেত। বড় তিনটি ছেলে চাকরি করলেও তাদের মাইনের টাকা ঘরে খুব কমই আসে। ধারের কথায় ভেঙ্কটরমন মূর্তি কেঁপে উঠতেন। বরং না খেয়ে থাকবেন তবুও কারো কাছে ঋণের জন্য হাত পাততে প্রস্তুত নন তিনি।

বড় ছেলে বরদরাজলু বি. এল. টি. বিশাখপত্তমের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দ্বিতীয় ছেলের নাম রঙ্গনাথ রাও। মহাকষ্টে স্কুল ফাইনাল পাশ করে বাবার সুপারিশে পেদ্দাপুরাম মুন্সেফ কোর্টে কেরানীর চাকরি পেয়েছে সে। সে বেজায় ঘুষখোর। ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ ভালভাবেই আছে। তৃতীয় ছেলে বি. এ., বি. এল। শিক্ষানবিশির পাঠ চুকিয়ে এখন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। কিন্তু দৈনিক দশটাকাও রোজগার করতে পারে না। বাবার প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে এখন সে মুন্সেফ হবার চেষ্টায় আছে। পরমেশ্বর মূর্তি হল চতুর্থ ছেলে। ওর পরের বোনের নাম উমা। তারপর দুই যমজ ভাই, রামা রাও এবং লক্ষ্মণ রাও। সেই জন্যই তিনি পরমেশ্বর মূর্তিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অন্য কোথাও থাকলে তাকে কোনো রকম সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। বাড়িতে থাকলে যা হোক দুবেলা দুমুঠো খাওয়াতে পারবেন।

পরমেশ্বর নারায়ণ রাওয়ের চেয়ে দু বছরের বড়। মহাত্মা গান্ধীর ১৯২১ সালের সত্যাগ্রহের সময় সে এক বছরের জন্য জেল খেটেছে। তার বয়স তখন উনিশ। বি. এ. পড়ছিল। কারাবাসকালে নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বরের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীরতর হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তাদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হল। মনে হল পৃথক দুটি দেহ হলেও আত্মা এক। পরমেশ্বর ১৯২৪ সালে বি. এ. পাশ করল।

নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর উভয়েই সর্বকলায় দক্ষ, নারায়ণ রাও খুব বুদ্ধিমান। পরমেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের চেয়েও সৃজনীশক্তি বেশী। আর নারায়ণ রাওয়ের কলার চেয়ে বুদ্ধি ছিল বেশী। নারায়ণ রাও কোনো কিছু একবার দেখেই বুঝে নিত। কঠিন কঠিন সমস্যাকে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারত। ভাল বক্তৃতা করতে পারত। নারায়ণ রাওয়ের স্মরণশক্তিও বেশী। তার জ্ঞানপিপাসা কোনো একটি বিষয়ে সীমিত ছিল না, প্রতিটি বিষয়ে গভীর আগ্রহ তার। 'রমন এফেক্ট'-এ তার যতখানি আগ্রহ অন্ধ্রের ইতিহাস জানার আগ্রহও তার চেয়ে কিছু কম নয়। নিউটন, আইনস্টাইন, এডিসন, কণাদ, নাগার্জুন প্রভৃতির সঙ্গে তার পরিচয় গভীর এবং স্বচ্ছ।

নারায়ণ রাওয়ের মত পরমেশ্বরের অগাধ জ্ঞান ছিল না। তবে উভয়েই

রসজ্ঞ। পরমেশ্বরের মধ্যে কলার প্রভাব ছিল বেশী, উভয়ই সুন্দরের উপাসক বলা চলে, জ্ঞানপিপাসুও বটে। তবুও জ্ঞানের ব্যাপারে পরমেশ্বর যদি হয় তড়াগ তবে নারায়ণ ছিল সমুদ্র। তাদের মধ্যে এটাই হল বড় পার্থক্য।

নারায়ণ রাওয়ের হৃদয় ছিল ভাবগম্ভীর আর পরমেশ্বরের হৃদয় আয়নার মতো। সে কোনো কিছু লুকোতে পারে না। তার জ্ঞান সর্বমুখী। তার জন্মরাশি বুধ। পরমেশ্বর লতার মতো কোন বুদ্ধিমান বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখত। বন্ধুবিহীন হয়ে সে বাঁচতে পারবে না এই ছিল তার দৃঢ় ধারণা। ধ্যানমগ্ন হয়ে সে অনেক ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে পারে। কোন ব্যাপারে পেছিয়ে পড়া তার স্বভাব নয়। জেলে যাবার সময়ই তার পরিচয় পাওয়া গেছে। গোদাবরীতে সে মাইলের পর মাইল পানকৌড়ির মতো দ্রুত বেগে সাঁতার কাটতে পারে।

পরমেশ্বরের মনটা ননীর মতো নরম। মেয়েদের মতো সে চট করে পরের মনে নিজের স্থান করে নেয়। নানান ধরনের গান সে গাইতে পারে এবং অভিনয়ে সে দক্ষ। নারী চরিত্র অভিনয়ে সে মহিলা শিল্পীদেরও হার মানায়। দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি তার মোহ নেই। সবকিছুকেই সে ক্ষণ-ভঙ্গুর ও সাময়িক মনে করে। আর সদাপ্রফুল্ল মানুষটি।

যাদের সঙ্গে মনের মিল নারায়ণ রাও কেবল তাদেরই ভালবাসে। পরমেশ্বর কিন্তু সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু সকলকে সে মন উজাড় করে দিতে পারে না, অপর পক্ষে নারায়ণ রাওয়ের প্রেম অনির্বাণ শিখার মতো আজীবন জ্বলে। পরমেশ্বর যাকে তাকে ভালবাসে। অপর পক্ষ ভুলে গেলেও সে ভোলে না।

নারায়ণ রাওয়ের ভালবাসার পাত্র হতে পেরে পরমেশ্বর ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। চোখ বগড়ে সে মাঝে মাঝে নারায়ণ রাওয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। নারায়ণ রাও সামনে দাঁড়ালেই তাকে যেন স্বপ্নে দেখার মতো মনে হয়। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বউ প্রায়ই ঠাট্টা করে তাকে বলে, "নারায়ণ রাও তোমার ভাই, না স্বামী, না বউ!"

৬। কবিতা

নাগেশ্বর রাও মশাই ভারতী পত্রিকা থেকে পরমেশ্বর মূর্তিকে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া শুরু করলেন। সে সস্ত্রীক মাম্বলমে থাকতে লাগল। ঘি আসে রাজমহেন্দ্রবরম থেকে। আর নারায়ণ রাও মাঝে মাঝে এসে, "বাবা কোত্তা-পেটা থেকে পাঠিয়েছেন" বলে ডাল তেল নুন এসব দিয়ে যায়। রুক্মিণীকে শহর অথবা সিনেমা দেখানোর অবকাশ যেদিন থাকে, নারায়ণ রাও সেদিন নিজের গাড়ীখানা দিয়ে দেয়। নারায়ণ তাকে একটি ভাল ঘর ভাড়া নিতে বলল। ঘরের উপযুক্ত খাট, পালঙ্ক থেকে শুরু করে যাবতীয় আসবাব নারায়ণ রাও নিজেই কিনে দিল।

রাজারাও যখন সময় পায় তখন সে হয় পরমেশ্বরের ওখানে যায়, নয়তো পরমেশ্বরকে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে। অথবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে। সে কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে নারায়ণ হয় তাকে তার গাড়ী নিয়ে যাবার জন্য বলতো, নয়তো নিজেই গাড়ী করে পৌঁছে দিত। রাজারাও, আলম, পরমেশ্বর মূর্তি এবং নারায়ণ এরা পরস্পর পরস্পরের পরম সুহৃদ্।

পরমেশ্বর সমকালীন কবিদের কবিতা ধীরকণ্ঠে আবৃত্তি করত। বহু সভাতেও সে আবৃত্তি করত। নিজেও কবিতা, গান এবং গল্প লিখত। তার লেখা ভারতীতে প্রকাশিত হত। একবার একটি গান লিখে নারায়ণ রাওকে সে শোনাল :

কোথায় যাচ্ছ বাওয়া তুমি !
কোথায় তোমার গ্রাম
নেই কো নগর, নেই মহল্লা
গোটা দেশ যে তোমার···

কোথায় যাচ্ছ বাওয়া···

পরমেশ্বর গান গাইবার সময় হঠাৎ রাজারাও সেখানে এসে হাজির। গান শেষ হতেই আলম ঢুকল। পরমেশ্বরকে আবার গাইতে বলল। তার

অনুরোধে পরমেশ্বরকে আবার গাইতে হল। গাঁয়ের মানুষের জীবন তাদের মানসচক্ষে ভেসে উঠল।

ভিক্ষে করে যারা জীবিকা অর্জন করে যুগ যুগ ধরে তারা ভিক্ষেই করে আসছে। জঙ্গম, বুড়বুক্কল, বৈরাগী গান্ধীরেড্ডী, দাসরিওয়াড়ী, কম্মাদাসারেলু, কোয়ওয়ারু, এরুকল, মন্ত্রগাড়ুলু, আড়ায়িচাঞ্চুলু রামদাস, য়ানাদি, ভাগাওয়া-তুলু, নুনাপাড্ডেলাওয়ারু, আম্মাওয়ারি, দেওয়ারুলু, দামুলু, তোনবোম্মালা-ওয়ারু, দম্মারি ওয়াড়ালু, সঞ্জল ওয়ারুলু, কাশিপরমল ওয়ারুলু, ভটরাজুলু, বিবি মোচারালু, গঙ্গানম্মা, ভক্তজঙ্গালু ইত্যাদি নানান শ্রেণীর ভিক্ষুকরা আমাদের দেশে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

রাজা—আমাদের দেশে ভিখিরিদের সংখ্যা কোটিতে পৌঁছাবে।

নারায়ণ—আমি তা স্বীকার করি না।

আলম—আমিও না।

নারায়ণ—জানতে চাও কারণটা? যুগ যুগ ধরে এদের দিয়ে আমাদের মনোরঞ্জনের কাজ, ওঝার কাজ, চিকিৎসা ইত্যাদি কত রকমের কাজ করিয়েছি।

রাজা—তাহলে তুমি ভূত প্রেতে বিশ্বাস কর?

নারায়ণ—আমি ভিখিরিদের ইতিহাসের কথা বলছি, নিজের ভূত বিশ্বাসের কথা নয়। শোনো, এরা আমাদের উপকার করে নিজেরা উপকৃত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এদের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। জঙ্গমদের বোব্বিলি কথা, দেশিঙ্গিরাজু কথা, সর্বায়পাপর কথা, বালনাগাম্মা কথা, মরাঠী কথা, ছেন্নাইয়া রেড্ডী কথা, কামাম্মা কথা সবতো আমরা শুনেছি। কত সুন্দর এবং চমৎকার। শ্রোতারা কত আনন্দ পায়।

আলম—আমাদের ধর্মই সবসময় দান করার প্রেরণা দেয়।

রাজা—আমাদের দেশ গরিব। তবু দারিদ্র্য যেন ওদের এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায় না।

পরমেশ্বর—কী করে ছাড়বে? ওদের জীবিকার অন্য কোনো পথ তো খোলা নেই। ওদের কি আর ভিক্ষে করতে ভাল লাগে? গান শুনে আনন্দ পেয়ে ওদের এক মুঠো করে ভিক্ষে দেওয়া হয়, এই তো!

রাজা—তুমি যা বলছ তা যখন ওরা দেয় না, তখন?

পরম—কিছু-না-দিয়ে-ভিক্ষে-করা লোকের সংখ্যা খুব কম। যারা করে, তারাও গোড়ার দিকে কিছু না কিছু করেছে।

রাজা—আমি যা বলছি তোমরা কেউ বুঝতে পার নি।

নারায়ণ—বুঝতে পেরেছি, তুমি বলতে চাইছ, ওরা যা দেয়, তা দেওয়া না-দেওয়া সমান। আমাদের মত গরিব দেশের পক্ষে এরা বোঝাস্বরূপ! তাই এদের উচিত ভিক্ষে করা ছেড়ে দেওয়া, এই তো তুমি বলতে চাও?

রাজা—ঠিক তাই।

নারায়ণ—এই ভিখিরিদের তুমি কাজ পাইয়ে দেবে?

রাজা—আমিও তো তাই বলছি এদের এই ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

নারায়ণ—সেটাই তো আসল কথা। প্রশ্ন হচ্ছে পাগলামি না ছেড়ে গেলে বিয়ে হবে না। ব্যাপার হল বিয়ে না হলে পাগলামি ছাড়বে না। খেতখামার থেকে শুরু করে মিল ফ্যাক্টরি পর্যন্ত সর্বত্র লোকের ভিড়। ওদেরই অনেকে বেকার। তার উপরে এই ভিখিরিদের পুছছে কে! অনেক ধর্ণা দিয়ে একটা কাজ পেলেও খুব জোর ছমাস চলে। তারপর বসে আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হয়। এই যখন অবস্থা তখন ঐ ভিখিরিদের আবার কাজে ঢোকালে, যারা কাজ করছে তাদের দুবেলাই কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ বর্তমানে যারা চাকরি করছে তাদের সংখ্যার চেয়েও ভিখিরিদের সংখ্যা কম নয়।

রাজা—সে কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু প্রশ্ন হল আমাদের দেশে অনেক জমি এমনি পড়ে রয়েছে। চাষ-আবাদ হয় না। ঐ জমিতে তো ফসল ফলানো যায়।

নারায়ণ—যে জমির কথা বলছ তার তিন-চতুর্থাংশ চাষ-যোগ্য করা যেতে পারে। বাকি সব পাহাড় জঙ্গল আর মরুভূমি।

রাজা—যাক তিন-চতুর্থাংশ জমি আছে তো?

নারায়ণ—আছে, তবে সেটাকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য যে হাজার হাজার টাকা খরচ করা দরকার তা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? আজকাল সরকার তা দিতে পারে না। আর কোটিপতিদের সংখ্যা নিতান্তই কম। যে কজন আছে তারাও দিতে পারে না। দেশের সর্বত্র টাকা-পয়সার বড্ড অভাব।

রাজা—তাহলে তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাও যে ভিখিরিরা শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করে, আর শ্রমিকদের ভিক্ষেতেই ওরা বেঁচে আছে।

নারায়ণ—তা তো বটেই, ধনীদের ভিক্ষেতে ওদের কদিন চলে?

রাজা—আমাদের দেশের মহিলাদের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব যতদিন না পড়ছে ততদিন আমাদের ভিখিরিদের কোনো ভয় নেই। আর প্রভাব পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে এতদিনের ঐতিহ্য চট করে নষ্ট হবে তাও নয়।

পরম—তোমরা দুজনে যাই বলো না কেন ভিখিরিরাই কিন্তু শিল্পের অঙ্গ। ওদের মধ্যে যতখানি রসবোধ রয়েছে আমাদের মধ্যে ততখানি নেই। ওদের মধ্যেই রয়েছে বড় বড় চিত্রশিল্পী। রামদাসদের মধ্যে রয়েছে বড় বড় গাইয়ে আর জঙ্গমদের মধ্যে গল্পকার। আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এইসব শিল্পকলাকে পুনরুজ্জীবিত করা। প্রয়োজন হলে লোকশিল্পকে সাধারণের শিক্ষার বিষয় করে দেবার জন্য বিদ্যালয় খোলা।

রাজা—এই রে! পরমেশ্বর স্বপ্ন দেখছে।

নারায়ণ—ভিখিরিদের সম্পর্কে চিন্তা করে, এই ধর্মপ্রধান দেশে ধন-সম্পত্তি কীভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত? আমাদের দেশে রাশিয়ার পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। সব ব্যবস্থাই বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আমাদের দেশ আধ্যাত্মিক দেশ; তাই রাশিয়ার পদ্ধতি চলবে না। কৃষিপ্রধান হলেও আরও বহু কারণে সে পদ্ধতি অচল। যে পদ্ধতির ফলে আত্মার বিকাশ ঘটে না সে পদ্ধতি অচল—এটাই ভারতের ধর্মবাণী। জাপান পাশ্চাত্য দেশকে অনুকরণ করেছে। তুর্কী করেছে। সেইপথে চলেছে। গত দেড়শো বছর ধরে আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইংজেকশন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তবু আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি।

নারায়ণ ভাবতে ভাবতে চোখ রগড়ে বিড় বিড় করে বলল, "হে ভারত মাতা! তুমি কবে মুক্তি পাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্ধন থেকে?"

পরমেশ্বর বলল, "কি হে, কী চিন্তা করছ? আলমও অনেকক্ষণ নীরব। কই আমার গান সম্পর্কে কিছু বললে না তো? কত করে লিখেছি, কোকিলকণ্ঠে গেয়েছি, তবু তোমরা মন্তব্য করবে না?" আলম হাসতে

হাসতে বলল, "আক্ষেপ কোরো না। আমি তোমাকে প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি ওমর খৈয়ামের সঙ্গে তুলনা করছি।"

নারায়ণ বলল, "ড্রাইভারকে বলেছি গাড়ী আনতে। নাও একটু কফি খাওয়া যাক। রাজারাও তো আবার সিগারেট খায় না। আমি থ্রি-ক্যাসেল ধরাই। একটু সিনেমায় যাওয়া যাক। সুব্বাইয়া, কফিটা নিয়ে এসো তো।"

আলম—আমার কিন্তু পরোটা আর ডিম চাই।

পরম—নারায়ণ আর কেন, এর গলায় একটা পৈতে ঝুলিয়ে দাও। তা না হলে ঠাণ্ডা করা যাবে না।

আলম—আমি তো আবার ভাবছি তোমাদের সবাইকে মুসলমান করে ফেলব।

নারায়ণ—তেলুগু এবং তামিল মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের যখন কোন বিরোধ নেই, তখন তোমাকে হিন্দু বলব না কেন!

৭। জগন্মোহন রাও

শ্রীরাজা কব্বুরী বসবরাজ, শ্রীজগন্মোহন রাও বাহাদুর গঞ্জাম জিলার নারিকেল বলমের জমিদার। নারিকেল বলম বহরমপুর থেকে সামান্য দূরে। তার জমিদারি শুধু দশটি গ্রাম নিয়ে। মাসিক আয় তিন হাজার টাকা। কিন্তু জগন্মোহন রাও খুব দিলদরিয়া মানুষ। তার মতে টাকা এক জায়গায় সঞ্চিত হয়ে থাকা অনুচিত। অর্থ হল গতিশীল; বারবনিতা, শুঁড়ি, জুয়াড়ী আর বন্ধুবান্ধবরা তো টাকাপয়সার ক্ষেত্রে গতিসঞ্চারের জন্যই বিখ্যাত। এঁদের অবর্তমানে অর্থের অবস্থা স্থিতিশীল অর্থাৎ নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু। এই হল মোটামুটি জগন্মোহন রাওয়ের অর্থনৈতিক ধারণা। তার মতে শ্যাম্পেন-ব্রাণ্ডি ছাড়া বিশ্বসৌন্দর্যের যথার্থ অনুভব অসম্ভব। সিগারেট জ্ঞানের দরজা খুলে দেয় আর তার দৌড়কে দীর্ঘায়িত করে। আর বার-নারীদের প্রোৎসাহিত করা এবং লালন-পালন করার মধ্যেই ললিতকলার সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে।

কেউ যখন বলে যে তার জমিদারির প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকদের কল্যাণ সাধন তখন সে গগনফাটা হাসি হেসে বলে, "তাই যদি হবে তাহলে সরকার জমিদারি পদ্ধতিকে বহাল রাখবে কেন। রায়তদারিই থাকত তাহলে। সুতরাং জমিদারের কর্তব্য হচ্ছে নিজের মর্জিমত জমিদারি চালানো। ঋণ-গ্রস্ত হলেই বা জমিদারি নষ্ট হতে যাবে কেন? জমিদারি তো আর শাশ্বত বস্তু নয়। যদ্দিন আছে তদ্দিন তার মজা লুটেপুটে নিতে হবে। তাতে যদি সেটা বেহাত হয় তবু কুছ পরোয়া নেই। জমিদারি নামক এই বস্তুটির রস চিরদিন একজনই বা ভোগ করবে কেন? জমিদারি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে আইন জারির প্রয়োজনটা কোথায়? চিন্তাশীল এই জমিদারপুঙ্গব এক একটি প্রশ্নের জন্ম দেন আবার পরক্ষণেই এই ধরনের সদুত্তর খুঁজে বার করতেও তার দেরি হয় না। যে সব নির্বোধ জমিদারির সমুদ্র থেকে আনন্দ অমিয় মন্থন করে নিতে অক্ষম তারাই অন্যদের বিলাসিতা আর কামুকতার অপবাদ দেয়। আমি হলাম সহস্র নারীবেষ্ঠিত-গোপীকৃষ্ণ।" ইত্যাকার ভাবনায় উদ্বেল মন নিয়ে জগন্মোহন বিশাখপট্টনমের নিজস্ব বাংলো থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমান গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়ি ছুটে চলল এবং অবশেষে মাকৃলী জেমস নামক একজন ফিরিঙ্গি সাহেবের বাড়ির কাছে থামাল।

জগন্মোহন রাওয়ের গায়ের রঙ পীতাভ-গৌর। ছিপছিপে চেহারা, লম্বা মুখ। ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ। ছোট্ট কান। ছুঁচলো চিবুক। চুলগুলো সামান্য একটু লালচে। মাথাটা উঁচু। সব মিলিয়ে লোকটাকে দিব্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে। জমিদারী আদবকায়দা পুরোমাত্রায় মেনে চলে সে। মনে-মেজাজেও খাঁটি জমিদার। ইংলণ্ডের বড় বড় লর্ডের মতো জীবনধারা তার পছন্দসই। ডেমলার কার, পিয়ানো, ঘোড়দৌড়, উপযুক্ত একটি আরবী ঘোড়া। মাসিক পঁচাত্তর টাকার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি। গ্রীষ্মে উটি যাত্রা, গলফ, ইংরেজী ড্যান্স, আর পাশ্চাত্য বেশভূষা—এইসব হচ্ছে তার আদবকায়দার প্রধান অঙ্গ।

অগস্ট মাসে সেই সন্ধ্যায় ডেমলার গাড়ি থেকে নেমে ম্যাকলিন জেমসের বাড়ির দিকে যাবার পথে জেমস ভগ্নি ডায়না জেমসের সঙ্গে তার সামনাসামনি দেখা। তাকে দেখে জগন্মোহন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চুম্বন করল।

—মোহন, আজ একটু দেরি হল কেন? তুমি যে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়মত আসতে, ডার্লিং!

—একটু কাজ ছিল, তাই। প্রিয়তমা ডায়না, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার অধরসুধা কখন যে পাব এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে এক-এক যুগের মতো সুদীর্ঘ প্রতিটি মিনিট কাটিয়ে ছুটে এসেছি মাদ্রাজ থেকে। পাখির মতো উড়ে এসেছি আমি।

—বাব্বিল কাপে তোমার ঘোড়া তৃতীয় হয়েছে শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে টেলিগ্রাম করেছি। আগামী বছর গভর্ণরস্ কাপে তোমার ঘোড়া নিশ্চয় প্রথম হবে।

—ঠিক বলেছ। গভর্ণরস্ কাপে হ্যাপী-ওয়ারীয়র নামে যে ঘোড়াটা জিতেছিল আমি তার সওয়ারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে এসেছি। বিখ্যাত রেস্তনাল্ডস্‌কে বলেছি ঘোড়াটাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। চলো ডায়না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

আবার আলিঙ্গন এবং ঠোঁটে, চোখে, গলায় এলোপাতাড়ি চুম্বন। সবেমাত্র তারা গাড়ীর ভেতর বসছে এমন সময় জেমসের মা এসে বললেন, 'বেড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!'

জেমস্ এখনো বিয়ে করে নি। বাড়িতে তার মায়েরই কর্তৃত্ব। সে-ই ডায়নার সঙ্গে জগন্মোহনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং পরিচিতিকে আরো গভীর এবং গাঢ়তর করে তোলার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করেছে। জগন্মোহন ডায়নাকে মাসে মাসে দু'শো করে টাকা দিত। তাছাড়া নানা ধরনের ভেট বা উপহার সবকিছু মিলিয়ে বছরে তিন-চার হাজার টাকা ডায়নার পিছনে খরচ হত। ডায়না সুন্দরী। গায়ের রঙ দুধে আলতা। হাতীর দাঁতের মতো চিক্কণ-মোলায়েম তার দেহ। মধুক্ষরা অধরোষ্ঠ লালিমাময় লালিত্যে ভরা। ছোটখাটো হলেও গড়নটি চিত্ত-হারী। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা তাকে বলত,—'রূপসী।' সাঁতারে, টেনিসে আর ভলিবল খেলায়, বেহালা বাজানোয় আর নৃত্যে পটিয়সী মেয়ে। ওয়াল্টেয়ারে খ্রীষ্টমাস উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনীত নাটকে সে নায়িকার অভিনয় করে। ডায়না সুকণ্ঠি, সুগায়িকা। ওয়াল্টেয়ার এবং বিশাখপট্টনমে ইউরোপীয়ান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এমন কোন যুবক ছিলনা

যে তাকে মনে মনে কামনা করত না। কিন্তু ডায়না পছন্দ করেছে জগন্মোহন রাওকে।

তাদের গাড়ি সিমহাচলমের রাজপথ ধরে নলমন্তা প্রভৃতি গ্রামকে পিছনে ফেলে ভিমনিপট্টনমে পৌঁছাল। গাড়ি থেকে নেমে সমুদ্রতীরে গিয়ে বসল তারা। সেই অন্ধকারে সাগর সংগীত শুনতে শুনতে নিজেদের হারিয়ে ফেলল ওরা।

হাসি মুখে কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পরে আবার এসে তারা গাড়িতে বসল। বিশাখাপট্টনম পৌঁছানোর আগে ওয়াল্টেয়ারে রোজরিয়ো নামক এক গার্ডের বাড়িতে গিয়ে গার্ড দম্পতি এবং তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করল তারা। সেদিন জেমসের বাড়িতে জগন্মোহনের নেমন্তন্ন ছিল। জগন্মোহন গোরুর মাংস ছাড়া আর কোনো মাংস পছন্দ করে না। ম্যাকৃলীন নিজের প্রিয়তমা—রোজারিয়োর মেয়ে এবং তার মা-বাবাকেও নিমন্ত্রণ করেছিল। ওদের জন্য ম্যাকৃলীন এবং তার মা অপেক্ষায় ছিল।

জেমস ম্যাকৃলীন তার বাড়ির বারান্দায় রঙ্গিন ছবি, বাঘের মাথা, সড়কি, তীর প্রভৃতি টানিয়ে রেখেছিল। দামী দামী গদি-আঁটা চেয়ার আর টেবিল, টেবিলের ওপর ফুলেভরা চীনে মাটির ফুলদানি সাজানো। বারান্দার দুই প্রান্তে সুন্দর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা ছিল। যথাকালে সবাই চেয়ারে আসীন হল। রোজারিয়ো সাহেব মেল ট্রেনের একটি ঘটনার কথা বিস্তারিত ভাবে ডায়নার দিকে ফিরে হাসিমুখে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। ডায়নার মা এবং শ্রীযুক্তা রোজারিয়ো পরস্পরের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছিলেন। ওদের কথা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। জেমস নিজের প্রিয়তমা ফ্রান্সিসকে নিয়ে বাগানের দিকে গেল। দু-চার পা এগিয়ে প্রেমিক সুলভ সুরে বলল, "আমি তোমাকে আমার হৃদয় দিয়েছি, এখন তোমার ইচ্ছামত তুমি যা করতে চাও করো।" এদিকে জগন্মোহনের চোখ নিবদ্ধ ডায়নার চোখে। তন্ময় হয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে দেশীয় খ্রীশ্চান বাটলার এসে দুজনকে এক-এক গ্লাস আঙুরের রস ঢেলে দিয়ে গেল। ধীরে চুমুক লাগাল ওরা তাতে।

ডায়না ভিতরে গেল খাবার সময়ের পোশাক পরার জন্য। জগন্মোহনও একটা চামড়ার স্যুটকেসে করে কাপড় চোপড় এনেছিল। সেও গেল

পোশাক বদলাতে। রাত নটা নাগাদ বিস্তৃত ভোজনকক্ষে বিরাট এক টেবিল ঘিরে সবাই বসে পড়ল। মোমবাতি জ্বলছে। খাবার সময় কাপড় যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য সবাই কোলে ন্যাপকিন বিছিয়ে নিয়েছে। প্রথমে সুপের সদব্যবহার হল। তারপর এল বাঁধাকপি আর মুরগীর মাংস! মাঝে মাঝে লেমোনেড কিংবা শ্যাম্পেন।

সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়া শেষ হল। এর পরে হরেক রকম মদের ফোয়ারা ছুটল। জগন্মোহন ডায়নাকে অনুরোধ করল পিয়ানো বাজাতে। তারপর ওরা গেল সংগীতকক্ষে। ডায়না পিয়ানো বাজিয়ে গান ধরল। পরের গানটি গাইল ফ্রান্সিস। পিয়ানো অবশ্য ডায়নাই বাজাল। পাশ্চাত্য সংগীত সভায় সংগীত পরিবেশনার দিক থেকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সুনাম আছে। নাচগানে বাজনা দিয়ে তারা আনন্দোৎসব করে।

পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় সংগীতের স্রোত এক। তবু ভারতীয় সংগীত পৃথক পথে চলার ফলে উন্নত হয়েছে। সেই পথেই পাশ্চাত্য সংগীত কিছুকাল চলে থেমে গেল। তখন জার্মান জাতি তাকে পুনর্জীবিত করে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করল।

ভারতীয় ঐতিহ্য রাগ এবং তালের সমৃদ্ধি সাধন করেছে। পাশ্চাত্য করেছে শ্রুতির। ওদের কাছে শ্রুতিই মুখ্য, শ্রুতিই সব কিছু। তাই তারা দু-তিনটি মাত্র রাগ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সংগীতে রাগ অনেক, তাল বহু।

৮। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সান্নিধ্য

জগন্মোহন রাও ভারতীয় সংগীতে আনন্দ পেত না। পাশ্চাত্য সংগীতও তার মনে সাড়া জাগাতে পারত না। লোক দেখানো এবং বনেদীয়ানা রক্ষার জন্য গান শোনার ভান করতে করতে নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকত। কোনো তরুণী গাইলে তবেই সে গান শুনতে যেত। আর বসে বসে নায়িকার অধর কণ্ঠ এবং বক্ষের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। লোকে কিন্তু মনে করত জগন্মোহন রাও খুব বড় সংগীত রসিক।

ডায়না যতক্ষণ গান গাইছিল ততক্ষণ সে তার সুদীর্ঘ গলা এবং সুন্দর

চুলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তাকে নিজের প্রিয়তমা হিসেবে পাওয়াকে সে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করত। তাকে বিয়ে করতে পারলে সে ধন্য হত। বয়সে তার চেয়ে দুবছর বেশি হোক ক্ষতি নেই। ঐ ধরনের বিয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু হয়। প্রকৃত সভ্যতা ওদের মধ্যেই আছে। ওদের ধারায় যারা জীবন কাটায় তাদের আর সৌন্দর্যের অভাব কী? অনেকে এই বলে তার নিন্দে গাইত যে সে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে সে যদি ইংলিশ-মহিলাদের চেয়েও ভাল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে গ্রহণ করতে আপত্তিটা কী? মাদ্রাজে মেয়েটি লেখাপড়া শিখেছে। এটা ঠিক যে ওর মা কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাকে বোঝাতে তার কতক্ষণ লাগবে। সেও চায় যে জমিদারদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠুক। ইংলণ্ডের কুলি এদেশের জমিদারদের সমকক্ষ, এদেরই সমগোত্রীয় হচ্ছে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা। এই অবস্থায় মায়ের কী আপত্তি থাকতে পারে? ব্রাহ্মণদের চেয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সব দিক থেকে বড়। ডায়না কতই না খুশী হবে। সে সুন্দরী, অপ্সরী, আমার প্রিয়তমা পত্নী, জমিদারির রাণী, আমার ঘরের মহারাণী। ওকে দেখে লোক ধন্য হবে। পিসিমাও সাদাসিধে মানুষ। আমি সারদাকে বিয়ে না করার ফলেই এক গেঁয়ো অকর্মা-ঢেঁকির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হল বলে তিনি হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সুন্দরী এই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেললে গোড়ার দিকে দু'-চার কথা শুনতে হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে। আর ওঁর স্বামী! তাঁকে পোছে কে! তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন না অথচ লাঙলটানা একটা মোষের হাতে তাকে সঁপে দিলেন। এহেন লোক স্বীকৃতি দিল কি না দিল তার জন্য আমার মাথাব্যথা নেই।

সংগীত সমাপ্ত হল। রাত বারটা, ডায়না হাওয়াই নাচের রেকর্ড গ্রামোফোনের উপর চড়িয়ে জগন্মোহনকে নাচার জন্য আহ্বান জানাল। জেমস ও তার বাগদত্তাকে ডাকল। দুইজোড়া প্রেমিক পাশ্চাত্য নৃত্যে তন্ময় হয়ে গেল। পনেরো মিনিট একটানা নেচে ওরা এসে বসল আর সকলের মাঝে। ওয়াল্টস্ প্রভৃতি নাচ একজন পুরুষ আর একজন মহিলা মিলে মিশে নাচে, পুরুষ তরুণীর কোমরে হাত দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে নিজের অন্য হাতে তার হাত ধরে তালে তালে পা মিলিয়ে নাচে।

জগন্মোহন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মতো নাচতে পারত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাও তার সঙ্গে নাচার জন্য ছিল উদ্‌গ্রীব।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নেতা কর্নেল সিডনি কলকাতায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করছিল। "সারা দুনিয়ায় কোন জাতি যদি চরম দুরবস্থায় থাকে তো তা হচ্ছে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা। ভারতীয়রা আমাদের কাছে ঘেষতে দেয় না। আর পাশ্চাত্যরাও আপন জন হিসাবে গ্রহণ করতে চায় না। ওদের বক্তব্য, আমাদের ধমনীতে নাকি বিশুদ্ধ ইউরোপীয়ান রক্ত নেই। তাই আজ দুদিক থেকে বহিস্কৃত হবার ফলে দিন এসেছে নিজেদের পথ এবং কর্তব্য ঠিক করার। ভারতবর্ষে আমাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তার উপর সারাদেশে আমরা ছড়িয়ে আছি। তাই আমাদের ভোটের ওপর কেউ ততটা গুরুত্ব দেয় না। স্থানীয় সংস্থাসমূহে এবং বিধানসভায় আমরা ন্যায়-সঙ্গত প্রতিনিধি পাঠাতে পারি না। আমাদের জাতির বহু লোক রেলের ড্রাইভার, গার্ড, টিকিট চেকার হিসেবে কাজ করছে। যতদিন রেল ইংরেজ কোম্পানির হাতে রয়েছে ততদিন আমাদের চাকরির কোনো ভয় নেই। কিন্তু এসব যদি সরকারের হাতে চলে যায় এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যদি কায়েমী হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, আজকাল আন্দোলন হচ্ছে, দাবি উঠছে, রেলে বেশী সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ করা হোক। গিতনি এসব কথা বলেছিলেন—মনে আছে?" রোজারিয়ো বলল।

জগন্মোহন—তা আছে। কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা সব ব্যাপারেই তো ইংরেজদের সমান, ওরা যখন তাদেরই সন্তান, আমি তো বুঝেই উঠতে পারি না এত ভয় পাবার কী আছে!

রোজারিয়োর স্ত্রী—সেযাই হোক, আমাদের দেশ তো ইংলণ্ডেই। কোনোনা কোনোদিন আমাদের সেখানে যেতেই হবে, একজন ইংরেজ নেতা একথা বলেছিলেন তা তুমি শোননি?

জগন্মোহন—আমি তো আগেই বলেছি—আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন! এই ব্রিটিশ সরকার চলে যাচ্ছে না, আর যতদিন এই সরকার বহাল রয়েছে ততদিন ভয় কিসের।

জেমস—রাজাবাহাদুর, আমি একথা ভাবতেই পারি না যে একদিন না একদিন আমাদের ভারতীয় হিসেবেই নিজেদের ধরে নিতে হবে।

রোজারিয়ো—ভারতীয়রা আমাদের আপন করে নিতে চাইছে না। ওরা বলছে—

জেমস—ঠিকই বলছে, তার কারণ আমরা ইংরেজদের মন্ত্রশিষ্য; আর নিজেদের মনে করি ভারতীয়দের চেয়েও বড়। আমাদের ইচ্ছে ভারতীয়েরা যেন আমাদের পূজা করে। আজ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভারতের যাতে মঙ্গল হয় এমন কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করা। এই মনোভাব কিছু লোক পোষণ করে বলেই ভারতীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে ট্রেড ইউনিয়ন করছে, ধর্মঘট প্রভৃতিতেও আমাদের লোক ওদের সঙ্গে মিলেমিশে অংশ গ্রহণ করছে।

রোজারিয়ো—জেমসের কথাই ঠিক। আমরা এদেশে জন্মেছি এদেশেই আমাদের জীবন কেটে যাবে, এদেশের মাটির সঙ্গেই আমরা লীন হয়ে যাব। ইংরেজ ফরাসী অথবা জর্মানরা আমাদের কি বাড়িতে ডেকে খাওয়াচ্ছে? আমাদের কি ওরা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করছে? হাত পা ছাড়া আমাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই। তাই আজ কোনোরকম দ্বিধা বা দ্বন্দ না রেখে ভারতবাসীর সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অপর পক্ষে সরকারের প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির প্রমাণ দিয়ে তাদেরও কৃপাপাত্র হতে হবে।

ডায়না—আপনার কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু দুদিক থেকেই যদি উপেক্ষিত হই?

রোজরিয়ো—সেই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যেই আমি এ পথ বাৎলেছি।

ডায়নার এই আলোচনা আর ভাল লাগল না। তার ইচ্ছে হল প্রজাপতি নৃত্য নাচার। ভাইকে সে ভায়োলীন বাজাতে অনুরোধ করল আর মাকে পিয়ানো। গুরোল্ড ব্লাণ্ডো তার প্রজাপতি নাচের সংগীত লিপি এনে ওদের দিল।

ওরা বাজাতে শুরু করল আর বাজনার তালে তালে ডায়না বিচিত্র বেশ পরে নাচতে শুরু করল। নাচে সে যখন গভীরভাবে মগ্ন তখন দেয়ালঘড়িতে বাজল একটা। অগত্যা নাচ থামাতে হল। রোজরিয়া দম্পতি আর ফ্রান্সেস জগন্মোহনের গাড়িতে করে চলে গেল। জগন্মোহন ডায়নার সঙ্গে উপরের ঘরে চলে গেল।

জেমস অন্ধকারে সোফায় বসে বসে দামী চুরুট টানতে থাকল।

সত্যাইয়ার বউ নতুন এসেছে। বয়স সতেরো, শ্যামবর্ণা, মজবুত গড়ন, চঞ্চল চাহনি, আকর্ষণীয় চেহারা, একগলা যৌবন। তার আবির্ভাবে সোমইয়ার বাড়ির হাওয়া বদলে গেছে। সত্যাইয়া বেছে বেছে গরিব পরিবারের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে।

—মাত্র একশো' টাকা পণ দিলেই হবে? "ভাগ্যটা ভাল হওয়া চাই, ভাগ্যে যদি না থাকে হাজার টাকা পণ পেলেও বাড়িতে বউয়ের পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সব ভস্ম হয়ে যাবে। বউ আমার মহালক্ষ্মী। দেখবেন আমার ছেলের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে।" প্রায়ই সোমাইয়া এসব কথা বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলত। লক্ষ্মীর মত দেখতে সুরম্মা গয়নাগাঁটি পরে মুখ টিপে হাসতে হাসতে সুব্বারায়ের পেছনে এসে দাঁড়াল।

বরবধূ যখন জানকী আম্মা এবং সুব্বারায়কে প্রণাম করার জন্য এল, তখন তাঁদের হাতে একশোটি টাকা দিয়ে তাদের পারিবারিক জীবনের দুঃখ কষ্টের কথাও শুধোলেন। সত্যাইয়াকে উপদেশ দিলেন যাতে সে বউকে ফুলের মতো সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে। তারপর আশীর্বাদ করলেন, 'দীর্ঘায়ুরারোগ্য ভিবৃদ্ধিরস্তু দীর্ঘাসুমঙ্গলীভব, পুত্র পৌত্রাভিবর্দ্ধিরস্তু।'

—মা, শ্বশুর শাশুড়ীর মনে ব্যথা দিও না। ঠিকমত চোলো। তাঁদের সেবা করতে কার্পণ্য কোরো না। ভাল কথা, সত্যাইয়া, এই টাকা কটা দিয়ে তুমি বউয়ের জন্য গয়না গড়িয়ে দিও। তোমাকে আশীর্বাদ করি যেন নাতি-নাতনীদের মুখ দেখে যেতে পার। জানকী আম্মা আশীর্বাদ করে, বউকে একখানি শাড়ি, সিঁদুর, হলুদ এবং নারকেল দিলেন।

পরের দিন সোমাইয়া ধান ক্ষেত নিড়াতে গেল। বুড়ম, কোনামণি, আদ্র গড্ডা, অকুল, কৃষ্ণকাটুকলু, এবং সুব্বারায়ের বাড়িতে ব্যবহারের জন্য পাটগড় ও পালটগাম জাতের ধান বোনা হয়েছে। আশী একর জমি আগেই নিড়ানো হয়ে গেছে। ধান বোনার কাজও শেষ হয়ে গেল। বাকী কুড়ি একর জমিতে কাজ করছে হরিজনরা। সোমাইয়া তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে একটা উঁচু জায়গায় বসে কাজ দেখাশোনা করছিল।

হরিজনদের মোড়ল বৃদ্ধ নাগন্না বলল, "আজকালকার ছেলেরা আবার কাজ করে নাকি? আরে, এদিকে ছাখ, আড্ডা মারিসনে, কাজের নামে অষ্টরম্ভা। একটু ভাল করে কাজ কর না।"

সোমাইয়া—ওরে এই পোতিগা, কী করছিস, ধান নিড়াচ্ছিস না চরে বেড়াচ্ছিস? বকছিস কেন? ঠিকমত কাজ না করলে মজুরী পাবি না কিন্তু। ঐ মেয়েটিকে দেখেও অন্ততঃ কাজ কর, তা না হলে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব!

নাগন্না—বাবু, এদের বলে কি কোনো কাজ হবে—বড়দের কথা একটুও গ্রাহ্য করে না।

সোমন্না—ও মোড়ল, ভাল দেখে একটা গল্প বলো দেখি। তোমার গল্প শুনতে শুনতে ওরা সব কাজ করবে ভাল। ষণ্ডামার্কা চেহারা নিয়ে শুধু ঘুরে বেড়াতে পারে কাজের কথা বললেই কেঁদে ফেলে।

নাগন্না—গল্প তো বলব। হুঁ হুঁ করবে তো সবাই?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ-নিশ্চয়ই আমরা হুঁ হুঁ করব।" নাগন্না গল্প বলতে শুরু করল।

—একদেশে এক শহর ছিল।

—হুঁ।

—সেই শহর থেকে একটু দূরে হরিজনওয়াড়া একটি গ্রাম। সেইগ্রামে গায়ে গায়ে লাগা দুশোটি বাড়ি।

—হুঁ।

—সেই হরিজনওয়াড়ার মোড়ল রাজারাজড়াদের চাকরি করত। ওদের শ শ একর জমি দেখাশোনা করত। খুব করিৎকর্মা লোক।

—হুঁ।

—মোড়লের ছিল জমি। গোয়াল ভরা গোরু। আর ঘরবাড়িতো ছিলই। কোনো কিছুর অভাব ছিল না। লাল পোশাক পরে হাতে ছড়ি নিয়ে যখন বেরোত গলিতে, সত্যিই চমৎকার দেখাত। ভক্তও বটে। সব সময় ভজন, পড়াশুনা আর গান এই চর্চাতেই মজে থাকত। কৃষ্ণ পাণ্ডবের দর্শনও পেয়েছিল। যা বলত, তাই নাকি সত্যি হত। তার হাত থেকে বিভূতি পেয়ে অনেকের অনেক রকমের রোগ সেরে যেত। ভূত

প্রেত তার কাছেও ঘেঁষত না। স্বয়ং মা কালী নাকি তার ডাকে সাড়া দিতেন।

—হুঁ।

—এহেন মোড়লের এক ছেলে ছিল। সে ব্যাটা আবার না ভয় করত ভগবানকে, না করত ভূতকে। ভূতের চেয়েও বেশি তাগদ রাখত সে, কেউ কেউ বলে রাক্ষসের চেয়েও নাকি বেশী। তার পেট নাকি ভালুকের মতো ছিল। তাকে দেখে লোকে ঠকঠক করে কাঁপত।

—হুঁ।

—তার নাম ছিল মকর। ভীষনভাবে মেয়েদের পেছনে লেগে থাকত সে। একটা আঁচল একটু নজরে পড়লেই হল, আর রক্ষে নেই। সিঁদুরের টীপ লাগিয়ে সেজে গুজে হাতে ঝুড়ি নিয়ে কোনো মেয়ে যদি দোকানদারের সঙ্গে হেসে কথা বলেছে তো আর রক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ তার জন্য সে জীবন দিয়ে দিত।

—হুঁ।

—আগে পিছে কিছু চিন্তা করত না। মেয়েটির জাতকুল দেখত না। তৎক্ষণাৎ পিছু লাগত। এটা চাইত ওটা চাইত। প্রকাশ্যেই বলত, একবার চুমু খেতে দে না—আমি কি সুন্দর নই? তারপর গুনগুণ করে গান গাইত আর গোঁফে তা দিত।

—হুঁ।

—তার জ্বালায় মেয়েরা ঘাটে যেতে, ক্ষেতে যেতে ভয় পেত। কেউ ওর নজরে পড়েছে কি আর রক্ষে নেই—গোরুর পেছনে ষাঁড় যেমন লেগে থাকে তেমনি লেগে থাকত সে। কোনদিন কোন মেয়েছেলে একা বেরিয়ে কি তার নিস্তার নেই। অজগর হরিণকে দেখলে যেমন লকলক করে ওঠে, ঠিক তেমনি তার চোখ দুটো জ্বলে উঠত।

—হুঁ।

—মকর বাবার কথা শুনত না। কোনো ধর্মের কাহিনীই সে মানত না। কারো উপদেশের ধার ধারত না সে।

—হুঁ।

—গাঁয়ের বৃদ্ধ অথবা গণ্যমান্য কোনো ব্যক্তি কিংবা অসহায় মেয়েরা এসে

যখন তার বাবার কাছে নালিশ করত তখন তার বাবা বলত, "আজ না হোক কাল, ঘরে না হোক বাইরে পুরুষ অথবা মেয়ে কেউ তাকে উচিত শিক্ষা দেবেই। ওকে আর আমি আমার ছেলে বলে মনে করি না। ও আর মানুষ নয়। ওর খারাপ কাজের জন্যেই ওকে মরতে হবে।"

—হুঁ।

—মকরের চেহারা ছিল মোষের মতো। দুর্যোধনের কাছে যেমন শকুনি আর কর্ণ, ওরে বন্ধুরাও ছিল ঠিক তেমনি। দশটা পাগলা কুকুরের গায়ে যত না জোর মকরের গায়ে ছিল তার চেয়েও বেশী।

—হুঁ।

—ঐ হরিজনওয়াড়া গ্রামের—পোদ্দাবীরাম্মা পুকুরের ধারে ছিল রেটি বিরন্নার কুঁড়ে ঘর সেই ঘরে থাকত তার মেয়ে নীলা। তার সঙ্গে বিয়ে হল গণ্ডীগঙ্গাম্মার। ছিপ ছিপে চেহারা লীলার। মোলায়েম হাত, চাঁদের মতো মুখ। আকাশের তারার মতো ঝকঝকে দাঁত। ডবকা মেয়ে।

হুঁ।

—তার স্বামীটি ছিল গোদাবরীর মতই সরল প্রকৃতির। লীলা এবং তার স্বামীকে চমৎকার মানিয়েছিল। বাবলার সঙ্গে যেন নিম। একজোড়া কবুতর যেন। পরস্পরকে খুবই ভালবাসত ওরা।

—হুঁ।

—স্বামী কোন কাজে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিল। আর বউও গেল বাপের বাড়ি। বাঘের চোখে গোরু পড়ার মতো মকরের নজরে পড়ল লীলা।

—হুঁ।

—নীলাকে দেখে মকর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। মনে মনে সে বলে উঠল, ওকে যদি না পাই তো এ জন্মই বৃথা। এত যে শক্তিমান আমি কী হবে এ শক্তিতে। এ জীবনের দাম কি। মকর নীলার বাবার কাছে আম, কলা, শাড়ি ইত্যাদি পাঠল। নীলার বাবা ফেরত নিয়ে গিয়ে সে সব মকরের বাড়ির সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর মকরের বাবার মুখের উপর বলল, "তোর ছেলে দেখছি আর কোন কাজই বাকি রাখল না। তার জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। তুই ওকে দমন করলে আমরা সবাই একটু টিঁকতে পারতাম।

—হুঁ।

—সেদিন নীলা পুকুরে গেল জল আনতে। পথে তাকে দেখতে পেয়েই মকর বলল, তোমার চোখে যে আমার মন লেগে আছে। তোমার শরীরের ওপর থেকে আমি দৃষ্টি সরাতে পারছি না। তোমার অমন সুন্দর হাত পিঠ —তোমার গোটা চেহারার সৌন্দর্য আমাকে একেবারে কুকুরের মতো হ্যাংলা বানিয়ে দিয়েছে। এসো না—তোমাতে আমাতে একসঙ্গে থাকি। তোমার ঐ স্বামীটিকে ভাগিয়ে দাও। ও যত টাকা চায় আমি দেব। দেখো, এত খোসামোদ আমি কিন্তু অন্য কোন মেয়েকে কখনো করিনি। আমি তোমার গোলাম। তুমি সামনে দাঁড়ালে আমার সমস্ত শক্তি যেন কোথায় হারিয়ে যায়। আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। আমাকে এই জ্বালা থেকে বাঁচাও।' নীলা কাঁপতে কাঁপতে বলল, ভাই, আমি যে তোমার বোন। আমার সঙ্গে এ ধরণের কথা বলা কি তোমার উচিত হচ্ছে? কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আরও দু-তিনবার খোসামোদ করে হঠাৎ তার শাড়ি ধরে সে টান দিল।

হুঁ।

—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নীলা পালাল। মকর মনে মনে বলল,—সোজা আঙ্গুলে দেখছি ঘি উঠবে না, খোসামোদে দেখছি কাজ হবে না। জোর করেই আদায় করতে হবে। নরম কথায় ওর মন ভুলবে না। তবে হাঁা— একবার ওকে চুমো খেতে পারলেই জীবন সার্থক।

—হুঁ।

একদিন খুব ঘুট ঘুটে অন্ধকারে বাবার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল নীলা। এই ধরণের একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই মকর ওৎ পেতে ছিল। ওকে দেখেই মকরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তেঁতুলগাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল সে। একা নীলাকে ঐ পথে যেতে দেখে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এল। মকরকে সামনে দেখেই বাঘ-দেখা হরিণীর মতো কাঁপতে লাগল নীলা। তারপর বুঝিয়ে শুনিয়ে কী এক কায়দা করে ওর হাত থেকে একটু ছাড়া পেয়ে প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে সে ছুটতে লাগল। ছুটছে আর চিৎকার করছে। মকর একা ছিল না, ওর বন্ধুও ছিল। ছুটতে ছুটতে নীলা এসে ঢুকল ওয়েঙ্কটদাসের ঘরে। ঢুকেই পড়ে গেল।

—হুঁ

ওয়েঙ্কটদাস বলল, কী হয়েছে মা তোমার? ভয় কিসের? তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে দরজার কাছে এগোতেই বাবাকে ধাক্কা দিয়ে মকর ঘরে ঢুকল। মনে হল যেন ঝটিকা বেগে ভূত এসে ঘরে ঢুকেছে। বন্ধুটি থ-বনে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

—হুঁ

ওয়েঙ্কট দাস—'রাম-রাম, রাক্ষস কোথাকার। ঘরে পা রেখেছিস কি তোর আর রক্ষে নেই। পূর্বজন্মের অনেক পাপের ফলে তুই এবাড়িতে জন্মেছিস। ছেলের পথ আগলে দাঁড়াল বাবা। দুই হাত ছড়িয়ে বুক টান করে দাঁড়াল বাবা।

—হুঁ

—মকর সেই সময়ও বাবাকে পরোয়া করেনি। দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করার ছেলে সে নয়! বাবাকে সরিয়ে কম্পমান নীলাকে ধরল। ওয়েঙ্কট দাস আপ্রাণ চেষ্টা করল ছেলেকে টেনে নিতে, তার হাত থেকে নীলাকে ছাড়াতে। কিন্তু তারপর মকর বাবাকে এমন এক ধাক্কা মারল যে সে একটা বস্তার মতো গড়াতে গড়াতে ঘরের এক কোণে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল।

—হুঁ।

—মকর পিশাচের মতো হয়ে গেল। নীলাকে বিবস্ত্র করে তার শাড়িটা ছুঁড়ে ফেলল ঘরের এক কোণে। মুহূর্তে নীলার দেহ যেন কুঁকড়ে দুমড়ে গেল। আর মকর শুয়োরের মতো, বাঘের মতো, বুনো মোষের মতো বিবস্ত্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। তার বাবা যে ঘরের এককোণে পড়ে রয়েছে, বন্ধু যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, এসবের কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে নীলার সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হল সে। ঘরের কোণে পড়েছিল ওয়েঙ্কট দাস ঠিক যেন একটি পুঁটলি, ঝাঁটাও বলা যায়। রামনাম করতে লাগল। বাপ হয়ে এ দৃশ্য দেখবে কী করে। এদিকে নীলা চিৎকার করছে, আমাকে বাঁচান, ওয়েঙ্কট দাস, আপনি আমার বাবার মতন, আমাকে বাঁচান···বাঁচান। প্রাণপণ চেষ্টা করছে নীলা মকরের সঙ্গে যুঝতে।

—হুঁ।

—মুহূর্তে হুঙ্কার তুলে ওয়েঙ্কটদাস গা-ছাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। না জানি কোত্থেকে সে প্রচণ্ড শক্তি পেল। মাকালীর কাছে সে পাঁঠাবলী দেবার খড়্গটা তুলে বসিয়ে দিল ছেলের গর্দানে। ছিটকে পড়ল মাথা একদিকে আর ধড়টা আর একদিকে। আবার অল্-অল্-অল্। ওয়েঙ্কটদাস গর্জন তুলে ছেলের রক্ত হাতে মুখে গায়ে মেখে চিৎকার করতে লাগল,—আমি ভৈরব, আমি মহাবীর হনুমান।' সেইভাবেই সে খড়্গহাতে বেরিয়ে পড়ল পথে ধাওয়া করল মকরের বন্ধুকে। পথেই দুটো বন্ধুকে সাবাড় করে দিল। মকরের বাকী বন্ধুরা প্রাণপণে ছুটে পালাল।

—হুঁ

—তারপর সেই যে শক্তি ওর উপর ভর করল। সেই করালী শক্তিকে ওয়েঙ্কটদাসের ঘাড় থেকে নামাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল। যখন তার হুঁশ হল এবং বুঝতে পারল যে সে নিজের হাতে নিজের ছেলেকে এবং তার বন্ধুদের হত্যা করেছে, তখন সে খাটে শুয়ে পড়ল। সেই-ই তার শেষ শোওয়া। এদিকে নীলার সতীত্ব যে মুহূর্তে নষ্ট হল, সেই মুহূর্তে সেও চোখ বুজেছিল আর খোলেনি। সেও মারা গেল।

—হুঁ

—নীলার বাবা যখন জানতে পারল যে তার মেয়ে মারা গেছে, তখন সেও ছোরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মকরের যে কটি বন্ধুকে পেল সবাইকে মেরে ফেলল। তারপর নিজে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরল।

—হুঁ।

১০। চাকর

শংনো মিত্রঃ শং বরুণঃ শংনো ভবত্বর্যমা,
শংনঃ ইন্দ্র বৃহস্পতিঃ শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে এই দেশ সব সময় কৃষিপ্রধান ছিল। সুব্বারাও বসে বসে ভাবছিলেন, 'হে বরুণদেব, আমার ক্ষেতে জল যাতে না দাঁড়ায় সেদিকে তুমি লক্ষ্য

রেখো। হে ইন্দ্র, তোমার সপ্তবর্ণ ধনুক আমার যেন চোখ জুড়ায়। আমায় ভূমিকে ফলবতী করো। এইসব কথা তাঁর মনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

সুব্বারায় সব সময় দেশের হালচাল সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকেবহাল রাখতেন। অন্ধ্রকৃষ্ণ পত্রিকা নিজে পড়তেন। অন্ধ্র-প্রকাশিকা, এবং মনোরমাও আনাতেন। অন্ধ্র-ভাষা-বর্ধিনী-সমাজ, বিজ্ঞান চন্দ্রিকা-মণ্ডলী প্রভৃতি প্রকাশন সংস্থার সদস্য ছিলেন তিনি। প্রত্যেকটি বই মন দিয়ে পড়তেন এবং তার বিষয়বস্তু মনে রাখতেন। তাঁর কাছে প্রায় দশহাজার বই-এর সংগ্রহ ছিল! একজনকে দিয়ে তিনি ঐ সমস্ত বইয়ের বিষয়ানুসূচীও করিয়েছিলেন। পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ফসল কোন্ কোন্ সময় কোথায় কী ভাবে হয়, তার সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য ভূগোল শাস্ত্রও গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি পড়েছিলেন। সেই জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত নারায়ণ রাও এবং রামমূর্তি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে থ-বনে যেত। নারায়ণ রাওকে দিয়ে উনি ইংরেজী ভাষায় রচিত অর্থশাস্ত্রের বই পড়িয়ে শুনতেন। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ সঠিক করে অনুধাবণ করার চেষ্টা করতেন। কোন দেশের আয় কত, কোন্ দেশে কোন্ বিষয়ের উপর কী পরিমাণ কর সরকার কর্তৃক ধার্য সেবিষয়ে সম্যক ধারণা ছিল তাঁর।

ভারতে জমির দাম খুবই কম। যেদিন থেকে যুদ্ধ শুরু হল সেদিন থেকে দাম বাড়তে লাগল। জমির দাম বাড়তে দেখে লোকে বেশি খরচ করতে লাগল। বেশি খরচ করার ফলে বেশি করে ধার হতে লাগল। সুব্বারায় ভাবলেন, এদেশ কোন দিকে যে এগোচ্ছে কে জানে। দিনের পর দিন টাকার সুদ বেড়েই যাচ্ছে। মাড়োয়ারী মহাজনরা শতকরা চার পাঁচ টাকা, মাসিক সুদ নিচ্ছে। উনি নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আট দশ আনার বেশী সুদ কখনও নেবেন না। ওদিকে টাকা দেবার সময়েই মহাজনরা প্রথম মাসের সুদ কেটে নেয়। একশো টাকা চাইলে হাতে পাওয়া যায় পঁচানব্বই টাকা। এছাড়া যার মাধ্যমে টাকাটার যোগাযোগ ঘটে তাকেও কমিশন কিছু দিতে হয়। আর একবার টাকা ধার নিলে সুদ গুনতে গুনতেই জীবন শেষ।

যাই বলো ভাই, জমির দাম যেভাবে বাড়ছে সেটা এ দেশের অনুকূল মোটেই নয়। যুদ্ধ এভাবে লেগেছে কেন কে জানে? সব জিনিসের দাম

বেড়ে গেছে। গত দশ বছরে লোকের অবস্থা যদি যুদ্ধের আগেকার মতো হত তাহলে কারো কি ধার দেনা থাকত, উল্টে পাঁচ দশ টাকা জমত। আমার কাছে ধার চাইতে এসছ। যদ্দিন জমির এই দাম থাকবে তদ্দিন তুমি এই দেনা শোধ করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাকে এই জমি বিক্রি করতেই হবে। চাকরী করে যদি কেউ টাকা জমিয়ে থাকে সেই-ই এ-জমি কিনবে। আর ওরকম লোক পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। কি ভাই বসন্তাইয়া—ঠিক বলছি কিনা? সুব্বারায় গোপালপুরমের বড় কিষাণ বসন্তাইয়াকে বললেন। বসন্তাইয়া তাঁর কাছে জমি বন্ধক রেখে চার হাজার টাকা ধার চাইতে এসেছিল।

—খেত খামারের কাজ শুধু নিজেদের তত্ত্বাবধানে করলে কি আর লাভ থাকে? বাপঠাকুরদার আমল থেকে আমরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করে থাকি। ফসল যাই হোক না কেন, কর মেটাতেই সব সাবাড় হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সব সময় দেশের বাইরে টাকা চলে যাচ্ছে এবং সেই জন্যেই বিপদ আরো বাড়ছে।

—এ কী বলছেন, যাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হত বেশ শাঁসালো লোক, তার ভিতরের অবস্থাও এত ফাঁপা যে কহতব্য নয়।

—এর কারণ কী বলতে পারেন?

—ধার।

—ধার হয়, কেন?

—এতক্ষণ আপনি যে কারণগুলো বলছিলেন, সেই কারণেই। ভালভাবে ভাবনা চিন্তা না করেই ধার করা হয়। ছেলেবেলায় দেখেছি, রূপোর গয়না-গাঁটি হত। ধারদেনা করেছেন বলেই তো সোনার গয়নাগাঁটি হচ্ছে। যুদ্ধ লাগার পর থেকেই সোনা কেনার ঝোঁকও বেড়ে গেল। আমাদের ঘাড়ে ধারদেনার চাপ বাড়ল। আর মেয়েদের গায়ে বাড়ল সোনার অলঙ্কার—সোনা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্যান্য খরচ সম্বন্ধে কী বলেন? আমার দুই ছেলের পেছনেও তো কম খরচ করতে হচ্ছে না। একজন রাজমহেন্দ্রবরমের কলেজে পড়ে আর অন্যটি হাইস্কুলে পড়ছে—দুজনের পেছনেই টাকা ঢালতে হচ্ছে।

—আমি একথা বলছি না যে লেখপড়া করা খারাপ। আমরা লেখাপড়া

করার জন্য ছেলেদের পাঠাই কেন? যুদ্ধের আগে কম লোকে লেখাপড়া জানত তাই চাকরি চট করে জুটে যেত। দু-চার টাকা সব সময় পকেটেও থাকত আর আমাদের কৃষকদের হাতে একমাত্র ফসল কাটার পরেই দু-চার টাকা আসে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর সবাই চাকরির পেছনে ছুটল। জমি জায়গার দিকে না তাকিয়ে, শিক্ষার দিকে ঝুঁকল। আমাদের দেশে শিক্ষা যত ব্যয়সাপেক্ষ অন্য কোনো দেশে ততো নয়। আগে শিক্ষিত লোকদের সত্যিকারের দাম ছিল। আজকাল নানা রকমের বই, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট প্রভৃতির জন্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। এত খরচ হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে?

তবে হ্যাঁ, তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের লেখাপড়ার একটা সুবিধা হতে পারে, ফলও ফলতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের একেবারে উজাড় করে দিচ্ছে। চাকরির জন্য লেখাপড়া করা একটা কতবড় মূর্খতা ভেবে আমরা কৃষিকর্মে লিপ্ত হই, তাই ঘাটতির পর ঘাটতি আসে।

—আমি ত্রিশ একর জমি চাষ করছি, চারশো পঞ্চাশ বস্তার ওপর ধান হয়। কর বাবদ আশী বস্তা চলে যায়। চাকর, মুটে, মজুর আর বীজের জন্য সব মিলিয়ে আরো একশো বস্তা খরচ হয়ে যায়। বাকী দুশো সত্তর বস্তার মধ্যে বাড়িতে খরচ হয় পঞ্চাশ বস্তা। বাদবাকী যা থাকে তা বিক্রি করে পাই তেরশো আশী টাকা। এই টাকা দিয়েই সারা বছর সংসার চালাতে হয়। এর থেকে ওদের লেখাপড়া আর বাড়ির সকলের পোশাক-আশাকের জন্য খরচ করতে হয়।

—তা তো বটেই। খরচ তো আর এখানেই শেষ নয়। মামলা-মোকদ্দমা ফৌজদার রেজিস্ট্রি, বিক্রি করার রেজিস্ট্রি, কেনার রেজিস্ট্রি, রেলগাড়ি, ঘোড়া আরো কত খরচই তো আছে। তার উপর বাড়িতে কারও বিয়ে হলে তো আর কথাই নেই।

—তা আর বলতে, দেখতে দেখতে মেজো মেয়েটির বিয়ে দেবার সময় হয়ে এল। এতদিন খেটেখুটে আগের দুটোর বিয়ের ঋণ শোধ করেছি। আপনার কাছ থেকে নেওয়া আগেকার পনেরো শো টাকা ধার তো আছেই। তার উপর এই বিয়ের পেছনে যা খরচ হবে সবই আপনার কাছে

ধার নিতে হবে। সব মিলিয়ে সাড়ে চার হাজার টাকার দেনায় জড়িয়ে পড়বো।

—কোথাকার পাত্র ?

—পুল্লগ্রামের। খুব পয়সাওয়ালা লোক। ছেলেটাও অল্পবয়সী। আমার ছেলের সঙ্গে রাজমহেন্দ্রবরমে পড়ছে। পণ বাবদ চার হাজার আর অন্যান্য খরচ হাজার দেড়েক হবে।

—শুধু বিয়েতেই তো দু হাজার খরচ হবে। সব মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজারে কী করে হবে ?

—এতদিনে ধার মেটানোর জন্যে পনরশো টাকা জমিয়েছি। বউও অনেক বছরের জমানো টাকা এক হাজার দিয়েছে।

—তুমি মস্ত বড় কিষাণ—ত্রিশ একর জমি আমার কাছে বন্ধক রাখার কী দরকার ? কুড়ি একর রাখলেই চলবে। দশ কিস্তিতে মেটাতে হবে। সুদের হার ঐ আট আনাই থাকবে। প্রয়োজন হলে পনরশো টাকা আরও নিয়ে যেতে পার।

—আমি যা নিচ্ছি তা তো আমাকেই মেটাতে হবে। যা কিছু ধার করছি সব আপনার কাছেই। আপনি ছাড়া অন্য কারও কাছে ধার চাইতে যাইও না।

লেখাপড়ার দিনক্ষণ জেনে নিয়ে বসন্তাইয়া চলে গেল। সুব্বারায় প্রত্যেক দিন নিজের ক্ষেত দেখতে যেতেন। সেদিন সন্ধ্যায়ও বসন্তাইয়াকে বিদায় দিয়ে ভেতরে গিয়ে পোশাক বদলে চুরুট ধরিয়ে রুপোর কাজ করা ছড়িটা নিয়ে এবং দামী চপ্পলটা পরে কয়েকজন চাকর, দুজন কৃষক ও একজন ক্ষত্রিয় কিষাণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতের দিকে রওনা হলেন।

প্রত্যেক দিন এইভাবে বেরোনো সুব্বারায়ের অভ্যাস। মাঝে মাঝে বাগান দেখতেও যান। কোন ক্ষেতে কী ধরনের ফসল হচ্ছে তা নিজে দেখে আসেন। বেগুন, যব, অরহর, মুগ, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি তাঁর জমিতে প্রচুর পরিমাণে ফলে।

অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত ক্ষেতের আলপথে উনি বেড়াতেন। রাত্রে আলো জ্বলার পর বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত এসে তাঁর গা-হাত পা টিপে দিত। তারপর শীতকাল হলে গরমজলে, আর অন্য সময় ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে তিনি সন্ধ্যা করতে বসতেন।

সুব্বারায়ের মনে পড়ল রাশিয়ার বলশেভিজমের কথা, পৃথিবীতে কদ্দিন আর মানুষ বলবে, এটা আমার সম্পত্তি, এটা আমার টাকা। সম্পত্তিহীন নির্ধনদের সংখ্যা বিত্তবানদের চেয়ে অনেক বেশী। দরিদ্ররা সবাই জোট বাধলে ধনীরা এতদিন কোথায় থাকত কে জানে। এই সব সৈনিকদের রুখতে হবে। মানুষের মন কী বিচিত্র। রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনোদেশের জনসাধারণ তথা সৈনিকরা কি বিদ্রোহ করেছে ? আর যেসব দেশে রাজা পদচ্যুত হয়েছেন, সেসব দেশের রাজার কর্মচারীরা এবং বিত্তবানরাই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

অল্পবুদ্ধি শ্রমজীবী মানুষরা বিদ্রোহ করে নি। অর্থের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। ধনীদের কাছে সাধারণ মানুষ কী রকম যেন ঘাবড়ে যায়। হাত পা নাড়তে পারে না। রাশিয়ার পরিস্থিতি আগে খুব খারাপ ছিল। তা না হলে সেখানকার দরিদ্ররা বিপ্লব করত না। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সুব্বারায় যাচ্ছিলেন। তিনি ভাবতে থাকেন, নারায়ণরাও ইত্যাদির বক্তব্য হচ্ছে—প্রাচীন ভারতে বলশেভিজমের চেয়েও উৎকৃষ্ট ধরনের রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল। জানি না সেটা কতদূর সত্যি। আজকাল সহজে আর কে টাকা ছাড়তে চায়। গান্ধীর মতো মহাত্মাদের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে বড় জোর দু-চার জন।

১১। বিষবীজ

শারদা দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যও বাড়ছিল। নিজের রূপলাবণ্য সম্পর্কে সে সচেতন। সে যে আরও সুন্দরী হয়ে উঠবে সে কথা সে জানত। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সম্বন্ধে সে যত্নশীল থাকত। গান শেখার সময়, পড়ার সময়, পথে গাড়ী করে যাবার সময়, এমন কি খাবার সময়ও সে মনে মনে ভাবত যে, অন্যেরা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। কেউ যখন তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করত তখন সে মনে মনে খুব খুশী হত।

পরপুরুষের দিকে তাকানো যে দোষ—এধরণের কথা তার আজানা ছিল।

এমনকি, নারী পুরুষের মিলনমাধুর্য সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান ছিল না। কৌতূহল ছিল বটে, কামেচ্ছাও হয়তো ছিল, তবে তা অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলের মতোই। তার সব নারীত্বটুকু তার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

শারদা শুনেছিল দশহরার ছুটির সময় শ্বশুর বাড়ির লোকরা আসবে। শ্বশুরবাড়ির লোকের এভাবে ঘন ঘন আসা-যাওয়া তার পছন্দ নয়। অর্থাভাবই যদি না থাকে, তাহলে কেন জমিদারবাড়িতে থাকার জন্য ওরা এমন ঘন ঘন আসে? শ্বাশুড়ী অবিশ্যি মাত্র এক বারই এ বাড়িতে এসেছিলেন—শ্বশুর কোনদিনই আসেন নি। শ্বশুর বাড়ির অবস্থা সত্যি ভাল। ওদের বাগান এদের বাগানের চেয়ে ভালই।

যাইহোক, শ্বশুর বাড়ি সম্বন্ধে শারদার ধারণা ভাল নয়। হয়তো এই জন্যই জগন্মোহন রাও যখন মাদ্রাজ যাবার পথে রাজমহেন্দ্রবরমে নামল, তখন শারদা অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা বলল। গৃহ প্রবেশের দিনে কোত্তাপেঠায় যে সব কু-সংস্কারের লক্ষণ সে দেখেছিল সে গুলো নিয়ে তারা হাসাহাসি করতে লাগল।

জগন্মোহন শারদাকে দেখে আশ্চর্য হল। শুনেছিল বটে শারদা রজস্বলা হয়েছে কিন্তু যৌবনে পা দেবার পর মেয়েরা যে এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় তা সে কল্পনাই করতে পারে নি। শারদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে ভাবছিল এই মেয়েটি, এই যে জগন্মোহিনী আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এর কোথায় আমার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা আর কোথায় শেষ পর্যন্ত হল একটা শুয়রের সঙ্গে। আমার বউ হলে আমি একে ইংলণ্ডে নিয়ে যেতাম। ফুল দিয়ে ওর পূজো করতাম। জমিদারপত্নী হিসেবে একেই সবচেয়ে ভাল মানায়। এর চেহারা যে এত খুলবে, এর রূপের ফোয়ারা যে এত ছুটবে তা আগে জানলে এর বিয়েই হতে দিতাম না। যেনতেন প্রকারে বিয়ে পণ্ড করে দিতাম। ওর বাবা আর কী করতে পারতেন? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গেই শারদার বিয়ে দিতে হত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বান্ধবীরা, বাইজী বাড়ির মেয়েরা শারদার কাছে কেউ কিছু নয়। শারদা যদি পেট্রোম্যাক্স হয় তো ওরা এক-একটি হ্যারিকেন।

শারদার স্নিগ্ধ সুন্দর শরীর, তার পরণে ঘাঘরা ওড়না সবকিছু খুঁটিয়ে

দেখে জগন্মোহনের মন ভরে যায়। শারদার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খোঁজে সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কাছে বসে থাকে। আর সুযোগ পেলেই তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে।

তার মনে যে চাঞ্চল্য, যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা শান্ত করলেন তার পিসিমা। বরদকামেশ্বরীর আগাগোড়াই ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের ছেলের সঙ্গেই শারদার বিয়ে দেওয়ার। নিজের গর্ভে ধরা সন্তানদের প্রতি যতই টান থাকুক না কেন, নিজের ছেলেমেয়ের চেয়েও জগন্মোহনকেই বরদকামেশ্বরী বেশী ভালবাসতেন।

—কী ব্যাপার মোহন। বউদি কি বিশাখপট্টনমে আছে? তুমি মাদ্রাজ যাচ্ছ নাকি? পিসিমার প্রতি তোমার খুব টান তাই দেখতে এলে—না? কতবার তো মাদ্রাজ গেছ কবার এখানে নেমেছে!

—কী করবো পিসিমা—কাজ থাকে। আমিও পিসেমশাইয়ের মহা-শাসনসভার সদস্য হবার চেষ্টা করছি। কী যে হবে জানি না, কিছু খবর নেবার জন্যই আজ মাদ্রাজ যাচ্ছি। এত জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে আর শারদাকে দেখতে একবার নেমে গেলাম। যাই বল পিসিমা শারদার চেহারা কিন্তু খুব খুলছে।

—তোমার ঘরের লক্ষ্মী হবার কথা যার ছিল তার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত এই লিখন হলো? তোমাদের দুজনের জুড়ী কি সুন্দর হত। সবদিক থেকেই তোমরা দুজনে ভালই ছিলে। আমারও চোখ জুড়োত। তোমার চেহারার সঙ্গে শারদার চেহারা মানাত ভাল। আর শারদার পাশেও তোমাকে বেশ মানাত। দুজনকে মদন-রতির মত দেখাত। আমি কিছুতেই তোমার পিসে-মশায়ের মতলব বুঝতে পারি না। আমার তো ঐ জামাইকে দেখে—

—না, ওকথা বোলো না। সে কি কারোর চেয়ে পাত্র হিসেবে কম সুন্দর।

—সুন্দর না ছাই! একটা রাক্ষসের মতো।

—শারদাকে সত্যি দেবকন্যার মতো দেখায়।

—একে যে শ্বশুর বাড়িতে কী করে পাঠাব তাই ভেবে পাচ্ছি না।

—তা হলে কি ঘরজামাই করে রাখবে?

—ঘরজামাই, ওকে দেখলেই তো আমার ভয় করে। তার উপর প্রত্যেক দিন যদি ওই চেহারা দেখতে হয় তাহলে তো আমি বাঁচবোই না।

মা এবং জগন্মোহনের কথা শারদা শুনছিল। ওদের কথাবার্তা অপ্রিয় বলেও মনে হয়নি। মা বহুবার তার সামনেই জামাইয়ের নিন্দে গেয়েছেন। ভালমন্দ মুখে যা এসেছে তাই বলেছেন। সে নিজেও মনে মনে শ্বশুর বাড়ির লোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। সূর্যকান্তমকে অবিশ্যি সে মনে মনে ভালবাসে। নিজে যে ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে তাতে সে গর্বিত। তাই সূর্যকান্তম সম্পর্কে যখন সে চিন্তা করে তখন সত্যি সে তার জন্য অস্বস্তি অনুভব করে। শারদা ভাবে তার স্বামীর কথা! বাবা যে কেন ওঁকে কেন এত ভালবাসেন ভেবে পাই না! লোকে বলে, বাবা খুব বুদ্ধিমান। আজকাল উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মতো আমি কাকে ভালবাসি? সবাই বলে আমি সুন্দর। আমার মতো সুন্দর মেয়ের যোগ্য স্বামী কে হতে পারে? শারদা এই ধরণের কথাই সব সময় ভাবে।

—শারদা কী ভাবছ বলো তো? জগন্মোহন প্রশ্ন করে।

—কিছু না।

বরদকামেশ্বরী সরে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

—স্বামীর কথা ভাবছ নাকি?

—ছি!

—ছি আবার কিসের? যাক, আমার আর কী। তবে যাই বল শারদা তুমি কিন্তু অনেক বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছ। আমি বহু সুন্দরী সিনেমার অভিনেত্রীদের দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী কাউকে আমি দেখিনি।

—তুমি সব সময় প্রশংসাই করে থাক।

—কী বলছ! প্রশংসা? আমি হলপ করে বলতে পারি যে আজ যদি সারা বিশ্বের সুন্দরীদের প্রতিযোগিতা হয়, নিঃসন্দেহে তুমি শ্রেষ্ঠ হবে। আমি বহু মেয়ে দেখেছি শুধু ইংরেজ যুবতীদের নয়, আরও বহু দেশের তরুণীদের দেখেছি। কিন্তু তোমার সমতুল্য হবার যোগ্যতা কারও নেই।

—তাহলে তুমিও বাবার মতো শাসনসভার সদস্য হতে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

জগন্মোহন শারদার কাছে গিয়ে তার কোমরে হাত দিয়ে বলল, "আমাদের দুজনকে সত্যি কী সুন্দর মানাত। ভগবান যে কেন এ-রকম

ওলট-পালট করে দিল তাই ভাবি। ইংলণ্ডে বিয়ের পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের রেওয়াজ আছে। এখানে তা নেই। একবার ছেড়ে দিয়ে সেখানে আবার বিয়ে করা যায়। একাধিকবার বিয়ের রেওয়াজ সেদেশে আছে।”

শারদা নাক কোঁচকালো।

—শারদা, তুমি এবছর স্কুল ফাইনেল দিচ্ছ না, কিন্তু আমাদের মত জমিদারদের এসব পরীক্ষার কী দরকার? লেখাপড়া তো শুধু চাকরির জন্যে।

—তাহলে কি বাবাও চাকরির জন্যে লেখাপড়া করেছিলেন?

—তোমার বাবা জমিদার মানুষ। তাঁর লেখাপডা সত্যি সত্যি একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ লোক লেখাপড়া করে কেন? চাকরির জন্যই তো?

—বড় হবার জন্যেও তো লোক পড়াশুনা করে?

—ওদের মাথা আর মুণ্ডু। বেনেরা কি বড় হবার জন্যে লেখা পড়া করে?

—তাহলে আর কিসের জন্যে?

—এমনি।

—তাহলে আমাদের মতো জমিদারের লেখাপড়া করাও তো একটা শখের ব্যাপার। ঐ শখ না থাকলে লেখাপড়া না করলে কোন ক্ষতি নেই।

—যাক এখন বলো দেখি, মাদ্রাজ থেকে তোমার জন্যে কী আনব?

—আমার কিচ্ছু দরকার নেই।

—শারদা তুমি আমাকে ভালবাস না?

শারদা কোন কথা বলল না। মুখ টিপে হাসল শুধু। ইসারায় বলল আমি জানি না।

—ইংরেজরা বলে, চুপ করে থাকাই নাকি স্বীকৃতির লক্ষণ। তুমি কি বলতে চাও একটু বলো না?

শারদা হাসি বন্ধ করে কী যেন ভাবতে থাকে।

—শারদা তোমাকে দেখে যে মুগ্ধ না হবে সে মানুষই নয়। তোমাকে দেখে ঋষিদেরও ইচ্ছে করবে ভালবাসতে। আর আমার মতো লোকের তো কথাই নেই।

ইতিমধ্যে শারদার ছোট ভাই কুমাররাজ কেশবচন্দ্র রাও ছুটতে ছুটতে সেখানে এল। তার বয়স পাঁচ বছর।

—দিদি, দিদি, আমার কুকুরটা আজকাল সার্কাসের কুকুরের মতো অনেক খেলা দেখাচ্ছে।

—তুমিও সার্কাস কোম্পানি চালাবে নাকি? জগন্মোহন তাকে বলল।

—খুব বড় সার্কাস কোম্পানি খুলব। বাবার কাছে তো ঘোড়া আছেই। হাতি আর তিনটে বাঘ কিনে নেব।

—কত টাকায় কিনবে ভাই?

—একশো কিংবা এক লাখ টাকা দিয়ে কিনে নেব।

১২। কেশবচন্দ্র রাও

শারদার পর তিনটি সন্তানের মৃত্যু হয়, তার পরে কুমাররাজ কেশব রাওয়ের জন্ম হয়। সে মেয়েদের মতো সুন্দর, মাখমের মতো মোলায়েম, বড় আদর-যত্নে সে গড়ে উঠছিল। বড়দির চেয়েও ছোড়দিকে সে বেশি ভালবাসত। মার সে ছিল চোখের মনি। মা তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিতেন না। প্রায় প্রত্যেক দিনই ডাক্তারের যাতায়াত ছিল ও বাড়িতে। একটু কিছু হলেই আর রক্ষে নেই, মায়ের খাওয়া স্নান ঘুম সব বন্ধ! ছেলের মধ্যেই যেন তার প্রাণভোমরা লুকিয়ে রয়েছে।

বাবাও ছেলে বলতে অজ্ঞান; ছোট্ট ছেলেদের কাছে ডেকে অবশ্য বেশি আদর দিতেন না। কালেভদ্রে ছেলেকে ডেকে তাকে একটু কোলে নিতেন, তার মাথায় চুম্বন করতেন।

কেশবচন্দ্রের কথা খুব মিষ্টি। ছেলেটি কয়েকজনের কাছে সাগ্রহে যেত আর কারো কারো কাছে যেত না। নারায়ণ রাও প্রথম যেদিন শারদাকে দেখতে এল, সেই দিনই কেশবচন্দ্রের তাকে ভাল লেগে গেল। তারপর থেকে নারায়ণ রাও যেদিনই আসে এই বাড়িতে সেদিনই তাকে কাছে ডেকে আদর করে, তার সব প্রশ্নের উত্তর দেয়, এবং সহজবোধ্য করেই দেয়। ছোট ছোট গল্পও শোনায়।

নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই প্রীতির সম্পর্ক দেখে জমিদার মনে মনে খুশী হতেন। কিন্তু ব্যাপারটা বরদকামেশ্বরীর কাছে আদৌ ভাল

লাগত না। তাঁর সবসময় ভয়, নারায়ণ রাওয়ের শক্ত হাতের মুঠোয় ছেলেটি পিষে না মরে। নিজেই ছেলেকে শিখিয়ে দিতেন, "খোকা, নারায়ণ রাওয়ের কাছে যেয়ো না—খুব গেঁয়ো লোক। ওর কাছে গেলে তুমিও গেঁয়ো হয়ে যাবে।"

—না, জামাইবাবু গেঁয়ো লোক নন, আমাকে কেমন সুন্দর সুন্দর গল্প শোনান। কত কথা আমার কাছে বলেন। দিদির চেয়েও ভাল ভায়েলিন বাজান, শুনতে বেশ লাগে!

মা তার কথায় জবাব দিতে পারতেন না, চলে যেতেন। সেই ছোট্ট বালকের মনও বুঝেছিল তার জামাইবাবুকে একমাত্র বাবা ছাড়া আর সকলেই বিদ্রূপ করে। আজ জগন্মোহন রাওয়ের সঙ্গে শারদাকে কথা বলতে দেখে তার কেমন যেন খারাপ লাগল! জগন্মোহন রাও তাকে দেখে যখন বলল, "কী হে কুমার রাজাসাহেব? তোমার বই পত্তর কোথায়?"

—নেই, কী জানি কোথায়! জানি না।

—রাগ করেছ নাকি?

—না তো।

—দেখেতো মনে হচ্ছে রাগ করেছ।

—আমার কাজ আছে···ওরে এই রামুডু···

"বাবু" বলে রামুড়ু ছুটে এল। কেশবচন্দ্র ইসারায় তাকে কোলে নিতে বলল, চাকর তাই করল। শারদা ভিতরে চলে গেল।

জগন্মোহন সোফায় বসে শারদার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল শারদা নিশ্চয়ই তার ঐ স্বামীটিকে চায় না। আমি তো এ বাড়ির জামাই হতে পারতাম। সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে পিসি আমার সাহায্যেই করছে। পিসি যদি এইভাবে সাহায্য করে যায়, তা হলে আমি শারদাকে আলিঙ্গনে বাঁধতে পারবই। ভাল কথা—ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তখন কী হবে?

শারদা ভিতরে চলে গেল। সংগীতকক্ষে গিয়ে শ্রীরামাইয়া মশায়ের সামনে বসে ভায়োলিন বাজাতে লাগল।

শারদার জন্যে তার বাবা একজন বন্ধুর মারফত হল্যাণ্ড থেকে ভায়েলিন আনিয়েছিলেন। বাদ্যটি আরবদেশের সারঙ্গী শ্রেণীভুক্ত। আরব সভ্যতা

যখন পাশ্চাত্যদেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ফরাসীরা সেই সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে ভায়োলিন বানাতে শিখল—বিশেষ করে ফ্রান্স, ইটালি, জর্মান, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ভাল বেহালা তৈরী হয়। বহু ভায়োলিন আছে যার এক-একটির দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। তার ধ্বনি গম্ভীর এবং সূক্ষ্ম।

সারঙ্গী ভারতে আমদানি হয়েছে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে। আঠারো শতকে ফরাসীরা এদেশে ভায়োলিন নিয়ে আসে। উনিশ শতকে এই বাদ্য ভারতীয় অন্যান্য বাদ্যের মধ্যে গণ্য হয়। আধুনিক কালে সেকালের বীণার স্থান বেহালা পায়।

অন্ধ্রদেশে এই বাদ্য বিশেষ করে বাঈজীদের নাচের সময়ই ব্যবহার করা হত। যেদিন থেকে উচ্চশিক্ষিতরা এই বাদ্যটিকে উচ্চস্তরের বাদ্য হিসেবে স্বীকার করে নিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে সোবিন্দ্রস্বামী পিল্লাই, চোডাইবা, অন্ধ্রের কোটাইয়া, বারানসী ব্রহ্মাইয়া, বল্লরামাইয়া, হরিণাগ ভূষণম, দ্বারম, ভেঙ্কটস্বামী নায়ডু প্রমুখ এই বাদ্য বাজিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। দাক্ষিণাত্যে এই বাদ্যের প্রচলন এত বেশী যে তার ফলে এমন নিপুণ বাজিয়েও তৈরি হয়েছেন, যাঁরা ইউরোপের বহু শিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেন। জর্মানিতেও এর প্রচলন রয়েছে। হল্যাণ্ডে যে ধরণের ভায়োলিন তৈরী হয়, জাপানেও হয় সেই ধরণের।

শ্রীরামাইয়া প্রবীণ ভায়োলীন যন্ত্রশিল্পী। কণ্ঠসংগীতেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় মেলে। বহু ভালভাল গাইয়ে ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। শিক্ষকের মন ভাল হওয়া চাই। শিষ্যের মন বা অভিরুচি অনুধাবন করার মতো শক্তি তাঁর থাকা চাই। তা নাহলে সংগীত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়না। শিল্পী যতই পণ্ডিত হোন না কেন, তাঁর পাণ্ডিত্য সবই গুপ্তধনের মতো গুহায় আবদ্ধ থাকে। বহু এম.এস.সি. এবং বি. এস. সি. পণ্ডিত ছাত্রদের কাছে মুখ খুলতে পারেন না।

শ্রীরামাইয়া ছাত্রদের খুব চমৎকারভাবে শেখাতেন। তাঁর কাছে শিক্ষা-লাভের সুযোগ শারদা মহাভাগ্যের ফলে পেয়েছে। একথা ভেবে জমিদারও কম আনন্দিত হতেন না।

সেদিন রামাইয়রা ত্যাগরাজের বিখ্যাত এন্দারোমহানুভাবুলু……গীতটি শেখাচ্ছিলেন।

কুমার রাজা কেশবচন্দ্র রাওয়ের শৈশব থেকেই গান শোনার আগ্রহ ছিল। শারদা যখনই গান শিখতে বসে, তখনই টের পেয়ে গান শোনার জন্য সে ছুটে আসে। যেখানেই থাকুক না কেন, গানের সুর কানে গেলে আর এক মুহূর্তও দেরী তার সয় না।

সেদিনও শারদা যতক্ষণ পুরোনো পাঠ দিচ্ছিল ততক্ষণ সে কিছু করেনি। যে মুহূর্তে নতুন গানের কলি তার কানে গেল সে তৎক্ষণাৎ রামুডুকে ডাকল।

—"ছোটবাবু ডাকছেন নাকি?" রামুড়ু এসে বলল।

ব্রাহ্মণ জমিদারদের বাড়িতে যে কোন জাতের চাকর থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বলমা, ক্ষত্রিয়, কাপু, কম্পা প্রভৃতিদের জমিদারদের বাড়িতে চাকর হিসেবে রাখা হয়। ওরা জমিদার পুত্রদের, বাবু, ছোটবাবু—কুমার, রাজা বলে ডাকে।

জমিদারপুত্ররা এমনিতেই একটু আদুরে হয়, আর তার উপর কেশবচন্দ্রের তো কথাই নেই, সে যে তিনটি সন্তানের মৃত্যুর পরে জন্মেছে। তাই চাকরদের কাছেও তার আদর বেশী। চাকরদের নাগালের বাইরে যাবার তার উপায় নেই। খেলার সামগ্রীও কম ছিল না তার মোটর, ট্রাম, ইঞ্জিন প্রভৃতি সবই ছিল।

কেশবচন্দ্র অত অল্প বয়সেও মিতভাষী, যে দু'চারটি কথা বলত মিষ্টি করেই বলত। মাঝে মাঝে তাকে বড়দের চেয়েও গম্ভীর দেখাত।

তার মা তাকে কখনও বা কৃষ্ণের পোশাক পরাত আবার কখনও আকবর বাদশাহের। আবার কোনোদিন সম্রাট পঞ্চম জর্জের।

১৩। শাসনসভা

জমিদারমশাই আইনসভার বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য মাদ্রাজে গেলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্টেশনে তাঁর জামাই উপস্থিত ছিলেন। কথা বলতে বলতে ওঁরা ঘরে পৌঁছলেন। ল' কলেজ দুপুর একটায় বন্ধ হয়ে যায় তাই নারায়ণ রাও বলল, সুযোগ পেলে সেও আইনসভার

ভেতরে দেখতে যাবে কী ভাবে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়।

আইনসভার সদস্যরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে বসেন, সরকার সদস্যরা অধ্যক্ষের ডানদিকে এবং বিরোধীরা তাঁর বাঁদিকে বসেন। সরকারী সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী গভর্ণর, কার্য নির্বাহকসভার সদস্য এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত যাঁরা তাঁরা সকলেই উপস্থিত থাকেন। বিরোধীরা তাঁদের বিপরীত দিকে বসে সরকারের দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করে, তাঁদের মুখোশ খুলে দেন।

যেসব প্রশ্ন তাঁদের থাকে, সেগুলোকে আগ ভাগেই লিখিতভাবে উপস্থিত করতে হয়। একটি প্রশ্নের জবাব দেবার সময় সে প্রসঙ্গে সম্ভবত আরও ছোটখাট প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া হয়। যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলো জেলা কালেকটরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তার উত্তর চাওয়া হয়। ওঁরা যে উত্তর দেন সেগুলোই শাসনসভায় পঠিত হয়। মাঝে মাঝে এক একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা সরকারকে নাস্তানাবুদ করে তোলেন। হিমসিম খেতে হয় সরকার পক্ষকে।

মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমস্যা প্রবল। এই সমস্যা বোম্বাইয়েও কিছুটা আছে। ইংরেজদের মাদ্রাজে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরাই সমস্ত চাকরি দখল করে নেয়, বিশেষ করে তামিলনাড়ের আইয়ার এবং আয়েঙ্গাররা বড় বড় পদ হাতিয়ে নেয়। দক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণদের অত্যন্ত হীন দৃষ্টিতে দেখে। ব্রাহ্মণদের পাড়ায় (অব্রাহ্মণদের আগমন একরকম নিষিদ্ধ ছিল।) কোনো ব্রাহ্মণের বন্ধু হলেও তাকে নিমন্ত্রণ করলে বারান্দায় খেতে বসানো হত। হোটেলে ব্রাহ্মণদের এবং অব্রাহ্মণদের আলাদা বসবার জায়গা।

দিনকে দিন ব্রাহ্মণদের উপর অব্রাহ্মণদের রাগ বাড়তে লাগল। তারাও নিজেদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে লাগল। ডাঃ নায়ারের সভাপতিত্বে একটি সংগঠন গড়ে উঠল। ভাষণ এবং লেখার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চলতে লাগল। এই সমস্যা অন্ধ্রেও ছড়িয়ে পড়ল। ত্যাগরাজ সেট্টি, কুর্মিভেঙ্কটরেড্ডীনায়ডু, রাসপান গড়, রামস্বামী মুদালিয়র প্রমুখ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। আন্দোলনের সূত্রপাত যিনি করেন সেই ডাঃ নায়ার পরলোক গমন করেছেন, ইতিমধ্যে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।

অব্রাহ্মণরা সরকারের পক্ষ নিল। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী শাসনসভার সদস্যসের মধ্য থেকে মন্ত্রী চয়ন করা হল। শোনা যায়, অব্রাহ্মণ নেতারা নাকি এই বলে হুমকী দিয়েছিল যে তাদের যদি মন্ত্রিপদ না দেওয়া হয় তাহলে তারা কংগ্রেসে যোগদান করবে। তখন লর্ড ওয়েলিংটন রাজা পানগড়কে মুখ্যমন্ত্রী (এবং ওয়েঙ্কটরেড্ডীনায়ডু ও পরশুরাম পাত্রীকে উপমন্ত্রী) নিযুক্ত করলেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অনুষ্ঠিত বারদৌলী সত্যাগ্রহ যখন চৌরীচৌরার ঘটনার পরে বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গঠিত 'স্বরাজ্য পার্টি' আন্দোলনে যোগ দিল।

অসহযোগীদের সংখ্যা যেহেতু বেশী ছিল, স্বরাজ্য পার্টি মাত্র নাগপুরে এবং বাঙলাদেশেই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। মাদ্রাজেও এর শক্তি বর্ধিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বহু দেশপ্রেমিক আলাদা আলাদা পার্টি বানিয়ে স্বরাজ পার্টিকে সাহায্য করতেন। এঁদের দলের মধ্যে আমাদের জমিদারও ছিলেন।

সেদিন আইনসভায় কৃষ্ণা এবং গোদাবরী জেলার কিষানদের অবস্থা সম্পর্কে জমিদার কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। স্বামী ওয়াঙ্কেটলেম শোট্টি প্রমুখ জমিদারের পক্ষ নিলেন। আধঘণ্টা ধরে এমন ওজস্বিনী ভাষায় তিনি ভাষণ দিলেন যে মনে হল সরকারকে তাঁরা কণ্টকাকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর জমিদার অন্ধ্রবিভাজন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন : "অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এ-প্রস্তাব আবার উত্থাপন করছি। অন্ধ্রের বিভিন্ন নেতা এই আন্দোলন সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই আন্দোলন পনেরো বছর ধরে চলছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস এই আন্দোলনের ঔচিত্য স্বীকার করে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের রায় দিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাজের প্রায় অর্ধেক তেলুগুভাষী এগারোটি জেলা ছাড়াও এজেন্সি ক্ষেত্রও রয়েছে, এই ক্ষেত্রে আয় যা হয় তা দুইকোটি টাকার অধিক। অন্ধ্রের অর্ধেক আমদানি এই অংশ থেকেই পাওয়া যায়। অন্ধ্রদেশ, আসাম, মধ্যভারত এবং পাঞ্জাবের চেয়েও বড়। এমন কি আজকাল সরকারী কাজ কর্মও পৃথকভাবে হয়। পুলিশ, আবগারী, রেভিনিউ, শিক্ষা, পাবলিক

ওয়ার্কস, মহকুমা, অরণ্য, জেল প্রভৃতি বিভাগের প্রধানরাও আঞ্চলিক লোক। প্রাদেশিক শাসক এবং জেলা শাসকের মধ্যবর্তী দু-একজন প্রশাসক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিও অন্ধ্রপ্রদেশীয়। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের কাজও এমনভাবে পরিচালিত হয় যা অন্ধ্ররাজ্য গঠনে সহায়ক।

হাইকোর্ট মাত্র একটিই আছে ; এবং তাও মাদ্রাজে। এক-একটি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোর্টের অত্যন্ত বিলম্ব হয়। বছরের পর বছর এক-একটি কেস্ ফাইল চাপা হয়ে থাকে। এই অবস্থায় দুটি বিচারালয় স্থাপন করার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি যে তথ্য উপস্থিত করেছি তাতে এটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অন্ধ্রবিভাজনের ফলে কোন ক্রমেই খরচ বেড়ে যাবে না। দেশভাগ যদি না হয়, পৃথক প্রদেশ যদি গঠিত না হয়, তাহলে এই আন্দোলন আরো তীব্র হবে। এই মনোভাব আরো সুদৃঢ় হবে যে তামিল ভাইরা অন্ধ্রদের এগোতে দিচ্ছে না। অপরপক্ষে দুটি প্রদেশ যদি গঠিত হয়, তখন পরস্পরের প্রতি সহৃদয়তা এবং মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এইভাবে জমিদার দেড় ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে আরো কয়েকজন ভাষণ দান করলেন। বিলম্ব হয়ে যাওয়াতে ভোটাভুটির আগেই বিরতি ঘোষণা করা হয়।

জলযোগের জন্য আইনসভা মুলতুবী ঘোষণার পর আইনসভার রেস্তোরাঁ থেকে নিজের, জামাইয়ের এবং তার দুই-তিনজন বন্ধুর জন্য জমিদার টিফিন আনালেন। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে জামাইয়ের এবং তার বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, পরে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলেন তখন অন্ধ্র পত্রিকার পক্ষ থেকে শাসনসভার কার্য বিবরণী সম্পর্কে রিপোর্ট নেবার জন্য আগত রিপোর্টার পরমেশ্বরকে জমিদার বললেন, "দেখলেন তো পরমেশ্বর মূর্তি মশায়, এই হল মামলা, আর এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা! সরকার পক্ষের লোকেরা অন্যদের কাঠের পুতুল বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে নিতে চায়। শুধু আমরাই নিজেদের উদ্যোগে কিছু করতে পারি না। মেনে নিলাম যে নির্বাচিত সদস্য সরকারী সদস্যের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। আমাদের মধ্যে থেকে কারো কোনো প্রস্তাব পাশ করাতে হলে গভর্ণর এবং ভাইসরয়ের অনুমতি নিতে হয়। তারপর তা প্রকাশিত হয়, প্রকাশিত বক্তব্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার জন্য একটি সমিতিও রয়েছে। সেই প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে

গৃহীত হলে, তার উপর গভর্ণর, গভর্ণর জেনারেল এবং সেক্রেটারি ফর ইণ্ডিয়ার ছাপ পড়া চাই। এত কাণ্ডের পর সেটা আইন হিসেবে গৃহীত হয়। এখন আপনি সহজেই অনুমাণ করতে পারেন যে এর গতি যে কোনো জায়গায় রোধ করা যায়।"

পরম—এইজন্যেই তো নারায়ণ রাও বলে যে যতদিন না ভালভাবে স্বরাজ মিলছে, ততদিন এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে। দেশের শাসনভার হাতে পাবার পর কিছু করা যায়। শাসনক্ষমতা পাবার পর সেটাকে আমরা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অথবা প্রজাতন্ত্র যাই বলি না কেন তাতে কিছু এসে যায় না।

জমিদার—আমরা যদি ততদিন মুখ বুজে থাকি তখন দেখব যে সরকার এমন সব কাজ করছে যা সহ্য করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই মাঝে মাঝে একটা হৈচৈ লাগিয়ে রাখলে লাভ বই লোকসান নেই।

নারায়ণ—কথা তো সেটা নয়, আর লাভ যা হবে তা সেই মামলা মকদ্দমার মত। একজন হাল চষবে আর তার ফলভোগ করবে আরেকজন। মকদ্দমা বেশীদিন চললে যারা মকদ্দমা করে তাদেরই লোকসান। যদি ধরেও নিই যে যার জিত হয়, তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তাতেও কিন্তু এটা নিশ্চিত যে যতটা খরচ হয় ততটা ওঠে না। ফলে ধারদেনা বেড়ে যায়, সুদ বাড়ে, তাই অবস্থা দিনকে দিন যেভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে অবিলম্বে যদি জোট বেঁধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া না হয় তাহলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। আর আন্দোলন যদি জোরদার হয় সরকার বাধ্য হবে ফয়সালা করতে। সেই আন্দোলনই কংগ্রেস করছে।

জমিদার—ঠিকই বলছ নারায়ণ রাও। আমাদের উদ্দেশ্য সত্যি মহৎ হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের স্বভাবের কথাও মনে রাখতে হবে। একটি ছোট্ট পরিবারেও দেখা যায় চার ভাই থাকলে চারটি পথে চলে। আমাদের দেশে প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে কমপক্ষে তিন কোটি হয়তো এ-বিষয়ে চিন্তা করে। পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেহেতু আমরা সবাই একই স্থানে পৌঁছাতে চাই, আমি নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে আমরা সবাই মিলিত হবই। সর্বদেব নমস্কার, কেশবং প্রতিবাহতি। আর কোনো পার্টি যদি জিদ ধরে বসে থাকে যে অন্যান্য পার্টিগুলো তার মধ্যে এসে

নিজেদের বিলুপ্ত করুক, তাহলে পথেই বাধার সৃষ্টি হবে। এই রকম আমার ধারণা।

নারায়ণ—আমি বলছি না যে আপনার কথা ভুল। আমি শুধু এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে মহাত্মা গান্ধীকে মূর্খ মনে করা অনুচিত। বড় রোগের জন্য তেমনি ওষুধ চাই। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসকই ঠিক ওষুধের সন্ধান দিতে পারে। মহাত্মাগান্ধীও সেই ধরণেরই একশজন চিকিৎসক। তিনি যে ওষুধ দিচ্ছেন তা যদি দেশ গ্রহণ না করে তাহলে দেশের রোগ কী করে সারবে?

জমিদার—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পদ্ধতি একবার কার্যকরী করার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী?

পরম—সেইজন্যই তো গান্ধীজী তাঁকে বাধা দেন নি। নিজে আলাদা হয়ে খদ্দর-হরিজন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

জমিদার—কিন্তু জনসাধারণ স্বরাজ্য পার্টিকে সমর্থন করছে না। সেই জন্যই এই পার্টি অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। আইনসভার সদস্য হয়ে, স্বরাজ্য পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করে, জনসাধারণের যথাসাধ্য কল্যাণসাধন করা কি উচিত নয়?

পরম—সরকার যদি তাতে রাজী না হয়—তখন?

জমিদার—রাজী না হলে গভর্ণরকে আইনসভা রদ করতে হবে। আবার নির্বাচন হবে আর সেই নির্বাচনে জয়ী হবে আমাদেরই পক্ষ। তারপর আমাদের লোক মন্ত্রী হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে।

পরম—গভর্ণর যদি তাতে রাজী না হয়?

জমিদার—রাজী না হলে এই শাসন বিধান বানচাল করে দিয়ে গঠিত কার্যকরী সমিতি শাসনকার্য চালাবে। তখন লোকেও বুঝতে পারবে যে বর্তমান আইসভা পুরোপুরি ধোঁকা দিয়ে চলছিল।

নারায়ণ রাও—মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই জানতে পেরেছিলেন যে এটা একটা ধাপ্পাবাজি। তাই উনি এই রোগ সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। রোগটা টাইফয়েড জেনেও লোককে বোঝানোর জন্য, দেখানোর জন্য, ডাক্তার কুইনাইন দেয়, দিয়ে প্রমাণ করে যে সেটা ম্যালেরিয়া নয়—টাইফয়েড, এবং তারপর টাইফয়েডের চিকিৎসা করে। এই ব্যাপারটাও সেরকম হল না

কি? অবশ্য ইতিমধ্যে এও হতে পারে যে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

জমিদার—আর যদি সত্যি সত্যি ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে!

নারায়ণ—সেই কথা ভেবেই তো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চিকিৎসা চলেছে আর কত বছর চলবে?

পরম—আমাদের দেশ দিব্য, দু-চার বছর যদি বিলম্বিত হয় ক্ষতি কী!

নারায়ণ—তা তো বটেই, আমাদের আত্মা অনাদি-অনন্ত। চিকিৎসারই বা কী দরকার!

১৪। শ্যামসুন্দরী দেবী

নারায়ণ রাও পরদিন হাইকোর্টে আল্লাডি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের কাছারিতে হিন্দু ধর্মশাসন সম্পর্কে বিতর্ক শুনতে গেল। চারটে পর্যন্ত সেখানেই থেকে রামকৃষ্ণ লাঞ্চ হোমে খুব খানাপিনা করে, গাড়ীতে করে কোলপাকে পৌঁছুল সে। সেখানে তার এক সহপাঠী তার অপেক্ষায় ছিল। শ্বশুর তখনও ফেরেন নি। বন্ধুর হাত ধরে বলল, "কিহে কতক্ষণ অপেক্ষা করছ?"

—ভাই নারায়ণ, তুমি কিন্তু আজ আধ-ঘণ্টা লেট।

—কী করবো বলো, দুটো জরুরী চিঠি লিখতে হল, তাই এই দেরী, ক্ষমা করো।

—তাতে কী হয়েছে।

—দশ-মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে আসছি। ইতিমধ্যে তুমি জলযোগ করে নাও।

—কোনো দরকার নেই।

নারায়ণ রাও তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গেল। দাড়ি কামিয়ে নিয়ে সুগন্ধি জলে স্নান করল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে খদ্দরের পোশাক পরে ও-ডি-কলোন মেখে চুল আঁচড়ে, কাঁধে উত্তরীয় চড়িয়ে, চপ্পল পায়ে দিয়ে, হাতে ছড়ি নিয়ে বন্ধুর কাছে এল। তার আসার আগেই বন্ধু জলযোগ সেরে নিয়েছে।

শ্বশুরের বড় গাড়ীখানি গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু তাতে উঠে বসল। পুন্নসহে হাইরোড, এগামার, হারিসপুল, রাউণ্ডথানা মাউন্ট রোড প্রভৃতি পথ ধরে তিরোবল্লিকেন গিয়ে, সেখানকার আকবর সাহেব গলিতে ঢুকে, একটি দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ী দাঁড়াল।

তামিলবন্ধু—এ বাড়ির ভাড়াটে দিনকয়েকের মধ্যেই উঠে যাবে। বাড়িটি খুব একটা ভাল না হলেও, খুব বেশি খারাপও নয়।

নারায়ণ রাও—পাড়াটা তত ভাল নয়। এরা কি ভদ্র পরিবারের?

তামিলবন্ধু—হ্যাঁ, বাড়ির কর্তা জেলার প্রধান ডাক্তার হিসেবে কাজ করে রিটায়ার হয়েছিলেন। পেন্সন পেতেন। এখন আর উনি নেই, মারা গেছেন। এখন এ-বাড়িতে তাঁরই স্ত্রী চারটি ছেলে এবং মেয়েদের সঙ্গে থাকেন। বৃদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেছেন।

নারায়ণ—এরা কি মঙ্গলুরের?

তামিলবন্ধু—এরা তেলুগু এবং মহীশুরের। বাড়ির প্রত্যেকে ইংরেজী এবং তেলুগু ভাষা জানে। মা মঙ্গলুরের বাবা মহীশুরের।

কথা বলতে বলতে দুই বন্ধুতে বাড়ির ভেতর গেল। বৈঠকখানা সুন্দর ভাবে সাজানো ছিল। বেতের তৈরী চেয়ার রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা। টেবিলের উপর ফুলদানী তাতে ছিল রঙ-বেরঙের ফুল। অন্য একটা চেয়ারে বসেছিল আঠারো বছরের একটি ছেলে। ওদের আসতে দেখে ছেলেটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে বলল, ও. সি. নটরাজন, আপনি এসে গেছেন?—আসুন।

নটরাজন—ইনি হলেন আমার তেলুগু বন্ধু নারায়ণ রাও। ভায়োলিন চমৎকার বাজান। আর এ মুঙ্গেশ্বর রাও। থার্ড ইয়ারে পড়ছে।

নারায়ণ রাও মুঙ্গেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক্ করল।

মুঙ্গেশ্বর—বসুন, আমি ভেতরে গিয়ে বোনদের ডেকে আনছি।

সে ভেতরে চলে গেল। নারায়ণ রাও এই প্রথম কলেজে পড়া মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেল। নারায়ণ রাও যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের পক্ষে, একথা সে যত্রতত্র বলে বেড়াত। মেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল সে। কোনক্রমেই মেয়েদের অশিক্ষিত রাখার পক্ষে সে নয়। তার বাবা

মাঝে মাঝে বলতেন, এখন ওরা অশিক্ষিত থাকলে কোন ক্ষতি নেই—দেশ স্বাধীন হবার পর ওদের শিক্ষিত করে তোলা যাবে।

ইতিমধ্যে মুঙ্গেশ্বর রাও নিজের চার বোনকে নিয়ে ফিরে এল, চারটি তরুণী স্বর্ণলতার মতো, শরীরে গোদাবরীর তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে যেন। তাদের সৌন্দর্যের মধ্যে আর্য রক্তের পূর্ণ প্রকাশ বিদ্যমান।

—নারায়ণ রাও, এর নাম শ্যামসুন্দরী দেবী, এর নাম রোহিণী দেবী, ইনি সরলা দেবী, আর ইনি নলিনী দেবী…এই ভদ্রলোকের নাম নারায়ণ রাও। নটরাজন তরুণীদের সঙ্গে নারায়ণ রাওয়ের পরিচয় করিয়ে দিল। এবং প্রতিনমস্কারের পালাও শেষ হল।

—নারায়ণ, শ্যামসুন্দর দেবী ভায়োলিন, রোহিনী দেবী, বীণা দেবী, সরলা দেবী জলতরঙ্গ, সেতার, সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সুপটু। আর নলিনী চমৎকার বাঁশি বাজাতে পারে। এদের বাবা পেন্সন নেবার পর বহুদিন মহীশূরে ছিলেন। সেখানকার দরবারী পণ্ডিতেরা এদের সংগীত শিখিয়েছেন। শ্যামসুন্দরী দেবী, এই নারায়ণ রাও মশাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সংগীত চর্চা করেছেন। শৈশব থেকেই রামস্বামী আইয়ারের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন। আপনাদের পরস্পরের আলাপ গভীরতর হলে, মনে হয় চর্চা আরও ভালই হবে।" নটরাজন বক্তব্য শেষ করে খুশী হয়ে হাত কচলাতে লাগল।

শ্যামসুন্দরী দেবীর বয়স বাইশ। গায়ের রঙ সোনার মতন উজ্জ্বল। "আপনার আসতে বিলম্ব হওয়ায় ভেবেছিলাম আপনি হয়তো রোজ আসতে পারবেন না"—সে বলল।

নারায়ণ—আমার জন্যই দেরি হয়েছে, ক্ষমা করবেন, একটি প্রশ্ন করছি। মুঙ্গেশ্বর রাও-ও কি কোন বাদ্য বাজাতে পারে?

নটরাজন—পারবে না কেন; কোনোদিন অবশ্য কিছু শেখে নি। তবে বোনেদের বাজাতে দেখে সে প্রায় সব বাজনাই বাজাতে পারে!

নারায়ণ—তাই নাকি, মুঙ্গেশ্বর রাও! তাহলে তো আপনি খুব ভাগ্যবান।

মুঙ্গেশ্বর—নটরাজনের কথা ছেড়ে দিন। সব কথা বাড়িয়ে বলেন।

রোহিনী—বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আপনার মতে সবচেয়ে ভাল কোনটি?

নারায়ণ রাও—আমার মতে বীণা ও ভায়োলিন।

শ্যাম—এ দুটোর মধ্যে আবার কোনটা ভাল?

নারায়ণ রাও—এ বড় শক্ত প্রশ্ন। সেকেলে লোকের কাছে বীণা সমধিক প্রিয়। অবিশ্যি তাঁরাও আজকাল ভায়োলিন পছন্দ করছেন। কিন্তু যে মাধুর্য বীণায় রয়েছে তা ভায়োলিনে নেই। মন এবং মেজাজ ভাল থাকলে দুটোই ভালো লাগে। সত্যি কথা বলতে কী, আমার কাছে বীণাই ভাল লাগে, ওর শিক্ষানবীশী আজও আমি ছাড়িনি।

নলিনী হেসে বলল, আপনার সমর্থন সঠিকভাবে কোনোপক্ষই পেল না।

সবাই হেসে উঠল। নারায়ণ রাও হাসতে হাসতে বলে উঠল, "আপনারা যদি প্রশ্ন করেন যে মালবীয় মশাই ভাল, না গান্ধীজী, তাহলে আমিও এর সঠিক উত্তর কী ভাবে দিই? তবু বলছি, বীণা যতখানি ভাল লাগে, ভায়োলিন ততখানি নয়। স্বামী ভেঙ্কট নায়ডু, বলরামইয়া, সোচিমন্দস্বামী পিল্লাই প্রমুখের গান আমার খুবই প্রিয়।

নলিনী—ফ্লুট সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

নারায়ণ—বাঁশির কথা বলছেন? সেটাও সত্যি খুব ভাল জিনিস। তবে অন্য বাদ্যের তুলনায় সেটা একটু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় কি? অবশ্য সঞ্জীব রাওয়ের মতো দক্ষ লোক বাঁশিতেই বীণা এবং ভায়োলিনের মিলন ঘটাতে পারেন। আপনি বাঁশি কি রকম বাজান সেটা জানতে ইচ্ছে করছে।

শ্যাম—আপনি কি ভায়োলিন এনেছেন?

নটরাজন—হ্যাঁ গাড়িতে রয়েছে। আনছি।

নারায়ণ—আমার বাজনা আর কী শুনবেন। আগে আপনারা বাজান।

শ্যাম—না আগে আপনি।

নটরাজন—আপনারা চারবোনে মিলে আগে বাজান—এইটেই আমার অনুরোধ।

শ্যাম—বেশ তাই হবে।

মৃঙ্গেশ্বর রাও, নলিনী, সরলা ভিতরে গিয়ে তানপুরা, বীণা, ভায়োলিন, সেতার প্রভৃতি নিয়ে এল। রোহিনী ধরল তানপুরা, শ্যামসুন্দরী ভায়োলিন এবং অপর দুজন শ্রুতি মেলাল। পল্লবীর আগে আলাপন করে বাজাতে লাগল।

১৫। বোনেরা

ভগ্নীচতুষ্টয়ের মধ্যে কে যে বেশী সুন্দরী আর কে যে কম, তা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রত্যেকে সমান সুন্দরী হঠাৎ দেখলে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে নাক, নিচের ঠোঁট এবং চিবুকে সামান্য তফাত লক্ষ্য করা যাবে, চোখের ভাবেও সামান্য পার্থক্য ধরা পড়তে পারে। মেজো এবং ছোট বোনটির দেহের গঠন হুবহু একরকমক। বড় আবার এদিক থেকে সেজোর সমতুল্য। বড় এবং মেজোর চুল সামান্য কোঁকড়ানো, অন্য দুটির নয়। বড় এবং ছোট একটু খাটো, অন্য দুজন লম্বা।

শ্যামসুন্দরী দেবীর কণ্ঠস্বর পঞ্চমে বাঁধা। রোহিণী দেবীর কণ্ঠ নিষাদ-শ্রুতিসম্পন্ন সরলা দেবীর কণ্ঠ বেণুনাদ পুরিত, নলিনীদেবীর গলা এখনো পরিণত নয় তবে স্বর মিষ্টি।

শ্যামসুন্দরী মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। মেজো বোন ইণ্টার মিডিয়েটের প্রথম বর্ষে, আর ছোটটি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।

শ্যামসুন্দরীর পরিবার সম্পর্কে নটরাজন নারায়ণ রাওকে কিছু জানিয়েছিল। রাজারাও শ্যামসুন্দরী দেবীর সঙ্গে ক্লাসে কথা বলত বটে, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য মেয়েদের পরিচয় ছিল না কারণ স্বভাবটি তার একটু লাজুক। নটরাজনও যন্ত্রসংগীত শিখছিল। শ্যামসুন্দরীর পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল স্নেহের। নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর যেদিন জানতে পারল যে শ্যামসুন্দরী এবং তার বোনেরা ভাল গান গাইতে পারে সেদিন থেকেই তাদের বাড়ি যাবার ইচ্ছা ছিল।

পরমেশ্বর প্রথম আলাপেই মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে। নারায়ণ রাওয়ের স্বভাব একটু অন্যরকম। সেই ধরণের মেয়ের সঙ্গেই সে পরিচিত হতে চায়, যারা তার সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক। একমাত্র রাজারাওই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে লজ্জা পেত। নারায়ণ রাও এবং নট-রাজনের আগমনের একঘণ্টা পরেই পরমেশ্বর এবং রাজারাওয়ের আসবার অবসর হল। নটরাজনই বন্ধুদের সবাইকে গান শোনাবার জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিল। গান শুরু করতে যাবে, এমন সময় পরমেশ্বর ও রাজারাও-এর আবির্ভাব হল।

—ইনি কবি, চিত্রকার, সংগীতজ্ঞ। অভিনয়েও দক্ষ। নতুন বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচনা করে থাকেন। এভাবে পরমেশ্বরের পরিচয় দেওয়া হল। রাজারাওয়ের পরিচয় আগে থেকেই সবাই জানত।

বৈঠক বসল। নারায়ণ রাও ভায়োলিন বাজালো। পরমেশ্বর অভিনয় করতে করতে গান শোনাল। নটরাজনও শোনাল তামিল সংগীত। শ্যাম, রোহিণী, সরলা এবং নলিনী সবাই যে যার শিল্পদক্ষতা প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। মুঙ্গেশ্বর রাও-ও রাচপ্প, কর্কটাইয়া, বালগন্ধর্ব ফণ্ডেরকরের অনুকরণে গান গাইল।

ওরা পরস্পরের প্রশংসায় মুখর। প্রত্যেকে খুশী। নারায়ণ রাও ভায়োলিনে রাগ শোনাল। অস্পষ্ট, মধুর ধ্বনি, সূক্ষ্ম ধ্বনি—ধীরে ধীরে ক্লাইমেক্সে উঠে থেমে গেল। শ্যামসুন্দরী দেবী তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, "পাণ্ডিত্য যে কত গভীর সে কথা প্রকাশ না করেও বলা যায় যে আপনার তান লয় প্রবাহ সত্যি আকর্ষণীয়। কোত্থেকে শিখলেন এত সুন্দর ভায়োলিন বাজানো?"

—আমি সব সময় ভায়োলিন বাজিয়ে থাকি। জানেন তো আমাদের দেশে বড় বড় সংগীতজ্ঞ জন্মেছেন, হাজার বছর ধরে বহু জনের সংগীত সাধনার ফলে আজ আমাদের সংগীতাকাশে বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। কিন্তু একটি দুঃখ, ত্যাগরাজের পরে আর কোনো বড় সংগীতজ্ঞ জন্মান নি। আমি ভায়োলিন শিখেছি একজন পশ্চিমী সংগীতজ্ঞের কাছে, তাই আমার বাজনায় পশ্চিমী গন্ধ রয়ে গেছে। জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, ইরাণ, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সংগীত মন দিয়ে কান খাড়া করে শুনেছি। গতি রাগ তালের বিষয় অধ্যয়ন করে নতুন নতুন রাগ এবং লয়ের সমাবেশ করার চেষ্টা করেছি।

—রাত আটটা বাজতে চলল এবার আমরা আসি। বলতে বলতে রাজারাও দাঁড়িয়ে উঠল। অগত্যা অন্যরাও উঠে পরস্পরকে নমস্কার জানাল নারায়ণ রাও, রাজারাও, পরমেশ্বর এবং নটরাজন গাড়ীতে বসে গলি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রতীরে গেল বেড়াতে।

প্রত্যেককে যে-যার বাড়িতে নামিয়ে সকলের শেষে নারায়ণ রাও বাড়ি ফিরল। শ্যামসুন্দরীকে দেখার পর থেকে তার মনে একটা আলোড়নের

সৃষ্টি হয়েছে। শ্যামসুন্দরীকে মনে হয়েছে তার বোন—সবশুদ্ধ যেন ছ'টি বোন হল তার। শ্যামসুন্দরীর দিকে তাকাতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সূর্যকান্তমের মুখ। সূর্যকান্তম তার বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। তার প্রতি তার টান ছিল প্রবল। শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্বটা বেশি আর সূর্যকান্তম তার বাৎসল্যের পূর্ণ অধিকারি। তবে আজ থেকে শ্যামসুন্দরীও তার সেই অধিকারের অংশীদারে পরিণত হল।

কিন্তু কী করে স্থাপিত হল এই সম্পর্ক? কেন মনে হল, জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক তাদের? কী করে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে? সে তার ছোট্ট বউটিকে ভালবেসেছে। শারদা তার প্রাণ, আর সৌভাগ্য। তাকে দেখে—নারায়ণ রাওয়ের সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠেছিল। তার আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায়, চুম্বনের আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল সে। একেই কি বলে প্রেমের প্রকাশ? বিচিত্র গতি আর অসীম শক্তি এই প্রেমের!

এ-এক আশ্চর্য ঘটনা। শ্যামসুন্দরীকে দেখে কেন তার মনে এই পুলক জাগল না। তাকে দেখে কেন তার মনে ভ্রাতৃসুলভ স্নেহ জেগে উঠল?

পরমেশ্বরও সাত-পাঁচ ভাবছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন সে, টেরই পেল না কখন বাড়ির কাছে গাড়ী পৌঁছে গেছে। নারায়ণ রাও হাঁক দিল,—"ওহে, ও-কবি আর স্বপ্ন নয়, এবার জাগো।"

—আমি যদি স্বপ্নে ডুবে থাকি, তুমি কি তাহলে মনশ্চক্ষু খুলে বসেছিলে! পাশে বসে আছ অথচ একটি কথাও তো বললে না। কী ব্যাপার?

—টের পেলাম তুমি ভাবছ, তাই ভাবতে দিলাম।

—ও তাহলে তুমি আমাকে দয়া করে ভাবতে দিয়েছ, বাঃ—চমৎকার!

—তুমি কী ভাবছিলে, বলো তো? অবশ্য আমিও যে কিছু না ভেবে বসেছিলাম তা নয়।

—তাই বল। আজ আমার বউ কিন্তু খুব দুঃখিত হবে। সে তো আমার মনের খবর রাখে।

—তা হতে যাবে কেন? তুমি কি আজ প্রেমের অমৃত—অথবা বিষ পান করেছ?

—আরে, ওরা হল অপ্সরী, ওদের দিকে তাকালে ঋষিরাও টলে যাবেন

—নিজেদের মন ঠিক রাখতে পারবে না। রোহিণী দেবীকে তো মনে হল সাক্ষাৎ চন্দ্রমা।

—অ' এতদিনে বুঝলাম তোমার নাম পরমেশ্বর কেন।

—সত্যি কথা বলতে কী, জান? আমাদের উভয়ের চোখ উভয়ের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। বাজানোর সময় সে আমারই দিকে তাকাচ্ছিল বারবার—কী মাদকতাপূর্ণ দৃষ্টি!

—ও কি অতই সুন্দরী?

—আরে তুমি হলে কবি। চিত্রকলাও তুমি ভালবাস। ছবি আঁকতেও পার। সংগীত ও জীবন এক, তা তুমি জান না?

—শোনো পরমেশ্বর, জীবন যদি সুষ্ঠু সুন্দর করে তুলতে হয় তাহলে মেয়েদের দিকে একটু ভক্তি-ভাব নিয়েই তাকানোই ভাল। এতক্ষণ ভাবছিলাম মেয়েরা কী ধরণের জিনিস।

—খুব তো বলছিলে আজকাল আমরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় আছি। প্রাচীনকালের সেই বৈদিক ঐতিহ্যানুসারে চলছি না। আবার নতুন সভ্যতাও গ্রহণ করতে পারছি না।

—এ তোমার কেমনতর কথা!

—আমি দেখছি পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে যারা পড়েছে তারা হচ্ছে না ঘাটকা না ঘরকা—জীবন তাদের বিস্রস্ত হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

—তা ঠিক। সুন্দর পশুতে পরিণত হয়, ওদের দেখে অন্যরা আনন্দ লাভ করে, তাই না? তবে ঐ ধরণের মেয়েদের সম্পর্কে রাজেশ্বরের অভিজ্ঞতা বেশী হতে পারে। কাল সে আসছে। যখন তখন হুট করে রাজমহেন্দ্রবরমে পালিয়ে যায়। ওর মতিগতি খুব ভাল ঠেকছে না।

১৬। পুষ্পশীলা

রাজেশ্বর রাও বি. এ. পড়ছিল। এ বছর তার পড়াশুনা ভাল হচ্ছিল না। মায়ের অসুস্থতার অজুহাতে সে রাজমহেন্দ্রবরম্ চলে গিয়েছিল এবং পুষ্পশীলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সেখানে নানারকমের ফন্দি ফিকির

খুঁজছিল। তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পুষ্পশীলাও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। পুষ্পশীলা সে সময় তার স্বামীর প্রতি অসীম ভালবাসার ভান করে যাচ্ছিল। সুব্বাইয়া শাস্ত্রীরও আনন্দের সীমা ছিল না। এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে মায়ের অসুস্থতার একখানা প্রমাণ পত্র যোগাড় করে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে আর দশ দিনের ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে রাজেশ্বর সেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পশীলার সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ সে পাচ্ছিল না। সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর চাকরবাকরেরা খুব বিশ্বাসী ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার অন্যান্য জিনিসপত্র এবং স্ত্রীর প্রতিও নজর রাখত যাতে কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে না যায়। তারা ঘুষও নিত না আর অপ্রয়োজনীয় কথার মধ্যেও থাকত না।

তার মনের ইচ্ছা সম্বন্ধে জানাজানি হোক এটা পুষ্পশীলা চাইত না। সকলের চোখের আড়ালে হয় বাড়িতে নয়তো অন্য কোথাও সে তার দেখা পেতে চাইত।

রাজেশ্বরের একদিনের আলিঙ্গনের স্বাদ সে পেয়েছিল। সে স্মৃতি আজও তার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। 'রাজী' যদি তার স্বামী হত তাহলে তার জীবনটা সার্থক হত। কিন্তু এখন তো রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে দেখা হবার কোন পথই সে খুঁজে পাচ্ছে না। অবশ্য তার বাপের বাড়িও রাজমহেন্দ্র-বরমেই সে তার সঙ্গে সেখানেও তো দেখা করতে পারে। মতলবটা মন্দ নয়।

পুষ্পশীলা সেদিন তার স্বামীকে আরও আদর করল, ভালবাসা দেখাল। পৃথিবীটা সুব্বাইয়া শাস্ত্রীর কাছে সোনালী—মধুময় বলে মনে হল। নারী কি এতখানি আনন্দের উৎস? ওরা যেন মূর্তিমতী আনন্দ। স্ত্রীকে বাদ দিলে মানুষের জীবনটাই মরুময়।

—তোমার মধ্যে এত প্রেম আছে, পুষ্প?

—আমার জীবনটাই প্রেম।

—তুমি ফুলের মতো সুন্দরী,—আমার প্রাণসুন্দরী!

—আপনাকে নিয়ে আমি কবিতা লিখব। পুরুষেরাই আজ পর্যন্ত কবি হয়েছে। আপনাকে নিয়ে লেখা কবিতা আমি ছদ্মনামে পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবো?

প্রভু আমার, তোমার দিকে তাকিয়ে
তোমার মনের মধুরস হয়ে
তোমার শিরায় শিরায় আমি ধাই।
সুউচ্চ পাহাড়ের উপর
নীল আকাশের মতো আমি তোমার উপরেই
অবিরাম আনন্দে নৃত্য করি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিন্তু পাঠাবার আগে আমাকে দেখিয়ে নিও। কবিতা আমি লিখতে পারি না, পারলে আমিই তোমাকে নিয়ে হাজার হাজার কবিতা লিখতাম।

পরদিন স্বামী আদালতে বেরিয়ে গেলে দাসীকে সরাবার উদ্দেশে একটা চিঠি দিয়ে সে তার কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর গলিরই ছেলেকে দিয়ে রাজেশ্বর রাও-এর কাছেও খবর পাঠিয়ে দিল। সে পেছনের রাস্তা দিয়ে এসে পৌঁছল। রান্নাঘরের আত্মীয়াটিকে একটা কাজে নিয়োজিত রেখে, রাজেশ্বর রাওকে গোপনে দোতলায় পাঠিয়ে দিল। শেষে মাথা ধরার অজুহাতে নিজে উপরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনেক নারী অস্পষ্ট হাবভাবের মধ্য দিয়ে তাদের কামনার কথা ব্যক্ত করে, সেগুলি চরিতার্থ করে নেয়। অনেকে আবার লজ্জা ও ভয় বশত মনস্কামনাকে প্রকাশ করতে পারে না। কামনার কথা নিজের মুখে জানিয়ে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় এমন স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। এদের কামুকতাকে কে বাধা দিতে পারে? এই ধরণের ভালবাসাই রাজেশ্বরের প্রতি পুষ্পশীলার ছিল। সে যেমন করেই হোক না কেন তার ইচ্ছাকে পূরণ করতে চাইত। সব সময়ই যেন রাজেশ্বর রাওকে দেখতে পেত। তার হাসি, তার কথা সে যেন শুনতে পেত।

মিনিট খানেকের মধ্যে সেজেগুজে নিয়ে সে চলে এল। ঘর বন্ধ করে দিল। প্রতিটি মুহূর্ত রাজেশ্বরের কাছে এক-একটা যুগের মতো মনে হচ্ছিল।

—আমি ভাবছিলাম তুমি আসবে না। বুড়ির যেদিন অসুখ করেছিল সেদিন আমি এসেছিলাম। তোমার স্বামীও এসে পড়েছিল। কী জানি আজ আবার কে এসে পড়ে।—আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।

—আপনি পর-পুরুষ। এখানে আসা আমার উচিত নয়। আমি চলে যাই ?

—তাহলে আমায় ডেকেছিলে কেন ?

—কেন আপনি প্রতিদিন আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করেন, সেই কথাটা জিগ্যেস করার জন্য। এখানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প গুজব করেন নাকি ?

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ," রাজেশ্বর রাও তাকে আলিঙ্গন করল।

সে না এলে তার হাজিরি কাটা যাবে এই কথা সহপাঠীরা লেখায় রাজেশ্বর রাও রাজমহেন্দ্রবরম্ ছাড়তে বাধ্য হল। গিণ্ডীর রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে নারায়ণ রাওকে বলেছিল। এই একই কথা সে পরমেশ্বরকেও বলে রেখেছিল। সকালে গাড়ি নিয়ে নারায়ণ রাও 'সেণ্ট্রাল স্টেশনে' গেল। মেল এল।

ছুটিতে আসা দুতিনটি তামিল পরিবার ছাড়া মেলের আর সব যাত্রীরাই ছিল তেলুগুভাষী। ব্যবসা-বানিজ্য আর আদালতের কাজে যারা এসেছে তারা সব থার্ডক্লাসে ঠাসাঠাসি করে বসেছিল। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে শত শত তামিল কুলি ছুটে এল। "মালপত্র নামানোর পরে দর দাম হবে এখন,—আপনি মালিক লোক……আমি গরিব মানুষ,"—কুলীদের বক্তব্য হচ্ছে এই। অনেকের আত্মীয়বন্ধুরা এসেছিল। প্ল্যাটফর্মে হোটেলের এজেণ্টও ছিল। সকলের মিলিত কলরবে ষ্টেশন গমগম করছিল। নারায়ণ রাও ইণ্টার ক্লাসের বগীর কাজে পৌঁছতেই রাজেশ্বর রাও হাসতে হাসতে নেমে এল।

—আরে, এসে পড়লি, তোর মা কেমন আছেন ?

—ভাল আছেন তাই এসে গেলাম।

—চোখ বসে গেছে! দিনরাত বোধহয় মায়ের শুশ্রূষা করেছিস্। নেমে আয় পাগলা, তোর হাল ফিরিয়ে দেব।

—কুলি!

—মালগুলো গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।

—কী দেবেন হুজুর ?

—তোর মাথা, আয়, আয়!

কুলি মাল নিয়ে এল। দুই বন্ধু গাড়ির পেছনে সেগুলো বেঁধে দিল। গভর্ণরের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সেডাপেট হয়ে নারায়ণ রাও গাড়িটাকে গিণ্ডীর দিকে চালিয়ে নিয়ে চলল।

রাস্তায় রাজেশ্বর রাও তার সৌভাগ্যের কথা জানাল।

—যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম তা সার্থক হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে রে নারায়ণ! তার মতো মেয়ে তুই দেখিসনি। আর তার মতো মেয়ের কথা তুই শুনিসও নি। সুন্দরী নারীর সঙ্গলাভে বঞ্চিত মানুষের জন্মই বৃথা!

—আরে, তোর এসব কথা শুনে আমার মাথা খারাপ হবার উপক্রম হচ্ছে।

—নারায়ণ, তুই একেবারে ভীতু আর তুই তোর ভয়টাকেই বলিস ধর্ম।

—আরে শোন, ঠিকমত কথা বলতে শেখ! 'আমি ভুল করেছি। নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি সেটা আমার দুর্বলতা'—একথা বলার বদলে তুই আমাকে ভীতু বলছিস। তোকে ভালবাসি বলেই এসব কথা বলছি। যেভাবেই তুই থাকিস্, তুই আমার বন্ধু তো। পরস্ত্রীকে তুই অথৈ জলে ফেলে দিয়েছিস, তাকে অন্ততঃ টেনে তোল্। আমি একথাই বলব। তারপর তোর যা ইচ্ছা তুই তাই করবি।

১৭। রাজেশ্বর রাও

রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে একরাত কাটাবার জন্য নারায়ণ রাও আর পরমেশ্বর গিণ্ডীতে তার হস্টেলে গেল। রাজেশ্বর তার দুইবন্ধুকে পুষ্পশীলার প্রেমের কথা বলল। "আমার জন্ম দুঃখময়। যা কিছু ঘটার ঘটে যাক, তাকে আমি চাই। লেখাপড়া, জমিজায়গা, বন্ধুবান্ধব, কিছু চাই না,—আমি চাই শুধু পুষ্পশীলাকে।"—রাজেশ্বর রাও বলল।

"স্বামীর কাছে সে যতদিন আছে, তার কাছে যাওয়া আসা মুশকিল। আকাশপাতাল যদি একও করতে হয় তবু তাকে পুরোপুরিভাবে নিজের করে তবে ছাড়ব।"—সে বন্ধুদের জানালো।

নারায়ণ—ফৌজদারী করে তার স্বামী তোকে জেলে পাঠাতে পারে।

রাজেশ্বর—এ জেলের চেয়ে সে জেল ভাল।

পরমেশ্বর—জেলে গিয়ে তোর কী লাভ? পুষ্পশীলা তো সঙ্গে যাবে না।

রাজেশ্বর—নারায়ণ তুই গান্ধীজির শিষ্য। দেশের জন্য তুই জেলে গেছিস। তোর মতো পবিত্র মানুষ যেমন দেশ এবং ধর্মের জন্য জেলে যেতে প্রস্তুত, সেই রকম, আমিও যে কাজকে পবিত্র মনে করি তার জন্য জেলে যাব। এই নিয়ে দেশে যখন আন্দোলন হবে, আইনও তখন পাল্টাবে। পরস্ত্রীর সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্য অন্য দেশে কি কাউকে সাজা দেওয়া হয়?

নারায়ণ—অন্যান্য দেশে বিবাহকে একটি ধর্মীয় সম্পর্ক বলে মনে করা হয় না। বিবাহ সেসব দেশে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির চুক্তিমাত্র। তাই কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ দিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। স্বামীর ইচ্ছায় সে বিয়ে বাতিল করা যায়। আমাদের দেশেও নিচু জাতের মধ্যে এ প্রথার চল আছে। আর্য্যদের বিবাহ মুক্তিমার্গের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের জীবনের পরীক্ষা হচ্ছে আত্মানুভূতির জন্য। চার আশ্রম হচ্ছে এর চারটি ধাপ। সেই জন্য যে বিয়ে একবার হয়েছে তা আর বাতিল হয় না।

রাজেশ্বর—ন্যায় কোনটা তুই-ই বল। আজকাল কি আমরা জীবনকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখি? উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত যেসব কাজ আমরা করে থাকি সেগুলি সবই কি ধর্মসিদ্ধ? সবকিছুই আমরা করে থাকি অন্ধ সংস্কারের বশে। এরকম অবস্থায় বিবাহকে বাতিল করার আইন, স্ত্রীকে পর-পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার অধিকার কি দেওয়া উচিত নয়?

নারায়ণ—সরকারের পছন্দসই ব্যবস্থাগুলোই আজকাল পিনাল কোডে রাখা হয়েছে। যেগুলোকে তাঁরা চান সেগুলোকে তাঁরা কণ্ট্রাক্ট ল-এর আওতায় ফেলে দিয়েছেন। সেগুলোকে যদি বাতিলও করে দেওয়া হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বিবাহ বাতিল করা আমি কোনোমতেই সমর্থন করি না।

পরমেশ্বর—তাও কী, শোন,—আজকালকার যা আইন তা সরকারেরই সৃষ্টি, আমাদের প্রাচীন যুগের আইন নয়। এহেন অবস্থায় যত আইনই তৈরি হোক, আর যেভাবেই সেগুলো তৈরি হোক না কেন, আমাদের কিছু আসে যায় না।

নারায়ণ (রাগতভাবে)—এমনিতেই রাগ হচ্ছে দুর্ভাগ্য বশত দেশ আমাদের পরাধীন। অপরিহার্যরূপে কিছু দোষ এসে গেছে বলেই অবস্থাটা এইরকম দাঁড়িয়েছে। সেইজন্য, যে ধর্ম এখনও আইনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে নি, কমপক্ষে তাকে তো আমাদের বাঁচাতে হবে। তোমরা কি আমাদের অধঃপতন চাও? সেই সমস্ত মূর্খের দলে আমাকে পাবে না, যারা নিজেদের পূর্বাচারপরায়ণ এবং সনাতন ধর্মী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু একথা আমি বলব, যে উদার প্রাণের ফসল হিসেবে বিবেকানন্দ এবং গান্ধীজীর যে সব উপদেশ আমরা পেয়েছি, সেগুলিকে আমাদের কার্যকরী করতে হবে। তাদের মধ্যে দেশের মঙ্গলই নিহিত হয়েছে, তাই কিনা বলো?

রাজ্যেশ্বর—রেগে যাস না! এখন বল্, আমার কী করা উচিত? পরম, তোর কী মত? বল, আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। পড়তে পারি না, শুতে পারি না, খেতে পারি না। বল, নয়তো কোনদিন 'হিন্দু'তে পড়বে, 'জনৈক যুবকের মৃত্যু, এস, আই, আর লাইনে মৃতদেহ, আত্মহত্যা।

পরম—ছিঃ ছিঃ। আমি কেঁপে উঠছি। আমার প্রাণ আইঢাই করছে।

রাজেশ্বর—প্রাণটা গলা দিয়ে যেন বেরিয়ে না যায়।

নারায়ণ—ওর কথা তুই বলিস নে! রবিবার দিন আমি, রাজু, পরম সব আসব; তখন তোর কথা ভাবা যাবে, আয় শোয়া যাক গিয়ে।

রাজেশ্বর—নারায়ণ, আমার যখন ঘুম আসবে না তোদের তখন ঘুমাতে দেব কেন?

নারায়ণ—আরে, তোর মাথা ভেঙে তোকে ঘুম পাড়াব।

রাজেশ্বর—অন্ধ্র আর মাদ্রাজের অন্ধ্রদেশীয় ছাত্রদের মধ্যে তুই সবচেয়ে শক্তিমান হতে পারিস; রাস্তায় ধোপার ছেলেকে পিটতে দেখে সাইকেল থেকে নেমে চোখ রাঙিয়ে ইউরোপীয়ানকে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়াতে পারিস, কিন্তু তোর মারে কি আমার ঘুম আসবে?

সবাই হেসে ফেলল, শোবার সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণ রাও ঘুমিয়ে পড়ল। পরমেশ্বর আর রাজেশ্বর কথা বলতে থাকল। সকাল হয়ে গেল।

সহৃদয় পরমেশ্বর বহুভাবে রাজেশ্বরকে সান্ত্বনা দিল। প্রেমের স্বরূপ কে জানে? প্রেমের কত রূপ আছে। কুকুরের কামেচ্ছাও প্রেম, সুন্দরী নারীকে চাওয়ার নামও প্রেম, করুণাও প্রেমেরই এক অবস্থা, দুটি আত্মার মিলনই

হচ্ছে প্রেমের শ্রেষ্ঠ রূপ। প্রেমের পরম গতি হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার একীভূত হওয়া।

"কতদিন ধরে আমি এমন একজন মেয়ের প্রতীক্ষায় আছি, যে আমার হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে পারে, যে আমায় ভালবাসতে পারবে, যাকে আমি ভালবাসতে পারব। তোর উদ্দেশ্য তো এতখানি নয়, মেয়ে যেমনই হোক চমক-ঠমক থাকলেই তোর পক্ষে যথেষ্ট। আমার তাতে হবে না। কলারস-গ্রাহী মন চাই আমার, শিল্পের সৌন্দর্য চাই, এমন মণিকাঞ্চনসংযোগ কোথায় পাব? এমন মেয়ে যদি জোটে তাহলে দেহসম্বন্ধ আমি চাই না। ইচ্ছে করলে আমায় তুই নপুংসক বলতে পারিস, ভণ্ড বলতে পারিস। যাই বলিস আমি তোয়াক্কা করি না। আমি যে পবিত্র একথা আমি বলি না, দুজন সুন্দরীর সঙ্গে আমি প্রেম করেছি কিন্তু তারপর আমি আর তাদের মুখদর্শন করিনি। নারায়ণ ছাড়া আর কেউ বলে নি যে, 'অন্য নারীকে আমি জানি না, চাইনা, যদি বলে তা জানবি সে মিথ্যা কথা বলছে। দুদিন আগে আমি শ্যামসুন্দরীর বোন রোহিণীকে দেখেছিলাম। সবদিক থেকে সে আমারা বান্ধবী, সুন্দরীও বটে, আমার আদর্শের প্রতিরূপ। যে সুন্দর দেবীকে আমি যুগযুগ ধরে স্বপ্নে দেখে আসছি সে সেই। পরমেশ্বর গাইল—

"ও-সখী বলো না আমায় কে তুমি?
তুমি কি স্বপ্ন সুন্দরী-না-প্রকৃতি প্রেমবালা নবীনা
দূরের নীল আকাশে
মিটিমিটি তারায় নৃত্যরতা মহানন্দলীলায় মগ্না
আকাশগঙ্গার জ্যোতির্ময়ী কন্যা,
ও-সখী বলো না আমায় কে তুমি?"

রাজেশ্বর বললে শ্যামসুন্দরী কে? মেডিকেল কলেজে পড়ে মহীশূরের সেই মেয়েটি না? আমি তাকে খুব ভালভাবে জানি। ওদের সব কয়টি বোন খুব সুন্দরী। ওদের মধ্যে বড় তিনজনকে পাবার চেষ্টা আমি অনেক করেছি। শ্যামসুন্দরী সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি কিন্তু কোনো ফল হয় নি। শ্যাম-সুন্দরী অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। খদ্দর পরে। ১৯২১ সালে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। আবার কলেজে ভর্তি হয়েছে। নির্মল চরিত্রের মেয়ে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ওসব ওর ভান। পরে জেনেছি সত্যই সে অনন্যা।

তোমাদের সঙ্গে আমি সেখানে যেতে পারব না। শ্যামসুন্দরী আমাকে ভয় করে।" ঘুমোতে ঘুমোতে কী জানি কী করে নারায়ণ রাও হঠাৎ জেগে গেল। —কেন, শ্যামসুন্দরী দেবীর কী হয়েছে? তুই তাকে চিনিস?

রাজেশ্বর—আরে ভাই, এ কী? মেয়েছেলের নাম করতেই ওভাবে লাফিয়ে উঠলি কেন? শ্যামসুন্দরী নামের মধ্যে কী আছে?

নারায়ণ—এই রাজী, মুখ বন্ধ কর। বাজে বকিস নে। শ্যামসুন্দরীর চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক তা আমি জানি। স্বপ্নেও আমি এই জিনিসই জানলাম। আর ঠিক সেই সময় তোমরাও সেই কথাই বলছিলে। কথাটা কী?

পরমেশ্বর—ও বলছে যে তার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। গোয়েন্দাগিরি করেও এই কথাই জেনেছে।

নারায়ণ—যাই হোক, ভারতীয় নারীরা সচ্চরিত্রাই হয়।

পরমেশ্বর—তা আমিও স্বীকার করি।

রাজেশ্বর—তুই উঠে পরমেশ্বরের কাহিনী বন্ধ করে দিলি। শুনেছিস, ওর স্বপ্ন-সুন্দরী, আদর্শ নারী জুটে গেছে!

নারায়ণ—রোহিণী দেবী না? বোনগুলো সত্যিই খুব মনোহারিণী। এর পর তুই যখন আসবি তখন সবাই মিলে আমরা ওদের ওখানে যাব।

রাজেশ্বর—তারা আমায় চেনে। আমায় দেখলে ভয় পায়। পরে একদিন বলব এখন।

পরমেশ্বর—ফুলে ফুলে মধুখানেওয়ালী প্রজাপতি ভেবে ইনি তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। ফলে এঁকে হুল সইতে হয়েছে আর তারা গেছে ঘাবড়ে।

নারায়ণ (হাসতে হাসতে)—আরে হতভাগা, বাউণ্ডুলে, পরমমূর্খ!

পরমেশ্বর—আমার নাম তুলে কথা বোলো না!

হাসতে হাসতে সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

১৮। দশহরা

দশহরার ছুটিতে নারায়ণ রাও, জানকাম্মা, সুব্বারায়, সূর্যকান্তম্, রমনম্মা এবং লক্ষ্মীপতি রাজমহেন্দ্রবরমে ছিল। বেঙ্কাম্মা এবং সত্যবতী তাদের বাচ্চাকাচ্চা সহ আর শ্রীরামমূর্ত্তি তার পরিবার নিয়ে রাজমহেন্দ্রবরমে জমিদারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল।

জমিদার নিজে গিয়ে এদের নিয়ে এসেছিলেন। "আমি যেতে পারব না, আপনার মেয়ের শাশুড়ীকে নিয়ে যান।"—একথা সুব্বারায় অনেক বার বলেছিলেন কিন্তু জমিদারমশাই জোর করে তাঁকেও নিয়ে এলেন। সুব্বারায়ের বড় জামাইদেরও তিনি আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা তাদের অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে দিল।

জমিদার এবং সুব্বারায়ের বন্ধুবান্ধবের সুপারিশের জোরে লক্ষ্মীপতির রাজমহেন্দ্রবরমে গভর্ণমেণ্ট কলেজে শিক্ষকতার কাজ জুটে গিয়েছিল। তখন থেকে সে তার মা আর বৌকে নিয়ে রাজমহেন্দ্রবরমে বসবাস করতে শুরু করেছিল। জমিদারের বড় মেয়ে শকুন্তলাও এসেছিল। বড় জামাইয়ের উৎসবের দুদিন এসে থাকার কথা ছিল। বরদকাশ্বেরম্মা স্বামীকে বলে কয়ে তাঁকে দিয়ে জগন্মোহন রাওকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। শারদাকে দিয়েও অনুরোধ করে লিখিয়েছিল। মাদ্রাজ থেকে এসেছিল আনন্দ রাওয়ের স্ত্রী। নারায়ণ রাও আগেই ছুটি পেয়ে গিয়েছিল। সে কোত্তপেট গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌঁছল।

জমিদারের বড় জামাই ডেপুটি কালেক্টার এবং মাদ্রাজ থেকে আনন্দ রাও-ও উৎসবের দিন এসে গেল। নারায়ণ রাও যখন মাদ্রাজে ছিল, আনন্দ রাও ভুলেও তাকে নিজের বাড়িতে আসতে বলে নি। শাসনপরিষদের সভায় যোগদানের জন্য জমিদার এলেপর, তিনি নিজে গিয়ে তাঁকে গাড়ি করে বাড়িতে নিয়ে এলেন। নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে তিনি কথাও বললেন না।

জমিদারের বাড়িতে তাঁর বোন, সুন্দরবর্ধনম্মা নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে কথা বললেন। জমিদারমশাইয়ের গরিব আত্মীয়দের মধ্যে রঙ্গম্মা খুব খুশী হয়ে

তাকে অভ্যর্থনা করল। দাসদাসীরা ভয়ে ভয়ে ভালবাসার চোখে তাকে দেখছিল। তার শাশুড়ী দাসীদের সামনেই তার সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করতেন বলে তারা মৌন থাকাই উচিত বলে মনে করত।

জমিদারমশাই ছাড়াও আর একজন নারায়ণ রাওকে ভালবাসত। সে হচ্ছে কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র জামাইবাবুকে ছাড়ত না। জামাইবাবুর সঙ্গে সে খেতো, গল্প করত। শোবার সময় পর্যন্ত কাছছাড়া হত না, গল্প শুনত। তার মতো ছেলে, যে কারো কাছে যায় না, সে নারায়ণের এতটা ন্যাওটা হওয়ায় জমিদার যুগপৎ আশ্চর্য ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নারায়ণ রাও, বড় জামাই, সুব্বারায়, আনন্দরাও এবং মেয়েদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে ঘর জমিদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত আত্মীয়বন্ধুদের থাকার ব্যবস্থা এই ভাবেই করা হয়েছিল। ঘরগুলিকে সাজানো হয়েছিল। শোবার ঘরগুলি ছিল দোতলায় এবং একতলায় ডান দিকে, পেছনের ঘরের সঙ্গে সামনের ঘরের যোগাযোগ ছিল। জমিদারের অফিস ছিল জমিদার বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ তফাতে, সেটিও দোতলা বাড়ি। সেখানে ম্যানেজারের ঘর, রেকর্ডের ঘর এবং খাজাঞ্চিখানা প্রভৃতি ছিল।

জমিদারবাড়িতে ঘট-প্রতিষ্ঠা, দশদিন পূজা, হরিনাম এবং সংগীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। জমিদার ছিলেন বীরেশলিঙ্গম পণ্ডলুর শিষ্য। সেই জন্যই তিনি পূজাপার্বণে অত উৎসাহ প্রকাশ করতেন।

শ্রী রাজে রাজা বিশ্বেশ্বর রাও—ডেপুটি কালেকটার একবার নারায়ণ রাওয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে ছিল। সে যে শ্বশুরের বেশি প্রিয়পাত্র একথাটা তার জানা ছিল। তার মনে ঈর্ষা এসেছিল। "হোক না ভদ্র, সাধারণ ঘরের এই ছেলেটিকে শ্বশুরমশাই কেন যে এত পছন্দ করেন জানি না।"—সে ভাবত।

সেদিন সে শ্বশুরকে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে আবার কথা বলতে দেখল। জমিদার বড় জামাইকে জানালেন যে নারায়ণ রাও খুবই বুদ্ধিমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষাতেই সে প্রথম হয়েছে।

দুই জামাইয়ের কথাবার্তা শুরু হল। "আপনি তো জেল ঘুরে এসেছেন? তবে কেন কলেজে ভর্তি হলেন?"—বিশ্বেশ্বর রাও জিজ্ঞাসা করল।

—আমি ভুল করেছিলাম। বাপ মায়ের কথা শুনি নি। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পরই সে বছর গ্রীষ্মে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলাম এবং জেলেও গেলাম।

—রাজমহেন্দ্রবরমেই ছিলেন কি ?

—ছমাস রাজমহেন্দ্রবরমে আর চার মাস কডলোরে !

—অঃ !

—জেল থেকে বেরিয়ে এলাম। জেলে যাবার আগে আমি দেশ ভ্রমণ করেছি। বক্তৃতা দিয়েছি। খদ্দরের প্রচার করেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে প্রথমে সংস্কৃত পড়ার কথা ভেবেছিলাম। গুজরাত বিদ্যাপীঠে ভরতি হতে চেয়েছিলাম। বয়স কম ছিল, সাহস ছিল খুব। তারপর এ ধারণাও ছিল যে পরীক্ষাগুলো পাশ করতে পারলে দেশ সেবা বেশি ভাল করে করা যাবে। তাই মাদ্রাজে গিয়ে বি.এ. অনার্স ক্লাসে ভর্তি হলাম। ১৯২৩ সালে ফিজিক্সে অনার্স পেলাম। ইতিমধ্যে স্বরাজ্য পার্টির প্রভাব বেড়ে গিয়েছিল। তাতে যোগ দিয়ে ল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম।

—আপনারা সত্যাগ্রহীরা তো আদালত তুলে দিতে চান। সুতরাং আপনার ল-কলেজে ভর্তি হওয়াটা আশ্চর্য নয় কি ?

—সকলেরই আশ্চর্য মনে হতে পারে। ওকালতি করার উদ্দেশ্যে আমি ভর্তি হইনি। এখনও আমি এ বিষয়ে মন ঠিক করতে পারিনি। কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারি যে এমন একটা কাজ করছি যাতে আদৌ আমার মন নেই।

—আমি বলি কি, সত্যাগ্রহ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে হাইকোর্টে উকিল হয়ে—কিন্তু—মুন্সেফের কাজ অতি সহজেই পাওয়া যায়। যাকগে, জেল কেমন লেগেছিল ?

—প্রথম প্রথম ভয় লেগেছিল, তারপর সহ্য হয়ে গেল।

—আপনাকে দিয়ে কী কাজ করানো হত ?

—আমাদের মত লোকদের তেলের ঘানি অথবা যাঁতা ঘোরানোর কাজ দেওয়া হত। দড়ি পাকানো, কম্বল তৈরি করা ইত্যাদিও। রাজমহেন্দ্রবরমে সে সময় মোপলারা এসেছিল। তাদের পায়ে শেকল লাগিয়ে গরাদের সঙ্গে পশুর মতো বেঁধে রাখা হত।

—খাওয়া-দাওয়া ?

—সত্যমূর্তি মশাই আমাদের জন্য আলাদা খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। সীতারাম শাস্ত্রী কারাধ্যক্ষের কাছে চৌদ্দটি দাবি উপস্থিত করেছিলেন। লণ্ঠন, লেখার কাগজ, আলাদা পায়খানা ইত্যাদি খাদ্যের ব্যাপারে ডাল তরকারি করা। ঘি এবং আটা দেওয়া, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা, মাসে দুটি করে চিঠি লেখার সুযোগ, মাসে একজন আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পা থেকে শেকল খুলে নেওয়া, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়ানো ইত্যাদি।

—দাবিগুলো কি মঞ্জুর হয়েছিল ?

—কোথায় ? রাজমহেন্দ্রবরমে লেখার কালি আর কাগজ দেওয়া হয়েছিল। সাবান, থালা, ঘি, মাখন এসব পাওয়া গিয়েছিল। নিজের লণ্ঠন আনার অনুমতি সকলকে দেওয়া হয়েছিল, কডলোরে কিন্তু এসব সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। আন্দোলন করায় আবার অনেক জিনিস দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমার ছ'মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে ছাড়া পেলাম।

—খুবই কষ্ট। জানি না আপনারা সেখানে কী ভাবে ছিলেন, এই অসহযোগ আন্দোলনকে আমি একেবারে ব্যর্থ বলে মনে করি। যে অধিকার আমরা লাভ করছি, সেটুকুকে সম্বল করে, সন্তুষ্টমনে আমরা যদি শাসনকার্য চালাই তাহলে অন্যান্য অধিকারও আমরা লাভ করব এবং স্বরাজ্যও মিলবে।

—মত ভেদ আছে। এসব ব্যাপারে একমত হওয়া অসম্ভব।

তাদের আলাপ আলোচনা জমিদার চুপচাপ করে শুনছিলেন। নারায়ণ রাও যখন জেলের বর্ণনা করছিল তখন চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল। সুব্বারায়ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

জমিদার ভাবলেন, নারায়ণ রাও বীর। তাকে পুত্র হিসেবে পেয়ে সুব্বারায় নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

নারায়ণ রাও আন্দাজ করলেন যে তাকে পরিহাস করার উদ্দেশ্যেই বিশ্বেশ্বর রাও এসব প্রশ্নের অবতারণা করেছিল। নারায়ণ রাওয়ের হৃদয় ছিল নিষ্কলঙ্ক, সে সত্যভাষী, তার মতে সত্যই সর্বশক্তিমান।

শ্বশুরের মনটার পরিচয় তার জানা ছিল। বাপের হৃদয়ের সঙ্গেও সে অপরিচিত ছিল না। নীচমনী মানুষদের নিম্নস্তরের কথায় নারায়ণ রাও

লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে দেখল। নিজের বংশের মধ্যে সে কোন দোষ খুঁজে পেল না।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল।

১৯। পুরস্কার

শারদা শাশুড়ীর কাছে গেল না। জানকাম্মা এও দেখলেন যে শারদার মা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে নিজেদের আত্মীয়বন্ধুবর্গের সঙ্গে মেলামেশা করে গল্প করছিলেন। সুন্দরবর্ধনম্মা কিন্তু একাই একশো হয়ে জানকম্মা হয়ে তাঁর মেয়েদের দেখাশুনা করছিলেন।

স্বামী যে তার গেঁয়ো—গোঁয়ার জগন্মোহনের কাছ থেকে এ কথা শোনার পর শারদার মনে আতঙ্ক এসে গিয়েছিল।

জগন্মোহন বলেছিল, "স্বামী শিক্ষিত হলেই বা কী লাভ?"

জগন্মোহনের হাল্কা হলুদ রঙের পাশে সুস্থসবল নারায়ণ রাওকে তার কালো বলে মনে হল। দশমীর দিন তারা যখন একসঙ্গে খেতে বসল জগন্মোহনের সামনে সবাইকে তখন নিষ্প্রভ বলেই মনে হল। লক্ষ্মীপতি এবং নারায়ণ রাও যে নিগ্রোর মতো দেখতে, সে দিকে তার মা-ই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তবু মন বলছিল যে স্বামী তার ফর্সা। তার প্রশস্ত বুক, মস্ত বড় মাথা, জ্ঞান, ধৈর্য, শক্তি বেশভূষা শারদার উপর প্রভাব বিস্তার করা সত্ত্বেও মায়ের মনভাঙানির ফলে তাকে তার পছন্দ হচ্ছিল না।

খাওয়ার পর সবাই পান চিবুচ্ছিল। শারদার বাবার ইচ্ছা যে এবার তার মেয়ে শ্রীরামৈয়ার সঙ্গে সংগীতকলা নৈপুণ্যের পরিচয় দিক। "এঁদের জন্য আমাকে কি গাইতেও হবে?" শারদা তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা আজ আমার গাইতে ইচ্ছে করছে না।"

জমিদার তাঁর ছেলেমেয়েদের খুবই ভালবাসতেন। তাদের ইচ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখতেন না। তারা তিনজন বাবাকে ভয়ও যেমন করত ভালও তেমনি বাসত। তারা সব সময় তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। বাবার নিরাশ ভাব দেখে শারদার মনে কষ্ট হল। সে বলল, "আমি নিশ্চয় গাইব।"

"বেশ!" বাবা বললেন, কিন্তু তার ছলছল চোখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন—"শরীর যদি ভাল না থাকে তাহলে গেয়ো না, অন্য কোনো সময় হবে'খন।"

শারদা সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। আদরের মেয়ের দুঃখটা কোথায়—জমিদার ভাবতে লাগলেন। নারায়ণ রাও তার ছোট্ট বউএর জন্য কত উপহার এনেছিল,—যার মধ্যে ছিল আঠারো-শো টাকা দামের সোনার একটা জড়োয়া হার। বউয়ের গলায় নিজের হাতে হারটা পরিয়ে দেবার জন্য সে উদগ্রীব হয়েছিল।

যেমন করে হোক তাকে দোতলায় আনার জন্য সে রঙ্গম্মাকে অনুরোধ করল। সে তাকে একটা উপহার দিতে চায়, কী একটা ছুতোয় রঙ্গম্মা শারদাকে ওপরে নিয়ে এল। নারায়ণ রাও এসে বলল, "শারদা, উৎসব উপলক্ষে আমি তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।" হারটা সে তাকে দেখাল। হারটা না নিয়ে শারদা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। রঙ্গমা বলল, "নিয়ে নাও বাছা, তা না হলে অমঙ্গল হবে।" হারটা শারদা নিয়ে নিল। তারপর নিজের ঘরে সেটা বাক্স বন্ধ করে রেখে নিচে চলে গেল। হারটা গলায় দিলে তাকে কেমন মানায় তা দেখার ইচ্ছা নারায়ণ রাওয়ের ছিল।

একটা মজার জিনিস দেখবার অছিলায় তাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া এবং স্বামীর উপহার দেওয়া দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। রঙ্গম্মার উপর ঝাল ঝাড়ার উপায় ছিল না। চিন্তাগ্রস্ত মনে সে ছোট ভাইয়ের খেলার ঘরে গিয়ে বসল।

—হাতি বেশি জোরে দৌড়ায়, না ঘোড়া?—ভাইয়ের প্রশ্ন।

শারদা কিছু বলল না।

—ছোট জামাইবাবু তোমায় মাদ্রাজ নিয়ে যাবে?

—ছ্যাঃ, কে যাচ্ছে!

—খালি খালি তোমার বেশি বেশি রাগ! জামাইবাবু তোমার চেয়ে ভাল।

ক্ষুব্ধ শারদা সেখান থেকে চলে গেল। পথে তার জগন্মোহনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জগন্মোহন বলল, "শারদা একটু এদিকে এসো না, কোথায় লুকিয়ে ছিলে? তোমাকে সারা দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

তখনও শারদার রাগ পড়ে নি, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসে পড়ল।

"বড্ড রেগে রয়েছ মনে হচ্ছে?—কার ওপর? আমার ওপর নয়ত? দেখো, তোমার জন্য উৎসবের উপহার এনেছি! কত ছোট দেখো ঘড়িটা —চুড়ির সঙ্গে গাঁথা!"—সে বলল।

ঘড়িটা পরখ করে শারদা বলল, "বড় সুন্দর ঘড়ি, বাবা যেটা দিয়েছেন তার চেয়েও।"

"হাতটা দেখি।" শারদার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে ঘড়িটা পরিয়ে দিয়ে হাতটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ করে সে দেখল, তারপর তার ওপর একটা চুমু খেল। শারদা যেন কেঁপে উঠল। হাত দিয়ে শারদার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সে তার মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। শারদার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল, জগন্মোহনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শারদা বলল, "তোমার ঘড়িটা মাকে দেখিয়ে আসি।" এই বলে সেখান থেকে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় নির্জনে বসে জগন্মোহনের আলিঙ্গনের কথা সে ভাবছিল —"ও ভারী ভাল, সুন্দর। কিন্তু ওর আলিঙ্গন আমার ভাল লাগে না কেন? অবশ্য শরীর আমার পুলকিত হয়ে উঠেছিল। দুজনের উপহারের মধ্যে কারটা ভাল? দুইই ভাল।"

জগন্মোহন রাও যে সুন্দর সেকথা সবাই বলে। তবু জগন্মোহন রাও আর নারায়ণ রাওয়ের মধ্যে কে যে বেশি সুন্দর তা সে এখনো ঠিক করে উঠতে পারে নি। কিন্তু জগন্মোহন রাও যে তার চেয়ে বেশি সুন্দর নয় তা-ই বা কী করে হয়?

জগন্মোহনের সঙ্গে বিয়ে হলে সে হত একজন জমিদারগৃহিনী। এখন গ্রামে থাকতে হবে। স্বামী চাকরি করলেই বা কী লাভ?

সে যে তাকে কত ভালবাসত তা নিয়ে জগন্মোহন রাও অনেক গালগল্প ফাঁদবে। কেন? ও বোধ হয় আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মা এবং দিদি বহুবার একথা ভেবেছে যে বড়ই দুর্ভাগ্যক্রমে তার বিয়ে ঐ পরিবারে হয়েছে। এখন তার নিজের ধারণাও সেইরকম হয়ে আসেনি কি?

উৎসবের দিন খাওয়াদাওয়ার পর জমিদার নিজে সুব্বারায়কে রেশমী কাপড় দিলেন। জামাইদের আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের এবং লক্ষ্মীপতি ও শ্রীরামমূর্তিকে তিনি কেশবচন্দ্রের হাত দিয়ে ভেট পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ে-মহলে উপহার বিলোলেন জমিদারনী, সকলে নতুন কাপড় পরল।

সকুটুম্ব সুব্বারায় পরদিন কোট্টপেট পৌঁছলেন। সুব্বারায়ের প্রপিতামহের নাতি রাধাকৃষ্ণৈয়া দোণ্ডপেট থেকে এলেন। পচাত্তর বছরের বৃদ্ধ তিনি। গাড়িতে তিনি যেতেন না। যতদূর হোক না কেন পায়ে হেঁটে যেতেন। সাদা গোঁফ—বড় বড় চুল তাঁর। যেন ভীষ্ম। সুব্বারায়ের চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন।

"ওরে সুব্বারায়, ছেলেপুলে ভাল আছে তো? দেখতে এলাম। আর দেখতে পাব কিনা কে জানে। আরে, তুই যে দুর্বল হয়ে পড়েছিস্। তোদের বয়েসেই আজকাল মানুষ বুড়ো হয়ে পড়ে! তোর ছেলে পুলে কোথায়? এটি বুঝি বড় আর ওটি ছোট? তোর চারটি মেয়ে না? ওটি বুঝি বড়? শ্রীরামমূর্তি, তোর বাচ্চারা কই? ওই ছোকরাটি নিশ্চয় তোর ব্যাটা? আমার বৌমা কোথায়? বিয়ের সময় রাজমহেন্দ্রবরম্ আসব ভাবলাম কিন্তু বিজয়ানগরমে যেতেই হল। হেঁটেই যাই, কিন্তু এবার চলবৈয়া জেদ ধরলো গাড়িতে যেতে হবে। হেঁটে গেলে আমি গাড়ির চেয়ে আগেই পৌঁছতাম। কিন্তু এই প্রথমবার গাড়িতে চড়লাম তো—অদ্ভুত একটা মজা লাগল।—জমিজায়গা কী রকম করলে?"

—আছে, তোমার কাছে কিছুই তো গোপন নেই।

—তোর কাজকর্ম ভাল? শুনলাম জমিদার বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছিস, শুনে খুশী হলাম। তোর দ্বিতীয় বৌটিকে দেখতে হবে, রাজমহেন্দ্রবরম যাবো। তুই তোর ভায়রাকে লিখে দে যে আমি যাচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা করে আমি মোটরে করে দ্রাক্ষারাম যাবো।

—দিন দশপনেরো এখানে থাক!

—না, তা সম্ভব হবে না।

—না, তা বললে চলবে না।

—আচ্ছা!

তটবর্ত্তান্দ্র-বংশের খুব নামডাক ছিল। প্রদেশের সর্বত্র তারা ছড়িয়ে রয়েছে। জমিজায়গাও তাদের প্রচুর আছে। রাধাকৃষ্ণৈয়ার সম্পত্তির পরিমাণও মন্দ ছিল না। কিন্তু চার ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়াতে প্রত্যেকের ভাগে কুড়ি একর করে জমি পড়েছিল। এছাড়া বিয়ে-থার ব্যাপারে কিছু ধার হয়েছিল। এখন সেটা বেড়েই চলেছে।

—ধারধোর সব শোধ হয়ে গেছে?

—কীসের শোধ? আমার ছেলেদের জীবন মনে হচ্ছে মারোয়াড়ীদের হাতে বাঁধা পড়বে। রামচন্দ্রপুরমের ওদের সাত হাজার দিতে হবে। যার দিকে চাই, তার কাছেই ধারি, সর্বত্র ধার বেড়ে যাচ্ছে। কী ভাবে যে শোধ করি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। এমন একজনও নেই যার কাছে দু-দশ টাকা গচ্ছিত আছে।

"হাঁা, দেশের ফসল কোথায় যাচ্ছে? লোকে বলছে যে সরকারের দ্বারা নির্দিষ্ট টাকা আর সোনার এত দামের জন্যই এমন হচ্ছে। বিনিময় দর নামিয়ে টাকার দামটা যদি ঠিক করা যায় তাহলে এ দুঃখ আর থাকে না। জাপানে এই রকমই করা হয়। সেই জন্য তাদের জিনিস পত্রও অত সস্তা। সেখানে ধারও নেই, আর দারিদ্র্যও নেই।"—নারায়ণ রাও বলছিল।

—কী জানি কী ব্যাপার। আমরা ছোটবেলায় যা খেয়েছি তা হচ্ছে ভাত। জিনিসপত্র খুবই সস্তা ছিল। আমাদের পিতৃপুরুষের দুশো একরের মতো জমি ছিল। বাড়ির বাগান ছিল। শাকসব্জী নিজেদের জমিতেই হত। আমার বাবা মাঠ থেকে যবের পোয়াল বয়ে নিয়ে আসতেন। দুনিয়া তাঁর ভয়ে কাঁপত। কোম্পানির রাজত্বের আগের যুগের কথা আমার ঠাকুরদা রাঘৈয়া আমাকে বলতেন। তোমার বাবাও জানেন বোধ হয়। তোমার ঠাকুরদা এ গাঁয়ের জামাই হয়ে এসেছিলেন। সেকালে আমাদের ঠাকুরদার বাবা পালকি করে যখন বেরুতেন, তাঁকে দেখার জন্য লোকের ভিড়ে রাস্তায় জায়গা থাকত না। তোমার ঠাকুরদাই যে আমার ঠাকুরদার বাবা ছিলেন তা কি তুমি জান? বুঝলে সুব্বারায়, নবাবের কাছেও তিনি পাল্কিতে করেই যেতেন!

নারায়ণ—আচ্ছা দাদু, আপনার ঠাকুরদা খুব লম্বা-চওড়া ছিলেন ?

রাধাকৃষ্ণৈয়া—বুঝলে নারায়ণ, আমায় দেখছ তো, আমার তুলনায় আমার ঠাকুরদা ছিলেন মন্দিরের সিংদরজার মতো ! তাঁর মতো শক্তিসামর্থ্য আমাদের মধ্যে কই ?

নারায়ণ—আপনাদের যা আছে আমাদের তাও নেই !

রাধাকৃষ্ণৈয়া—তাঁর সামনে তোমরা কিছুই নও। চোদ্দগাঁ ঘুরে আমার বাবা যখন ঘরে ফিরতেন, মা ধান ভেনে চাল করতো, সেই চালের ভাত আর লাউয়ের তরকারি রেঁধে দিতেন। রান্না হয়ে গেলে ঠাকুরদা ফিরতেন। স্নান এবং আহ্নিক সারতে সারতে বারোটা বেজে যেত, সব মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি পাত পড়ত আমাদের বাড়িতে।

নারায়ণ—মাদ্রাজ যাবার আগে আমি একবার দোগুপেট গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে আসব।

রাধাকৃষ্ণৈয়া চার দিন ছিলেন। সুব্বারায় তাঁর কাকাকে জমি, বাড়ি, বাগান সব দেখালেন।

শুধু অন্ধ্রের নয় সারা ভারতের অধঃপতন হচ্ছে, এই ছিল রাধাকৃষ্ণৈয়ার অভিমত। মানুষ মাত্রেরই সব সময় অসুখ আর অসুখ। শিরদাঁড়া সোজা করে দুপায় হাঁটার ক্ষমতা কারোর নেই। একশো বছর তো পরের কথা, সত্তর বছরও কেউ বাঁচে না।

—আরে সুব্বারায়, প্রাচীন কালের সুকৃতির ফলেই এদেশ এখনো বেঁচে আছে ! তা না হলে কবে শেষ হয়ে যেত। তুমি কী বলো ?

—হ্যাঁ, তাই তো। কোনো পথ নেই। শিক্ষাদীক্ষা, মোটর-রেল, ভেজাল খাবার, এসব কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে।

—আরে এইসব জিনিসের জন্যেই আমাদের এই হাল। লোকে বলে, মোহানার মাটিতে যাদের বাস তারা অন্যদের চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের চেয়ে গরিব আর কেউ নেই। খালের নীচের জমি সব বন্ধ্যা হয়ে গেছে না ?

—তারপর আবার কলে ছাঁটা চাল।

—তা নয়তো কী ? তোমার বাড়িতে ঢেঁকি ছাঁটা চাল দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। আজকালকার লোকেরা গরিব আর শক্তিহীন হয়ে পড়ছে কেন ?

তার কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে দেবতার প্রতি ভক্তি নেই, সন্ধ্যা-আহ্নিক করে না, মন্দিরে যায় না। এদের জন্যেই দেশের এই দুর্দশা।

নারায়ণ—দাদু, এ আপনি কী বলছেন? এই সব পূজো-আচ্চা কোন্ যুগে হত?

রাধাকৃষ্ণৈয়া—কোন্ যুগে? আমাদের যুগে!

নারায়ণ—তা হলে আমাদের জন্মটা কাদের দুর্ভাগ্য? আপনাদের না আমাদের?

রাধাকৃষ্ণৈয়া—তোমাদেরও আমাদেরও।

নারায়ণ—আপনাদেরই মনে করতে হবে! সে ক্ষেত্রে আমাদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে ভক্তি না থাকার কারণ যেহেতু আপনারা, সুতরাং আমরা নির্দোষ। আর কারণ হিসেবে আমাদেরই যদি ধরা হয় তাহলে বর্তমান অবস্থায় আসার জন্যেও অন্ততপক্ষে কোনো না কোনো সময় আমরা দুষ্কর্ম করেছি। তার মানে হচ্ছে এই যে সে সময়ও নাস্তিক ছিল, এবং তখন যদি থাকতে পারে তাহলে এখন থাকার মধ্যে আশ্চর্য হবার কী আছে?

রাধাকৃষ্ণৈয়া—ওরে সুব্বারায়, তোর ছেলে তো ভারি চালাক।

সেদিন সন্ধ্যায় দাদুর কথাগুলো নারায়ণ রাওয়ের মনে পড়ল। সেসব দিনের কথাও মনে পড়ল যখন সে বলত, রাম অথবা ঈশ্বর কারো অস্তিত্বই নেই। ইঙ্গর সোলে'র' বইকে বহুদিন সত্য বলে মনে করেছিল। আধুনিক কালের যুবকেরা সব ভক্তিহীন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের সময় মন্দিরের সান্নিধ্যে এলে যখন তার মধ্যে ভক্তিভাব জেগে উঠত সে সময়কার কথাও তার স্মরণ হল।

ভক্তি কিসের জন্য? মোক্ষ লাভের জন্য? মোক্ষের তাৎপর্য কী? মোক্ষ কি সোঽহং-ভাব? মোক্ষলাভ না হলেই বা ক্ষতি কী? জন্মাবো আর মরবো, জন্ম-মৃত্যুর মাঝে থেকে বিচ্ছিন্ন শয়তান হয়ে থাকলেই বা ক্ষতি কী? ভগবান কে? কোনো একজন শক্তিশালী মানুষ? সেই শক্তিমান মানুষটার জন্ম কে দিল? না কি তিনি নাম, রূপ প্রভৃতির আয়ত্তের বাইরে কোনো শক্তি, এ-ও নয় ও-ও নয়, কিছুই নয়। কিছু না হলেই বা ক্ষতি কী? এইভাবে কখনো কখনো নারায়ণ রাও কষ্টকল্পিত যুক্তির অবতারণা করত। আজ সেইসব পুরানো কথা তার মনে হল।

এই অনন্ত বিশ্বের সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত একটি অংশে একটি কীট মাত্র সে। ভগবান সম্বন্ধে তার বক্তব্য কি সত্য? 'শিবোহহং' এই জ্ঞান লাভের মধ্যেই কি মুক্তি রয়েছে? নয়তো আমিই ব্রহ্ম এবং সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। আমি কি সেই সম্রাটের মতো যিনি স্বপ্নে নিজের মর্যাদার কথা ভুলে যান এবং জাগরণে আবার সম্রাটত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন? ব্রহ্মও কি নিজেকে এমনই মনে করেন? আত্মজ্ঞান পরিপক্ক হলে এইসব বই পড়ে কিছু জানা যায়। কী জানা যায়?—যা জানা যায় তাও তো সব মায়া হতে পারে? সত্যদ্রষ্টা বোধ হয় শ্রেষ্ঠ মানুষরাই হয়ে থাকেন। আচ্ছা, এ জন্মে আমি কি সত্যের সন্ধান পাব? একটি বাসনাও তো আমার দূর হয়নি? শারদা আমার, বন্ধুরা আমার, বিষয় সম্পত্তি আমার, আত্মীয় আমার, বিদ্যা আমার, আমার আমার।—সে ভাবতে থাকে।

২১। স্ত্রী-জীবন, হীনজীবন

পরের দিন সুব্বারায় তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার চিঠি পেলেন। কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে সত্যবতী। বড় ভাল মেয়ে। দেখতে শুনতেও ভাল। কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেহ তার খাক্ হয়ে গিয়েছিল। স্বামী তাকে সব সময় কষ্ট দিত। প্রথম মেয়েটির পর একটি ছেলে হয়ে মারা যায়। এখন আবার সে গর্ভবতী। বরভদ্ররাও ছিল খুব শৌখিন আর নির্দয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ছোট বেলায় সে খুব খোসমেজাজের ছিল। এখন কিন্তু সব সময় আগুন ওগরায়। তার মা পর্যন্ত তাকে ভয় করেন। পোদ্দাপুরুমে ডেপুটি কালেক্টারের অফিসে সে একজন কেরানী। মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা, সাকুল্যে আশী টাকা পর্যন্ত আয় হত।

রেভিনিউ সম্পর্কিত বিষয়ে সে খুব ওয়াকিবহাল ছিল। বাড়িতে যদি সে বাঘ হয় তবে অফিসে ভিজেবেড়ালের বেশি কিছু নয়। অফিসারদের সামনে সে কাঁপত, তাদের সে খুশী রাখত আর গোমস্তাদের ওপর নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোনো বড়লোক এলে তার কাজ সে মুহূর্তের মধ্যে করে দিত। সাধারণ মানুষের সামনে তার রাগের আর রোয়াবের

সীমা থাকত না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যদি বিরক্ত হয়ে বলত, "কেন বাপু, কী ব্যাপার? দাঁড়াও এদের সবাইকে সাক্ষী রেখে, আমি তোমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করব। কালেক্টারের কাছে তোমার নামে নালিশ করব," তাহলে বীরভদ্ররাও তৎক্ষণাৎ মুচকি হেসে নরম সুরে বলত, "আহা, রেগে যাচ্ছ কেন? বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছি। সকাল থেকে খাটছি। সন্ধ্যে পর্যন্ত এভাবে কাজ করতে হলে মানুষ মাত্রই বিরক্ত হয়ে পড়ে। তাড়াহুড়ো কোরো না, বলো, কী করতে হবে?" খানদানী এবং প্রতিষ্ঠিত পরিবারের লোক সে। সেই জন্যই সুব্বারায় তার ঘরে মেয়েকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মেয়ের কষ্টে সুব্বারায় সব সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন।

নারায়ণ রাওয়ের বোনদের মধ্যে সত্যবতীই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। চোখদুটি ছিল তার শিশুদের চোখের মতো ঝকঝকে উজ্জ্বল। হরিণীর মতো সাদাসিধে, সরল আর পতিব্রতা মেয়ে সত্যবতী। তার উপর সে বুদ্ধিমতী। লাঠি দিয়ে স্বামী যখন তাকে প্রহার করত তখন চোখের জল ফেলা ছাড়া সে আর কিছু বলতও না, করতও না। সত্যবতীর মেয়েটিও হয়েছিল সোনার প্রতিমার মত। ঠিক যেন অবিকল তার মা। বাবা যখন তার মাকে মারত সে তখন কাঁদতে থাকত, প্রহারের সময় একদিন সে বাবাকে থামাতে গিয়ে বলেছিল, "বাবাগো, মেরো না, রক্ত বেরুচ্ছে।" ফলে বাবা সেদিন তাকেও নির্দয়ভাবে পিটেছিল।

সত্যবতীর মেয়ে নাগরত্নম্ জানকম্মার কাছে চিঠি লিখেছিল। তাতে লেখা ছিল, "দিদিমা, বাবা আজ মাকে এমন মেরেছে যে মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। দু ঘণ্টা হল জ্ঞান ফেরেনি। বাবা ডাক্তার ডাকতে গেছে। আমাদের ভাড়াটে বিজয়লক্ষ্মী তোমাকে চিঠি দেবার জন্য এই কার্ডটা দিয়েছেন। তিনি এটা পাঠিয়ে দেবেন। বাবার রাগ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। ইতি আপনার নাতিনী—নাগরত্নম্।"

চিঠি পড়ে জানকম্মা অঝোরে কাঁদলেন। সুব্বারায়ও রেগে গেলেন। ভাবলেন কী করা যায়? আমি যখন ছোট ছিলাম সে সময় আমার বোনের ওপর এরকম অত্যাচার যদি হত তাহলে আমি কী করতাম? অমন ভগ্নী-পতিকে মাটিতে পুঁতে ফেলে বোনকে ফিরিয়ে আনতাম না? না, ওরকম করা ঠিক হবে না। পতিব্রতা মেয়ে। পতি-পরায়ণা, স্বামী মারলেও সে

সহ্য করবে। স্বামী যত খারাপই হোক না কেন, স্ত্রী কখনই চাইবে না যে তার ভাই তাকে শেষ করে দিক। যাই হোক, মেয়ের আমার ভিন্নগতি নেই। আমি যদি তাকে নিয়ে আসি তাহলেও কি সে সুখী হবে? যাকগে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, যদি তাকে নিয়ে আসি, আর ফেরত না পাঠাই? আমার মেয়েই তাতে রুষ্ট হবে। যেভাবেই হোক দুর্ভোগ তাকে ভুগতেই হবে। এইসব নানা চিন্তায় সুব্বারায় বিব্রত হয়ে বসে রইলেন। এসব শুনে রাধাকৃষ্ণৈয়া বললেন, "বুঝলে সুব্বারায়, মাসিকেও তার স্বামী খুব মারধোর করত। যখন দুবছরও স্বামীর ঘর করেনি? তারই মধ্যে দু-দুবার সে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। আর দুবারই কেউ না কেউ দেখে ফেলে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এরপর তার মধ্যে এমন শক্তি এসে গেল যে স্বামীকেই সে ঠেঙিয়ে দিত। সুতরাং তুই আর কী করবি? আর আমিই বা কী করব? মিয়া-বিবির ঝগড়ার নিষ্পত্তি কে করবে?"

এই ঘটনার কথা শুনে নারায়ণ রাও বাবার অনুমতি নিয়ে পোদ্দাপুরম্ চলে গেল। পার্বন উপলক্ষ্যে এই কয়েকদিন আগেই তার বোন বাড়ি এসে, আবার ফিরে গেছে। এরই মধ্যে আবার কী ঘটল? মেয়েছেলেদের কষ্ট দেবার মতো লেখাপড়া জানা পশুও এজগতে রয়েছে। তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা বোধহয় ভগবানেরও নেই।

বেলা দুটো নাগাদ নারায়ণ রাও পোদ্দাপুরম পৌঁছল। ভগ্নীপতি বাড়ীতে ছিল না, বোন আর ভাগ্নী নাগরত্নম্ ছিল। "ছোটমামা, কালই মার জ্ঞান ফিরেছিল। মার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। লাঠি দিয়ে মেরেছে। বাবা আমাকেও মেরেছে।" নাগরত্নম্ বলল। "দাদা, আমারই কপাল খারাপ। কিন্তু তোমরা কষ্ট পেয়ে কী করবে? এ পাগলী তোমাদের চিঠি দিতে গেল কেন বলো দিকিনি? বাবা মাকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া এতে আর কী লাভ হবে?"

"মারলে কেন?"

"যে জন্যেই মারুক না কেন, তাতে কী হয়েছে? পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করছি। কোনো কারণ নিশ্চয় আছে। তিনি ভাল লোক। শহরের সকলের কাছে তিনি ভাল। সে জন্যেই তো তিনি আমাকে মেরেছেন জানতে পেরে লোকেরা আমাকেই বকছে। আমি তাদের কী করে

বোঝাই যে আমাকে তারা যা মনে করছে আমি তা নই, কর্মফলেই এমন হচ্ছে।"

—বড়মামা মাকে রেখে যাবার পর থেকেই বাবা চেঁচামেচি করছিল। তখন থেকেই রেগে আগুন হয়ে আছে।—নাগরত্নম্ বলল।

—কিন্তু তোকে এত মার মারল কেন?

—আবার কী? উৎসবের সময় বাড়ি গিয়ে আমি নাকি বাইরের লোকেদের সঙ্গে দেখা করেছি আর কী কী সব বলেছি। আমি কোনো জবাব দিইনি। তা হলে তো প্রাণটাই থাকত না।

—তা হলে এই ব্যাপার!

—দাদা, তোমায় আমার দিব্যি দিয়ে বলছি রেগে গিয়ে তুমি যদি কিছু করে বস তাহলে আমাকে তোমরা কুয়োর মধ্যে পাবে।

—বোন, তোর স্বামী একটা জানোয়ার। জন্ম যখন হয়েছে তখন মানুষের উচিত হচ্ছে মানুষেরই মতো থাকা। পশু হওয়া উচিত নয়। এরকম জীবন বৃথা, এর চেয়ে কুকুর-শুয়োরের জীবনও তো ভাল। এই নির্বোধের দল স্ত্রীকে খুন করে আবার একটা বিয়ে করে আর সেই বৌয়ের পায়ে তেল মালিশ করে। নীচ কোথাকার! নরকের কীটের মতো হচ্ছে এদের জীবন।

—আরে, তুমি তো রেগে যাবেই। হয়তো বা হাত তুলে বসবে। আমার আরও দুর্গতি হবে। এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আমার ভোগ আমায় ভুগতে দাও। তুমি যাও, বাড়ি যাও!

—বোন, তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। আমি কি ওকে মারতে পারি? মারতে পারলে তো ভালই হত। গায়ের জোরের কথা বলছি না, এরকম নীচ কাজ আমি করতে চাই না।

সন্ধ্যায় বীরভদ্ররাও বাড়ি ফিরল। আরাম কেদারায় সম্বন্ধীকে বসে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল।

—কী ভাই, কখন এলে?—সে জিজ্ঞাসা করল।

—দুপুরবেলা।

—কী দরকারে?

—মাদ্রাজে যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

"তাই নাকি।" ভেতরে গিয়ে সে তার মেয়ে নাগরত্নমকে জিজ্ঞাসা করল,

"তোমার ছোট মামা কেন এসেছে ?" ভয়ে নাগরত্নমের কাঁপুনি ধরে গেল। তার চোখ ছলছল করে উঠল। টের পেয়ে ভেতরে গিয়ে নারায়ণ রাও তাকে বলল, "আসল কথাটা শোনো। মাকে না জানিয়ে প্রতিবেশীর দেওয়া কার্ডে নাগরত্নম্ আমাদের ওখানে চিঠি দিয়েছিল। পড়ে আমি চলে এসেছি। তুমি শিক্ষিত লোক। দুদিন বাদে মেয়ের বিয়ে দেবে। দুনিয়া সুদ্ধ লোক তোমাদের সম্বন্ধে কী ভাবছে তুমি কি জান না। আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে কোথাও কখনো তো এমন হয় নি।"

—আমার নিয়মই এই। আমায় কী করতে বল ? আমার রাগ একটু বেশি। রাগটা দমন করতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। বলো কী করব ?

—যাক, রাত্তিরে কথাবার্তা হবে। এখন আর কিছু বোলো না।

নারায়ণ রাও তার জন্য একটা ঘড়ি কিনে এনেছিল। কিন্তু সে যখন সেটা দিতে গেল, বীরভদ্ররাও সেটা নিতে অস্বীকার করল। নারায়ণ রাও তার দিকে ফিরে বলল, "দিন দিন তুমি কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছ। আমরা পুরুষ। মেয়েরা আমাদের অধীন। তাদেরও মানুষ বলে ভাবা আমাদের উচিত কিন্তু অনেকের চোখেই তারা যেন পশু। সেই জন্য তাদের মেরে ফেললেও কেউ কিছু বলবে না, কেন ? আফ্রিকার নিগ্রোদের কাছে স্ত্রীলোক একটা জিনিসের মত। মেয়েরা কি গোলাম ? আমাদের দেশেও এই গোলামি থাকবে সেই চেষ্টাই কি আমরা করব ? তোমার মন ভাল। সমাজে প্রতিষ্ঠাও হচ্ছে। তুমি তোমার রাগের পুরো মাত্রাটাই কি বৌয়ের ওপর দেখাও, না ওপরওয়ালাদের জন্যও কিছুটা রাখো ? উঁচু পদের অফিসাররা রাগ দেখালেও তোমার রাগ হয় না, কিন্তু ঘরের বৌয়ের ওপর সেটা এসে পড়ে ? অফিসারের প্রতি যে রাগ তার কী গতি হয় ? আমরা তাকে দাবিয়ে রাখি, সংযত করি, আমাদের অধীন লোকদের ক্ষেত্রে সে সংযমটা আমরা দেখাই না কেন ? গান্ধী, বুদ্ধ, যীশু, এইসব যুগাবতাররা প্রেমের উপদেশই দেন। ক্রোধকে শান্ত করে ভালবাসা দিতে পারলে ভালবাসার পাত্ররা যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু একজনের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে কোনো লোক যদি সারা বিশ্বে প্রেম বিলোয়, তা হলেও সে ব্যক্তি অসৎ প্রবঞ্চক। রাগ হওয়ার মানেই

হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যেকার পশুত্ব এখনো যায়নি। তোমার চেয়ে অশিক্ষিত লোকরাও অনেক ভাল। তুমি ভাবছ যে আমি বক্তৃতা করছি। কিন্তু আমি সবাইকে এই বক্তৃতা শুনিয়ে বেড়াই। তুমি আমাকে খুব ভাল করেই জান। এ ব্যাপারে তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সকলেই মর্মাহত, আমিও দুঃখিত। আমি বয়সে ছোট। তবু ন্যায়ের জন্যই আমাকে এত কথা বলতে হচ্ছে।

মেয়েরা আঘাত সয়ে নেয়, কিছু বলতে পারে না, এটাই পতিব্রতার ধর্ম। তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক! কিন্তু তারাও তো আমাদেরই মতো মানুষ। এটুকু তুমি বোঝ এই প্রার্থনাই আমি করি।

২২। আমার দায়িত্ব আছে

সম্বন্ধীর কথা শুনে প্রথমে বীরভদ্ররাওয়ের রাগ হল। পরে সে লজ্জিত এবং দুঃখিত হল। সে কিছু বলল না। চোখে তার জল এসে গিয়েছিল। আবার রাগ এসে গেল। তারপরই তার মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। নারায়ণ রাও ভাবছিল যে তার উপদেশ শুনে বীরভদ্ররাও উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

না জানি কী হয় এই আশঙ্কায় সত্যবতী খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। মনে মনে সে কাঁপছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে খাবার তৈরি করল। ভাই আর স্বামী হাত পা ধুয়ে খেতে বসল। বীরভদ্ররাওয়ের খাবারে রুচি ছিল না। নারায়ণ রাও তাকে দেখে বলল, "তুমি খুশী মনে, ভাল করে খাও, তা না হলে আমিও খেতে পারব না।"

খাওয়া-দাওয়ার পর বীরভদ্ররাও নারায়ণ রাওকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কী তোমার বোনকে নিয়ে যাবে?" "সে আবার কী? এই তো সেদিন বোন আমাদের ওখান থেকে এল। সাত মাস হলে তখন আবার নিয়ে যাব। আমার মা বলেছেন, সবকিছু নিয়মমতো হওয়া দরকার। প্রসবের জন্য আমরা ওকে রাজমহেন্দ্রবরমে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছি, তুমি কী বল? তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে আমি ওকে আমার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে

যাব। তা নাহলে হাসপাতালে রাখব। আর তাও যদি না হয় তবে আমি মাদ্রাজে নিয়ে যাব। ভেবে নাও, মা রাও আসবেন।"

যে সমস্ত কারণে বীরভদ্ররাও বৌকে মারছিল সেগুলো হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। জমিদার তাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। জমিদার ডেপুটি কালেক্টরকে বলেছিলেন বীরভদ্ররাওকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তিনিও তাকে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। জমিদারকে তিনি এ-ও লিখেছিলেন যে বীরভদ্ররাও তাঁর অফিসের সেরা ক্লার্ক আর তার পদোন্নতির জন্য তিনি সুপারিশ করে রেখেছেন। এরই মধ্যে কালেক্টরকে জরুরী কাজে বাইরে যেতে হল। তিনি জানতেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে একমাত্র বীরভদ্ররাও ছাড়া তাঁর কাজ অন্য কেউ চালাতে পারবে না। যাবার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি থেকে যাও। মেয়ে আর বৌকে পাঠিয়ে দাও।" বীরভদ্ররাওয়ের বলার কিছু ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে সে তার বৌ আর মেয়েকে জমিদারের ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জমিদার নিজে ড্রাইভারের পাশে বসে এবং পেছনে সত্যবতী আর তার মেয়েকে বসিয়ে রাজমহেন্দ্রবরমে নিয়ে এলেন।

জমিদারমশাই যে বড়লোক এবং পূজনীয় ব্যক্তি একথা সে জানত। তাঁকে সন্দেহ করা যে হাস্যকর তাও সে জানত। উৎসবের চারদিন বীরভদ্র রাও কি অস্বস্তিতেই না কাটিয়েছে? না জানি কতলোক জমিদারের ওখানে এসেছে? বৌও হয়তো তাদের দেখছে। তারাও ফ্যালফ্যাল করে নিশ্চয় তার দিকে চাইবে। এর আগে স্ত্রীর বাপের বাড়ি যাবার দরকার হলেই সে সঙ্গে গেছে। পর্ব উপলক্ষ্যে রাজমহেন্দ্রবরমে যাবার চেষ্টাও সে করেছিল। কিন্তু ডেপুটি কালেক্টর যেতে দিলেন না। শ্রীরামমূর্তি তার বৌকে বাড়িতে রেখে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার মনের ঝাল ঝাড়তে শুরু করল। "তুই বদমাইস,—পেদ্দাপুরমের বেশ্যাদেরও অধম, তা নাহলে তুই যাবি কেন? পেটে পেটে তোর যদি বদমাইশি না থাকত তা হলে কি তুই ওরকম করতিস? না জানি তুই ওখান থেকে কতজনকে চিঠি দিয়েছিস।" এই ধরনের বহু অকথ্য বাক্য, যা লেখা যায় না, সে ওগরাতে থাকল। বীরভদ্ররাও আজ নিজের নীচতাকে অনুভব করল। সত্যবতীর সেবা, প্রেম আর সহৃদয়তার কথা সব আজ তার মনে পড়তে লাগল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সন্দেহের ভূত

আবার এসে তার ওপর ভর করল। সন্দেহটা অবশ্য এনয় যে সে অন্যে অনুরাগিনী, সেটা বরং এই যে সে তাকে ভালবাসে না।

নারায়ণ রাও দুদিন সেখানে রইল। উপদেশ প্রসঙ্গে অন্য দেশের মেয়েদের কথাও তুলল। ভারত যে চিরকাল নারীর মর্যাদা স্বীকার করে এসেছে সেকথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

"আমাদের কাছে নারী হচ্ছে একটা গৌরবের জিনিস। আমাদের সভ্যতা, সুনীতি এবং জাতিকে সে-ই বাঁচিয়ে রেখেছে। খড়্গ তিকন্নাকে স্মরণ কর, রুদ্রম্মাদেবী, তরিগোন্ড বেঙ্কনাম্বা প্রভৃতি বীরাঙ্গনাদের কথা ভুলে যেয়ো না। মাঞ্চালা তাঁর স্বামীর জন্য তপস্যা করেছিলেন। বেশ্যার ফাঁদে পড়ে বিপন্ন পতিকে রক্ষার জন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি যখন পতিচরণধ্যানে মগ্ন, বালচন্দ্র সেই সময় যুদ্ধে যাবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য এলে, তলোয়ার উপহার দিয়ে তিনি তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হলে তিনিও সতী হয়েছিলেন। গল্লম্মা দেবীর জীবনী জান না?"

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নারায়ণ রাও তার প্রশংসায় কাটাল, "তোমার মনটা খুব সাদা। আমি জানি যে মানুষের বহু উপকার তুমি করেছ। তোমার মতো মানুষ যদি আমাদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিত তাহলে বড় নেতা না হয়ে সে যেত না। চাকরির জাঁতাকলে পড়েই তোমার মনটা এমন খিঁচড়ে গেছে। কিন্তু ন্যায়বান চাকুরেদের প্রশংসায় আজও কি মানুষ পঞ্চমুখ নয়?"

পরের দিন ভগ্নীপতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার দেওয়া কুড়িটা টাকা বোনের হাত দিয়ে সে কোত্তপেট চলে এল।

মাকে এসে সে সব কথা খুলে বলল। এ আশ্বাসও দিল যে দুচার মাসের মধ্যেই তার বোনাইয়ের মনের পরিবর্তন ঘটাবে।

—বাবা তুমি তো ও কথা বলছ, কিন্তু সেই নির্দয়ের মন কি কেউ পাল্টাতে পারবে? এইভাবে জ্বলতে জ্বলতে সত্যম একদিন গিয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দেবে।

—না, মা, না, কেন কষ্টে কষ্টে শুকিয়ে যাচ্ছ? তার দুঃখ দূর করার ভার আমি নিলাম। সে যদি আবার অত্যাচার শুরু করে তাহলে আমি গিয়ে

তার বাড়িতে অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করব। এইভাবে অন্তত তার মনের পুরোপুরি পরিবর্তন এসে যাবে।

২৩। অইউন ঋন্ধ

নারায়ণ রাও মাদ্রাজের পথে যাত্রা করল। রাধাকৃষ্ণৈয়া ঠাকুরদাও সঙ্গে গেলেন। দুপুর নাগাদ তারা নারায়ণ রাওয়ের শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গেল। জমিদারমশাই জামাইয়ের ঠাকুরদাকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা জানালেন। অন্ততপক্ষে চার-পাঁচ দিনের জন্যেও তাঁকে থাকার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণৈয়া জানালেন যে তাঁর খুবই জরুরী কাজ আছে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে তাঁকে ফিরতেই হবে।

সেদিনের মেলে নারায়ণ রাওয়ের মাদ্রাজ যাওয়া হল না। জমিদারের বহু অনুরোধে রাধাকৃষ্ণৈয়াও সেদিনকার মতো থেকে যেতে রাজী হলেন। রাধা-কৃষ্ণৈয়া একটা রূপোর থালা শারদাকে উপহার দিলেন। তাকে নারায়ণ রাওয়ের অনুগতা পত্নী জেনে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। পরের দিন লক্ষ্মীপতির সঙ্গে দেখা করে মোটরে দ্রাক্ষারাম চলে গেলেন।

রাধাকৃষ্ণৈয়া বিদায় নেওয়ার পর জগন্মোহন রাও তাঁকে নিয়ে শারদা আর পিসিমার সামনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করল।

—পিসেমশাইয়ের মতিভ্রম হয়েছে। যত আজেবাজে ওঁচা মালের সমাদরে তিনি উঠেপড়ে লেগেছেন।

—কত বুড়ো হয়েছেন, দেখেছ ?

—আমি তো ওঁকে দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ওই বুড়ো তোমার স্বামীর ঠাকুরদা না ?

—হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।

—তোমার স্বামী আর উনি যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ঠিক যেন মনে হচ্ছিল একটা বুড়ো বাঁদর আর একটা জোয়ান বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাসি চেপে রাখতে পারি নি। শারদা, হা—হা—হা !

শারদা চুপ করে রইল। জমিদারগৃহিণী বললেন, "তোর উপমাটা একে-বারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য !"

জমিদারবাড়িতে সেদিন নারায়ণ রাওকে কেন্দ্র করে খুব হাসি ঠাট্টা চলল।

সন্ধ্যায় জগন্মোহন শারদার কাছে গিয়ে বলল, "শারদা, এসো, চলো আমরা বাগানে বেড়িয়ে আসি!"

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। জ্যোৎস্নার দুধসাগরের তরঙ্গ যেন তাথৈ তাথৈ নৃত্যে মেতেছিল।

শারদা বাগানে এল। তার সৌন্দর্যও চাঁদেরই মতো অনন্য। এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি হেনে জগন্মোহন রাও-ও তার পেছন পেছন চলছিল। তারা একটা বেদির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জগন্মোহনের দিকে চেয়ে শারদা মুগ্ধ হল। নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে জগন্মোহন পাতলা একখানি পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে বেরিয়েছেন। পাউডারের পরিমিত পালিশও ছিল। সুগন্ধে পরিবেশটা মৌ মৌ করছিল। জগন্মোহনকে মূর্তিমান কামদেব বলে মনে হচ্ছিল। 'ওর সঙ্গে বিয়ে হলে কী ভালই না হত।' একথা ভেবে শারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। তার মনে হল সে তাকে আবাল্য ভালবাসে। প্রেম সম্বন্ধে সে উপন্যাসে পড়েছে। যাকে সে ভালবাসেনা তার সঙ্গে বিয়ে হলে তার কী গতি হবে? 'বাবাকে যে আমার জন্যে বরের খোঁজ করতে হয়েছে সেটাই একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। যে সব উপন্যাস আমি পড়েছি তাদের প্রত্যেকটির নায়ক নায়িকার বিয়েই কি তাদের বাপ-মা এইভাবে দিয়েছে?'—সে ভাবছিল।

—কী ভাবছ শারদা? এতদিন আমি জানতাম যে তোমার দেহের রক্ত-প্রবাহকেই শুধু বাইরে থেকে দেখা যায়, এখন কিন্তু তোমার ভাবনাটাকেও দেখা যাচ্ছে।

—না, কিছু ভাবছি না।

—শারদা, তোমার আর আমার সৌন্দর্যের মিলন হলে কী ভালই না হত? আমি যদি তোমার স্বামী হতাম তাহলে সবসময় তোমার পায়ের কাছে বসে সেবা করে যেতাম।

শারদা কিছু না বললেও জগন্মোহনের কথায় গর্বে বুক তার ফুলে উঠল।

শারদার কোমর নিজের বাহুবন্ধনে বেঁধে জগন্মোহন তাকে চুমু খেতে যাবে এমন সময় কেশবচন্দ্র দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, "দিদি, বাবা তোমায় ডাকছেন।" কেশবচন্দ্রের সাড়া পেয়ে দুজনেই চমকে উঠল। হাত

সরিয়ে নিয়ে জগন্মোহন দূরে সরে গেল। আর শারদাও উঠে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

জগন্মোহন একলা সেখানে বসে রইল। এই ছেলেটাও যেন কী রকম। নিজে জমিদার-নন্দন হলে কী হবে, সেই গাঁইয়াটার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। বাপের মতোই আর কী। আর এক মিনিট পরে এলেও চুমুটা আমার খাওয়া হত, শারদা আমারই—সে ভাবছিল।

শারদা ভেতরে গিয়ে দেখল জমিদারমশাই আরাম চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাকে কাছে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে মা ?"

—বাগানে।

—তোমার ভাই বলছিল যে জগন্মোহন তোমাকে মেরেছে ?—কেশবচন্দ্র বাবার দুহাতে হাত রেখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "হ্যাঁ বাবা, শারদাকে টেনে নিয়ে মারতে যাচ্ছিল, জানলা দিয়ে আমি সব দেখেছিলাম। বিশ্বাস না হয় আপনি রঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করুন !"

ছেলেকে কোল থেকে তুলে বুকে চেপে ধরে জমিদার আবার তাকে নামিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ মা, জগন্মোহন রাও কি বাগানে রয়েছে ?

—হ্যাঁ বাবা! আমরা দুজনে বাগানে গিয়েছিলাম। তাই দেখে ভাই বোধহয় ভেবেছে যে সে আমায় মেরেছে।

—তাই হবে আর কী। তুমি ভেতরে যাও মা !

শারদা আবার আসবে এই আশায় জগন্মোহন বসে ছিল। সে এল না। খাবার সময় হয়ে গেল। তবু সে বসেই রইল। শারদাকে জড়িয়ে ধরায় চোখে তার লালিমা এসে গিয়েছিল। শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দেহের সেই কাঁপনটাকে আয়ত্তে আনতে আনতে শারদার কথা সে ভাবতে লাগল এবং সেইখানেই বসে রইল। বিজয়নগরের সেই বেশ্যাটির সঙ্গে যে লীলা সে করেছিল তার কথা জগন্মোহনের মনে পড়ল। কয়েক লাখটাকা সে সেই মেয়েটিকে দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কারো সঙ্গে থাকতে সে রাজী নয়। সেদিন তার কাছ থেকে যে আনন্দ সে পেয়েছিল শারদার সঙ্গে তার চেয়েও বেশি আনন্দ হয়ত পেত। মাথা নীচু করে এই সব কথাই সে ভাবছিল।

জগন্মোহনের সঙ্গে শারদাকে বেশি কথাবার্তা বলতে দেখে জমিদার-মশাই তাঁর মেয়েকে বললেন, "মা, জগন্মোহনের সঙ্গে তোমার এত বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়। তুমি আজকাল লেখাপড়া কম করছ। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ এবার অবশ্যই করতে হবে, বুঝেছ! তোমার অধ্যাপককে বলে দেব যাতে তিনি আরও ভাল করে তোমায় পড়ান। তুমি ভেতরে যাও!"

শারদা বিব্রত বোধ করল। সে বলল, "আমি পড়ছি তো বাবা। পরীক্ষায় পাশ আমি নিশ্চয়ই করব।" চোখ তার ছলছল করে উঠল।

বাবা জেনে ফেলেছেন যে জগন্মোহন তার সঙ্গে প্রেম করছে এই সন্দেহে শারদা ভীত হল। তার হাবভাবে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না। মনে তার কোন পাপ ছিল না। তিনি তার দিকে একবার দেখলেন। তার পর তিনি মেয়েকে আদর করলেন। শারদা চলে গেল।

জগন্মোহন রাও যে বিজয়নগরের কোন বেশ্যার বাড়িতে যাতায়াত করত সে কথা জমিদার জানতেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দহরম-মহরমও তার ছিল। জমিদারির আয় তার বাবুয়ানার পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় সে ধার করত।

ছোট জামাইবাবু তাকে গল্প বলছেন এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে কেশবচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়ল।

নারায়ণ রাও মেলে করে মাদ্রাজের দিকে এগিয়ে চলেছিল। গাড়ি কী গাইছে? জোরে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গাড়ি যেন তাল দিচ্ছে—টক্, টক্, টক্। বিদ্যুতের মতো শারদা তার মনে একবার ঝিলিক দিল, সে গুনগুনিয়ে একটা গানের কলি ধরল:

কবিতা, তুমি বিশ্বমোহিনী, তোমার উৎপত্তি কি শিবের ডমরু থেকে?

অইউন, ঋ৯ক্

এই যে গাড়ির শব্দ, এর উৎপত্তি কি এই থেকেই?

অইউন ঋ৯ক্;

শ্রীবাণী গিরিজাশ্চিরায়ুদ্ধতো বক্ষামুপখজ্ঝমে।

কবিতা হচ্ছে সর্বকলাস্বরূপ, বিশ্বস্বরূপ। সর্বসৃষ্টিময়। অ, ই, উ, অই, উন। সে শুয়ে পড়ল।

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

১। মিলনোৎসব

বি. এল. পরীক্ষায় নারায়ণ রাও প্রথম হল। তারপর সে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিলের অধীনে অ্যাপ্রেন্টিস্ রইল। অ্যাপ্রেন্টিসশিপের পরীক্ষাতেও ১৯২৮ সালে সে হল প্রথম। শারদা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। জমিদার তাকে ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য পড়াতে লাগলেন।

সে বছর গ্রীষ্মের সময় স্বামী-স্ত্রীর মিলনোৎসবে তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করলেন। নারায়ণ রাওয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে বন্ধুরা যেমন এসেছিল এবারও তেমনি এল। স্বামী-স্ত্রীর মিলনোৎসবে এইভাবে ঘনিষ্ঠদের আগমন নারায়ণ রাও-এর মনঃপূত না হলেও পিতৃদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবার উপায় ছিল না।

প্রাতঃকালেই পতি-পত্নীকে পিঁড়ির উপর বসিয়ে দেওয়া হল। উচ্চ শ্রেণীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। সুসজ্জিত সভা মণ্ডপে বন্ধু-বান্ধব, পণ্ডিত এবং বাড়ির লোকের ভিড়।

ভরা যৌবনে নারায়ণ রাও-ও ডগমগ করছিল। ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ তার মুখ আলো করে ছিল। অতুলনীয়তায় কৃষ্ণেরই মতো সে সভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সন্ধ্যাবন্দনা সাঙ্গ হলে গিলে করা পট্টবস্ত্র পরে সে পিঁড়ির পাশে দাঁড়াল।

সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিতা ফুলের সাজে কবরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সর্বাভরণ-ভূষিতা শারদা পতির পাশে দাঁড়াল।

মঙ্গলবাদ্যের তুমুল কোলাহল উঠল। দম্পতিকে পিঁড়ির উপর বসানো হল।

'ওঁ কেশবায় নমঃ স্বাহা, ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ সবিতায় স্বাহা'—ইত্যাদি সাঙ্গ হল।

চোরা-চোখে নারায়ণ রাও তাঁর পত্নীর দিকে চাইল। তারুণ্যে ভরা তার দেহ চাঁপাফুলের মতো রঙে জ্বল জ্বল করছিল। চোখ দুটি তার নিশ্চয়

নির্মল রাত্রির তারার মতো দ্যুতিশীল ছিল। তার কপালে ছিল উষার রক্তিমা। দেহ যেন তার সোনার জৌলুসে ঢাকা। চলনে তার লজ্জা, ভঙ্গীতে শ্রী, শরীরে কান্তি আর আঁখিতে নীলিমা দেখে নারায়ণ রাও-এর মনে হল সে যেন এক দিব্য রাগিণী শুনছে। চক্ষুদুটি মুদ্রিত করে সে তারই ধ্যানে মগ্ন হল। মনে মনে সে তাকে আলিঙ্গনে বাঁধলো। তাকে নিজের আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ বলে বোধ হল। আচমনের জন্য তার হাতে জল ঢালতে গিয়ে আঙুলগুলিকে চাঁদের কিরণ বলে মনে হল।

পুরোহিত কী কী করেছিল, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে দিয়ে কখন তাকে এবং তার স্ত্রীকে নব-বস্ত্র দেওয়া হল কীভাবে তাদের আশীর্বাদ করা হল আর কী করে আরতিই বা করা হল এ সমস্ত নারায়ণ রাও মনেই করতে পারল না।

পিঁড়ি থেকে নামার পর পরমেশ্বর নারায়ণ রাওকে বলল—"পিঁড়ির উপর তুই বেশ শোভা বর্ধন করছিলি, কিন্তু বসে বসে কী ভাবছিলি বল ত? তোদের দুজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে আমি ভাবছিলাম যে এর চেয়ে ভাল জোড় আর কী কোথাও হতে পারে?"

—তুই স্তুতি শুরু করে দিলি তো?

—স্তুতির কী আছে? তোর বউ-এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আর তোর চেয়ে সুন্দর যুবক কি কোথাও আছে নাকি? সিনেমায় নেমে তোরা দুজনে আদর্শ শিল্পী হয়ে যাস্ না কেন?

—তুই কি বলতে চাস যে আমরা ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ আর মেরি পিক্‌ফোর্ড?

—হ্যাঁ!

—ভাগ্যি তুই আমাদের দেশের নতুন তারকাদের তুলনা করিসনি, আমাদের শিল্পীদের রোজই মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

নারায়ণ—ছেলেবেলায় পরমেশ্বরকে সুন্দরী মেয়ের মতো দেখাত। স্ত্রীভূমিকা সব সময় ছিল তার দখলে।

পরম—তুই কলেজে অর্জুন হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় নামিস নি?

নারায়ণ—আমি কী বলছি? ইংরিজি নাটকগুলোতেও তো তোকে দিয়ে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করানো হয়েছিল।

পরম—লক্ষ্মীপতিও তখন অভিনয় করত।

লক্ষ্মীপতি—আমাদের তো চাপরাশি করা হত।

নারায়ণ—আমি যখন এলাম তখন ও চলে গেল।

পরম—তুই থাকলে আমায় দিত না। তোর বুদ্ধি, প্রতিভা এইসব দেখে তোকেই সব দিক থেকে কাজে লাগাতো।

লক্ষ্মী—আমাদের নাটক কি পাশ্চাত্য নাটকের মতো নাকি?

নারায়ণ—কেন, কী রকম? তাদের পয়সা আছে,—বাস্তবতার ভ্রান্তি আনার জন্য তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়ে তারা মঞ্চে নামে। দরকার হলে মঞ্চে তারা উত্তরী ধ্রুবও তৈরি করে নেয়। রঙ্গমঞ্চ কি রঙ্গমঞ্চ থাকে নাকি? সবই বাস্তব বলে মনে হয়। মঞ্চের উপর সত্যিকারের মন্দির, সিংহদ্বার, ঘর, সমস্তই দেখা যায়।

পরমেশ্বর—পয়সাওয়ালা, তাই পনেরো টাকার টিকিট করলেও লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানি হয়,—হাজার হাজার টাকা মাইনে দেয়। সেইজন্যই ওদেশের প্রতিভাবান যুবকরা অন্য চাকরি নেয় না। দেশও সেই রকম। সরকার থেকে তাদের স্যার উপাধি পর্যন্ত দেওয়া হয়। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের দেশ গরিব।

লক্ষ্মীপতি—নারায়ণ রাও যা বলেছে তাতে তুই খালি হ্যাঁ-তে-হ্যাঁ মিলিয়ে যা! এ বেশ, ওসব তো আমি দেখি নি। আমি তো কেবল এই কথাই বলছি যে আমাদের একাঙ্ক নাটকের চেয়ে ওদের নাটক ভাল।

পরমেশ্বর—আমাদের মতো তাদের একাঙ্ক নাটক আছে? সংস্কৃতে কি তাদের নাটকের মতো নাটক নেই?

নারায়ণ—সংস্কৃতের মতো নাটক কি তেলুগু দেশেও আছে?

পরমেশ্বর—না! কিন্তু যক্ষগান, ভাষাকলাপ, গল্লকলাপ রয়েছে। আর সংস্কৃত নাটকেরও অভিনয় হয়।

লক্ষ্মীপতি—তেলুগু ভাষায় নাটক নবাগত। আগে ছিল না এটা তো স্বীকার কর?

নারায়ণ এবং পরম সমস্বরে—হ্যাঁ!

লক্ষ্মীপতি—সংস্কৃত নাটক কি ইংরিজি নাটকেরই মতো?

নারায়ণ—হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের ধারা যেমন

আলাদা, তাদেরও উৎপত্তি এবং বিকাশের ধারা পৃথক পদ্ধতিতে অভিন্ন কিন্তু ভাবে পৃথক।

পরমেশ্বর—তাদের ভাবে জাগতিক আর আমাদের আধ্যাত্মিক।

লক্ষ্মীপতি—তাদেরও কি একাঙ্ক নাটক আছে?

নারায়ণ—অপেরা রয়েছে না। সেটা অনেকটা আমাদের একাঙ্ক নাটকের মতো। অপেরা এবং সাধারণ নাটকের সমন্বয় ঘটালে আমাদের একাঙ্ক দাঁড়িয়ে যায়।

লক্ষ্মী—কিন্তু কী জানি কিভাবে লোক অত হৈ হল্লা সহ্য করে। রানী পর্যন্ত চীৎকার করে,—কথোপকথন নেই-ই। সমবেত গলাবাজি। সবটাই আমার কাছে প্রহসন বলে মনে হয়। রাজ-পোশাকে সেজেগুজে শিল্পী নিজেই চেঁচাতে চেঁচাতে আসেন, পুর-নেতার সঙ্গে রাজা আসছেন। এটা কি একটা অভিনয়?

নারায়ণ—একাঙ্ক নাটকের এটা ত্রুটি নয়, বরং এর গুণ।

পরম—শাস্ত্রমতে তুমি যে চরিত্রের অভিনয় করছ, তোমার সে ব্যক্তি হয়ে যাওয়া দরকার। বাস্তবিক তুমি সেই বিশেষ ব্যক্তিটি নও বলেই এটা দেখানো দরকার যে তুমি ঐ চরিত্রে অভিনয় মাত্র করছ। অভিনয়ও চিত্রকলার মতোই একটি শিল্প। ভ্রান্তির প্রতিষ্ঠাই এই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

লক্ষ্মী—তুই যুক্তি দিচ্ছিস না—কবিতা করছিস। নারায়ণ রাও, ও কী বলতে চাইছে তুইই বল।

নারায়ণ—শোনো, ভারতবর্ষের সমস্ত শিল্পই যে শিল্পীর ভাবনাকে প্রতিফলিত করে একথা সত্য। তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টির চেষ্টা করে না। 'ইনিই হরিশ্চন্দ্র' এই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাটাই মিথ্যা। আমি হরিশ্চন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করছি এবং আমার ধারণায় চরিত্রটি এই রকম—এটাই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অভিনেতা বলে 'হরিশ্চন্দ্র আসছেন'—এবং নিজেই হরিশ্চন্দ্র হয়ে যায় অর্থাৎ সে বলতে চায় যে হরিশ্চন্দ্র এই রকম।

লক্ষ্মী—তোমরা দুজনে একই কথা একভাবে বললে। আরও পরিষ্কার করে বলো।

২। শয়নকক্ষ

অনেক সময় কেটে গেল, তবু সন্ধ্যা হল না। নারায়ণ রাও তাস খেললো। ব্রিজ ইত্যাদি সবই খেললো। কিছুতেই মন বসলো না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশ থেকে এদেশের ক্লাবে, লাইব্রেরিতে আর বাড়িতে বাড়িতে তাস এল। খেলার রাজা ব্রিজ। অন্ধ্রের লোকেরা এ খেলায় বেশ দক্ষ। দেশের সর্বত্র এর চল আছে। যদিও খেলার পদ্ধতির পার্থক্য অনেকখানি। গ্রামেও এর প্রচলন আছে। বেস্তাটু অন্ধ্রের নিজস্ব খেলা। বাজি ধরে খেললেও খুব বেশি লোকসান হয় না। অল্প একটু বাজি ধরে যদি ক্ষতি হয়ই, তাহলেও সেটুকু অন্যের হবে লাভ। 'রণথোর' খেলা, অর্থাৎ যাকে জুয়া বলা যায়, অনেকে লুকিয়ে চুরিয়ে খেলে। নানা চিন্তায় নারায়ণ রাও বেস্তাটুতে দুটাকা খোয়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারের প্রতীক্ষায় ছিল সে। নিজের ভাবনাগুলির কথা সে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কাউকে জানতে দিতে রাজী ছিল না।

রাত্রির শুভ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। রেশমী কাপড় পরে নারায়ণ রাও দাঁড়াল। ফল আর মাঙ্গলিক দ্রব্যের পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শারদা। পুরোহিতের নির্দেশমত তারা একটি পিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। তারা শ্রীগণেশের পূজা করল। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে জমিদার দম্পতি তাদের বই উপহার দিলেন। মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, মঙ্গলবাদ্য বাজানো হল।

খানিক পরে স্বামী-স্ত্রীকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। শয়নকক্ষ পরিপাটি করে সাজানো হয়েছিল। মনে হচ্ছিল চার দেয়াল শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী। নন্দলাল বসু, প্রমোদকুমার, অবনীন্দ্রনাথ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অসিত হালদার এবং অন্ধ্রের দামর্ল রামারায় ও পরমেশ্বর মূর্তির আঁকা চিত্রাবলী টাঙানো। বিশাল শয়নকক্ষে বিভিন্ন বর্ণের আলোর ব্যবস্থা। রূপো আর চন্দন কাঠের মূর্তি, লোহার খেলনা এবং আরও হরেক রকমের জিনিসে সাজানো। টেবিলের উপর স্তূপাকার করে নানা রকমের ফল সাজানো। একটি পাত্রে থরে থরে অগুণতি মিষ্টান্ন আখরোট কাজুবাদাম প্রভৃতি। ধূপের সুগন্ধে ঘর ভরে উঠেছিল।

এই ঘর সাজানোর জন্য জমিদার শত মুদ্রার বিনিময়ে মাদ্রাজ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আনিয়েছিলেন। গোলাপ, মল্লিকা এবং আরও নানা রকমের ফুল ঘরটিতে যে কত লক্ষ ছিল তার হিসাব নেওয়া মুশকিল।

অপ্সরাদের মতো সেজে গুজে কয়েকটি তরুণী সেখানে উপস্থিত ছিল। দম্পতির জন্য তারা এনেছিল ভালবাসা আর পোশাক পরিচ্ছদের উপঢৌকন।

পুলকিত হয়ে নারায়ণ রাও পত্নীর দিকে চাইল। চন্দন-লিপ্ত তার মুখ। নারায়ণ পান খেয়ে তাকে খাওয়াল। ভগ্নীপতির দিকে চেয়ে শকুন্তলা দেবীর মন প্রশংসায় মুখর হল। নিজের বিবাহোত্তর মিলনোৎসবের কথা মনে পড়ল। নারায়ণ রাওয়ের মতো হাবভাব তার স্বামী কেন করেন নি? তাদের সংসারে তার মতো কেউ নেই। এই অজুহাতে সে তাকে স্পর্শ করল। বোনকে তার সঙ্গে তুলনা করল। পান দিল। সূর্যকান্ত এবং জানকাম্মা খুব খুসি।

শারদার কোনো হুঁশ ছিল না। তার উদাসীনতা কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের প্রফুল্লতার মাত্রাকে কমাতে পারল না। মেয়েরা গান গাইল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও শারদা গাইল না। কয়েকজন মেয়ে রাধাকৃষ্ণের গান গাইল। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ঘরের দরজা বন্ধ করে সবাই চলে গেল। শারদাকে নিয়ে শকুন্তলা কোথায় যেন গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা নারায়ণ রাওয়ের প্রাণ ছটফট করতে থাকল। পালঙ্ক থেকে নেমে সোফায় বসে প্রতীক্ষায় রইল। তার স্ত্রীর মনের মধ্যে কী রকম হচ্ছে তা সে কল্পনা করল। অনেক দেরি হল, তবু শারদা এল না!

নারায়ণ রাও উঠে দাঁড়াল। ঘরের সাজ-সজ্জা দেখতে লাগল। চোখে কিন্তু তার শারদার মূর্তি ছাড়া আর কিছু আসছিল না। শারদা-সর্ববিভুষণ বিভূষিতা। সন্ধ্যার সদ্যফোটা গোলাপের সাজে তাকে সাজানো হয়েছিল। শাড়ীও এমনই দামী যে পরার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য দ্বিগুণ বেড়েছে। তার স্পর্শেই শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। একঘণ্টা হল তবু শারদা এল না। নারায়ণ রাও ঘড়ির দিকে তাকাল। তার নেশা লেগেছে। যত মিলনোৎসব সে দেখেছে তাতে কি এমনই দেরি হয়েছিল?

পালঙ্কে উঠে সে শুয়ে পড়ল। পালঙ্কটা পুরানো। শ্বশুরের পূর্বপুরুষদের বোধ হয়।

এক-এক দেশের এক-এক ভাব—প্রথম রাত্রির মুগ্ধা বালিকাদের ব্যবহার কেমন হয়।

—নর-নারীর সম্পর্ক কেন এমন মোহময়? নিজের সবকিছু মানুষ নারীকে অর্পণ করে। নর-নারীর এই সম্পর্ক বিশ্বের ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে।

—সে কী করবে?

—ঘড়িতে মিষ্টি দুটি আওয়াজ হল।

—শারদাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে শকুন্তলা আর তার পিসি বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সব নীরব।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কিসের যেন শব্দ তার কানে এল। নারায়ণ রাও চমকে উঠল। শারদাই কাঁদছে না? ভয়ে বোধ হয়? ভয়? খানিক পরেই হয়তো কান্না বন্ধ হবে। লজ্জায় সেও কিছু করতে পারল না। উঠে আস্তে আস্তে সে শারদার কাছে গেল। জিগ্যেস করল—"শারদা! এখানে দাঁড়িয়ে কেন?" শারদা নিরুত্তর! কান্না তার বেড়েই গেল। নারায়ণ রাওয়ের মন দয়ার্দ্র হল। সে তাকে একদিকে নিয়ে এল, সে যেন কুঁকড়ে গেল—যেন ফুলের মতো নেতিয়ে পড়ল, "কেন কাঁদছ বাবলী? তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমি আমার পৌরুষ, বুদ্ধি, সম্পদ, সবকিছু তোমায় সঁপে দিচ্ছি। শারদা, আজ পর্যন্ত আমি কাউকে ভালবাসিনি। প্রথম দর্শনের দিন থেকে আমি তোমাকে আমার হৃদয়েশ্বরী মনে করে আসছি।" শারদা আরও জোরে কাঁদতে লাগল। নারায়ণ রাও বিস্মিত হল। সে খানিকটা দমেও গেল, সে গিয়ে সোফায় বসল, গালে হাত দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। প্রায় আধঘণ্টা পরে শারদার কান্নায় ভাটা পড়ল। নারায়ণ রাও তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। পঞ্চদশী সুন্দরী। এই বা কী রকম? এ জগতে লজ্জা আছে, রাগ আছে, কিন্তু লেখাপড়াজানা মেয়ের পক্ষে এ কী রকম ব্যবহার? নারায়ণ রাওয়ের কাছে সে যেন দূরের বস্তু।

একটু পরে নারায়ণরাও উঠে বলল, 'শারদা, তুমি পালঙ্কে এসে শোও —ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন?' সে তাকে ফুলের মতো কাছে টেনে নিল।

আলিঙ্গনে বেঁধে চুমু খেতে উদ্যত হতেই শারদা পিছিয়ে গেল। নারায়ণ রাও লজ্জিত হল। সে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। খানিক বাদে সে উঠে গিয়ে আবার সেই জায়গায় দাঁড়াল।

এ অভিনয় নয়তো? মেয়েরা বোধহয় এমনই করে। এখন আমার কী করণীয়? না রাজারাও, না পরমেশ্বরমূর্তি নিজের নিজের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এমন কথাতো বলেনি। রাজারামের স্ত্রী কিছুটা লজ্জা দেখিয়েছিল বটে কিন্তু দরজা বন্ধ করা মাত্রই তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিল। পরমেশ্বরমূর্তির স্ত্রী কিছুটা দেরি করেছিল কিন্তু পরে সে তার স্বামীর বুকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিল। আরও কয়েকজন বন্ধুর অভিজ্ঞতাও অনুরূপই। কিন্তু এ কেমন বিচিত্র ব্যাপার?

—শারদা তুমি শিক্ষিতা, সমঝদার, এ কেমন কথা?

পতি তাকে বোঝায়! শারদার এত জেদ কেন? শারদা বোধ হয় আমাকে ভালবাসে না! কথাটা কোথা থেকে যেন তার মনে এল,—সে কি অসুন্দর? শারদা কী এতই নির্বোধ?

অনুরাগ অথবা বিরাগের কারণ মানুষের বুদ্ধি বা রূপ, গুণ বা দোষ নয়—বোধহয় পূর্ব জন্মের কর্ম্মফল, নারায়ণ রাও আবার শারদার কাছে গেল। সে-ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে গালচের ওপর বসে পড়ল।

৩। ব্যর্থ মনোরথ

ঘড়ি ততক্ষণের তিনের ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছে। শারদার কাছে গিয়ে বসে, নারায়ণ রাও বলল, "শারদা, এই শুভমুহূর্তকে এভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া ঠিক নয়। এখানে তোমার এভাবে শুয়ে থাকা অনুচিত। বিছানায় গিয়ে শোও। তোমার অপছন্দ হলে আমি শোফাতেই শুয়ে পড়ব। এভাবে আমাদের জেগে থাকা সংগত নয়।" নতশিরে সে বসে রইল। "কিন্তু একটা কথা ভুলো না—আমি তোমার স্বামী সেই কারণে আমি আমার অধিকার বা দাবি চাইব না। তুমি না চাইলে আমি আর তোমায় মুখ

দেখাব না। তোমার মনে আমি দুঃখ দেব না। আমরা শিক্ষিত। তুমিও পরীক্ষায় পাশ করেছ।" শারদা নির্বাক।

নারায়ণ রাও সোফায় গিয়ে অর্ধশায়িত হল, অন্তর্জ্বালা তার দহনক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিল। সে হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকল। পরীক্ষায় পাশ করার পর থেকেই শারদার মনে গর্ব ছিল যে, সে লেখাপড়া জানা মেয়ে, সুসভ্য মহিলা। উপন্যাসের শিক্ষিতা নায়িকাদের মত তার কাছে যার প্রতি প্রেম নেই সে পুরুষ পরপুরুষ। প্রেমের বন্ধনই ঈশ্বর-অভিপ্রেত বিবাহ-বন্ধন।

যার প্রতি প্রেম নেই সে পুরুষকে স্পর্শ করা যায় কীভাবে? তার অধ্যাপিকা, আমেরিকান মহিলা প্রেম সম্বন্ধে তাকে অন্যর কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় শোনা যায় স্বামী-স্ত্রী যখন বুঝতে পারে যে তাদের মধ্য থেকে প্রেম অন্তর্হিত হয়েছে তখন তারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় এবং পরস্পরের মুখ দর্শন পর্যন্ত করে না।

ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য সে পরিশ্রমের সঙ্গে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। বাড়িতেই তৈরী হচ্ছিল এবং লেখাপড়া জানা মেয়েদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও হয়েছিল। কথায় আছে, লেখাপড়া জানা মেয়েদের পক্ষে বিয়ের চেয়ে ভুল আর কিছু নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের মনে পার্থক্যের পর্দা থাকে না। অশিক্ষিত মেয়েদের প্রেম কাকে বলে তা পর্যন্ত জানা নেই। পশুদের মতো তারা শ্বশুরবাড়ি যায়, স্বামী যাই করুক সব সহ্য করে। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনেই তারা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়েরা প্রেম করতে জানে। হৃদয়ে প্রেম যখন আসে, অন্য কাউকে বিয়ে করা কি তখন সম্ভব? প্রেমিকের জন্য তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে।

শারদা ভাবে শিক্ষিতা সহপাঠিনীরা তো এই ধরণের কথাবার্তাই বলত। আমার বিয়ে হয়েছে, আমি স্বামীকে ভালবাসি না কেন? আমার পরিবার আলাদা? শিক্ষিত হলেও কী হবে? তাদের চাল-চলনে উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত ভাব নেই। কেন, খৃষ্টানরা লেখাপড়া করছে না? গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা কুলীদেরওতো হয়,—এ সমস্ত কথা জগন্মোহন রাও কয়েকবার বলেছে। জগন্মোহনের খ্যাতি ও জাঁকজমক শারদার শ্বশুর বাড়ির লোকেদের মধ্যে কী ভাবে আসতে পারে? তাহলে সে কি জগন্মোহনকে ভালবাসে? তা সে বলছে না বটে কিন্তু জগন্মোহন তাকে ভালবাসে। সে প্রেম কাকে বলে

তা জানে। জগন্মোহনকে সে ভালবাসে কিনা বলা যায় না, কিন্তু এটা ঠিক যে সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। কয়েক মাস কেটে গেল। আমেরিকান অধ্যাপিকা তাঁর ক্লাসে বলেছিলেন যে আমেরিকায় জমিদার রাজা-মহারাজা নেই। আজ যে মেথরের কাজ করে কালই সে রাষ্ট্রপতি হতে পারে। সেই কারণে জমিদার প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োজনীয়তাও তাদের দেশে ফুরিয়ে গেছে। সে সময় শারদার তাঁর উপর রাগ হয়েছিল। কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে তার চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়নি। পতিগৃহের যাত্রার অনুষ্ঠানটির কথা শুনেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মায়ের কাছে কান্নাকাটিও করল। মা গিয়ে জমিদারকে বললেন—"আমি চাই না যে মেয়ে এখনই পতিগৃহে যাক্।"

—কেন ?

—ও এখনও শিশু।

ষোল বছর চলছে। আঠারো বছর পর্যন্ত অনুষ্ঠান না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ওর শ্বাশুড়ী সেকেলে মানুষ। শ্বশুরও চান যে তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানের পর্ব শেষ হয়। আমি না বলতে পারলাম না। সেইরকম কথা দিলাম।

—এমন আজব ঘরে মেয়ে দিতে গেলে কেন ?

—তারা সেকেলে মানুষ হলেই বা কী হয়েছে ? তাদের মতো উদার সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবার আমাদের মধ্যে আর কই ? ছেলেটি এতই ভাল যে মহারাজদের জামাই হবার যোগ্যতা রাখে। তার মতো জামাতা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

—তুমি কি তোমার জামাইয়ের খোসামুদি করছ নাকি ? সে যাই হোক অনুষ্ঠানটা এখন ক'র না। এই আমার প্রার্থনা।

—কথা দিয়েছি, যা হয় করে গ্রীষ্ম পর্যন্ত স্থগিত রাখব। একমাসের মধ্যেই বড়দিন আসছে। সুব্বারায় বলেছেন তার মধ্যেই কাজ সেরে ফেললে ভাল হয়। গতকাল আমি তাঁর কথায় মত দিয়েছি। আজ লিখে দেব যে গরমের ছুটি পর্যন্ত কাজের সময় পিছিয়ে দেওয়া হোক।

তখনকার মতো শারদার অসম্মতির কারণ দূর হল। কিন্তু চৈত্রমাস সুব্বারায় তাঁর চিঠিতে লিখলেন—

"এখানে আমরা সব কুশলে আছি। শ্রীমহালক্ষ্মী স্বরূপ বেয়ান বৌদি,

বধূ, শকুন্তলা ও শারদা এবং কুমার রাজা কেশবচন্দ্র সহ বন্ধু-বান্ধবদের কুশল সংবাদ কামনা করছি। পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনার মত অনুযায়ী আগামী বৈশাখেই শুভদিন স্থির হোক। গ্রহনক্ষত্রের অপূর্ব সম্মিলন রয়েছে ঐ তিথিতে। আপনি যদি দিন স্থির করে লিখে পাঠান তা হলেই অনুগৃহীত হই।

ভবদীয় বিনীত

সুব্বারায়লু।"

বধূবরণের অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সত্বর অনুষ্ঠিত হোক এবং বউ ঘরে উঠুক এটাই নারায়ণ রাওয়ের মা চাইছিলেন। তিনি স্বামীকে দিয়ে এই চিঠি লিখিয়েছিলেন।

সুব্বারায়ের চিঠি স্ত্রীকে পড়ে শুনিয়ে জমিদার বললেন, "অনুষ্ঠানের দিন আর পিছানো যায় না।" খবর পাওয়া মাত্র অনুষ্ঠান এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেবার অনুরোধ শারদা তার মার কাছে করল। এই ভয়াবহ দিনটিকে দু-এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ভেবে সে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন আবার সে চিন্তায় পড়ল। মা আবার গিয়ে স্বামীকে জানালেন, "মেয়ে ছোট আর তুমিই বলতে যে আঠারোর আগে মেয়েদের বিয়ে হওয়া উচিত নয়।" তাঁর বক্তব্য যে ঠিক তা জমিদার জানতেন। গ্রাম্যলোকদের অবুঝ মনোভাবের জন্য তিনিও বিরক্ত হলেন।

জমিদার নিমরাজী হলেন। জমিদারগৃহিণী বললেন যে এই শুভকাজ শারদার একেবারেই অপছন্দ। জমিদার বললেন, "তা সত্যি, শারদার অপছন্দ, মেয়ে ছোট্ট, খেলাধূলার শখ এখনও যায়নি, সঙ্গীতের সাধ এখনও অপূর্ণ রয়েছে। আমি লিখে দেব যে এখন বধূবরণের অনুষ্ঠান হবে না।" "চোখভরা জল নিয়ে শারদা আমার কাছে কেঁদেওছে।" "কেঁদেছিল? কেন? বাবলীর চোখে জল কেন? লজ্জার, না পড়া বন্ধ হবার ভয়ে? লেখাপড়া জানা মেয়েরা কী তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়িতে যেতে চায় না? যাই হোক্ কাঁদার মতো অবস্থা শারদার হল কেন?" জমিদার বুঝতে পারলেন যে তাঁর পত্নী এবং সম্বন্ধী শারদার শ্বশুরবাড়ীর তরফকে বিদ্রূপ করছিলেন। তবু কোনো কারণেই তিনি অনুষ্ঠান স্থগিত থাক্ এটা চাইলেন না। অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েকে যে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সুতরাং শারদার ভয়ের কী আছে?

শুভকাজের দিন স্থির হয়ে গেল। শারদা জেদ ধরলে কোনো না কোনো অজুহাতে তার বাবা অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতেন। কিন্তু শারদা সেটা ঠিক মনে করল না। অনুষ্ঠান হলেই বা সে কী করতে পারে? কপালে কী আছে কে জানে? নামে মাত্র পতি, কিন্তু যার প্রতি প্রেম নেই সে তো পরপুরুষ এবং পরপুরুষকে সে স্পর্শ করে কী করে?

৪। আমার প্রতি কি ভালবাসা নেই?

সাড়ে চারটার সময় নারায়ণ রাও ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখল শারদা দরজার কাছে গালচের ওপর পড়ে ঘুমচ্ছে। চোখের জল তখনও শুকোয় নি। ফুল এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আঁচলও ঠিক জায়গায় ছিল না। অমন সুন্দর স্ত্রীর এমনভাবে শোবার দুর্ভাগ্য কেন হল? না জানি কত ঘৃণা ও আমায় করে। হয়তো আমায় একটা দানবই ভেবে বসেছে। বেচারীর না জানি কত কষ্ট হচ্ছে।

এ মেয়ে আমার মধ্যে এমন কী দোষের সন্ধান পেয়েছে যে আমায় ভালবাসছে না? ভালবাসায় কি দোষগুণের বিচার আছে? প্রকৃতপক্ষে প্রেম একটি ভাব। ঐ নামের কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আছে কী? বলা যায় না। মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই আমি যে একেই ভালবাসি সে কথা কি ভাবছি না? শুধু ভাবার কথাও নয়—আমি কি একে ভালবাসি না? ওর জন্যে তো ছটফট করছি। মেয়েটির মধ্যে এই প্রেম যদি না থাকে তাহলে আমি কী করতে পারি? প্রেমহীন পত্নীর সঙ্গে ঘরই বা কী করে করা যায়? সংসারে সর্বাগ্রে আসে প্রেম, পরে বিয়ে হয়? বিবাহ এবং বধূবরণের পর শতকরা নব্বুইটি লোকই তো ভালবাসার মধ্যে সংসার করছে। তারা কি ভালবাসতে জানে না? তরুণের চাই তরুণী, আর তরুণীর তরুণ। তারা একসঙ্গে থাক, পরস্পরকে স্নেহ করুক—আমাদের বিবাহপদ্ধতির শিক্ষাই তো এই। তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রেম থাকলে তো কথাই নেই। আর যদি নাও থাকে তবু তারা সৌহার্দ্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

‘এ মেয়ে কি আমায় পছন্দ করে না? কখনো কি পছন্দ করবেও না?’

দয়ার্দ্র হৃদয়ে শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখতে চাইল সে। নিদ্রিতা শারদাকে সে পালঙ্কের উপর তুলে নিয়ে গেল। সে তাকে চুম্বন করতে গেল। শারদা চম্‌কে উঠল—"আরে!"

—জানতে পারলে লোকে হাসবে। পালঙ্কেই যে ঘুমিয়েছ, অন্তত সেটুকু দেখাও। সকাল হয়ে এলে উঠে চলে যেও। শেষবারের মত জিজ্ঞেস্ করছি। এমন হতে পারে যে আমার প্রতি তোমার ভালবাসা নেই ; কিন্তু অন্যদের কথাও ভাবো, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে কী প্রেম হবার পর হয়েছিল ? কিন্তু তাঁরা কি সুন্দর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হন নি ? তোমার দিদি কি তোমার জামাইবাবুকে প্রেম করে বিয়ে করে-ছিলেন ? কিন্তু দুজনে বেশ আছেন। কেমন সুন্দর বাচ্চাকাচ্চাও হয়েছে। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সর্বত্র এইভাবেই চলছে। তুমি যেমন করছ শারদা, এমনিটি কোথাও দেখা যায় নি। আমি সাধারণ একজন স্বামী নই। স্বামী হিসাবে আমার যদি কোনো খুঁত থাকেও, আমার প্রেমের মধ্যে কী দোষ থাকতে পারে ? সকলের সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে।

শারদা মাথা নীচু করে পালঙ্কের ওপর বসল। নারায়ণ রাও ভাবল তার মন গলেছে। সাহস করে সে তার গায়ে হাত দিল। শারদা বলল—"ও কী ?" নারায়ণরাও চমকে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "আস্তে দরজা খুলে তুমি চলে যাও। সকাল পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।" সে পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। বাইরে থেকে ছিট্‌কানি দেওয়া আছে ভেবে শারদা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তাই দেখে নারায়ণ রাও সেখানে গেল। দরজাটা টেনে দেখল খোলা। তারপর সে ফিরে এসে এমন ভাবে শুয়ে পডল যেন সে ঘুমোচ্ছে।

প্রেমের দিব্যচক্ষু আছে বলেই প্রেমিককে আমরা অনায়াসে চিনতে পারি। আগের দিন শকুন্তলা বুঝতে পেরেছিল যে তার বোনটি পতির প্রতি প্রেম-ভাব প্রকাশ করে না! নারায়ণ রাওয়ের প্রতি তার অন্তরে ভালবাসা উচ্ছলিত হয়ে উঠল। সে যদি তার স্বামী হত তাহলেই ছিল ভাল। একথা সে ভাবল। সে সুন্দর। সে বুদ্ধিমান, কী নয় সে ? "ভালবাসার উপযুক্ত, তার চেয়ে ভাল স্বামী কোথায় পাওয়া যাবে ? শারদা পাগলী। আমার স্বামীর চেয়ে ওর স্বামী ভাল এবং শ্রদ্ধা বেশি পাবার যোগ্য। এমন বর পেয়ে

খুসি হওয়াতো দূরের কথা, সে অসন্তুষ্ট। এ শারদার দুর্বুদ্ধি ছাড়া আর কী। আচ্ছা আমরা সবাই মিলেই কি মেয়েটার মন বিষিয়ে দিই নি ? তার সামনে আমি এবং মা কি তার দেবতুল্য পতির নিন্দা করিনি ?"

শকুন্তলা দেবী তার বোনকে প্রশ্ন করল—"কী শারদা তুই এমন করে রয়েছিস কেন, বোন ?" শারদা কিছু বলল না। শকুন্তলা তাকে বোঝাতে লাগল, তোর বরটি বেশ ভাল। সে সাধছিল আর তুই পিছু হটছিলি। ওরকম করে নাকি, বোকা! অমন স্বামী পেলে সংসারে আমার আর কিছুরই দরকার ছিল না। তোর মতো ভাগ্যবতী আর কেউ নেই। পুরুষদের মন খুবই নরম। তুই ভুল করছিস। খবরদার আর যেন করিস না। সে তোর চার দিকে প্রেমের দুর্গ তৈরী করার মতো সুন্দর মনের মানুষ। কি সহানুভূতি-শীল। আজেবাজে জমিদারগোষ্ঠীর লোকের মতো সে নয়। আমার দুঃখের কথা তুই কি জানিস্ না ?"

রাগের মাথায় শারদা বলে ফেলল, "তার বিরুদ্ধে তুইও তো অনেক কথা বলতিস।" সে কাঁদতে লাগল। এর মধ্যে শারদার পিসি সেখানে এসে পড়লেন। তিনি শারদাকে ভেতরে যেতে বললেন। মেয়ের জামাই পছন্দ হয়নি জেনে জমিদার গৃহিণী খুসি হলেন। কিন্তু লোকে যদি জানতে পারে যে বাসরে মেয়ে জামাইয়ের কাছে যায়নি তাহলে কী ভাববে ? সেইজন্যে তিনিও বল্‌লেন, "মা ভেতরে যাও।"

পিসি এবং দিদি অনেক সাধ্য সাধনা করে বোঝানোর ফলে মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে শারদা যেতে রাজী হল। অন্য কোন পথও ছিল না। আদরের দুলালীকে যেতে দেখে জমিদার গিন্নীর চোখে জল এল। তিনি মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরলেন। শকুন্তলা চোখ রাঙিয়ে বাঘিনীর মতো গর্জন করে উঠলো, "মা, আমরা কি বুদ্ধির মাথা খেয়েছি ? সকলে জেগে গেছে, সকাল হয়ে আসছে।" পিসি বললেন "মেয়েকে ভাল শিক্ষাই দিচ্ছ। লোক শুনলে হাসবে! ক্ষান্ত দাও, ভাই জানতে পারলে আমার আর রক্ষা রাখবে না। এমনধারা কোথাও দেখিও নি আর শুনিও নি বাপু। শারদা এখানে এসো।"

হাত ধরে শারদাকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরতেই শকুন্তলা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—"দাঁড়াও মা, দেখে ফেলবে।" শারদাকে ভেতরে পাঠিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়া হল।

বোনের কথা ভাবতে ভাবতে সারারাত শকুন্তলা দেবীর ঘুম হল না।

শকুন্তলা দেবী দুই সন্তানের মা। বয়স একুশ বছর। শারদার মতো সেও সুন্দরী। দুবার প্রসবের ফলে শরীরে কিঞ্চিৎ স্থূলতা এসেছে। রং তার ফরসা, বোনের মতন পিঠ ভরা চুল। বড় বড় চোখ। ছোট্ট মুখটি। উঠে পাশের ঘরে গিয়ে কপাটে কান লাগিয়ে সে কী যেন শুনল। তারপর দরজার শেকল খুলে দিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। সকাল বেলা শারদা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই সে চমকে উঠল। আলো জ্বালিয়ে শারদাকে সে ভাল করে দেখল। তারপর আলোটা আবার নিবিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে শুলো।

পর দিন সন্ধ্যাটা নারায়ণ রাও গল্পগুজবে বেশ উৎসাহ দেখাল। শারদার অবস্থা কিন্তু পূর্ববৎ। শকুন্তলা দেবী ভাবল যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তার প্রথম রাত্রির কাহিনী যেন কেউ টের না পায় এটাই নারায়ণ রাওয়ের অভিপ্রেত ছিল। ও বিষয়ে ভাবার কোন অবকাশই সে কাউকে দিতে চায় না। সেই জন্যই তার কথাবার্তায় এত উৎসাহের আধিক্য দেখা গিয়েছিল।

এসব দেখে শারদা কিন্তু খুব বিস্মিত হল। কথাবার্তা আনন্দ উল্লাস শেষ হল। সবাই চলে গেল। মাথা নীচু করে ঘরে এসে শারদা শুয়ে পড়ল। নারায়ণ রাওয়ের উৎসাহও অন্তর্হিত হল। মাথা নীচু করে চেয়ারে বসে সেও কী যেন ভাবতে লাগল। জীবনটাই তার কাছে মরুময় বলে মনে হল। "আমার নির্মল চরিত্রে না জানি কী কলঙ্ক লাগবে ? আমার আরাধ্যা দেবী শারদা কি আমার হবে না ? আমাদের বাড়িতেও তো তিনরাত্রি এক সঙ্গে থাকতে হবে। তখন দেখা যাবে।" নিরাশার মেঘকে দূরে ঠেলে হাসি মুখে নারায়ণ রাও শারদার কাছে গেল। "তোমায় কী বলে ডাকব ?—আনন্দময়ী, না মুগ্ধললনা ? আমি চিন্তায় পড়েছি। বলো শারদা, কি নামে আমি তোমায় ডাকব ?"—সে প্রশ্ন করল।

শারদা সঙ্কুচিত হল। কিছু বলল না।

"আমাদের জীবন ব্যর্থ হোক এই কী চাও ? তাহলে তাই হোক। অপরকে কষ্ট দিতে আমি চাইও না, পারিও না। আমি স্বপ্ন দেখতাম যে একটি সুন্দরী মেয়ে আমার বৌ হবে। সে শিক্ষিতা, শিল্পী বিষ্ণুর মতো তাকে আমি হৃদয়ে স্থান দেব। শিবের মতো তার সম্মিলনে অর্ধনারীশ্বর হব। ব্রহ্মার মতো আমি তাকে বাঁশীতে ধারণ করব। আমার স্বপ্ন তোমাতে এসে রূপ পরিগ্রহ

করল বলে মনে হয়েছিল। ভাবতাম জন্ম আমার সার্থক। তুমি বাজাবে বীণা আর আমি বেহালা। স্বর্গীয় সুখ সাগরে ভাসব। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ভাবলাম সৌভাগ্যক্রমে আমার স্ত্রীও বিদুষী, আমার গর্বের সীমা ছিল না।

ভাবতাম আমার চিত্রকলা ও কবিত্বের প্রতিষ্ঠা তোমার সাহচর্যে বিকশিত হয়ে উঠবে। কত ভাষায় আমার বাণীকে আমি চিত্রিত করব এবং কত বর্ণে আমি তার সৌন্দর্য প্রকাশ করব। হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে প্রণয় কলহে লিপ্ত হব। জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমায় ভালবাসবার জন্য হৃদয়ে আমার প্রেমের নদীর স্রোতধারা, এত প্রেম যে তোমার প্রেমের ঘাটতিকে পূরণ করে দেবে। আমার প্রেমের নদীতে আমি তোমাকে সাঁতার কাটাব। আপন করে নেব। আনন্দ লোকের প্রেয়সী, তুমি অন্তত সুখী থাকো অপ্রকাশ্যে, মনে মনে হলেও আমার প্রেমের স্বীকৃতি দাও। মরুভূমির বালুরাশিতে যে নদী লুপ্তধারা সেই নদীর মতো আমাদের জীবন যেন ব্যর্থ না হয়।"

৫। আমার প্রেম নেই

স্বামী যতক্ষণ মুখর, শারদা ততক্ষণ নির্বাক। পতির কথার যথার্থতা অনুভব করে দু-একবার তার মনটা নরমও হয়ে এসেছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জগন্মোহনের কথা তার স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে এসে পড়ল—'যার প্রতি প্রেম নেই সে রকম ব্যক্তিকে স্পর্শ করা পাপ।' একথাগুলো বজ্রের গর্জন বলে তার মনে হল।

মেয়েদের সঙ্গে নারায়ণ রাওয়ের বেশি মেলামেশা ছিল না। এত কথা সে যে কী করে বলে ফেললো তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। এরপর তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুতে চাইল না। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করল—"শারদা, কথা বলছ না কেন?" শারদা ভীত হয়ে পড়েছিল। সত্যি কথা বললে বোধ হয় নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এই কথাই সে ভাবছিল। কম্পিত স্বরে সে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি না।" বলেই হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল।

নারায়ণ রাওয়ের মনে হলো কে যেন তার মুখে চাবুক মারল। সে পিছিয়ে এল। বিভ্রান্তি তাকে আচ্ছন্ন করল। কেমন যেন টলতে টলতে সে সোফার ওপর পড়ে গেল। আর কী বাকি রইল! সব শেষ হয়ে গেল। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। তার তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। জীবন হল ব্যর্থ। সারাজীবন দুঃসহ জ্বালায় জ্বলে মরার অভিশাপে অভিশপ্ত বলে সে নিজেকে মনে করল। শ্বশুরালয়ে এবং নিজের বাড়িতে পাষাণ হৃদয় নিয়ে কৃত্রিম হাসির মুখোশ পরে নারায়ণ রাও অবশিষ্ট রাতগুলি নাটকের মতো কাটিয়ে দিল। বন্ধুরাও বুঝতে পারল না আচার-অনুষ্ঠানপর্ব এইভাবে সমাপ্ত হল।

তার বাবা বাড়িতে সত্যনারায়ণের ব্রত উদযাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। কে জানে কী হয়? কী ভাবে হয়? শারদা বাপের বাড়ি ফিরে গেল। কিছুটা অস্পষ্ট এবং কিছুটা স্পষ্টভাবেই তার মনে হতে লাগল যে সে তার পতি এবং পিতার প্রতি অপরাধ করেছে।

বালক কেশবচন্দ্র যেন কী একটা অকল্যাণের ছায়া দেখতে পেল। তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বড় বোনের কাছে গিয়ে সে বলল—"ছোট জামাই বাবু খুব ভাল।" ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে শকুন্তলা চুমু খেল। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করল—"কী, ছোট জামাইবাবু ভাল নয়?"

—তার মানে তোমার বড় জামাইবাবু ভাল নয়?

—কেন?

—জানি না।

শারদার কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে বেশ সতর্কভাবে দেখতে দেখতে সে বলল—"ছোট জামাইবাবু ভগবানের অবতার, না? তাই আমার মনে হয়।"

শারদা তার কথায় চমকে উঠল।

শকুন্তলা বোনকে প্রশ্ন করল—"শারদা, তোর বর মাদ্রাজ যাবার পথে কি এখানে আসবে?" মাথা নেড়ে শারদা জানিয়ে দিল যে সে জানে না। ভগ্নীপতির দ্বারা শকুন্তলা প্রভাবিত হয়েছিল। নিষ্পাপ মনে সে মা, বোন, পিসি এবং বাবার সামনে তার প্রশংসা করছে, সে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে লাগল।

ভয়ংকর এক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। স্বামীর দিক থেকে বলাৎকারের ভয় তার ছিল না। কিন্তু তার নমনীয় ব্যবহার শারদার মন থেকে মস্ত এক বোঝা নামিয়ে দিয়েছিল।

পড়াশুনার প্রতি সে মনোযোগ দিল। সংগীতচর্চা আবার শুরু করল, ত্যাগরাজের কীর্তন গেয়ে গেয়ে মনের প্রসন্নতাকে ফিরিয়ে আনতে লাগল।

শারদাকে দেখে শকুন্তলা বলত,—"তুই ভাগ্যবতী বোন; রাজকুমারীদের ভাগ্যেও জোটে না এমন স্বামী তুই পেয়েছিস। গা। আমার গলা তো খারাপ হয়ে গেছে। বীণাও বাজাতে পারি না। বাচ্চারা সব সময় চেল্লায়।"

শারদা তার দিদির ছেলেপিলেদের সব সময় খেলতে দেয়। তাদের কাছে থেকে এক মুহূর্তও সরে থাকে না।

জমিদারকুলের মেয়েদের ব্যবহার কি এমনই হয়? না তার ভাগ্যই এমন হল। গানেও আর মন বসে না। বাগানে গিয়ে নারায়ণ রাও তার মনকে গাছের উপর বিছিয়ে দিত। নারায়ণ রাওয়ের মনে হত গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি ফুলদের তাকে দেখে ঈর্ষা হয়।

বাপ ভাই শ্বশুরের একান্ত ইচ্ছা যে নারায়ণ রাও রাজমহেন্দ্রবরমে ওকালতি শুরু করুক। সেও তার জন্য প্রস্তুত ছিল! কিন্তু এখন আর কী করে তা সম্ভব হয়? কিসের জন্য ওকালতি? গান্ধীজী আবার যদি সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং কারাবরণের অনুমতি দেন তাহলেই ভাল হয়। সব ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়াই বোধহয় শ্রেয়। এই কি শ্মশান বৈরাগ্য? আমার সব বাসনাগুলিই কি সমাধিস্থ হয়েছে? কোনো না কোনো ভাবে দেশসেবাই করতে হবে। কী করা যায়? গ্রন্থাগারের জন্য পরিশ্রম? এখন আর তাও ভাল লাগছে না। খাদি উৎপাদন? সে একটা ফ্যাক্টরির মত ব্যাপার। চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করব? কিন্তু আমি তো চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী নই। রাজু সব দিক থেকে ভাগ্যবান, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে এখন মাদ্রাজের বড় হাসপাতালে কাজ শিখছে।

পরমেশ্বরের মনটা ভাল। সে সন্তুষ্ট। কষ্ট এলেও সে বেপরোয়া। কে জানে তার নিজের জীবন কীভাবে দুঃখের মরুভূমি উত্তীর্ণ হবে।

"আমার জীবন থেকে শিল্পের কী বিলুপ্তি ঘটল? সংগীত, সাহিত্য,

চিত্রকলা এসব দিয়ে আমার কী হবে ?" নারায়ণ রাও একদিন তার বাবাকে বলল, "বাবা, আমি দেশভ্রমণে বেরুতে চাই।" তিনি বিস্মিত হলেন। "ছাত্রাবস্থায় তো সারা দক্ষিণভারত ঘুরে এসেছ ?"—বাবা বললেন।

—এবার উত্তর ভারতটা দেখতে চাই।

"উত্তর ভারত ?"—সুব্বারায় প্রশ্ন করলেন। উত্তর ভারত কথাটির অর্থ যে তিনি জানেন না সেজন্য অবশ্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য হয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন।

—কাশী, প্রয়াগ সব দেখে আসব।

—একলা ?

—আমি আর পরমেশ্বর যাব।

—কতদিনের জন্য ?

—দু-একমাস।

—আচ্ছা দেখা যাবে।

—না, বাবা, ওকালতি শুরু করলে আর ঘোরার সুযোগ পাব না।

—বললাম তো দেখা যাবে।

পত্নীকে নিভৃতে পেয়ে সেদিন সন্ধ্যায় সুব্বারায় বললেন, "পরে যেতে পারবে না বলে নারায়ণ কাশী যেতে চাইছে। দেশভ্রমণ সেরে ওকালতি আরম্ভ করা ভালই হবে।" জানকম্মার টনক নড়ল। ভ্রমণে বেরুনো কি সোজা কথা ? পর দিন পুরোহিত ডেকে সুব্বারায় যাত্রার শুভদিন দেখলেন। বোন এবং স্ত্রীকে নিয়ে সুব্বারায় আগেই কাশী ঘুরে এসেছিলেন। সেজন্য যা হয় করে পুত্রের কাশী যাওয়াটা জানকম্মা মেনে নিলেন। বিছানা-বোঁচকা বেঁধে নারায়ণ রাও চারশো টাকা সঙ্গে নিল। বাবা বললেন, "দরকার হলে টেলিগ্রাম করবে।" তাঁকে প্রণাম করে সে মার কাছে গেল। ছেলেকে কাছে ডেকে তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, "বাবা, ভগবান আমাকে রাম-লক্ষ্মণের মতো দুটি সন্তান দিয়েছেন। সাবধানে চলাফেরা করো। তোমার পথ চেয়ে আমি বসে থাকবো। তুমি বড্ড চঞ্চল—চলন্ত গাড়ীতে চড় ; অপরকে সাহায্য করার জন্য ছুটোছুটি করো। সাবধানে থেকো।" আশীর্বাদ করে তিনি ছেলেকে বিদায় দিলেন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব, বোনেরা যারা এসেছিল, তারা কবে ফিরে

গেছে। সূর্যকান্তম কিছুই বুঝতে পারছিল না তাই সে জিজ্ঞেস করল—"দাদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না।" বোনকে কাছে টেনে নিয়ে নারায়ণ রাও বলল—"সুরী তোর জন্য কী আনব রে?"

—তোমার যা ইচ্ছে। আমি যা চাই তা হচ্ছে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—ও, এই কথা।

আমার বোন, এই মেয়েটি যেন প্রেমের প্রতিমা। মন ওর মাখনের মতো নরম। রামচন্দ্র একে পেয়ে সত্যই ভাগ্যবান। এদের দাম্পত্য জীবন দেখার বড়ই ইচ্ছা হয়। কুইনাইন বাইসাল্ফেট, টিঞ্চার আয়োডিন্, টিঞ্চার বেঞ্জিন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড্, আনন্দ ভৈরবী, সিতাংশু রস, সান্নিপাত ভৈরবী, কার্লোমলেরগুলি, অম্রৃতাঞ্জন প্রভৃতি ওষুধ, ৬০ ফুট লম্বা দড়ি, বাসনপত্র, পাঁচ সের ঘি, তেল, চাল, লঙ্কা, তেঁতুল, কিছু শাকশব্জী, আচার প্রভৃতি; চাকু, দুমাসের মতো কাপড়-চোপড়, দুটি মশারী, ক্যাম্পখাট, দুটি বিছানা, চামড়ার দুটি সুটকেশ এবং দুটি কাঠের বাক্স নিয়ে নারায়ণ রাও সফরের জন্য তৈরী হল।

বউকে মার কাছে অথবা শ্বশুরবাড়িতে রেখে তার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরুবার অনুরোধ জানিয়ে নারায়ণ রাও ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর মূর্তিকে চিঠি লিখেছিল। ভ্রমণের সকল ব্যয়ভারই যে সে নিজেই বহন করবে একথাও জানিয়ে ছিল। এবার না এলে আর কখনও তার এমন সুযোগ মিলবে না। 'অন্ধ্র' পত্রিকার সম্পাদক দেশ নেতা নাগেশ্বর রাওয়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পরমেশ্বর মূর্তি নিয়ে নিল। ছুটি নিয়ে পত্নীকে মার কাছে রেখে সে রাজমহেন্দ্রবরমে নারায়ণ রাও-এর সঙ্গে মিলিত হল।

শুভক্ষণ দেখে পিতামাতা ও গুরুজনদের পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে বোনের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে নারায়ণ রাও যখন মোটরে চড়ে যাত্রা করল, সে সময় সুলক্ষণা এয়োরা গাড়ির দুধারে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় জানাল।

সেদিন সন্ধ্যায় পরমেশ্বরমূর্তি প্যাসেঞ্জারে রাজমহেন্দ্রবরম্ এসে পৌঁছল। নারায়ণ রাও তাকে ভগ্নীপতি লক্ষ্মীপতির বাড়িতে নিয়ে গেল।

তিনজনের মিলিত আলোচনায় সে রাত কাটাল। লক্ষ্মীপতিও সঙ্গী হোক, এই ছিল নারায়ণ রাওয়ের ইচ্ছা। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল না।

পরদিন খুব সকালেই রমণাম্মা দুই বন্ধুর জন্যে রান্না করল। নারায়ণ রাও তাকে কাছে ডেকে বলল—"রমণাম্মা, তোর আর বুটির জন্য ছবি আনব।" তারপর লক্ষ্মীপতিকে সঙ্গে নিয়ে দুটি টাঙ্গায় তারা যাত্রা করল। খুরদা হয়ে পুরীর দুখানি টিকিট নারায়ণ রাও কিনল। গোল্ড্ফ্লেক্ এবং থ্রি ক্যাসলস্ এর দশটি করে প্যাকেট্ এবং কিছু বই কিনে তারা গিয়ে মেলে চড়ে বসল। লক্ষ্মীপতির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ পর্ব সারার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

৬। উত্তরভারত যাত্রা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতভূমি জগৎকে সভ্যতা, মানবধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দিয়ে আসছে। হিমালয় থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত সাগর ঘেরা এই দেশে কত জাতির, কত রাজ্যের সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং ধ্বংস হয়েছে। একজাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্য জাতির। নতুন জাতিগুলোকে সে আপনার করে নিয়েছে। ভারত তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, একতার মধ্যে বিভিন্নতা, ভগবানের বিশ্বরূপ প্রকাশের ভূমিকায়, ভারতসভ্যতার ইতিহাসস্বরূপ মহানদীর উৎপত্তি কোথায় কে জানে? আর কেই বা জানে তার গন্তব্যস্থল কোথায়? পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের শিল্প নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর মূর্তির হৃদয় স্পর্শ করল।

আদিত্যদেবের মন্দির ভারতে দু-তিন স্থানে মাত্র আছে। কিন্তু কোনারকের মন্দিরে দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়নি। মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব মহারাজা তার দরবারী শিল্পের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

শিল্পীর একটি পুত্র ছিল। পিতার সেবাযত্নের অবকাশে সে শিল্প-নিপুণ হয়ে উঠেছিল। দেশান্তরের কলা জ্ঞান লাভের জন্য সে একদিন তার পিতার কাছে বিদেশ যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করল। পিতা বলল, "ভাব ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই।" সে তার পুত্রকে খেতে দিল না। ছেলেটি তার পিতার এই ব্যবহার অনুচিত বলে মনে করল। সে জবাব দিল—"অহংকারই পতনের কারণ।"

তারপর সে বিদেশ ভ্রমণে বেরুল। এদিকে পিতাও মন্দিরটিকে চূড়া পর্যন্ত তৈরী করে ফেলল। প্রধান মণ্ডপ, ভক্তমন্দির, বিবাহ মণ্ডপ, ক্ষেত্র পালকালয় প্রভৃতি নির্মিত হল। সে আর তার শিষ্যরা মিলে সিংহ, হস্তী, অশ্ব, অপূর্ব সুন্দরী রমণীমূর্তি এবং দেব দেবীর বিগ্রহ নির্মাণ করে ফেলল। মন্দিরের সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। কিন্তু কূপমণ্ডুক ঐ শিল্পীর 'শ্রী-বিমান' শীর্ষ নির্মাণের অভিজ্ঞতা ছিল না। মহারাজকে সত্য কথা বলাও তারপক্ষে সম্ভব নয়। দরকারী কাজের অজুহাতে সে অন্যান্য মন্দিরের চূড়া দেখার আশায় বেরিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে জ্যোতিষীরা মহারাজকে জানাল যে পনেরো দিনের মধ্যে শুভ লগ্ন আছে এবং অমন লগ্ন নাকি বহু বছরের মধ্যে আর আসবে না। শিল্পী সময় মতই চলে গিয়েছিল। তার শিষ্যবর্গের মধ্যে কেউ শীর্ষদেশটি নির্মাণ করতে পারবে কি না জানতে গিয়ে মহারাজ হতাশ হলেন। ফলে শিল্পীর খোঁজে তিনি চারদিকে লোক পাঠালেন।

এর মধ্যে শিল্পীর পুত্র দেশ ভ্রমণান্তে ফিরে এল। কথাটা তার কানে এল। পিতার অখ্যাতি হতে পারে এই ভয়ে কাজটির ভার সে স্বহস্তে গ্রহণ করল। তার অসাধ্য কাজ পুত্র করেছে জেনে পিতা ক্রুদ্ধ হতে পারে ভেবে ছেলেটি নিজের পরিচয় গোপন করেই কাজ আরম্ভ করল। দশ-বারো ফিট্ উঁচু গুরুভার চূড়াটি সে শ্রীবিমানের পাশেই একটি স্তূপের উপরে পাথর থেকে খোদাই করল। সমুদ্রের বালুকারাশির দ্বারা স্তূপটি আরও উঁচু করার প্রার্থনা সে রাজাকে জানাল। হাজার হাজার গাড়িতে করে বালি আসতে লাগল এবং তিন দিনের মধ্যেই স্তূপটির চূড়া ১২৪ ফিট উচ্চতা লাভ করল। শ্রীবিমানের চূড়ার ভিত্তিভূমিও ছিল ঐ সমতলে। এইবারে সে মন্দির এবং স্তূপের মধ্যে খুঁটি পুঁতে দড়ির সাহায্যে ঐ শিলাময় চূড়াটিকে যথাস্থানে স্থাপন করল।

এই অসাধারণ কর্মকাণ্ডকে রাজা প্রত্যহ পর্যবেক্ষণ করতেন। এর সাফল্যে তিনি আনন্দলাভ করতেন। কাজ যেদিন শেষ হল সেদিন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে বহু লোক মন্দিরটিকে দেখতে এল। সেই দর্শকস্রোতের মধ্যে রাজ শিল্পীও আত্মগোপন করে এসেছিল। তার আগমনের কথা কেউ টের পায়নি। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সে মন্দিরটা দেখল।

কাজ শেষ হলে পরে রাজা সেই বালক-শিল্পীকে নিজের গলার হার খুলে পরিয়ে দিলেন। পরদিন মাঙ্গলিক কার্যের প্রয়োজনে সেদিন সে মন্দিরেই শুয়ে রইল।

পিতা নিজ পুত্রকে চিনতে পারল না। অল্প বয়সেই সে চলে গিয়েছিল। সে এখন উদ্গতগুম্ফ যুবক। কিছুতেই তার কাছে শিল্পী ছোট হতে চাইল না। রাত্রে নিদ্রিত পুত্রকে সে ছুরিকাঘাতে বধ করল। পুত্রের বুক থেকে রক্ত বইল। আর্তনাদ করে জেগে উঠতেই প্রদীপের আলোয় পিতাকে সে চিনতে পারল। "বাবা আমাকে মারলে কেন? আমায় কি চিনতে পারনি? হায়! প্রাণ গেল। প্রভুর প্রয়োজনে আমি এই চূড়াকে উঠিয়েছি। বাবা, শুনেছি কাল নাকি শুভতম লগ্ন। পিতৃদেব! গুরুদেব! আমি তোমার হাতে মরে সুখী। আমার শেষ প্রণাম নাও।" ছেলেটি সেখানেই মারা গেল।

এইবার পিতা পুত্রকে চিনল। সে তার ঘোর অপরাধের রূপ দেখে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর হয়ে লজ্জায়-দুঃখে সেও সেখানেই দেহত্যাগ করল। পর দিবসের শুভ মুহূর্ত এল কিন্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল না, আর কখনও হয়ও নি। কাহিনী শুনে পরমেশ্বর মূর্তির চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

নারায়ণ রাও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করল। কোনারক-জগন্নাথ-ভুবনেশ্বরে দেবালয়গুলির প্রধান চূড়া সুউচ্চ। তার চেয়ে ছোট মধ্যমণ্ডপ, আরও ছোট সামনের মণ্ডপ এবং সিংহদ্বারটি হয় সবচেয়ে ছোট। ভিত থেকে চূড়া পর্যন্ত সমগ্র মন্দিরটি প্রস্তরময়। পাথরের মতো অন্য কোনো বস্তুর উপর অত সুন্দর কারুকার্য হয় না। গাঁগশিল্পী সকল রকমের রূপ রচনায় তন্ময় হয়ে যেত। গাঁগেরা ছিল অন্ধ্রবাসী। উত্তর অন্ধ্রের শিল্পীদেরই বলা হয় গাঁগ।

ভুবনেশ্বরের রাজরানী, পরমেশ্বর মার্কণ্ডেয়শ্বর ও লিঙ্গেশ্বর দেবালয়, কোনারকে, সাক্ষীগোপালে গাঁগ শিল্পীদের সুন্দর সুন্দর সৃষ্টির দেখা মেলে। সারা মন্দির জুড়ে মূর্তি শিল্প অঙ্কিত। মাঝে মাঝে মূর্তি রাখা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে চোল, পাণ্ড্য ও চালুক্য দেবালয়গুলিতে পাথর বা ইঁট দিয়ে মন্দির তৈরী হতো। গাঁগ দেবালয়গুলি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গোল করে তৈরী হত।

ভুবনেশ্বরে দুশো মন্দির আছে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কাছে আছে একটি করে গভীর পুষ্করিণী। কে জানে এত জল কোথা থেকে এল। শিল্পীরা

এগুলিকে এমনভাবে তৈরি করেছিল যাতে এদের জল কৃষিকার্যে ব্যবহার হতে পারে। জগন্নাথের পুরী, সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি দেখে নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বরমূর্তি কলকাতা পৌঁছুল। কলকাতায় যাদুঘর, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, উদ্ভিদ-উদ্যান, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জৈন মন্দির, বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রভৃতি তারা দেখল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি, মায়ের মন্দির, সেই মহাভক্ত পবিত্র পুরুষের বাসস্থান দেখে তারা পুলকিত হয়ে উঠল। নারায়ণ রাও পরমেশ্বরকে বলল যে, এই মহাপুরুষ বলেছেন সর্ব ধর্মের জননী হিন্দুধর্ম। আত্মানুসন্ধানের শিক্ষা এই হিন্দুধর্মই অন্য ধর্মকে দিয়েছে। রামকৃষ্ণ লেখাপড়া জানতেন না। তা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁর সম্বর্ধনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের মতো মহানুভবেরা তাঁর চরণ-সেবা করে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অর্জুনের মতো। সব ধর্মেই পালনীয় কতকগুলি নীতি পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে পড়ে। তবু সেগুলির পালন ক্রমেই মোক্ষলাভের আশা মূর্খতা ভিন্ন কিছু নয়। তিলক কেটে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে শ্রীবিষ্ণুর দর্শনকারীরাই বৈষ্ণব, মাথা কামিয়ে দাড়ি বাড়িয়ে যারা মহম্মদের শিষ্য হয়েছে কোরাণ যাদের ধর্মগ্রন্থ ; দুটি নয়, একটি-মাত্র ভগবান যাদের উপাস্য শুধু তারাই ধার্মিক। যীশু ভগবানের সন্তান, তাঁর মোক্ষ লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি তাঁর মতে বিশ্বাসী নয় সে নরকভোগ করবে এই রকম যারা মনে করে তারাই খ্রীষ্টান।—এ ধরনের যুক্তি বালসুলভ।

—আমাদের ধর্ম বলে সব ধর্মের গন্তব্য এই ভূমি।

—ও কথা বলো না, মহম্মদ অথবা খৃষ্টও কি এ কথা বলেন নি? প্রত্যেক অবতারই এই কথা বলেন।

—তুই এই কথাই তো বলছিস যে ধর্মের লোকই হোক না কেন সে মোক্ষলাভ করে। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশই ঠিক।

—হ্যাঁ তিনি মুসলমান হয়ে, আল্লার আরাধনা করে তাঁর সাক্ষাৎলাভ করেছেন। খৃষ্টান হয়ে জিহোভার কাছে গেছেন। রাধাভাবে কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন, হনুমান হয়ে রামের সংস্পর্শে এসেছেন। এসব একই পরমাত্মার বিভিন্ন রূপ নয় কি?

বেলুড়মঠ দেখে অর্থ দান করে তারা কলকাতা থেকে গয়া গেল, ফল্গু-নদীতে স্নান করল, রামগিরিতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মরকতমণিখচিত লিঙ্গ দর্শন করে বুদ্ধগয়া গেল। বুদ্ধ যে স্থানে বোধি লাভ করেছিলেন সেখানে বসে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে বুদ্ধমন্দিরের শোভা দেখে তারা সন্তোষ লাভ করল। বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করলে পর শিষ্যরা তাঁর পূতাস্থি পেটিকাবদ্ধ করে দেশবিদেশে পাঠিয়ে ছিলেন। যে সমস্ত রাজাদের কাছে সেগুলি পাঠানো হয়েছিল তাঁরা পবিত্রস্থানে সেগুলির উপর পাথর এবং ইঁটের স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তার উপর কারুকার্য করা হয়েছিল। স্তূপগুলিও পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছিল। ঐ স্তূপের উপর ভক্তরা, তাঁদের শিল্পের নিদর্শন রেখেছেন। এই উপলক্ষ্যে তোরণ প্রভৃতিও নির্মিত হয়েছিল। এই সব কাজে রাজা মহা-রাজারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। পরে বুদ্ধের জন্য কত মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। ঐ মন্দিরগুলিরই অন্যতম বুদ্ধগয়ার মন্দির। শোনা যায় স্তূপ নির্মানের পরই মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়। কিন্তু পরমেশ্বরমূর্তির মতে তার আগেও মন্দির ছিল।

গয়া থেকে মোগলসরাই হয়ে তারা কাশী পৌঁছাল। গঙ্গাস্নান সেরে বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব, গণেশ, অন্নপূর্ণা এবং বিশালক্ষ্মী দর্শন করে তারা কেদার ঘাটে বিজয়নগরের মহারাজার বাড়ীতে গিয়ে উঠল। তারপর কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেল।

—মহানুভব এক ব্যক্তি ভিক্ষুকবেশে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন প্রথমে এ্যানি বেশান্ত করেছিলেন। মানুষের চরিত্র কী বিচিত্র—পরমেশ্বর বলল।

"কত হাজার বছর ধরে এই মহাতীর্থ মানবসমাজের কল্যান সাধন করে আসছে। শ্রীরামচন্দ্র এই পুণ্যভূমি দর্শন করেছিলেন। আরে, পরমেশ, আমাদের দেশের তীর্থস্থানগুলির প্রতিষ্ঠা কত পরে হয়েছে; কিন্তু এই কাশী হচ্ছে সবচেয়ে পুরোনো তীর্থস্থান।"—নারায়ণ রাও বলল।

৭। ভারতীয় প্রচীন সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুরাগী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কেন সৃষ্টি করেছেন ?

—আরে নারায়ণ, একটা কথা রয়েছে এর মধ্যে। আজকের দিনে, যে সময় শিক্ষা বলতে পাশ্চত্য শিক্ষাই বোঝায় এই রকম একটা সময় সরকারের কোপদৃষ্টিকে এড়িয়ে জাতীয়তার ভাবকে উৎসাহিত করার জন্য সেই মহানুভব ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন।

—তুই ঠিক বলেছিস। পুরোনো দিনের কাশী বিদ্যাপীঠ, নালান্দা, তক্ষশীলা, অজন্তা, নার্গাজুর্ন কোণ্ডা, ধান্যকটক, নবদ্বীপ প্রভৃতির মতো শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আর আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। ১৯১১ সালে স্থাপিত গুজরাট, কলকাতা ও অন্ধ্র জাতীয়া বিদ্যালয় এখন নামে-মাত্র পর্যবসিত। শিবপ্রসাদ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত গুজরাট বিদ্যাপীঠ এখনও রয়েছে। আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রের দর্শন করে কী লাভ করব কে জানে ? শুনেছি অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয় বিজয়ওয়াড়া থেকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। তাকে যদি বিশাখা-পট্টনমে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে রায়লসীমাবাসীরা তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। বিজয়ওয়াড়া হচ্ছে অন্ধ্র প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রধান শহর। সব দিকে এর যোগাযোগ আছে। পবিত্র কৃষ্ণা নদী এর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

—আর ভাই এসব ভাববার লোকও বেশী নেই। আইনসভায় অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশাখাপট্টনমে নিয়ে যাবার প্রস্তাব আসছে। প্রস্তাব পাশও হয়ে যাবে। কিন্তু এইভাবে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে তাঁরা এমন কি কাজ করছেন যা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা হবে না, এটা আমি জানতে চাই।

তারা কাশী থেকে গেল সারনাথ। সেখানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্যের ফলে আবিষ্কৃত সঙ্ঘারাম ভবন দেখল। গুপ্তযুগের প্রসিদ্ধ এই মহাবোধি সঙ্ঘ পরিবর্ধিত করে সংস্কার করছে। বুদ্ধ এবং মঞ্জুশ্রী

তারার কীর্তি বিস্ময়কর। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি বুদ্ধের উপদেশাবলী সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার সংকল্প করেছিলেন। ঐখানে একটি অশোকস্তম্ভও আছে। কালক্রমে সঙ্ঘারামটি বৃদ্ধি পেতে থাকল। এই সেই বেণুবন। ওই স্থানটিকে আশ্রয় করে বুদ্ধদেব সূর্যের মতো জগৎকে সত্যপথ দেখিয়েছিলেন এবং উপদেশ দিয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, আর নারায়ণ রাও স্তূপের নীচে চক্ষু মুদিত করে বসে ভগবান বুদ্ধের কথা ভাবতে লাগল। তাঁর অমৃতবাণী নারায়ণ রাওয়ের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। পরমেশ্বর ভাবল যে ধ্যান-মগ্ন হয়ে সে "ওঁ মণিপদ্ম ওঁ" এর চিন্তা করছে।

কাশীর পর প্রয়াগে গিয়ে বন্ধুদ্বয় ত্রিবেণীসংগমে স্নান করল। ত্রিবেণী সংগমে আসলে দুটি নদীই মিলিত হচ্ছে। তৃতীয় নদীটি অদৃশ্য বলে কল্পনা করা হয়। যমুনা নীল, গঙ্গা সাদা আর সরস্বতী সোনালী। যমুনার চেয়ে গঙ্গার গভীরতা কম। সরস্বতার গভীরতার কথা মহাকালই জানেন, গঙ্গা বেগবতী। যমুনার ধারা গম্ভীরা। স্নান সেরে তারা দুজনে শহর দেখতে বেরুল। পণ্ডিত মোতিলালের বাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, দুর্গ প্রভৃতি দেখল। কেল্লার মধ্যে অশোকস্তম্ভও দেখা হল।

প্রয়াগ থেকে বড় বড় কলসীতে গঙ্গার জল ভরে তারা রাজমহেন্দ্রবরমের ঠিকানায় লক্ষ্মীপতির কাছে পাঠিয়ে দিল।

এলাহাবাদের পর তারা দেখল লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার এবং হৃষিকেশ। আকাশ-পথ ত্যাগ করে গঙ্গা হৃষিকেশেই আর্যাবর্তে নেমে আসছেন। সেখানে তারা ঋষিদের আশ্রম দর্শন করল। স্বামী রামতীর্থ যেখানে গঙ্গাদেহে বিলীন হয়েছিলেন সে স্থানটিও তারা দেখল। নারায়ণ রাও বলল, "এই ঋষি দিগম্বর অবস্থায় হিমালয়ে তপস্যারত থাকতেন। বিবেকানন্দের বিদেশে যাত্রার কার্যসূচী ইনি সম্পন্ন করেছিলেন। অসাধারণ মেধাবী ছিলেন ইনি। গণিত শাস্ত্রের এম.এ. পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দশটির মধ্যে আটটি প্রশ্নের উত্তর দেবার বদলে দশটিরই উত্তর নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেকের মধ্যে দিয়ে দিতেন। সত্যস্বরূপ ভগবানের দর্শন যিনি লাভ করেছেন এসব প্রশ্ন তাঁর কাছে আদৌ কোন প্রশ্নই নয়।"

কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দিল্লী পৌঁছাল, সেখানে কুতুবমিনার, লৌহ-স্তম্ভ, জুম্মা মসজিদ্, প্রভৃতি দেখল। ঐস্লামিক শিল্পনিদর্শনগুলিও তারা দেখল। নতুন দিল্লীর আধুনিক অট্টালিকাগুলি দেখে তারা ভাবল এই নিষ্প্রাণ শিল্প যুগোপযোগীই বটে। মোগল বাদশাহদের দ্বারা নির্মিত দুর্গ এবং দিল্লীর আশেপাশে অন্যান্য ভবন তাদের দৃষ্টিগোচর হল। আকবরের কীর্তি ফতেপুর সিক্রিও তারা দেখে নিল। ফতেপুর সিক্রিতে তারা দুদিন রইল। আকবরের সময়ের কথা তাদের মনে পড়ল।

নারায়ণ—"এই প্রাসাদগুলিতে ভ্রাম্যমাণ আনারকলির কাহিনী আমার মনে আসছে। কত বিদেশিনী এইসব স্থানে বসবাস করেছে তা কে জানে! তাদের কণ্ঠস্বর যেন এখনও অস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।"

—কবিতা, কবিতা। নারায়ণ, তুই একজন সরদার, তুই একদিন দরবারের দিকে যাচ্ছিলি। জানানা মহলের বাতায়নপথে দুটি মৃগ নয়নের আবির্ভাব হল। নয়ন দুটি তোর দিকে দেখল। তুই মাথা তুলে ওপর দিকে চাইলি। আঁখি দুটি হাসল।

—বেশ তারপর?

—তারপর তোর কাছে দূত এল। তোকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঢাকাই শাড়ি পরা সুসজ্জিতা তরুণীটি পারস্যদেশীয়। তুই তার পায়ে লুটিয়ে পড়লি। আনারকলির মতো ঠোঁট দুটিকে খুলে সে প্রশ্ন করল—'তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?' সে তালি বাজাল।

—কাহিনী বর্ণনায় আমার পিতৃদেবের পরেই তোর স্থান। নায়ক আমি, তাই আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। তার পর কী হল?

—তার তালি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন সৈনিকরা এসে পড়ল। হাতে তাদের লম্বা লম্বা তলোয়ার। ভয়ে তুই তো কম্পমান।

—আরে আরে!

—সে বলল, একে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচের কুঠরিতে বন্ধ করে রাখ। আর তারা তোমায় নিয়ে গিয়ে সেই কুঠরিতে বন্ধ করল।

—তবু বন্দী হওয়াও মন্দ না।

—কে জানে তার কত জন্ম বন্দীত্বের কথা কপালে লেখা আছে? কুঠরিতে নিয়ে গিয়ে তাকে কয়েদ করে রাখল। খাবার দেওয়া হত শুধু

জল আর রুটি। চতুর্থ দিনে নবাবের চারশততম ভাবী পত্নী কারাকক্ষের দ্বার খুলে ভেতরে এসে তোকে আলিঙ্গনে বাঁধল। তোর আনন্দের আর সীমা রইল না। সে তোকে খুব খাওয়াতে দাওয়াতে লাগল। রোজ রাত্রে সে তোর কাছে আসত। আর তা না হলে নিজের শয়নকক্ষে তোকে নিয়ে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই নবাব একথা জানতে পারলেন।

—তখন তিনি আমার মাথা নিলেন ?

—বা শুধু কি তাই। তিনি তোকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলে পিষে ফেলার আদেশ দিলেন। নবাব সে সময় হঠাৎ খবর পেলেন যে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তোদের দুজনার কথা তিনি ভুলে গেলেন। আর তোরাও সৈনিকদের ঘুষ দিয়ে দক্ষিণ দেশে পালিয়ে গেলি এবং সেখানে গিয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়িতে চাকরি নিলি।

—বেশ ভাল গল্প।

দিল্লী থেকে তারা মথুরা, বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর প্রভৃতি ঘুরে এল। এই সমস্ত স্থানগুলি ছিল শ্রীকৃষ্ণের বিচরণক্ষেত্র, কৌরব আর পাণ্ডবরা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। অভিমন্যুর কাহিনী মনে পড়ায় আমাদের যাত্রিদ্বয়ের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বৃন্দাবনে তারা স্মরণ করল মীরাবাঈকে। পরমেশ্বর মীরার একটি ভজন গাইল।

৮। বৃন্দাবন

মীরাবাঈয়ের জীবনী দুই বন্ধুর কাছে, অতি প্রত্যক্ষ বলে মনে হল, কৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি এসেছিলেন বৃন্দাবনে। সে সময় বৃন্দাবনে এক মহাপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অবস্থানকালে বৃন্দাবনে কোনো নারীর প্রবেশাধিকার থাকবে না; এই ছিল তাঁর আদেশ। তাঁর ধর্মানুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে চলছিল। বৃন্দাবনে প্রবেশকালে মীরাবাঈকে বাধা দেওয়া হল।

—ভাই, আমায় বাধা দিচ্ছ কেন ?

—মা তুমি স্ত্রীলোক। আমাদের গুরুর আদেশ বৃন্দাবনে নারীর প্রবেশ নিষেধ।

—তোমাদের গুরু কে?

—আমাদের গুরু হলেন শ্রীরূপ গোস্বামী, হিমালয়ে তপস্যার ফলে তিনি বহু শক্তির অধিকারী হয়েছেন।

—তাই যদি হয় তাহলে তাঁকে গিয়ে এই গানটি শোনাও। তিনি একটি গীত গাইলেন যার অর্থ হচ্ছে; শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর ভক্তেরা হচ্ছে নারী। সেই পুরুষে লীন হবার জন্যই এই ভক্তির তপস্যা। শিষ্যেরা গিয়ে গুরুকে এই গান শোনালেন। গুরুদেব চমৎকৃত হলেন। তিনি ওই গীতের মর্মার্থ অনুধাবন করলেন। এবং হন্তদন্ত হয়ে মীরার কাছে এসে হাজির হলেন। মীরার পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে তিনি বললেন, "তুমিই আমার গুরু। তুমি আমাকে সত্যপথ দেখিয়েছ। আমি মূর্খ, আমায় ক্ষমা কর। স্ত্রীলোক মোক্ষপথের বাধা এই ভ্রান্ত পথের আমি ছিলাম যাত্রী। আমার পথ ভুল।"

এই কাহিনীটি স্মরণ করে তারা যমুনাঘাটে, বাগ-বাগিচা, কালীদার গোবর্ধন প্রভৃতি দেখে বেড়াল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপকুমারা
বৃন্দাবন সঞ্চারা,
মুরলী মোহন মৃদুপদ নর্তন
মোহন লীলা কারা,
সুন্দর নন্দকুমারা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ...

গানটি গাইতে গাইতে পরমেশ্বর নারায়ণকে বলল, "নারায়ণ, এই জ্যোৎস্নায় যমুনার তীরে জলক্রীড়ারত শ্রীবেণুগোপালকে দেখি আয়।" নারায়ণ তার কথা শুনতে পেল না। দিব্যবালক শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ওই অঞ্চলে খেলাধূলা করতেন। তিনি কি মানুষকে সর্বত্যাগের পথ দেখিয়েছিলেন? নারীপুরুষের কামনার নামই কি প্রেম? দিব্যরূপিনী নারী হিসাবে প্রিয়তমার পূজা করা কি বিধেয়? এটা কি মূর্খতা? প্রেমিকের ভক্তিই তো প্রেম। প্রকৃত প্রেমিক ফললাভের বাসনামুক্ত। প্রভু অপর কাকে ভালবাসেন সে সম্বন্ধেও সে

উদাসীন। একাত্ম হওয়াই তার ধ্যানজ্ঞান। বাল্যের প্রেমই ভক্তি। ননীচোর, রাধিকাহৃদয়নাথ এবং কুরুক্ষেত্রে বেদ-উপনিষদ সাংখ্যসারের উদ্বোধক শ্রীকৃষ্ণ কি বিশ্বরূপধারণের মধ্য দিয়ে সর্বসমন্বয়ের কথা ব্যক্ত করেন নি?

—শোনো পরমেশ্বর, সাংখ্যদর্শন খুব ভালো। কিন্তু সাংখ্যের বক্তব্যটি কী? প্রতিটি আত্মা পুরুষ। আর সেই হল সাক্ষীভূত পরমাত্মা। মানুষের অভিমান, অহংকার, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হচ্ছে প্রকৃতি। নির্বোধ ব্যক্তিকে সাক্ষীভূত পুরুষ বলে মনে হয় না। প্রকৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সে ঘর সংসার সন্তানের প্রবাহে হাবুডুবু খায়, বাঁচে মরে। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা, যোগের দ্বারা মানুষ যখন আত্মপরিচয় লাভ করে, পুরুষ প্রকৃতিকে এবং তাদের পৃথক পৃথক অবস্থানকে চিনে নেয়, তখনই সে মোক্ষ লাভ করে। প্রকৃতিই পরিবর্তনশীল। পুরুষ হচ্ছে খোঁড়া পতির মতো আর প্রকৃতি হচ্ছে যেন অন্ধ পত্নী। পুরুষ যদি পথ দেখায় তাহলে প্রকৃতি তাকে বহন করতে প্রস্তুত। সাংখ্যধর্মের ত্রুটি কোথায়! আর সে ত্রুটির পূরণ শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে করছেন? মহর্ষি কপিল এইটুকু মাত্র বলেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করেন নি। কিন্তু প্রত্যেক আত্মাই যে এক-একটি পুরুষ একথা ঠিক নয় কি? অর্থাৎ বিশ্বে কোটি কোটি পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবে যদি থাকে তাহলে তাদের কতটুকু ক্ষমতা? তারা যদি আদ্যন্তহীন সর্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হয় তাহলে তাদের চালিকা শক্তি ত আছে। তা না হলে কি কোটি কোটি আত্মা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হবে? সেইজন্য কৃষ্ণ গেলেন উপনিষদের দিকে। উপনিষদ বলল, আদ্যন্তবিহীনই হচ্ছে অনির্বচনীয় ব্রহ্ম। বড় বড় জ্ঞানীও ঐ ব্রহ্ম বিষয়ে অজ্ঞ। ওই ব্রহ্ম থেকেই উৎপত্তি হয়েছে মূল প্রকৃতির। আর মূল প্রকৃতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টির। সৃষ্টির প্রত্যেকটি ব্যক্তি এবং প্রত্যেক প্রাণীই ব্রহ্ম। নক্ষত্র, আকাশ, ভূমি, নারী, পুরুষ, কুকুর, ঘোড়া সবই ব্রহ্ম। প্রকৃতির জন্য এই সৃষ্টির অস্তিত্ব। তদ্‌বিরহিত হওয়া মানেই ব্রহ্মে বিলীন হওয়া।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন? সকলে একই কথা বলেছেন। কিন্তু কেউই সবটুকু বলতে পারেন নি। সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ কী? এর কারণ জানতে চেয়ো না। সে চিদানন্দ পুরুষ ও প্রকৃতি সাংখ্য দর্শনে যেভাবে বর্ণিত

হয়েছে সৃষ্টিতেও সেইভাবেই আছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি পুরুষোত্তমেরই স্বরূপ। সব একই পুরুষের প্রত্যক্ষীভূত রূপ। প্রকৃতি স্বরূপ সব পুরুষোত্তমের অবতার। প্রকৃতি বিলীন হয় পুরুষে আর পুরুষ হয় পুরুষোত্তমে। নারায়ণ, ভগবদ্‌গীতা আমাদের আরও মনোযোগের সঙ্গে পড়া উচিত।

যাত্রী দুজন আগ্রা পৌঁছাল। প্রিয়তমার প্রেমের মূর্তিস্বরূপ, অশ্রুর ঘনীভূত রূপ, নির্মল হৃদয়ের প্রতিরূপ যে তাজমহল তাকে তারা যমুনাতীরে চন্দ্রালোকে দেখল। বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম এই তাজমহল। এর প্রতিটি রেখা, বক্রতা, উন্নতি সবকিছুই যেন একটি সুরমূর্ছনার দ্যোতক। যমুনার তীরে তাজমহল শোভা পাচ্ছে। তাজমহলের চূড়ায় তারা উদীয়মান সূর্যের আলো দেখল। মধ্যাহ্নের নীরবতায় তারা তাজমহলের মহিমা লক্ষ্য করল। আকাশভরা তারার মাঝে তার বৈশিষ্ট্যকে নিরীক্ষণ করল। দেখে দেখে মনের সাধ আর মেটে না। এ যেন এক পিপাসা, যার নিবৃত্তি নেই।

চতুর্থ দিন রাত্রে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। পরমেশ্বর তাজমহলের পনেরো-খানা ছবি তুলল। সেদিন রাত্রে তাজমহলে গান গাওয়া হবে বলে নারায়ণ রাও ঠিক করল। দুজনে যমুনাতীরে গেল।

নারায়ণ রাও বেহালায় সুর তুলল সা—সা—রে। প্রস্তর দ্রবীভূত হল। যমুনার স্রোত যেন থেমে গেল। তাজমহল যেন লুপ্ত হয়ে গেল এবং তার স্থানে মনে হল শাহজাহান ও মমতাজ বসে রয়েছেন। সব কিছুই অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। পরমেশ্বর আনন্দে ডুবে গেল।

দয়ালবাগ হল সৎসঙ্গীদের কাছে মক্কাবিশেষ। ওখানে তাদের গুরুদেব থাকেন। পঞ্চমগুরু বর্তমান রয়েছেন। আশ্রমের গঠনকার্য শুরু হয় চতুর্থ গুরুর সময়কালে। আশ্রমটি এখন সর্ববিষয়ে উন্নতির পথে। সৎসঙ্গ প্রধানত তিনটি বিষয়ে উপদেশ দেয়—ধর্ম, সংঘ এবং পরিশ্রমের বিষয়ে। পরমাত্মা শব্দরূপে অধিষ্ঠিত। আর সেই শব্দ রাধাস্বামী। এ সংসার পিণ্ডাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড ও শুদ্ধচৈতন্য এই তিনভাগে বিভক্ত। পিণ্ডাণ্ড হচ্ছে ভৌতিক, এবং ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে মানসিক। এই তিনটি অংশ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। পিণ্ডাণ্ড সব জানে। ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমে জ্ঞানচক্র ভ্রূদ্বয়ের মধ্যখানে থাকে। তার উপরে থাকে শুদ্ধচৈতন্য। প্রথমে ভ্রমর গ্রহ, তার উপর সত্যলোক, আগম প্রভৃতি। সবার উপরে রাধাস্বামী। ষড়্‌রিপুকে জয় করে রাধাস্বামীর

কৃপায় অনায়াসে পিণ্ডাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে লীন হইয়া যায় এবং শুদ্ধচৈতন্য লাভ হয়। আমরা যদি করুণাময় রাধাস্বামীর সেবা করি—নামজপ করি, যোগাভ্যাস এবং সৎসঙ্গ করি, তাহলে এই তিন অংশের উর্ধ্বে আমরা সদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছাতে পারি। সদগুরুই রাধাস্বামীর কাছে পাঠাতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন ধামগুলিতে পৌঁছালে স্বর্গীয় ছন্দোময় বিভিন্ন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় এবং বিবিধ বর্ণময় আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হয়। দয়ালবাগের সদ্‌গুরুর আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে সমাজ বা সংঘ সংস্কার। যে কোনো ধর্মের মানুষ সৎসঙ্গের অনুগামী হতে পারে। জাতি-বর্ণভেদ এদের মধ্যে নেই। ভোজন বা বিবাহে জাতিভেদ অনুপস্থিত। সৎসঙ্গ জাতিভেদের বিরোধী। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ বাঞ্ছনীয় বলে এরা মনে করে। আধুনিক আচারের স্থলে পরিচ্ছন্নতাকেই আচরনীয় বলে মানা হয়। জাতিভেদ না থাকলে অসাম্যও থাকবে না। সমাজবদ্ধ মানুষদের সমাজের উন্নতির জন্যই কাজ করতে হবে। সম্পত্তি হচ্ছে সঙ্ঘের এবং আয়ও সঙ্ঘেরই। ফলে সভ্যদের পরিবার প্রতিপালন সঙ্ঘই করবে। এই আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করবার জন্য দয়ালবাগে কাপড়, চাকু, গ্রামোফোন, রং, আয়না, চামচ, ঘড়ি, মাখন, জুতো, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। দয়ালবাগ দেখাতে চায়, দেশের প্রয়োজনীয় বস্তু স্বদেশেই তৈরী হওয়া উচিত। "ধন্য দয়ালবাগ। সদ্‌গুরু তোমায় প্রণাম। ভগবান তোমায় সফলতা দিন"—তারা বলল। নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর কিছুদিন সেখানে অতিথি হয়ে রইল। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে ঐ ধর্মও ভগবদ্‌গীতার ধর্মের তুল্য নয়।

৯। মিত্রদের নিমন্ত্রণ

যেমন-তেমন করে বি. ই. পাশ করে রামেশ্বর রাও কাজ শিখছিল। কিন্তু তার মনটা সব সময় পড়ে থাকত রাজমহেন্দ্রবরমে সুব্বিয়া শাস্ত্রীর বাড়িতে। একবার তাকে তামিলনাদ যেতে হয়েছিল, আর একবার সে মালাবারও গিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া তার উচিত ছিল কিন্তু কোনোরকমে

সে পাশ করল। সরকারী চাকরি দুর্লভ। তাই সে হায়দ্রাবাদ-রিয়াসতে অথবা জেলা বোর্ডে কাজের চেষ্টা করতে লাগল।

আলম, রাজারাও প্রভৃতি ওয়াই-এম-সি-এতে রাজেশ্বর রাওয়ের কাছে এল। আলম বি. এল. পরীক্ষা পাশ করেছিল। অ্যাপ্রেন্টিস্ পরীক্ষায় পাশ করার পর মাদ্রাজ হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হবার উদ্দেশ্যে নারায়ণ রাও তাকে নিজের কাছেই রেখেছিল। নারায়ণ রাওয়ের জন্য সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সকলে তাকে ডাকত ব্রাহ্মণ-মুসলমান বলে।

বি. এল. পড়তে পড়তেই নেলোরে আলমের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার শ্বশুর ত্রিপিলকেনেই ব্যবসা করতেন। তার বিবাহ অনুষ্ঠানে সব বন্ধুরা হাজির ছিল। অন্ধ্র এবং তামিলনাদে হিন্দু-মুসলমান এ সমস্যা একেবারেই নেই। হিন্দু-মুসলমানরা ভাইয়ের মতো বসবাস করে। নানানভাবে মুসলমানদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা সরকার করেছে, কিন্তু তার কোনো ফলই হয়নি। মুসলমানরা হিন্দুদের মন্দিরকে প্রীতির চোখে দেখে থাকে। মসজিদের কাছে হিন্দুরা বাজনা-বাদ্য বাজায় না, অন্ধ্রদেশের ব্রাহ্মণও মুসলমানের দোকানে শরবত প্রভৃতি খায়, পান কেনে। মুসলমান ফকিরের সমাধিতে হিন্দুরাও ফুল দেয়।

নেলোরে আলমের বাড়িতে গিয়ে নারায়ণ রাওরা বেশ কিছুদিন ছিল। সে সময় তারা আলমের বাড়িতে জলখাবার খেত আর ভাত খেত হোটেলে। আলম ছিল জবরদস্ত পালোয়ান। কুস্তিতে খুব পটু। ফুটবল, আর হকিতে সে ব্যাকে খেলত। এদিক থেকে মারলে তার বল গিয়ে পড়ত ওদিকের গোলে। সেইজন্য লোকে তাকে ফুটবল-শের বলত। ফুটবলকে উপলক্ষ্য করেই আলম আর নারায়ণ রাওয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল।

অন্ধ্রদেশ কোনো খেলাতেই নাম করে নি। ফুটবলের জন্য কলকাতার নামডাক আর ক্রিকেটের জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং লাহোর প্রভৃতির। হকিতে পটু পাঞ্জাব এবং টেনিসে দক্ষ মাদ্রাজ, কলকাতা, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ প্রভৃতি। টেনিস, ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অন্ধ্রে আজকাল বাড়ছে।

অন্ধ্রের অনেকে কিন্তু অনেকরকম খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ক্রিকেটে সি. কে. নাইডু, সি. এস. নাইডু, রামস্বামী, বালাইয়া প্রমুখ। টেনিসে রামস্বামী, নারায়ণ মূর্তি কৃষ্ণস্বামী প্রমুখ। যাই হোক এই অন্ধ্র কিছুটা

পিছিয়ে আছে। চট্ করে কোনো খেলায় তারা দক্ষতা অর্জন করে বিদেশে খ্যাতিলাভ করেনি।

খেলার ব্যাপারে আলম বড় শৌখিন। রাজনীতি অথবা অন্য কোনো কিছুতে তার মন লাগত না, টাকাপয়সাও তাকে আকৃষ্ট করতে পারত না। কেবল খেলা আর খেলা। 'হিন্দু' পত্রিকার খেলার পৃষ্ঠাটাই সে দেখত। সিনেমা যাওয়ার সুযোগ সে ছেড়ে দিত। কিন্তু যদি এস-ইউ-সি. এম. সি. সি. অথবা এম. এ. এল. এর কোথাও খেলা থাকত তাহলে সে সেখানে হাজির হবার সুযোগ কখনো ছাড়ত না। ইংল্যাণ্ড থেকে গিলিগানের অধিনায়কত্বে যে ক্রিকেট টিম এসেছিল তারা মাদ্রাজ পৌঁছবার আগেই সে বোম্বাইয়ে গিয়ে খেলা দেখে এসেছিল।

রাজেশ্বর—আলম, নারায়ণ আর পরমেশ্বর তোকে কোথা থেকে চিঠি দিয়েছে রে?

আলম—সাঁচী থেকে লিখেছিল, পরমেশ্বর তাতে শুধু কবিতাই লিখে দিয়েছিল। দুজনেই তোকে অপমান করেছে। আমাকে, নটরাজকে আর রাজারাওকে তাদের সঙ্গে অজন্তায় দেখা করতে বলেছে। সেখান থেকে ইলোরা, নাসিক, ঔরঙ্গবাদ, প্রতিষ্ঠান, পুণা, বাতাপি, বীজাপুর, হায়দ্রাবাদ, বরঙ্গল প্রভৃতি ঘুরে বিজয়ওয়াড়া পৌঁছবার কথা। এই সমস্ত ঘুরে আসতে দুমাস লাগবে। দুমাস থাকা সম্ভব না হলে আমরা অজন্তা ইলোরা দেখে চলে আসতে পারি।

নটরাজন—আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করে আজ আমায় যেতে বলেছে। টেলিগ্রাম পাঠানোর কারণটা জানবার জন্যেই আমি দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসেছি। এখন বুঝেছি যে ব্যাপার এই। রাজেশ্বর, চলো, যাওয়া যাক্।

রাজেশ্বর—সত্যি কথা বলতে কী, আমি অনেক দিন ঘরছাড়া। আমার মা এবং অন্য সকলে আমায় যেতে লিখেছে। তারের পর তার আসছে। তুমি যাও।

রাজা—কেন রাজু, আমিও কী বাড়ি যেতে চাই না? বাড়ির লোকদের আমিও অনেক দিন দেখিনি। তাছাড়া অমলাপুরমে আমি প্র্যাকটিস্ করব ভাবছি। বেপরোয়া হওয়া উচিত নয়। আমার যাওয়া কি সম্ভব? কিন্তু তাই বলে আমি কি যাচ্ছি না?

নটরাজন—আমারও অবসর নেই। আমার হাসপাতালে এ সময় কাজের খুব চাপ।

আলম—কেরানীকে ঘুষ দিলে হবে না?

রাজা—কত ডাক্তার রয়েছে, তোর কী দরকার?

আলম—কারও অমত করার কোনো অধিকার নেই। আজ থেকে তিন দিন পরে সকলকে হয় বোম্বাই এক্সপ্রেসে নয় মেলে চাপতে হবে। রাজেশ্বর রাওয়ের ব্যাপার কার অজানা? রাজমহেন্দ্রবরমের গোলাপের গন্ধ তার কাছে এখানে পর্যন্ত আসছে।

রাজেশ্বর—আমায় রাগিও না।

আলম—নবাব কাউকে ভয় করে না। গোলাপ যদি আমাদের হয় তবে রাজী। কোনো না কোনোদিন পাওয়া যাবেই।

রাজেশ্বর—আরে আলম; খবরদার। কথা দিয়ে ভোলাস না, বলছি।

আলম—তাহলে গ্রামোফোন কোম্পানিওয়ালাদের ডাকো।

নটরাজন—আলম সব সময় বাজে বকে।

রাজারাও—তোমরা সব পাগল হয়েছ মনে হচ্ছে, মাথায় তোমাদের পলেস্তারা লাগাতে হবে। মাথা মেরামত করা দরকার। কী, তোমাদের মতটা কী?

রাজেশ্বর—ঘা-ফোঁড়া ধুতে ধুতে আর গুলি পাকাতে পাকাতে আজকাল ডাক্তাররাও ঠাট্টা করতে শিখেছে।

রাজারাও—ইঁটের ওপর ইঁট সাজানোওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে ডাক্তার ভাল।

আলম—ও দুই এক। একজন বলে আমার হাতের গুলি মানুষকে সোজা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, অপরজন বলে আমার তৈরী পুল সোজা নদীতে ঝাঁপ দেয়।

রাজেশ্বর—সর্বনাশ তোমার ওকালতিই বোধহয় সবার সেরা। মিথ্যা কথার কেরামতিতে অজানা-অচেনা মানুষদের দফারফা করে কারা?

নটরাজন—পদার্থ তোমরা সবাই এক। গরিব চাষীদের রক্ত শুষে নেবার জন্যেই তোমাদের উদ্ভব। নরকের কীট সব।

রাজারাও—নটরাজ হচ্ছে প্রকৃত কৃষকসন্তান। কী সুন্দর কথা বলে!

কিষাণদের মধ্যে শক্তি ছিল না। সেইজন্য দেশোয়ালি এসে তাদের শুষতে আরম্ভ করেছে।

আলম—ঠিক আছে। সুলতানের হুকুম সম্বন্ধে এবার তোমাদের বক্তব্য কী?

রাজেশ্বর—আমি কোনমতেই আসতে পারব না।

আলম—তাহলে আমি একটা কথা বলছি। শোনো, আমি ওদের একটা চিঠি দিচ্ছি। ওরা হায়দ্রাবাদে এলে আমরা ওদের সঙ্গে মিলিত হব। ওখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে বরঙ্গল হয়ে বিজয়ওয়াড়া পৌঁছুব। কী বল?

রাজেশ্বর—মুসলমান মুসলমানই। হায়দ্রাবাদে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে যাব কেন? শরম নেই?

আলম—আরে, আরে, এ উর্দু কোথা থেকে শিখল?

রাজারাও—আমি বুঝেছি যে, রাজেশ্বরের কোনো আপত্তি নেই। আমরা বিপদে ফেলেছি নটরাজনকেই।

নটরাজন—তুই গেলে আমি রাজী···

রাজেশ্বর রাও যেন আকাশপথে রাজমহেন্দ্রবরমে পৌঁছল। এসে পর্যন্ত সে তাকে দেখার সুযোগ খুঁজছিল। ছাত্রাবস্থায় রাজেশ্বর রাও অদ্ভুত কায়দায় পুষ্পশীলার কাছ থেকে চিঠি আনাত। সে লিখত এক বন্ধুর কাছে। এবং বন্ধু আরেকটি ছেলেকে দিয়ে চিঠিটা পুষ্পশীলার কাছে পৌছে দিত। পুষ্পশীলা তার কাছে দুটো ফটো পাঠিয়েছিল। রাজেশ্বর সে দুটিকে নিজের ঘরে সাজিয়ে রেখেছিল। ছোট্ট একটা ছবি সে তার আংটিতেও বাঁধিয়ে রেখেছিল। একটা হারে তার ছবি গেঁথে সেটা গলায়ও পরে থাকত। অর্থাৎ ভিতর বাহির সর্বত্রই পুষ্পশীলা, সারা পৃথিবী পুষ্পশীলাময় এদের দুজনের সম্বন্ধে নানা রকমের কানাঘুষা চলত।

পুষ্পশীলাও রাজেশ্বর রাওয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠছিল। এমন না হয় যে স্বামী এবং বাড়ির বুড়িটা সব জেনে ফেলে। সে খুব সতর্ক হয়ে চলত। স্বামীকে ভালবাসার ভান করত। সে তার স্বামীর সঙ্গে রাজেশ্বর রাওয়ের তুলনা করতে লাগল। সে ওই বুড়োর জন্য নিজের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বলিদান দিচ্ছিল। ভগবান নির্দয়, একথাই তার মনে হত। ছিঃ

ছিঃ এই ঘৃণ্য কাজের জন্য ভগবানের নাম করার কী প্রয়োজন ? সে ভাবল-এতে পাপের কী আছে ? প্রকৃত প্রেমই বিবাহ। স্বামীর লুকিয়ে আনা উপন্যাসে সেই কথাই তো লেখা ছিল। "মুক্তপ্রেম সংঘের" অধ্যক্ষের লেখা ছিল ঐ উপন্যাসটি।

১০। দেশভ্রমণের খবর

শারদার মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছিল। প্রথম তিন দিন তো স্বামী তার সাধ্যসাধনা করেছিল। তারপর সে এমনভাবে থাকত যেন ঘরে সে নেইই। মনে মনে শারদা ভাবত, বাবা, বাঁচা গেছে। কিন্তু সময়ের গতির সঙ্গে শারদার মনে নানা রকমের চিন্তা উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

পতি বিদেশযাত্রায় বেরিয়েছে। না জানি কোথায় কোথায় ঘুরছে। এইসব কথা ভেবে ভেবে তার পিতা উৎকণ্ঠায় থাকেন। ফলে স্বামীর উপর তার রাগ হত। কিন্তু খেলাধূলা আর গানের চর্চায় সে তার কথা ভুলে থাকে। ইতিমধ্যে অক্টোবরের শেষে চিঠি এল যে নারায়ণ রাও কোত্তপেট পৌঁছেছে এবং সে কাশী সন্তর্পনের কথা চিন্তা করছে।

মাদ্রাজে ফিরেই জমিদার তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজমহেন্দ্র-বরমে এসে জামাই কি বাড়িতে এসেছিল ?

—আসেনি। সে রাজমহেন্দ্রবরমে এসেছিল কিনা তাও তো আমরা জানি না।

—শুনেছি সকালের মেলে এসে লক্ষ্মীপতির বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্ধুদের সঙ্গে কোত্তপেট গিয়েছিল।

—আমাদের এখানে এল না কেন ?

—কেন এল না ? তার ইচ্ছা হয় নি আসে নি।

—বাড়ি ছেড়েছে আজ তিন মাসের ওপর হল। এখানে এসেও বাড়িতে এল না। আশ্চর্যের কথা। সে তো কখনও এমন করত না।—সুন্দর বর্ধনম্মা বললেন।

নতুন নতুন বলে বোধহয় লজ্জা হয়েছে। তার না আসার মূলে কোনো

না কোনো কারণ আছেই। এপর্যন্ত শুধু অনুমান করা যায়। কারণটা কী হতে পারে? তিনি জানতেন যে তাঁর স্ত্রী জামাইকে পছন্দ করেন না। তাঁর সামনে তিনি বহুবার জামাইয়ের প্রশংসা করেছেন। তিনি আদর করলে জামাইও যে তাঁর সমাদর করবে একথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু জমিদারগৃহিণী একই রকম ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। "উদারহৃদয় জামাই এসব আমলেই আনত না। সে যখন এখানে এসেছিল সে সময় আমার গিন্নীই কিংবা অন্য যে কেউই হোক না কেন, তাকে এমন অপমান করে থাকবে যার ফলে এ বাড়িতে ঢুকতে সে লজ্জা পাচ্ছে। আর তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আজ থেকে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের এখানেই শেষ।" এই কথা ভেবে তিনি বোনের উদ্দেশ্যে বললেন, "তার মনটা খুবই পরিষ্কার। ছোটখাট কথায় কিছু মনে করার লোক সে নয়। আজ পর্যন্ত শহরে এসে এ বাড়ি না হয়ে সে যায়নি। তুমি এমন কিছু কর নি তো যা তার কাছে খুব খারাপ লেগেছে?"

—না তো।

—যেই তার অনাদর করে থাকুক তার সঙ্গে আজ থেকে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

—কী আজব কথা বলছ? তার অনাদর কে করবে?

ভেতরে বরদকামেশ্বরীকে দেখা গেল। ভুল করে সেই কিছু বলে ফেলেনি তো?

কাশীসন্তর্পণের জন্য জমিদার তাঁর পত্নী এবং কন্যাকে নিয়ে কোত্তপেট গেলেন।

জমিদারগিন্নী কখনও সেখানে যান নি, সুব্বারায়ের স্ত্রী তাই তাঁর খুব আদর যত্ন করলেন। নারায়ণ রাও এবং শারদাকে একটি বেদির উপর একসঙ্গে বসানো হল। দুজনে গঙ্গাপূজো করল। কেশবচন্দ্র জামাইবাবুকে খদ্দরের কাপড় দিল। জানকম্মা সূর্যকান্তমের হাত দিয়ে হলুদ, সিঁদুর, শাড়ি প্রভৃতি দিলেন। আরতি হল, ব্রাহ্মণদের সংবর্ধনা করা হল। অভ্যাগতদের গঙ্গাজলের ঘটি দান করা হল। সারা জীবন চলে যাওয়ার মতো গঙ্গাজল নারায়ণ রাও এনেছে বলে তার মা, বোনের গর্বের সীমা ছিল না।

খাওয়াদাওয়ার পর অন্য একটি মহলে জমিদার শ্রীরামমূর্তি, সুব্বারায়,

নারায়ণ রাও এবং অন্যান্য বন্ধুরা বসে পান খাচ্ছিলেন। জামাইয়ের বিদেশ-ভ্রমণের বিষয়ে জমিদার আলম ও রাজারাওয়ের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কাশীসন্তর্পণ উপলক্ষ্যে পরমেশ্বর তার স্ত্রীকে বিজয়ওয়াড়া থেকে কোত্তপেট এনেছিল। বিশাখাপট্টনমে সে কাশীসন্তর্পণ করবে ঠিক করেছিল।

বিশাখাপট্টনম থেকে পরমেশ্বরের বাপ-মা, ভাই-বোন রাজা রাওয়ের বাপ-মা স্ত্রী সুরমা ছেলেমেয়েরা, আরো অনেকে এসেছিলেন।

দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা, দয়ালবাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে বলার পর নারায়ণ রাও বলল, "সেখান থেকে আমরা গেলাম জব্বলপুর। সেখানে আমরা নর্মদা নদীর ঘাট দেখতে গেলাম। শ্বেতপাথরের মধ্যে দিয়ে নর্মদার স্রোতধারায় সৌন্দর্য পাপী পর্বতের মধ্য দিয়ে গোদাবরীর প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেখানকার জঙ্গল, পর্বত, জলপ্রবাহ, নীলাকাশ প্রভৃতির সৌন্দর্য আমাদের মনকে অভিভূত করে দিয়েছিল।

জব্বলপুর থেকে আমরা গেলাম ভুপাল। ভুপালের পরই আসে ভেলসা স্টেশন। সেখানে একটি স্তুপ আছে যেটি হচ্ছে ভারতের সুন্দরতম স্তুপগুলির অন্যতম। স্তুপটির চারদিকে যে মহাদ্বার রয়েছে তার উপর খোদাই করা চিত্রের অনুরূপ কারুকার্য ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। শোনা যায়, ধন্য-কটকের শিল্পীরা গিয়ে ওগুলো বানিয়েছিল।

সাঁচী থেকে উজ্জয়িনী গেলাম। কালিদাসও এই নগরের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। সুন্দর শহর। দশকুমারচরিত, বাসবদত্তা, মেঘদূত ও কথাসরিৎ-সাগরের বর্ণিত মহাকালেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দেখে আমরা আহমেদাবাদ গেলাম। সেখানে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম দেখলাম। মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। একটা মিনার দেখলাম। সেটা দোলে। আগে ওই ধরনের দুটো মিনার ছিল। একজন ইঞ্জিনীয়ার একটাকে ভেঙে তৈরী করায় সেটার দোলা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টি দুলিয়ে দিলে দোলে।

আহমেদাবাদ থেকে পোরবন্দর গিয়ে গান্ধীজীর জন্মস্থান প্রভৃতি দেখলাম। সেখান থেকে গেলাম দ্বারকা। দ্বারকা থেকে আহমেদাবাদ হয়ে আবু পাহাড়ে গেলাম।

আবু স্টেশন থেকে আবু পাহাড় পর্যন্ত বাস যায়। বাস থেকে নেমে চার হাজার ফুট উঁচু শহরে পৌঁছলাম। সেখানকার 'দিলওয়র' জৈনমন্দির

দেখলাম। মন্দিরটির কারিগরী বিস্ময়কর, অনেকক্ষণ ধরে দেখেও মন ভরল না। সমস্তটাই শ্বেতপাথরের, শোনা যায় জনৈক জৈনভক্ত সমস্ত জায়গাটাকে টাকায় ঢেকে দিয়ে কিনেছিলেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল।

দিলওয়ার থেকে অঞ্চলেশ্বর পৌঁছে সেখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। দুধরুটি প্রভৃতি দিয়ে খাওয়ার পাট চুকানো হয়েছিল। পর দিন গেলাম পাহাড়ের শৃঙ্গে। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু ঐ শৃঙ্গে একটি মন্দির আছে।

আবু পাহাড়ের পর যাওয়া হল চিতোর। মহারাজ সংগ্রাম সিংহ, ভীমসিংহ, লক্ষ্মণ সিংহ ইত্যাদির দ্বারা রক্ষিত চিতোরকে দেখে আমাদের চোখে জল এল, ওখান থেকে গেলাম বরোদা। গায়কোয়াড়ের প্রাসাদ এবং উদ্যান দেখে আমরা সেখান থেকে গেলাম বারদৌলী। বারদৌলীর লোকদের শৌর্যের কথা আগেই শুনেছিলাম। ওখানে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। একদিন ছিলাম। তারপর সোজা চলে এলাম জলগাঁওয়ে।

জলগাঁওয়ের কাছেই রয়েছে বোম্বাইগামী জি. আই. পি. রেলের বড় লাইন। জলগাঁও থেকে সোজা মোটরে গেলাম অজন্তা।

অজন্তা দেখে পরমেশ্বর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। তার আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। শিল্পীজনের সে যেন বারাণসী। ভঙ্গিরা নদী সাতপুরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে ঐ জায়গায় দু তিন মাইল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। ওই অর্ধচন্দ্রাকৃতি পর্বতমালায় আটাশটি গুহা আছে। সব গুহা-গুলি একধরনের নয়, কতকগুলি চৈত্য এবং কতকগুলি বিহার। চৈত্য মানে মন্দিরের গুহা। বিহারগুলি হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসগৃহ। কয়েকটি বিহারে হাজার ভিক্ষু একত্রে বাস করতে পারত। প্রতিটি গুহায় আছে বুদ্ধমূর্তি এবং মন্দির। গুহাগুলির স্তম্ভগাত্রে মাটি লেপে অদ্ভুতভাবে অপূর্ব ছবি আঁকা হয়েছে। ছবিগুলির রং দেখলে মনে হবে যেন সেগুলি গতকাল আঁকা। অসংখ্য জাতকের কাহিনী সেখানে চিত্রিত রয়েছে। বোধিসত্ত্বের মূর্তি প্রভৃতিও আঁকা আছে।

শুধু তাই নয়, যে অলঙ্করণ চিত্রই সেখানে রয়েছে তার মধ্যে আছে হাতী, পাখী, মানুষ, ফল, পদ্ম প্রভৃতির ছবি।

অজন্তায় আমরা কাটালাম এক সপ্তাহ। মনমদ হয়ে ওখান থেকে

আমরা ইলোরা এলাম। ইলোরার ষোড়শ গুহাটিই হল প্রধানতম। 'রাষ্ট্রকূট' বংশের প্রথম রাজা কৃষ্ণরাজ সেটি তৈরি করেছিলেন। জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দু গুহাও ইলোরায় আছে। সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হল হিন্দু গুহা।

বৃক্ষরাজার কুষ্ঠ হয়েছিল। বড় বড় বৈদ্যরাও দুরারোগ্য ঐ ব্যাধি সারাতে পারছিল না। এর মধ্যে একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে বললেন—"মহারাজ, ইলোরায় মহাদেবের প্রিয় গুহায় একটি জলধারা আছে, তার জলপান করে আপনি যদি শিবপূজো করেন তবে আপনার রোগ নিরাময় হবে।" এই কথা বলে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন।

রাজধানী মান্যকেতুনু ত্যাগ করে রাজা সোজা ইলোরা চলে এলেন। সেখানে তিনি শিবপূজা করতে লাগলেন এবং পাথরের মধ্য দিয়ে বহমান স্রোতধারার জল পান করলেন।

তাঁর কুষ্ঠ ব্যাধি সারতে লাগল। রাজা তখন শিবের প্রিয় কৈলাসপর্বত ওইখানেই তৈরী করে দেবেন বলে স্থির করলেন। একজন প্রসিদ্ধ শিল্পীকে নিযুক্ত করে তিনি তাকে কৈলাস মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন। শিল্পী কৈলাস গিয়ে একবছর পরে ফিরে এল। আরও বহু শিল্পীকে সমবেত করে সে মন্দির গড়ার কাজে হাত দিল। মন্দিরটি তৈরী করতে বহু বছর লেগেছিল।

প্রায় একশো ফুট পাহাড় কেটে তাতে মন্দির, মণ্ডপ, সিংহদ্বার, ধ্বজা-স্তম্ভ, দুটি হাতি, যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা, বিহার মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হল। সমস্ত মন্দিরটি একটিমাত্র পাথর খোদাই করে তৈরি।

১১। আন্ধ্র মহারাজের চিহ্ন

নারায়ণ রাও তার ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করছিল আর জমিদার এবং পরিজন-বৃন্দ আনন্দের সঙ্গে শুনছিলেন। সেই সময় কয়েকজন গ্রামবাসী এবং নারায়ণ রাও প্রতিষ্ঠা করা গ্রন্থাগারের প্রধান সেখানে এসে হাজির হল। তারা নমস্কার করে বসল। ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা দেবার আবেদন নিয়ে তারা নারায়ণ রাও আর পরমেশ্বরের কাছে এসেছিল। তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য জমিদার তাঁর জামাইকে অনুরোধ জানালেন।

নারায়ণ রাও বলছিল—"একটিমাত্র পাথর। অন্য একখানি পাথরও আনা হয়নি। তার মধ্যে খোদাই করা শিল্পের কথা কী আর বলব।" উপস্থিত একজন বলল ; "এইভাবে খোদাই করা কী দারুণ কঠিন কাজ। একটা পাথর থেকে ভেতরের দিক এবং বাইরের দিক কেটে বের করা কি কম কষ্টকর ?"

সবগুলি মিলিয়ে গুহার সংখ্যা ত্রিশটি। প্রথমে রয়েছে বৌদ্ধগুহা। তারপর হল হিন্দুগুহা এবং সবশেষে রয়েছে জৈনগুহা। হিন্দুগুহাগুলির মধ্যে দশাবতার গুহাই সবচেয়ে মনোহর।

সেদিন সন্ধ্যার সভায় পরমেশ্বরই বক্তৃতা দিল। নারায়ণ রাওয়ের কণ্ঠস্বরের চেয়ে পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর সভায় বলার পক্ষে বেশি উপযোগী। তার সুগম্ভার ভাষণ দিয়ে সে হাজার হাজার মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারত। নারায়ণ রাওয়ের কণ্ঠস্বরেও মিষ্টতা ছিল। তার বক্তৃতায় গতি ছিল। সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা সে সকলকে আকৃষ্ট করত।

পরমেশ্বর উঠে বলতে লাগল, "মানুষের হৃদয়কে উদার করার একটি পথ হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ। প্রত্যেক ছাত্রের এবং কৃষক সন্তানের কমপক্ষে সমগ্র আন্ধ্র দেশটা ঘুরে দেখা উচিত। আন্ধ্র কি কিছুতে কম ? ঋষিকুল্যা নদী থেকে কাঁচা পর্যন্ত, মুঞ্জিক নদী, ভীম নদী দ্বারা আন্ধ্র পরিবেষ্টিত। আমাদের দেশের রাজা ছিলেন আন্ধ্রদেশীয়। ইতিহাস বলে যে এদেশের ছশো বছর পর্যন্ত আন্ধ্ররা রাজত্ব করেছিলেন। পরে ইক্ষাকু, সাতবাহন, বৃহৎ কালায়ণ, পল্লব প্রভৃতি বিজয়ওয়াড়ার দলপতিরা রাজত্ব করেছিল। তারপর চাণক্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শাসন করেছে। আন্ধ্র রাজত্বের তাই গৌরবের নিদর্শন হিসাবে নাম করা যায় অমরাবতী, জগয়াপেট, ভট্টিপ্রোল, গোলী ঘণ্টসালা এবং নাগার্জুনের। এ সব জায়গার আন্ধ্র শিল্প অতুলনীয়। অমন মনোহর শিল্প তখনও আর কোথাও ছিল না আর এখনও নেই, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

আন্ধ্রশিল্পের মূল্যবান নিদর্শনগুলি এখন মাদ্রাজ, লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি শহরে জাদুঘরে রক্ষিত আছে। পল্লবদের সভ্যতার নিদর্শন কাঞ্চীপুরম ও মহাবলীপুরমে পাওয়া যায়। তাদের দ্বারা নির্মিত মন্দির বিজয়ওয়াড়ার কৃষ্ণা নদীর তীরেই আছে।

তার খ্যাতি গোদাবরার ধারার মতোই বেগবান। মহাবলীপুরমের শিল্প সমূহের তাৎপর্য বিচিত্র। অর্জুনের তপস্যা, বানরদম্পতি, হস্তী প্রভৃতি মূর্তি-গুলির সৌন্দর্য অনন্য। একটিমাত্র পাথর কেটে তৈরী রথটি ওখানকার বিশেষ আকর্ষণ। পঞ্চপাণ্ডবের পৃথক পৃথক রথ আছে। দ্রৌপদীর রথও আছে। কিন্তু শহরটি সমুদ্রগর্ভে ক্রমে বিলীয়মান হচ্ছে।

চালুক্য-শিল্প সমগ্র দেশব্যাপী বিক্ষিপ্ত। বাদামীতে, কল্যাণী, দ্রাক্ষারাম, রাজমহেন্দ্রবরম্, সিম্হাচলম্ প্রভৃতি বহু স্থানেই রয়েছে। আরও অনেক স্থানে বহু মন্দিরের মূর্তির মধ্যে চালুক্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। চালুক্য মন্দির দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহের তুলনায় ছোট। কাকতীয় শিল্প দেখা যায় অরঙ্গল, পালমপেট, অমকোণ্ড প্রভৃতি স্থানে। কাকতীয়রা নটরাজের নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্পের প্রকাশ করেছে সবচেয়ে বেশি। হম্পী, তাড়পত্রী, পেনুগুণ্ডা, গুত্তি, মার্চল ও লেপাক্ষীতে বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হম্পীর দৃশ্য দেখে কার হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে বিস্তৃত ও উদার করতে চাই তাহলে শিল্পসাধনা আমাদের করতে হবে। এতজন লোকের মধ্যে কজন ভদ্রাচলম্ গেছে? ভদ্রাচলম্ যাওয়া একটা আনন্দের ব্যাপার। গোদাবরীতে সাতদিন নৌকো করে যেতে হয়, পরে লঞ্চের ব্যবস্থা হতে পারে।

পাপী পর্বতমালায় দিন কাটানো, পাহাড়ী টিলায় বিশ্রাম করা, বনে-বাদাড়ে শুয়ে থাকা কী অপূর্ব রোমাঞ্চময়!

অজন্তায় কলধ্বনি সহকারে প্রবহমানা ভাঙ্গিয়া নদীর গান শুনতে শুনতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদর্শনে আমরা মুগ্ধ হই। মনে হয় আমরাও ঐ মূর্তিদের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছি।

বাতাপিনগরে রয়েছে চালুক্য শিল্পের নিদর্শন। কালের গুহাগুলি খুবই প্রাচীন আন্ধ্রদেশীয় বৌদ্ধ গুহা। বাইশ শো বছর আগেকার গুহাগুলি তাদের শিল্পনিদর্শনসহ সুরক্ষিত রয়েছে। নাসিকের গুহাগুলিতেও আন্ধ্ররাজারা বহু মূর্তি তৈরী করেছিলেন। ঔরাঙ্গাবাদেও ভাল ভাল মূর্তি রয়েছে। বহু স্থানে আন্ধ্রের সাতবাহন রাজত্বের চিহ্নও বর্তমান।

বীজাপুরের গোলগম্বুজটি পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজগুলির অন্যতম। ওই গম্বুজের ওপর থেকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও কিছু শোনা যায় না।

কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যদি কানে কানেও কিছু বলা হয় তাহলে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে।

দৌলতাবাদের কেল্লা ছিল অজেয়। অবরুদ্ধ হয়ে ক্ষুধায় মানুষ মরা সম্ভব ছিল কিন্তু পরাক্রমের দ্বারা তাকে জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। দুর্গটি ছিল পাঁচশো ফিট উচুঁতে পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের চতুর্দিকে একশো ফিট চওড়া গভীর খাদ। কেল্লার পাঁচিল দেড়শো ফিট উঁচু। পাহাড়ের চূড়ায় হচ্ছে দুর্গ। দুর্গের মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের শীর্ষে কামান সাজানো।

এম্বক হল গোদাবরীর উৎপত্তিস্থল। কোটি কোটি বছরের প্রাচীন পাহাড়গুলির উচ্চতা, চার-পাঁচ হাজার ফিট। পাহাড়ের উপর এক দেড় হাজার ফিট পর্যন্ত আমরা উঠেছিলাম। সেখানে একটি ছোট গুহা আছে এবং একটি কূয়ো আছে। ওই কূয়োর ধারে এক গোমুখ মূর্তি থেকে বিন্দু বিন্দু ধারায় গোদাবরী বেরিয়ে আসছে। ওখানে প্রবহমান সমস্ত নদীনালাই গোদাবরী নামে পরিচিত। কুড়ি মাইল দূরে নাসিকে আসতে আসতেই গোদাবরীর বিস্তার হয়েছে দুশো ফিট। প্রতিষ্ঠানে এসে সেই বিস্তার দাঁড়ায় চারশো ফিটে। নিজামাবাদে গোদাবরীর প্রস্থ হল ছশো ফিট এবং ভদ্রাচলমের কাছে প্রায় এক মাইল। রাজমহেন্দ্রবরমে সেটা দাঁড়ায় দু মাইলে। ধ্বলেশ্বরের কাছে চার মাইলে এবং সমুদ্রের নিকটে ত্রিশ মাইলে।

এর পর পরমেশ্বর পণ্ডরীপুরম, হায়দ্রাবাদ, গোলকুণ্ডা, বরঙ্গল প্রভৃতি নগরীর দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনা করল।

অন্যান্য প্রদেশের আচারব্যবহার, পাকপ্রক্রিয়া, বেশভূষা, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির বর্ণনা করে নারায়ণ রাও বলল, উত্তরাঞ্চলের শিখ, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, পাঠান এবং সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা সবচেয়ে বেশী বলবান। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র এবং আন্ধ্রের লোকেরা শক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। এরপর বঙ্গদেশীয়, তামিল, মালয়ালী প্রভৃতি, কন্নড়ীদের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাঝামাঝি।

সবচেয়ে সুন্দরী হলো কাশ্মীরের মেয়েরা। মাঙ্গালোর এবং মহীশূরের বৈষ্ণবদের স্থান তারপর। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে মালবী, রাজপুত, কোঙ্কণী, গুজরাতী, মহারাষ্ট্রীয়, আন্ধ্র দেশীয় ও বাঙালী মেয়েরা। সবার শেষ নাম করতে হয় দাক্ষিণাত্যের মেয়েদের।

বেশভূষার ক্ষেত্রে অন্ধ্রের মেয়েদের আধুনিক সাজ সজ্জা খুবই সুন্দর। এর পরই মহারাষ্ট্রের মেয়েদের পোশাকের নাম করতে হয়। তারপর আয়েঙ্গার মহিলাদের পরিচ্ছদ সুন্দর। কাথিয়াওয়াড় এবং রাজপুতানার মেয়েরা ঘাগরা পরে। গুজরাত ও উত্তর প্রদেশের নারীরা ছোট ছোট কাপড় পরে এবং ওড়না ব্যবহার করে। সবচেয়ে খারাপ পোশাক হল ওড়িয়া মেয়েদের। পরিচ্ছন্নতায় শ্রেষ্ঠ হলো মালয়ালীরা আর দু নম্বর হলো আন্ধ্রবাসীরা। তারপর যথাক্রমে আসে তামিল ব্রাহ্মণ, কন্নড় ব্রাহ্মণ। এর নীচে মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের স্থান। রাজস্থান, পঞ্জাব ও কাশ্মীর হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে উড়িষ্যাবাসী।

আন্ধ্রদেশীয় এবং কানাড়ীরা খাওয়ার পর পান খায়। অন্যেরা খেলেও নিয়মিত খায় না। তামাকও খায়। খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে দামী হচ্ছে গুজরাতী খানা। পঞ্জাবীদের খাবার তার পরই। এদের পরই নাম করতে হয় বাঙালী, মহারাষ্ট্রীয়, আন্ধ্রদেশীয় এবং কানাড়ীদের। তারপর তামিলনাদ, মালাবার এবং উড়িষ্যা হচ্ছে সবার শেষে। পাক-ক্রিয়ায় প্রথম নম্বর হচ্ছে দাক্ষিণাত্য, গুজরাত ও কানাড়া। বঙ্গদেশ ও উত্তর প্রদেশ হল তারপর। মালয়ালী ও তেলুগুরা তারপর উল্লেখ্য। উড়িষ্যার স্থান সবার শেষে।

আচার অনুষ্ঠানের সংখ্যা আন্ধ্রেই সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেকদিন ধোয়া কাপড় পরাই এ অঞ্চলের রীতি। কেউ ছুঁয়ে দিলে স্নান করতে হয়। কাপড় কাচতে হয়। অন্য প্রদেশে কালকের কাচা কাপড় আজ পরা যায়। একবার স্নান করার পর কেউ ছুঁয়ে দিলে আর স্নান করতে হয় না।

দাক্ষিণাত্য, মালয়ালী, অন্ধ্রদেশীয়, কানাড়ী এবং উত্তর প্রদেশবাসীদের মধ্যে চোখের রোগ বেশি। আন্ধ্র, দাক্ষিণাত্য, মালবী, মহারাষ্ট্র, কন্নড় এবং উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা মাংসাহার করে না। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণেরা মাছ খায়। মাংসও কখনও কখনও খেয়ে থাকে।

তাদের বক্তব্য শেষ হলে সভাপতি মশায় তাঁর ভাষণে বললেন যে এই দেশ ভ্রমণের ফলে নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর নিজেরা উপকৃত তো হয়েছেই উপরন্তু তাদের এই কাজের দ্বারা অন্যেরাও লাভবান হল। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানালেন।

১২। নারায়ণ রাওয়ের সাহসিক কাজ

সুব্বিয়া শাস্ত্রীর বৌয়ের সঙ্গে রাজেশ্বর রাওয়ের পালিয়ে যাওয়ার এবং অমলাপুরমে রাজারাওয়ের স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ নারায়ণ রাও কোত্তাপেটে পেল। বন্ধুবান্ধবেরা ইতিপূর্বেই চলে গেছে। নারায়ণ রাও মাদ্রাজেই সংসার পাতা স্থির করল।

ছেলেদের কথা সুব্বারায় ফেলতেন না। দুই ছেলেরই ঘরছাড়া হয়ে থাকা তাঁর এবং জানকম্মার মোটেই পছন্দ ছিল না। কিন্তু পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বললেন না। বড় মাসীর বালবিধবা কন্যাকে নারায়ণ রাও মাদ্রাজ নিয়ে আসবে ঠিক করল। সে গাঁয়েই ছিল। সূর্যকান্তম্‌ও মাদ্রাজ যেতে চাইল।

নারায়ণ রাও আর শারদার সংসার সূচনার আগেই যে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল একথা কী জানি কেমন করে সূর্যকান্তম্ আগেই টের পেয়েছিল। নারায়ণ রাওকে সে অত্যধিক ভালবাসত বলেই বোধ হয় কথাটা তার অজ্ঞাত ছিল না।

শারদা যখন কাশী তর্পণের জন্য এসেছিল তখন সে তার দাদার বহু সাহসিকতাপূর্ণ কাজের গল্প শারদার কাছে বলেছিল। রাজমহেন্দ্রবরমে দুটি ছাত্র গোদাবরী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। নারায়ণ রাও খুব ভাল সাঁতারু। সেও সাঁতার কাটছিল। এমন সময় দেখা গেল সাঁতারে অক্ষম ছাত্রটি ডুবে যাচ্ছে। সে যেই চীৎকার করে উঠল নারায়ণ রাও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে ছেলেটিকে ডাঙায় তুলে আনল। পেট টিপে জল বের করে ফেলল। তারপর তাকে কোলে করে উনীশপেটের এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটি এখনও বেঁচে আছে।

একবার মাদ্রাজে একটি ছেলে নিষেধ অগ্রাহ্য করে রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। পেছন দিক থেকে গাড়ি আসছিল। আর একটু হলেই সে কাটা পড়ত, ঠিক সেই সময় নারায়ণ রাও চীৎকার করে হনুমানের মতো লাফিয়ে পড়ল এবং ছেলেটিকে লাইনে থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। এক মুহূর্ত দেরি হলে দুজনেই গাড়ির নীচে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

কোত্তাপেটে একবার একটা কুয়োর মধ্যে গোরু পড়ে গিয়েছিল তাকে যেভাবেই তোলা হোক না কেন, শিরদাঁড়াটা ভেঙে যেত। মারকুটে বলে কেউ কুয়োর মধ্যে নামতেও সাহস করছিল না। নারায়ণ রাও কিন্তু নেমে গেল। তারপর গোরুর চার পা আর পিঠ একটা দড়ি দিয়ে কায়দা করে বেঁধে, দড়ির একটা দিক হাতে নিয়ে সে উপরে উঠে এলো অন্যরা দড়ি ধরে ওপর থেকে টানতে লাগল আর সে নেমে গিয়ে নীচে থেকে গোরুটাকে ঠেলতে লাগল। সে যাত্রা গোরুটা বেঁচে গেল। দাদার এই ধরণের অনেক গল্প সূর্যকান্তম শারদাকে বলেছিল।

—বৌদি, দাদা আমার পুরানো দিনের রাজকুমারদের মতো। কতজনকে যে সাহায্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার বাবা খুবই শক্তিমান পুরুষ। আর আমার দাদাও ঠিক তাঁরই মতো। গোদাবরীতে একবার বন্যা এসেছিল। সেই বানে একটা গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। একটা কুঁড়ে ঘরে এক বেচারী বুড়ি থাকত। আমার বাবা সেই বুড়িকে পিঠে করে চার মাইল সাঁতরে ডাঙায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সে দিন রাত্রে সূর্যকান্তমরা দুই বোনে মিলে সাজিয়েছিল। নারায়ণ রাওয়ের রসিক মন বোনের প্রশংসা না করে পারেনি।

শারদার মন আনচান করে উঠেছিল। সে দিন সে সূর্যকান্তমকে দিয়ে বেণী বাঁধিয়েছিল আর বাগান থেকে ফুল আনিয়েছিল। রাত্রে ঘরে যেতে তার ভয় হল। কিন্তু তার মনে কোথা থেকে যেন পতির প্রতি করুণা এল। এগারোটার সময় নারায়ণ রাও এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সোফায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শারদা স্বামীর পানে তাকাল। সূর্যকান্তম-বর্ণিত সেই বীর-শ্রেষ্ঠকে মূর্তিমান করুণার মতো পালঙ্কে শয়ান দেখে দুঃখে শারদার হৃদয় শিহরিত হল। নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক তাদের মধ্যে না থাকলই বা, দুজনে বসে আনন্দে গল্প গুজব করার পথে বাধা কোথায়?

সভায় বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে বক্তৃতারত নারায়ণ রাওকে দেখে শারদার মনে এক বিচিত্র আনন্দের অনুভূতি হয়েছিল। স্বামীর বন্ধু পরমেশ্বর মধুর গম্ভীর কণ্ঠে তার বক্তব্য উপস্থিত করছিল। আমাদের দেশে সত্যি সত্যিই এত বড় বড় জিনিস আছে? এইসব জেনে নিয়ে ভ্রমণে বেরুনো সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ। বক্তা নারায়ণ রাওকে শারদার পুরুষোত্তম বলে মনে হচ্ছিল।

সোফায় শুয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন শারদা, জমিদার, জমিদার-গৃহিনী এবং জমিদারের ভগ্নী রাজ মহেন্দ্রবরম্ চলে গেলেন।

রাজারাও তার শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুরমের দিকে যাত্রা করল।

রাজারাওয়ের দুটি সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। রাজারাওয়ের বৌ সুরম্মা অপূর্ব সুন্দরী। শ্বশুর শাশুড়ীর সে খুবই আদর যত্ন করত। স্বামী সোহাগিণী পতিব্রতা নারী সে।

রাজারাও অমলাপুরম্ থেকে রামচন্দ্রপুরম্ গেল। নারায়ণ রাও রামচন্দ্রপুরমেই তার সঙ্গে মিলিত হল। প্রসবের পর দ্বিতীয় দিন থেকেই সুরম্মার জ্বর দেখা দিল। রাজারাও ইনজেকৃশন দিল। নবজাত শিশুর অবস্থা ভালই ছিল। জ্বর একশো পাঁচ ডিগ্রী ওঠায় রাজারাও তার পেটে ঠাণ্ডা জলের পট্টি লাগিয়ে দিল। বায়ুর প্রকোপ হয়েছে বলে শাশুড়ীর সন্দেহ হলো। চতুর্থ দিন জ্বর নেমে এল। দুদিন পরে রাজারাও পথ্য দিল।

নারায়ণ রাও ছদিন বন্ধুর কাছে রইল। সময় কাটত বই পড়ে। সর্বপ্রকারে সে রাজারাওকে সাহায্য করেছিল। এরপর সে গেল কোত্তাপেট। ততদিনে পরমেশ্বর ইত্যাদিও চলে গিয়েছিল।

কোত্তাপেট পৌঁছে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রেরিত রাজেশ্বর রাওয়ের নিম্নলিখিত চিঠিখানি সে পেল।

নারায়ণ, আমি কী করব বল? আমার অহংকার চূর্ণ হয়েছে। আমি ভাবতাম প্রেম বলে জগতে কিছু নেই। নর-নারীর দৈহিক কামনাকেই মানুষ প্রেম বলে। এখন নিজের দিকে চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। আজ পর্যন্ত আমি কতই না সুন্দরী নারীর ভালবাসা লাভ করেছি। কিন্তু সে যে কী বস্তু তা আমার বোধের বাইরে। পুষ্পশীলাও আমার জন্য পাগল। 'তোমায় ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না, স্বামী আমার চাই না।' এই হচ্ছে তার কথা। আগে বলত, স্বামীকেও চাই আর তোমাকেও চাই। কিন্তু দুজনে আলাদা থাকতে পারা গেল না। সেইজন্য আমরা হায়দ্রাবাদে চলে এসে এমন জায়গায় আছি যেখানে আমাদের কেউ ধরতে পারবে না। আমরাই প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী। আমি তোর বন্ধুত্বকে ত্যাগ করতে অক্ষম। আর এই বৌকেও ছাড়তে পারব না। আমি তোর সহানুভূতি চাই। একমাত্র

সোফায় শুয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন শারদা, জমিদার, জমিদার-গৃহিনী এবং জমিদারের ভগ্নী রাজ মহেন্দ্রবরম্ চলে গেলেন।

রাজারাও তার শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুরমের দিকে যাত্রা করল।

রাজারাওয়ের দুটি সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। রাজারাওয়ের বৌ সুরম্মা অপূর্ব সুন্দরী। শ্বশুর শাশুড়ীর সে খুবই আদর যত্ন করত। স্বামী সোহাগিণী পতিব্রতা নারী সে।

রাজারাও অমলাপুরম্ থেকে রামচন্দ্রপুরম্ গেল। নারায়ণ রাও রামচন্দ্রপুরমেই তার সঙ্গে মিলিত হল। প্রসবের পর দ্বিতীয় দিন থেকেই সুরম্মার জ্বর দেখা দিল। রাজারাও ইনজেকৃশন দিল। নবজাত শিশুর অবস্থা ভালই ছিল। জ্বর একশো পাঁচ ডিগ্রী ওঠায় রাজারাও তার পেটে ঠাণ্ডা জলের পট্টি লাগিয়ে দিল। বায়ুর প্রকোপ হয়েছে বলে শাশুড়ীর সন্দেহ হলো। চতুর্থ দিন জ্বর নেমে এল। দুদিন পরে রাজারাও পথ্য দিল।

নারায়ণ রাও ছদিন বন্ধুর কাছে রইল। সময় কাটত বই পড়ে। সর্বপ্রকারে সে রাজারাওকে সাহায্য করেছিল। এরপর সে গেল কোত্তাপেট। ততদিনে পরমেশ্বর ইত্যাদিও চলে গিয়েছিল।

কোত্তাপেট পৌঁছে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রেরিত রাজেশ্বর রাওয়ের নিম্নলিখিত চিঠিখানি সে পেল।

নারায়ণ, আমি কী করব বল? আমার অহংকার চূর্ণ হয়েছে। আমি ভাবতাম প্রেম বলে জগতে কিছু নেই। নর-নারীর দৈহিক কামনাকেই মানুষ প্রেম বলে। এখন নিজের দিকে চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। আজ পর্যন্ত আমি কতই না সুন্দরী নারীর ভালবাসা লাভ করেছি। কিন্তু সে যে কী বস্তু তা আমার বোধের বাইরে। পুষ্পশীলাও আমার জন্য পাগল। 'তোমায় ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না, স্বামী আমার চাই না।' এই হচ্ছে তার কথা। আগে বলত, স্বামীকেও চাই আর তোমাকেও চাই। কিন্তু দুজনে আলাদা থাকতে পারা গেল না। সেইজন্য আমরা হায়দ্রাবাদে চলে এসে এমন জায়গায় আছি যেখানে আমাদের কেউ ধরতে পারবে না। আমরাই প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী। আমি তোর বন্ধুত্বকে ত্যাগ করতে অক্ষম। আর এই বৌকেও ছাড়তে পারব না। আমি তোর সহানুভূতি চাই। একমাত্র

তোকেই আমি আমার ঠিকানা দিচ্ছি। দরকার হলে আমায় হাজার টাকা দিতে হবে।

আমরা যে আনন্দ লাভ করেছি তা কি আর কেউ পাবে? তুই আমার কথা বিশ্বাস কর। শ্যামসুন্দরী আন্তরিক ভাবে তোকে চায়। তোর উত্তর-ভারত ভ্রমণের সময় বন্ধুদের কাছে সে কত জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আর দেরি করিস না।

পুষ্পশীলা আর আমি অনির্বচনীয় এক আনন্দসাগরে মগ্ন আছি। হায়দ্রাবাদ আসার সময় আমি দশ হাজার টাকা সঙ্গে এনেছিলাম। দু-তিন বছর ধরে এই আনন্দসাগরের স্বাদ না নিয়ে আমার সাধ মিটবে না। ততদিন পর্যন্ত আমি আর কিছু করতে চাই না।

সুব্বিয়া শাস্ত্রীর জন্য আমার করুণা হয়। আর কী করার আছে? তার পালক প্রতিষ্ঠানকে বল, কিছু না জেনে শুনে আমাদের সমাজে আসা তার উচিত হয়নি। সে অনেক বিপদের কারণ।

পুষ্পশীলা এ পর্যন্ত সুব্বিয়া শাস্ত্রীকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। আমারই জন্যে ওপর ওপর ভালবাসার ভান করে গেছে। এর জন্য সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

নারায়ণ রাও, পুষ্পশীলা হচ্ছে ফুলের গুচ্ছ। তার মধ্যে রয়েছে ফুলের সৌন্দর্য। নারায়ণ রাও, তোমার উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া। আমায় দেখে তোমার ঈর্ষা হওয়া উচিত।

পরমেশ্বরের জীবন দীর্ঘ একটা অবকাশের মত।

জীবনের রসাস্বাদের জন্য তার হৃদয় অস্থির। পত্নীর জন্যই সে কবি হতে পারেনি। তার হাবভাবে মনে হয় যে সে শ্যামসুন্দরীর বোনকে চায়।

কেন এসব আমি লিখছি? এর একমাত্র লক্ষ্য হলো এই যে তোমরাও আমার সঙ্গে প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিয়ে নির্বাণ লাভ কর।

তোমার স্নেহধন্য

রাজী"

এ চিঠি রাজী কি সুস্থ মস্তিষ্কে লিখেছে? প্রেমের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কী? মানুষ তার সহানুভূতি কা ভাবে লাভ করতে পারে? কোন এক সময় শারদাকে সে আরাধ্যা দেবী বলে মনে করেছিল কিন্তু এখন সে টক আঙুর

উকিল হয়ে যে জজের পদেও অধিষ্ঠিত হবে এই কথাই তাঁর মনে হল। রমা-মূর্তির পাঠানো দুটি আপীলের কেস সে নিজেই তৈরি করে আদালতে দাখিল করল। জয়রাময়েরও ছোট একটি আপীলে কাজ করার জন্য তাকে বললেন। আপীল চালানোর জন্য নারায়ণ রাও প্রস্তুত ছিল। অপরের সাহায্য ছাড়াও নারায়ণ রাও কী ভাবে কাজ করে সেটা তাঁরা দেখতে চাইছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই সে আপীলের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়ে তার পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে কেসের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে, বসে পড়ল। তার বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতি এবং বুদ্ধির প্রখরতা দেখে বিচারক খুশী হলেন। যে আপীলে অন্য উকিল কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগাতেন নারায়ণ রাও মাত্র দশ মিনিট সময় নিল। বিপক্ষের উকিলের সময় লাগল চল্লিশ মিনিট অথচ তার বক্তব্যকে খেলো মনে হল। নারায়ণ রাওয়ের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর আর তার চেহারাও সুন্দর। কঠিন কথা বলতেও তার দেরি হতো না। অন্য উকিলদের যুক্তিকে পাঁচ মিনিটে খণ্ডন করে নারায়ণ রাও বসে পড়ল। জজ নারায়ণ রাওয়ের পক্ষেই রায় দিলেন। গুরু তুল্য জয়রাময়র এবং অন্যান্য উকিলেরা তাকে অভিনন্দন জানালেন।

আইনশাস্ত্রে যদিও তার জ্ঞান বেশ গভীর ছিল এবং ওকালতি করার ইচ্ছাও ছিল তবু নিজের কাজে নারায়ণ রাওয়ের মন বসল না। কাজে মনকে নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে তাই সে জয়রাময়ের ওখানে গিয়ে খুব পরিশ্রম করত। নিজের বাড়িতে সে থাকত নানা চিন্তায় বিব্রত। ঘুমিয়েও নিস্তার ছিল না, স্বপ্ন দেখত।

স্বপ্ন আর স্বপ্ন। শারদা ছাড়া স্বপ্ন নেই। আগে নারায়ণ রাওয়ের ছিল শুলেই ঘুম। এখন কিন্তু এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা সে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে। শারদা কি তাকে কখনো ভালবাসবে? যদি না বাসে তাহলে সে কী করবে সে অন্য কাউকে ভালবাসে না তো? কর্মী মানুষের যথা সময়ে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। পত্নীরও নিজের ইচ্ছা মতো চলা অনুচিত, মস্ত দোষ। তার বৌ যখন ভুল করছে তখন তার পক্ষে বসে বসে দেখা কি সংগত?

ছোট বেলায় বিয়ে হওয়া কী দোষের? চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী ষোলো বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ করা উচিত। কোনো কোনো মেয়ের মন ঐ

বয়সে বিকাশ লাভ করে না এমনও হতে পারে। যাই হোক, স্ত্রী যদি পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয় তাহলে কী করা উচিত? কেউ যদি ভুল পথে চলে এবং অপর একজন যদি তাকে বাঁচাতে পারে তাহলে বাঁচাতে চেষ্টা না করাটাই অন্যায়। একজনের মুক্তির উপলক্ষ্য হওয়া গুরুর পক্ষেই সম্ভব। সে কি শারদার গুরু? অবশ্যই ধর্ম শাস্ত্রে, পতিকে গুরুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কি শারদার গুরু হবার উপযুক্ত? জ্ঞাত অজ্ঞাত ধর্ম চিন্তা একদিকে এবং শারদার প্রতি তার পূর্ব প্রেম অপর দিকে। আমার সঙ্গে থাকা ওর পক্ষে কষ্টকর, দুঃসহ। ও যদি আমার ঘরে থাকে আর আমার মনে যদি প্রেমের উথাল পাথাল চলে, তাহলে তাকে স্পর্শ না করে ব্রতধারী হয়ে থাকা অসম্ভব। যাই হোক, শারদার এখানে না আসাই মঙ্গল। তাই যদি হয়, তাহলে মেয়েটাকে কী করে বাঁচাই? অথচ বাঁচানোই আমার কর্তব্য। আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে কি আমার প্রতি ওর মনে প্রেমের সঞ্চার হবে না?

আচ্ছা, যদি ও পতির প্রতি অনুরক্তা না হয় তাহলে কি আজীবন এই ভাবেই থাকতে হবে? সে অবস্থায় পরপুরুষাসক্ত শারদার ভালবাসাকে স্থানচ্যুত করে নিজের প্রতি কী ভাবে আকৃষ্ট করা যায়? এমনও হতে পারে যে সে আমাকেও যেমন ভালবাসে না তেমনি অন্য কারো প্রতিও অনুরক্ত নয়। তাই যদি হয় তাহলে তাকে খুশী করাই ভাল। খেয়াল মতো চলতে দিলে তারও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। সুতরাং তাকে এখানে আনাই ভাল। এইসব চিন্তায় তার ঘুম এল না। আলো জ্বেলে বই হাতে নিয়ে সে বসল। পরমেশ্বরের আঁকা ছবিটা তার চোখে পড়ল। অন্যমনস্ক দাদার কাছে এসে সূর্যকান্তম্ বলল, "দাদা, কী ভাবছ? একলা আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আচ্ছা, দাদা, তুমি কি বৌদিকে শিগগির আনবে না? আমরা দুজনে বেশ মিলেমিশে থাকব।"

তার এই মধুর বচনে খুশী হয়ে নারায়ণ রাও তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "সুরী তোর মনটা ভালবাসায় ভরা। রামচন্দ্র রাও ভাগ্যবান পুরুষ।" হাসি মুখে সূর্যকান্তম পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখটা কেমন যেন হয়ে এল চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

"রামচন্দ্র রাও আজকাল চিঠিপত্র দেয়, না দেয় না? আমাদের মধ্যে সে

সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং কাজের লোক। আর মাত্র পাঁচ-ছ মাসের মধ্যেই সে ফিরে আসছে।" আদরের বোনকে সে আশ্বাস দেয়। নারায়ণ রাও সব সময় তাকে রামচন্দ্র রাওয়ের খবর শোনাত। তাকে দিয়ে রামচন্দ্র রাওকে চিঠি লেখাত। তার মনে আশার সঞ্চার করত। নারায়ণ রাওয়ের অনুরোধে প্রতি চার মাস অন্তর রামচন্দ্র রাও নিজের ফটো পাঠাত। সেও সব সময় সূর্যকান্তমের ফটো তাকে পাঠাত।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রামচন্দ্রের যদি তার বোনকে পছন্দ না হয় সেই আশঙ্কায় সে কোত্তাপেটে বোনের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেছিল। সে যখন সেখানে যেত তখন বোনকে ইংরাজী শেখাত। যে কোনো বই সূর্যকান্তম গড় গড়িয়ে পড়ে যেতে পারত। রামচন্দ্র রাওয়ের ফেরার আগেই যাতে সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নারায়ণ রাও সেই চেষ্টাই ছিল।

সুরী ছিল শারদার চেয়ে একবছরের ছোট। রামচন্দ্র রাও নারায়ণ রাওয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। সেয়ানা হয়ে সুরী বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠে ছিল। মুখটা ছিল তার রাজপুত মেয়েদের গড়নের। চোখ দুটি কাজল কালো। মুখের ভাবে ছিল গাম্ভীর্য। মুখমণ্ডলের রেখার সাবলীলতায় তার সৌন্দর্য হয়ে উঠেছিল অনুপম। রূপে-যৌবনে সে যেন রানীর মতো। রুদ্রমাদেবী, অহল্যা, ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাই, আর চাঁদসুলতানা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছিল। এসব সত্ত্বেও অন্তরের প্রেম তাকে করেছিল ননীর মতো কোমল আর স্নিগ্ধ।

বিবাহের সময় থেকে রামচন্দ্র রাওকে সে তার জীবনের আদর্শ বলে মনে করত। তার মধ্যে সংকীর্ণতা ছিল না। ছোটবেলায় বাবা তাকে যেসব গল্প শুনিয়েছিলেন সেগুলি তার মনে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীমতী ভণ্ডারা অক্কমম্মা লিখিত 'অবলা সচ্চরিত্র রত্নমালা' সে পড়েছিল। 'ভারতী' 'শারদা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা সে কিনত। দাদার মতো তার মনেও দেশভক্তি অঙ্কুরিত হয়েছিল। ভারতমাতার নামে সে পুলকিত হয়ে উঠত। পিতার অনুমতি-ক্রমে মায়ের সঙ্গে সে সব সভাতেই উপস্থিত হত।

ঘরের কাজ চটপট সেরে বই পড়তে সে ভাল বাসত। অনেক পরিশ্রম করে সে বীণা বাজানো শিখেছিল। ত্যাগ রায়ের 'বিশকৃতিয়াঁ' হিন্দীগীত, নম্বুরী সুব্বারায়ের গীত, দেওলপল্লা কৃষ্ণশাস্ত্রীর কবিতা, আধুনিক আন্ধ্র

সাহিত্যের জনক গুরজাডা আপ্পারাওয়ের গান এবং বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ মহাকবির গান সে শিখে ফেলেছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল মধুক্ষরা। পতিকে সর্বপ্রকারে খুশী করা এবং তার ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে গড়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। পরমেশ্বরের কাছ থেকে সে ছবি আঁকা শিখেছিল। মারাঠী এবং গুজরাতী মেয়েদের মতো কাপড় পরা পর্যন্ত সে শিখে নিয়েছিল।

পিয়ানো শেখার কথা সে দাদাকে বলছিল। স্বামী ফিরে এলে যে যদি তাঁকে ইংরাজী গান শোনায় তাহলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন, এই ছিল তার ধারণা।

১৪। রামচন্দ্রের শিক্ষা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্ররা নিজেদের জন্যে একটি পৃথক ছাত্রাবাস তৈরি করে নিয়েছিল। রামচন্দ্র রাও সেখানে নিজের স্থান করে নিল। আমেরিকার গরীব, ভারতের আমীর। আমেরিকায় পড়তে হলে বেশ অর্থ-বান হওয়া দরকার। সেইজন্য ভারতীয় ছাত্ররা সেখানে সন্ন্যাসীর মতো সংযমের জীবনযাপন করতে বাধ্য হত। রামচন্দ্র রাওই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করত।

আমেরিকায় এমন বহু লোক আছে যারা ভারতীয়দের হীন দৃষ্টিতে দেখে, বিচিত্র জন্তু বলে মনে করে। আবার এমনও অনেকে আছে যারা ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নত বলে মনে করে।

ছুটির দিনগুলিতে রামচন্দ্র রাও দেশটা দেখে বেড়াত। ওদেশের পার্ক, জলপ্রপাত প্রভৃতি দেখতে যেত। কারখানায় কারখানায় ঘুরত।

ইংরেজিতে উত্তীর্ণ না হলেও রামচন্দ্র রাও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ.-তে গণিতে সর্বাগ্রগণ্য। আমেরিকায় আসার পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকরা তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন এবং আলাদাভাবে ইংরাজী পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইংরাজী পরীক্ষা পাশ করতে তার ছমাস লেগেছিল। ইতিমধ্যে বি. এস-সি. ক্লাসে পড়ার জন্য রামচন্দ্র

রাওকে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। গণিতে এবং রসায়নে তার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করার মতো ছাত্র কেউ ছিল না।

দু বছর চার মাস আগে রামচন্দ্র রাও অমেরিকায় গিয়েছে। দু বছরের মধ্যে সে গণিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। এমন কতকগুলি বিষয় ছিল যা সে ছাড়া খুব কম লোকেই জানত। সে নিজে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করে তার উত্তর চেয়েছিল কিন্তু কেউ দিতে পারেনি। গণিতের অধ্যাপকরা তার সমাদর করতেন, স্নেহের চক্ষে দেখতেন। এম-এস-সি ডিগ্রী পেতে তার আর ছ মাস মাত্র বাকী ছিল।

এই দু বছরের মধ্যে সে রোনাল্ডসন পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য লিয়োনোরার সঙ্গে যেত। তারা উভয়েই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়াতে সপ্তাহে অন্তত দুবার তাদের দেখা হতই। তাদের দুজনের প্রীতির সম্পর্ক দিন দিন গভীরতর হল। লিয়োনোরা ক্রমে রামচন্দ্র রাওকে নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশী মান্য করতে আরম্ভ করল। সে বুঝতে পারত না যে সে রামচন্দ্র রাওকে পুরুষ হিসাবে চায় কিনা। রামচন্দ্র তার সঙ্গে কত রকমের আলোচনাই না করত। ভারতবর্ষের প্রশংসা করত এবং ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বলত। সেও নিজের বন্ধুদের এনে রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত। রামচন্দ্র রাওকে নাচ শিখিয়ে সে তার ভালবাসা প্রকাশ করত।

—রাম, আমেরিকান ছেলেদের মতো তুমি কেন স্ফূর্তি কর না?

—নারায়ণ, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিপদে তোমাকে তিরস্কৃত হতে হয় না। তোমাদের মতো আর কোনো দেশ এতখানি স্বাধীন এবং উন্নত? আমেরিকা যদি স্বাধীন না হত তাহলে কী হত? আকাশপাতাল তফাত হত। যে দেশের অবস্থা আজ কানাডার মতো হবার কথা সে সব দেশের সেরা, দুনিয়ার মহাজন, সমর উপকরণ নির্মাণে অগ্রণী এবং বৃহৎ-শিল্পে সর্ব-প্রধান। ফলে তোমাদের দেশে যত আনন্দ আমাদের দেশে ততটা নেই। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের সনাতন সংস্কার বিচিত্র এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা প্রাচীনও নই আবার অর্বাচীনও না।

—একথা তোমার ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। আমার তো মনে হয় যে তোমার দেশে ইংরাজ শাসন থাকা ভালই।

—তা সত্যি, কোন সম্রাটের অধীনে সারা দেশ একতাবদ্ধ হলেও তার অনুপস্থিতিতে দেশটা আবার খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে দেশে ঐক্যের চেয়ে বিভেদের শক্তি প্রবল ছিল। কিন্তু শক্তিশালী ইংরেজদের দ্বারা দেশ আক্রান্ত হওয়ায় সব জাতি উপজাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। তাদের আরও কাছাকাছি আসতে হবে। তার আগে আমাদের দেশ ছেড়ে ইংরেজ যাবে না।

—হ্যাঁ ভাই, ঠিক বলেছ। দেখো, আমেরিকায় প্রথমে ছোট ছোট রাজ্য ছিল। ইংরেজ আর ফরাসীরা নিজেদের মধ্যে বহু দিন লড়েছিল। কিন্তু আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন সবাই ঐক্যবদ্ধ হল। কানাডা ইংরেজদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হল, ফরাসী আর ইংরেজের মিলন হল। ঠিক ঐভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাচ্ এবং ইংরেজরা একীভূত হল।

লিওনোরা রামচন্দ্র রাওকে বোনের মতো একটি চুম্বন দিল। প্রথম প্রথম রামচন্দ্র রাওয় লজ্জা পেত কিন্তু পরে তার চুম্বনে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। লিওনোরার সান্নিধ্যে সে খুব আনন্দ পেত। তার কথা তার মনকে উৎফুল্ল করে তুলত। রাজ্যের কথা তাদের মধ্যে হত। তার পিতাও কখনও কখনও আলোচনায় যোগ দিতেন।

আমেরিকা যাবার পর কয়েক মাস সংকোচবশত রামচন্দ্র রাও যে বিবাহিত এ কথাটা লিওনোরা এবং তার পিতা-মাতাকে বলতে পারেনি। কিছুদিন পরে সে জানিয়েছিল যে তার তিন বছর আগেই তার বিবাহ হয়ে গেছে। নারায়ণ রাও প্রেরিত তার স্ত্রীর ছবিও তাদের দেখিয়েছিল এটা জেনে তারা খুব অবাক হয়েছিল।

ভাল ফটোগ্রাফারের তোলা সেই ছবিতে সূর্যকান্তমের সৌন্দর্য পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল। রামচন্দ্রকে দেখে রোনাল্ডসন বলল, "রামচন্দ্র, মিস মেয়ো যেমন বলেছেন, তোমাদের মধ্যে বালবিবাহ প্রচলিত রয়েছে।"

রামচন্দ্র—হ্যাঁ আছে। মেয়োর আরও বহু কথাই সত্য।

ভারতের নিন্দা অথবা অবহেলায় রামচন্দ্রের রাগ ও দুঃখ হল। বিদেশে থাকায় সে রাগ এবং দুঃখ চেপে রাখত। তখন তাকে খুবই চিন্তামগ্ন মনে হত।

রোনাল্ডসন—তোমাদের দেশে তিনমাসে শিশুর বিয়ে হয়ে যায় একথা কি ঠিক ?

রামচন্দ্র—হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা-ও হয় তবে খুব কম।

রোনাল্ডসন—এটা খুবই শোচনীয় ব্যাপার নয় কি ?

রামচন্দ্র—আপনাদের দেশে এর চেয়েও শোচনীয় ঘটনা ঘটে না কি ?

রোনাল্ডসন—হ্যাঁ, তবে আমাদের ধারণা ভারতবর্ষ জগৎকে সভ্যতার পাঠ পড়িয়েছে। তাই সেই দেশের এমন অধঃপতন দেখে আমাদের দুঃখ হয়।

রামচন্দ্র—তা ঠিক। অধঃপতন হলে মানুষের বহু দুর্মতিই হয়। কিন্তু আপনাদের বিবাহ প্রথার তুলনায় আমাদের বিবাহপদ্ধতি নিকৃষ্ট কিনা সেটা এখনো প্রমাণ হয় নি। জর্জ লিণ্ডসের লেখা তো আপনি পড়ে থাকবেন।

রোনাল্ডসন—তিনিও মেয়োরই সমগোত্রীয়।

রামচন্দ্র—গান্ধীজীর ভাষ্য অনুসারে এঁরা উভয়েই পায়খানা পরিদর্শক। হয়ত লিণ্ডসের তথ্য নির্ভুল, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল থাকতে পারে। মেয়োর লেখার মধ্যে দু-তিনটি বিষয় ছাড়া সবই মিথ্যা। আমাদের দেশের শত্রুরা তাঁকে দিয়ে এই নোংরা বইখানি লিখিয়েছে।

লিওনোরা তাদের কথাবার্তা শুনছিল না। রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে সে যে আকাশকুসুম রচনা করেছিল তা কিছু পরিমাণে মিলিয়ে গেল। এমন কেন হল ? এই হিন্দু ছেলেটির সঙ্গে তার প্রকৃত সম্বন্ধ কী তা সে বোধহয় নিজেই জানত না। সে এবং তার পরিবারের অন্যেরা তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সে ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশের সদ্‌গুণ সম্পন্ন একটি যুবক বলেই তো ? এই ভারতীয় ব্রাহ্মণ যুবকটির প্রেমে সে আসক্ত হয়ে পড়ে নি তো ? লিওনোরার সন্দেহ হত। অবদমিত চিন্তা প্রকাশ পেত। সে তার মনশ্চক্ষুর দিকে চাইল। ছেলেটির বিয়ে যদি না হত তাহলে সে ভেবেছিল যে তার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবে। সেই দিব্যভূমির অধিবাসী হবে এবং পবিত্র ভারতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে। সে তার দেশের সুন্দরী যৌবনসম্পন্না কন্যা। যাই ঘটুক না কেন, রামচন্দ্র রাও আমার। তার প্রেমের রূপটি কেমন ? লোকে বলে ভারতীয়দের প্রেম পবিত্র। তার জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন আমেরিকানদের ভালবাসা একধরণের আর রামচন্দ্র,যে তাকে ভালবাসে, সে ভিন্ন প্রকৃতির।

তারা নাচগানের কথাই বেশি বলে এবং শাস্ত্র প্রভৃতির বিষয় কম। তারা সব নিন্দুক। কবিতা, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে তারা জানতও কম এবং আগ্রহও তাদের কম ছিল। খুব সাধারণ বিষয়ে কথা বললেও রামচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে একটা গভীরতা থাকত। একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেই সে আলোচনা করত। এ কি প্রেমের প্রভাবের ফল না ভারতীয়দের সহজাত গুণ? লিওনোরা সতীত্ব না খুইয়ে তাকে কামনা করত আর রামচন্দ্রও তাকে চাক এটাও তার কাম্য ছিল। রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে সে এই সবই ভাবছিল।

রোনাল্ডসন-গৃহিণী—রামচন্দ্র, আমাদের স্বদেশীরা হিন্দুস্থানের নাম শুনলেই অজ্ঞান। আপনারা কেন যে ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হচ্ছেন না তাই আমরা ভাবি। অনেকে মনে করে ইংরেজদের ক্ষতি হবে, আবার অনেকে ভাবে হিন্দুস্থানের ক্ষতি হবে। আমেরিকানদের মনোভাব হচ্ছে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা লাভ করা উচিত এবং গান্ধীজীর আন্দোলন খ্রীষ্টান ধর্মমতের অনুকূল। কোনো না কোনো দিন ইংরেজরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। তাদের মধ্যে অনেকে ভারতবাসীকে ভুল বুঝতে চায়। গান্ধীজীর উপদেশই এই পরিবর্তনের কারণ।

রোনাল্ডসন—এই হচ্ছে সোজা কথা। আমাদের সকলের উদ্দেশ্য একই। রামচন্দ্র, গান্ধীজীর পথই শ্রেষ্ঠ। ইংরেজদের আত্মীয় মনে করে তাদের মনোবেদনার কারণ যারা না হবে, তাদেরই জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

১৫। গুরু খুঁজতে খুঁজতে আসছে

নারায়ণ রাও এবং শ্যামসুন্দরীর স্নেহের বন্ধন দিনে দিনে গভীরতর হচ্ছিল। সুযোগ পেলেই সে ওদের বাড়িতে যেত। তার গান শুনত, নিজের গান শোনাত। সে যখন শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে কথা বলত তখন অপর তিন বোন সেখান থেকে চলে যেত।

—বোন, সংগীতে কত সুরেরই না সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশীয়রা এবং আমরাও কেবলমাত্র বারোটি সুরই গ্রহণ করেছি। এই বারোটি সুরের

বাইরে আমাদের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। কিন্তু সব স্বরই এই বারোটি সুরে মিশে যায়। আর সবই সূক্ষ্ম।

—কেন দাদা, এক-একটি সুরের তিন-চারটি করে শ্রুতি হয় তো?

—তা বটে, কিন্তু শ্রুতির ধ্বনি খুবই সূক্ষ্ম শাস্ত্রমতে প্রস্তুত, যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ঐ সমস্ত শ্রুতি শুনতে পাই। অর্থাৎ দু-তিনটি শ্রুতি মিলিত হয়ে স্বরের একটি মৃদু ধ্বনির সৃষ্টি করে।

—তা হলে দাদা, আমাদের সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের তফাত কী?"

—কী বলি? কাকতি, নিষাদ, প্রতিমধ্যম, চতুশ্রুতি, ধৈবত হল অপশ্রুতি। পাশ্চাত্যে কিন্তু দুটিই মাত্র ব্যবহৃত হয়। এদেশের লোকরা যে-কোনো একটি রাগই কাজে লাগায়। আমার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে শ্রুতিতে অপশ্রুতি সৃষ্টি করে এবং অপশ্রুতি ও শ্রুতিকে কাছাকাছি এনে সুরের মধ্যে দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। স্বরকে কল্পনায় ভাব নির্ধারণের বাহন বলা হয়ে থাকে।

স্বর রূপ এবং শ্রুতিরূপ আপনি খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করেছেন। সুরের থেকে স্বর দ্রুত অথবা বিলম্বিত ভাবে বেরিয়ে আসে?

—এ একটা খুব জটিল প্রশ্ন। বড় বড় সংগীতকাররাও এই প্রশ্নের উত্তর পান নি। সর, সুরি গমকে আমরা সুর বলি। স এবং রি-এর সম্পর্কটা কী? 'স' থেকে কি 'রি' বেরিয়ে আসে? এ ধরনের বহু প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে গাইলে স থেকে রি পর্যন্ত কোনো ঝাঁপ আছে বলে মনে হয় না। তবু আমার মনে হয় যে একটি সুরের সঙ্গে অন্য একটির কোনো তফাত নেই। ফিল্মে ছবিগুলি পৃথক পৃথক হয়ে থাকে, একটির পর অপরটি আসে। প্রথম ছবিটি শেষ হতে না হতেই পরবর্তী ছবিটি এসে যায়। আমাদের মন যদিও একটি ছবি থেকে অপর ছবিতে লাফিয়ে চলে তবু সমস্তটা মিলিয়ে একটিমাত্র ছবি বলেই মনে হয়।

—সুরের ক্ষেত্রে আর একটি কথাও আছে। আমরা যখন এক স্বর থেকে আর এক সুরে যাই তখন এই দুয়ের মধ্যে বহু অব্যক্ত স্বর থাকে। ঠিক যেন ইন্দ্রধনু। ঘন নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, বেগুনী, লাল। রং প্রকৃতপক্ষে তিনটিই। কিন্তু লাল থেকে কি নীলের উৎপত্তি হয়? কিন্তু

লাল থেকে নীলে আসার পথে ঘননীল আর আকাশী নীল পড়ে। আবার নীল থেকে হলুদের মাঝে রয়েছে সবুজ।

—কিন্তু শোনা যায় এক সাদা রং থেকেই সব রং পাওয়া যায়। একটি মহাসুর থেকে সব স্বর বেরোয়। না দাদা?

—তা ঠিক। কিন্তু সেটা হচ্ছে অখণ্ড শ্রুতিস্বরূপ।

—শ্রুতি কি খুবই বৈচিত্র্যময়? পরশুর আগের দিন তুমি বলেছিলে যে শ্রুতির মধ্যেই রয়েছে অপশ্রুতি। সে কী রকম?

—আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এই সৃষ্টিতে অব্যক্ত অনির্বচনীয় পরব্রহ্ম ছাড়া সব কিছুই রয়েছে দ্বন্দ্বরূপে। রোদ-ছায়া, ভাল-মন্দ প্রভৃতি। শ্রুতি আর অপশ্রুতি এই ধরনেরই দ্বন্দ্ব। শ্রুতির মধ্যেই অপশ্রুতি নিহিত রয়েছে। শ্রুতিকে অনুসরণ করতে করতে বিচ্যুতি হলেই তো অপশ্রুতি হল। সাইকেল আরোহী আছে, তার ব্যালেন্স আছে। এই ব্যালেন্সের যে কোনো সময় গোলমাল হতে পারে। এই অপশ্রুতি কোথা থেকে আসে? শ্রুতি থেকেই তো। যেমন রোদ থেকে ছায়া।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ধরনের আলোচনা শ্যামসুন্দরী নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে করে থাকে।

আজ পর্যন্ত শ্যামসুন্দরী কারো প্রেমে পড়েনি। সদগুণের আকর সে। সব রাজনৈতিক আন্দোলনে সে অংশ গ্রহণ করত। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তার বান্ধবী। দেশসেবী এবং গান্ধীবাদীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে খদ্দর বেচত—সব দেশী জিনিস বেচত। শ্রীমতী আচণ্ট রুক্মিনী দেবীর সঙ্গে সে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত। মদ্যপান নিবারণে সে ছিল সচেষ্ট। সে বলত, হিন্দু মুসলমান একতাবদ্ধ না হলে স্বরাজ মিলবে না।

শ্যামসুন্দরী তেলুগু খুব ভাল ভাবে পড়তে পারত। মনে হত তেলুগুই যেন তার মাতৃভাষা। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে তেলুগুকেই সে উত্তম মনে করত। শ্যামসুন্দরীর হৃদয় ছিল পবিত্র। বহু পুরুষের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কিন্তু তার মনে কোনো বিকার ছিল না। এমন যে শ্যামসুন্দরী সে নারায়ণ রাওকে ভালবেসে ফেলল। হৃদয়টা তার নির্মল ছিল বলেই নারায়ণ রাওয়ের প্রতি তার ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হয়েছিল। এর কারণ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সে চিন্তা করত। সে তাকে ভাই বলেই নিশ্চিতরূপে মেনে নিয়েছিল।

কোনো যুবক এপর্যন্ত তার সঙ্গে অপরের অনুপস্থিতিতে কথা বলে নি। অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনাও সে জীবনে কখনও করেনি।

শ্যামসুন্দরীকে কেন্দ্র করে লোকে কানাঘুষা শুরু করল। "কত ছাত্রই আছে, কিন্তু এমন আজব কাণ্ড কোথাও দেখি নি। কিছু হোক বা না হোক পরপুরুষাসক্তি তার মধ্যে আছে।"

যত মুখ তত কথা। লোকরা কী ভাবে, তা শ্যামসুন্দরীও জানত। যে যাই বলুক না কেন, সে নিজে জানত যে তার কোনো দোষ নেই। তার দেশসেবার কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি হতে দেওয়া চলবে না, এ সিদ্ধান্ত সে করেছিল।

নারায়ণ রাওয়ের নামেই আজকাল শ্যামসুন্দরী রোমাঞ্চিত হয়। তার সুধাকণ্ঠ শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নির্বাক হয়ে থাকে।

তার মুখ দেখে সে তন্ময় হয়ে যায়। নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে পরমেশ্বর এলে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ভাইকে পাঠিয়ে দেয়। নারায়ণ রাওকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বহুক্ষণ তার সঙ্গে আলোচনা করে। নারায়ণ রাও সোফায় বসলে সেও গিয়ে তার পাশে বসে। নারায়ণ রাওয়ের স্পর্শে তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা যায় না তার কারণ হচ্ছে ভ্রাতৃস্নেহের বোধ। নারায়ণ রাও একদিন তাকে বলল, "তুমি, বোন, আজ তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং জীবনী সম্বন্ধে বল।"

—কী বলব দাদা? ছোটবেলা থেকেই আমার বড় গায়িকা হবার শখ, কবি হবার সাধ। স্বপ্ন দেখতাম, দেশের জন্য সর্বস্ব দেব। মা বাপ আমাকে বলতেন 'স্বপ্নকন্যা'।

শৈশবে বাবা যখন বদলী হয়ে স্থানান্তরে যেতেন আমি তখন পথের গাছপালা আর আকাশ দেখে আনন্দে মগ্ন হতাম। খেলনা আমি কখনো চাই নি আর খেলার জন্যে কখনো কোনো আবদার করি নি। অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমি খেলতে বেরুতাম না। সব সময় গাছপালা দেখতাম আর গ্রামোফোনের গান শুনতাম। ত্যাগরায়ের 'বামভিয়াসা' ছোটবেলা থেকেই আমার ভাল লাগত।

নারায়ণ—ও বস্তু আমাকেও পাগল করে দেয়।

'নন্নু পালিম্প উচ্চিতওয়া'—এ ভাষা আমাকে মাতিয়ে তোলে। কী জানি পূর্বজন্মে আমরা ভাই বোন ছিলাম কিনা। এতদিন কেন আমরা আলাদা রইলাম? কত দিনই না বৃথা গেল।

—সব কিছুর মূলেই কোনো না কোনো কারণ আছে, কর্মের এটাই হচ্ছে বৈচিত্র্য।

—কর্মের অর্থ বিধি নয়তো?

—না, বোন, তা নয়! কর্ম আত্মারই মতো অনন্ত। তিনটি শ্রেণীতে একে বিভক্ত করা যায়—প্রারব্ধ, সঞ্চিত, আগম। পূর্বকৃত অনুসারে যা চলে সেটাই প্রারব্ধ। এর থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মুক্ত পুরুষও এর হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। রামকৃষ্ণের গলায় যে ব্রণ হয়েছিল সে কথা কি তুমি শুনেছ?

—শুনেছি!

—বর্তমান কর্মই সঞ্চিত কর্ম। এর ফল এখনও মিলতে পারে আবার ভবিষ্যতেও মিলতে পারে! আগমের অর্থ হচ্ছে আগামী। এ হচ্ছে বর্তমান ইচ্ছা এবং ভাবের পরিণাম। তুমি জ্ঞানী অথবা কর্মযোগী হলে, প্রারব্ধের অনুধাবন করে চিরসঞ্চিত ও আগামী কর্মকে বিনষ্ট করে মুক্তি পেতে পার।

—ওই দুটিকে কী ভাবে বিনষ্ট করা যায়? আমিও রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের বই পড়েছি। কিন্তু আমার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি।

—আমি কী করে জানব, বোন? আমরা যেটুকু জানি সেটুকু অনুমানের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে আগে চাই একজন মহাত্মা বা গুরু।

—গুরু না পাওয়া পর্যন্ত কী করা যায়?

—এ জিজ্ঞাসা যখন তোমার মনে এসেছে তখন জ্ঞানমার্গ অথবা কর্ম-মার্গে প্রবেশের জন্যও কারো কাছে শুনে অথবা পড়ে তুমি আকুল হয়ে উঠবে। মনে মনে একটিমাত্র পথকে বেছে নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকবে। সেই জ্ঞানে বিজ্ঞ মানুষের কাছে যাবার কথা তুমি চিন্তা করবে। কিন্তু তোমার প্রতীক্ষিত গুরু নিজেই তোমাকে খুঁজে নেবেন।

—কলার ক্ষেত্রে আমি যেমন তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম!

—আমি আর কী বলব? আমি পাপী। কোনো বিষয়ে গুরু হবার যোগ্যতা আমার কোথায়?

১৬। জগন্মোহনের বিয়ে

কর্নুল-নিবাসী শ্রীরামরাজু সুব্বারামাইয়া নিজের মেয়ের সঙ্গে জগন্মোহনের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জমিদারের কাছে গেলেন। সুব্বারামাইয়া ছিলেন লক্ষপতি। তাঁর কন্যার বিয়ে কোনো জমিদার-সন্তানের সঙ্গে হোক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। জমিদারের সন্ধানে ছিলেন তিনি। এহেন সময় জগন্মোহনের কথা তাঁর মনে পড়ল। মেয়ে সোমত্ত হয়ে উঠেছিল। সে তখন মাদ্রাজে কোনো এক মিশনারি স্কুলের চতুর্থ ফর্মের ছাত্রী। দেখতেও সুন্দরী। চিন্তাধারায় আধুনিকা। তাকে দেখে জগন্মোহন কথাবার্তা বলে এল। দুজনকে দুজনের পছন্দ হল।

সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল। সামনের মাঘেই বিয়ের কথা পাকা হল। শুভ দিনটি ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল।

বীরেশ লিঙ্গমপন্তুলু মশাই আন্ধ্রের নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অনেক বড় কাজের তিনি উদ্যোক্তা। কিন্তু আজকের অবস্থাই এমন যে, যে সমস্ত কুপ্রথার তিনি মূলোচ্ছেদ করেছিলেন সেগুলিই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যে কাজের তিনি সূচনা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও নষ্ট হতে বসেছে। পণপ্রথা দূর করার মতো আর কেউ কি আছে?

—রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ এবং বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারক এবং আজকের গান্ধীজীও এই প্রথার বিরোধিতা করে এসেছেন। কিন্তু মাত্র দু-একজনই তাঁদের মতকে মেনে চলে। আমি এবং আমাদের জমিদার ব্রাহ্মসমাজের লোক। আমি বিধবা বিবাহ করব। কাল পর্যন্তও বলেছি যে পণ নেব না, আর আজ? 'বিয়ে করতে রাজী যখন হয়েছি তখন পণ কিসের জন্য?' বলা সহজ কিন্তু সেই মতো কাজ করুক তো কেউ!

—আরে দেয়ালেরও কান আছে। চেঁচাসনে। শ্রাদ্ধের পাঠ চুকিয়েছি। আচার বিচার ত্যাগ করেছি। যজ্ঞোপবীতও নেই। ব্যস, এই পর্যন্ত। কিন্তু দেখো, এই বিয়েতে কত খরচ হয়। যদি ব্রাহ্মই হও তাহলে বিধবা বিয়ে করো, পণের লোভ ছাড়ো। বিয়ের ঝামেলা একদিনেই চুকে যাওয়া উচিত, কী বল?

বিশাখপট্টনম্ থানায় বসে জমিদারের দুজন থানাদারের এই রকম কথা হচ্ছিল।

জমিদারের চাকর-বাকররা কাজে ব্যস্ত ছিল। কেউ টাকা জমা নিচ্ছিল, কেউ বা অন্য ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিল, আবার কেউ হয়তো নিমন্ত্রণপত্র পাঠানোর কাজে লেগেছিল। কাজের কি শেষ আছে?

এখান-ওখান থেকে জগন্মোহন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। দশটি গাঁয়ের মধ্যে দুটিকে বন্ধক রেখেছিল। ভেট হিসাবে কিষাণরাও প্রায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিল। কর্নুল যাবার জন্য একটা স্পেশ্যাল গাড়ির ব্যবস্থা করা হল। বন্ধুবান্ধব এবং অভিজাত ঘরের লোকদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিদেশী ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মাত্র একদিনের বিয়ে বলেই সংগীতের দরকার হয়নি। বিশাখপট্টনম এবং মাদ্রাজবাসী ইউরেশিয়ান বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হল। তাদের জন্য চাঁদোয়ার ব্যবস্থা করা হল।

শারদা এবং তার মাও বিয়েতে গেল। বল্লারী থেকে শকুন্তলা দেবীও এল। বড় জামাই নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল কিন্তু নারায়ণ রাওকে কোন খবর দেওয়া হয়নি। বিবাহের অনুষ্ঠান মাত্র মিনিট খানেক স্থায়ী। অনাবশ্যক সমস্ত আচার পরিত্যক্ত হয়েছিল। পাত্রের জন্য সুব্বারামাইয়াকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। সেইজন্য জামাইয়ের সব কথাই তিনি মেনে নিলেন।

পাশ্চাত্য অলংকারই জগন্মোহন তার বৌকে দিয়েছিল। মাদ্রাজ থেকে আনানো সুব্বারামাইয়ার ব্যাণ্ড বরযাত্রীদের কাছে বাজানো নিষিদ্ধ ছিল। অনেককে টেবিলে খাওয়ানো হল।

বর বৌ-এর মিছিলের সামনে রইল ইউরোপীয়ান ব্যাণ্ড বাদকেরা অবশ্য ভারতীয়। তারপর ছিল একটি দু-ঘোড়ার গাড়ি। তাতে বর বধূ; শেষে ছিল পনেরোটি ঘোড়ার গাড়ি।

বর ছিল ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত। মাথায় টুপি ইউরোপীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের পোশাক বধূকেও পরানো হয়েছিল। ইউরোপীয় বন্ধুরাই সে পোশাক এনেছিল, তাদের গৃহিণীরা বধূকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

মিছিলের ষোলটি গাড়িতে একজন করে ইউরোপীয় পুরুষ এবং মহিলা বসেছিল। পিছনের দুটি গাড়ীতে বরের বন্ধু, জমিদার-গৃহিনী, শারদা

ছেলেমেয়ে নিয়ে শকুন্তলা দেবী এবং বরের মা বাবার তরফের পনেরো জন লোক ছিল।

জগন্মোহনের সবকিছুই জমিদার-গৃহিণীর মনঃপূত।

জগন্মোহনের মা, জমিদার-গৃহিণী শিবকাম সুন্দরী দেবী বললেন, "এই জন্যই তো আমার ছেলেকে সবাই ভালবাসে।"

তাঁর ভাজ বললেন—কি সুন্দর! গাঁইয়াকে কখনো বিয়ে করতে আছে!

বরদকামেশ্বরী দেবী—শারদা, দেখছিস তোর বিয়ের সঙ্গে এবিয়ের কত তফাত? এ-ই হচ্ছে জমিদারী বিয়ে।

শারদা—ভারী সুন্দর কেমন শান্ত পরিবেশ। ইংরেজদের বিয়ের মতো। দিদি, তুমি কী বল?

শকুন্তলা—হ্যাঁ, সাধারণ ব্যাপার নয়। তবে এসব আমার ভাল লাগে না।

শারদা—আমার দাদা ইংরেজি কায়দা কানুন জানে।

শকুন্তলা—তুই আর ও সব সময় ইংরেজদের ল্যাজ ধরে থাকিস কেন বল্ তো?

শারদা—দিদি, তুমিও কি গান্ধীবাদীদের দলে ভিড়েছ?

শকুন্তলা—তোর ভাগ্য ভাল। সেই জন্যই তোর ননকোঅপরেশনী স্বামী জুটেছে। তুই ইচ্ছে করলে এক মিনিটেই ভিড়তে পারিস্।

শারদা চুপ করে রইল।

বরদকামেশ্বরী—ওকী শকুন্তলা, ওসব কী কথা? শারদার পেছনে লাগা ঠিক নয়? ও বড্ড দুঃখী মেয়ে। মড়ার ওপর কেন খাঁড়ার ঘা দিচ্ছিস? চুপ করে যা।

শকুন্তলা—থামো, তোমার কথা আমি বুঝি না। আমি দেখে যাচ্ছি যে বোনাইয়ের সম্বন্ধে তুমিও সব সময় অভিযোগ করে থাক, তাঁর আচার-আচরণ, রীতি-নীতি পরিবার, ধরন-ধারন লক্ষ তপস্যায়ও আমরা পাব না। আমাদের বাড়িতে যখন তারা আসে, আমরা তাদের গ্রাহ্য করি না। আমরা যখন তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তারা তখন এমন আদর যত্ন করেছিল যা বড় বড় লোকরাও পারে না, মন তাদের ভালবাসায় ভরা।

শিবকামসুন্দরী—কেন বৌ করবে না?

শকুন্তলা—কেন করবে? আপনারা তাদের কোন্ উপকারটা করেছেন?

আপনাদের সংসারগুলো চালাবার মত যথেষ্ট পয়সা তাদের আছে। তারা ধনী। ঘর তাদের ছেলেপিলেতে ভরা। আমার বোনাইয়ের বাড়িতেই কুড়িটি শিশু আছে। দেখাও তো আমায় এমন একটা জমিদার পরিবার যেখানে অন্তত দশজন লোক থাকে?

শারদা (ক্রুদ্ধ হয়ে)—তুমি কি তোমার বাড়িতে গোবর জল দিয়ে চাল ধোও?

শকুন্তলা (নাক সিঁটকে)—গোবর জল দিয়ে ধুস কিনা তা তুই পরে টের পাবি। গোবর জল দিয়ে তারা চাল ধোয় বলেই কি তুই শ্বশুরবাড়ি যাস না?

বরদকামেশ্বরী—কী হচ্ছে শকুন্তলা? শারদা চুপ কর। কেন এসব গোলমাল করছ শকুন্তলা?

শকুন্তলা—জিজ্ঞেস করছ কেন? জান না বুঝি? সকাল থেকে নারায়ণ রাওকে যাচ্ছেতাই বলছ। সে যখন বাড়িতে আসে তখনও এইসব শোনাও। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। লাখো চেষ্টাতেও নারায়ণ রাওয়ের মতো জামাই পাবে না। বাবা তাঁকে খুঁজে আনলেন কেন? এই সম্বন্ধকে স্বীকার করার আরজি নিয়ে বড় বড় লোকেরা শারদার শ্বশুরের কাছে গিয়েছিল। তোর যদি ভাল না লাগে তাহলে বাবাকে সাফসুফ বলে দে! এই ধরনের বেকুবির পরিণাম যে কী তা আমার জানা আছে। আমি সব খোঁজই রাখি, পরে পস্তাতে হবে।

সকলে বিব্রত হল। বরদকামেশ্বরী শারদার দিকে সোজাসুজি তাকালেন।

শারদা সেখানে নেই!

বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘর ছেড়ে শারদা রাগে নিজের ঘরে চলে গেল। একটি পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। অশ্রু ঝরতে লাগল। পাশ দিয়ে যাবার পথে জগন্মোহন তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। ঘরে ঢুকে শারদাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "শারদা, কেন কাঁদছ?" শারদা নির্বাক। বহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে সে বলল, "কিছু না, দাদা।" সে কাঁদতে থাকলো। আর হয়ত কান্নায় মুখটা তার আরও সুন্দর হয়ে উঠল। দিব্য সেই দেহবল্লরীকে জগন্মোহন নিজের

দিকে টেনে নিল। চুম্বন করল তার কপোলে কানে কণ্ঠে। তার মুখটিকে আরও তুলে ধরে চুম্বন করতে যেতেই শারদা বলে উঠলো, "কিছু নয়।" ঠিক সেই সময় তাকে খুঁজতে খুঁজতে শকুন্তলাও ঘরে ঢুকল।

১৭। শিশুদের প্রতি স্নেহ

শ্যামসুন্দরীর বাবার নাম সীমর্তী গোপাল কৃষ্ণাইয়া। তিনি ছিলেন মহীশূর প্রবাসী তেলুগু ব্রাহ্মণ। নামকরা ব্রাহ্ম দক্ষিণের এক জেলার একটি হাসপাতালে কাজ করার সময় একজন বৈষ্ণব বিধবার সঙ্গে ব্রাহ্মমতে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি মহীশূরে তাঁর পত্নীর বাঙলোয় বাস করতে লাগলেন। তাঁদের চারটি পুত্র এবং চারটি কন্যা হয়েছিল। ছেলেদের মধ্যে বড় তিনজন বিদেশে চলে গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে বড় ছেলে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিল। দ্বিতীয়টি ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিখে বর্তমানে দক্ষিণের আর্কট জেলার চিকিৎসক। তৃতীয় ছেলেটি জার্মানিতে কারখানা শিল্পে শিক্ষালাভ করছে এবং চতুর্থ জন মাদ্রাজেই পড়াশুনা করছে।

প্রাচীন কালে আন্ধ্রবাসীরা দূর দূর দেশে যেত। নৌকোয় করে তারা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। দেশজয়ও তারা করেছিল। চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন আন্ধ্র ব্রাহ্মণ মালয়াল দেশে গিয়ে নাম্বুদ্রী হয়েছিলেন। তাঞ্জোরে মধুর নায়করের আধিপত্যের সময় আন্ধ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ, নায়ক এবং কম্মারা দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন। অনেকেই হায়দ্রাবাদ থেকে বোম্বাই গিয়ে খুব উন্নতি করেছিল। তারা কমাটী নামে অভিহিত হয়ে পরবর্তীকালে নাগপুর, আহমেদাবাদ, জব্বলপুর কাশী এবং প্রয়াগে কাজের জন্য গিয়ে, সেখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেল। এরা বাড়িতে তেলুগু ভাষায় আর বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের ভাষায় কথা বলে।

এইভাবেই কোন সময় গোপাল কৃষ্ণাইয়ার পূর্বপুরুষরা মহীশূরে গিয়ে পড়েছিলেন। গোপাল কৃষ্ণাইয়ার পত্নী আয়েঙ্গার হলেও তেলুগু ভালই জানতেন। স্বামীর ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁর সন্তানদের তেলুগু শিখিয়েছিলেন।

ফলে শ্যামসুন্দরীর পরিবারের সকলে তেলুগু, তামিল, কন্নড় প্রভৃতি ভাষা ভালই জানত। হিন্দুস্থানে সবাই বলে যে সৌন্দর্যে মহীশূরের বৈষ্ণবদের স্থান দ্বিতীয়।

লজ্জাশীলতা, জ্ঞান এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে দেখলে তারাই প্রথম স্থানাধিকারী। মহীশূরের বৈষ্ণবঘরের মা এবং তেলুগু বাপের সন্তান শ্যামসুন্দরী আর তার ভাইবোনদের চেহারা খুবই সুন্দর ছিল। আন্ধ্রও একসময় বাংলা এবং পঞ্জাবেরই মতো সমাজ সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

একদিন পরমেশ্বর মূর্তি, আলম, রাজারাও আর তার তামিল বন্ধু নটরাজন শ্যামসুন্দরীর বাড়ি গেল। নারায়ণ রাও তখনো আসে নি। সে দিন তার শ্বশুরের আসার কথা ছিল। সেইজন্য বন্ধুদের সঙ্গে পরে মিলিত হবার কথা দিয়ে সে নিজের গাড়ি করে কিল্লাকে চলে গেল।

নানান বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল। শ্যামসুন্দরী নিজের বাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল—

"পরমেশ্বর মূর্তিমশাই, আমার বাবা ছিলেন বীরেশলিঙ্গম্ পাণ্ডুলুর শিষ্য। আমার মা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বাপ মাকে না জানিয়ে আমি বীরেশলিঙ্গম পাণ্ডুলু পরিচালিত বিধবা বিবাহ সংঘে ভর্তি হয়ে সেখানেই পড়তে লাগলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম। আমার মা আণ্ডালা দেবীর বুদ্ধি এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাবা তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

এর মধ্যে রোহিণী দেবী অতিথিদের চা জলখাবার পরিবেশন করে গেল। সৌন্দর্য দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপে শ্যামসুন্দরী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। রোহিণী পূর্ণযৌবনা। সরলা সেয়ানা হচ্ছিল। নলিনীও বড় হচ্ছিল। তার সুন্দর চোখ দুটি, মিষ্টি হাসি আর মধুর ভাষা সকলের মনোহরণ করত। মিতভাষী রাজা রাওয়ের সঙ্গে সে চিকিৎসকের পেশা এবং বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করত। কাজ ও প্রয়োজনে রাজারাও অমলাপুরম্ চলে গিয়েছিল। পরমেশ্বর মূর্তির স্ত্রীর গর্ভস্রাব হচ্ছে টেলিগ্রামে এই খবর পেয়ে সে আজ মাদ্রাজ এসেছে। ডাক্তারী প্র্যাকটিস শুরু করার পর এই প্রথমবার সে এদের সঙ্গে মিলিত হল।

নমস্কার রাজারাওমশাই, কখন এলেন ?" তিনটি মিলিত কণ্ঠে প্রশ্ন হল।

—দুদিন হল।

—এবং এখন আপনার দেখা পাওয়া গেল, ডাক্তার সাহেব! শ্যামসুন্দরী বলল।

রাজারাও—পরমেশ্বর মূর্তির বৌ-এর অসুখে ও খুব ঘাবড়ে গেছে। নারায়ণ রাও আর পরমেশ্বরের টেলিগ্রাম পেয়ে কাল সকালে চলে এলাম। কাল সন্ধ্যা থেকে অবস্থাটা একটু ভালর দিকে গেছে।

শ্যামসুন্দরী—অসুখ করেছে? নারায়ণ রাও তো আমাকে কিছু বলে নি আর পরমেশ্বর মূর্তিও না।

পরমেশ্বর—ক্ষমা করবেন, আমি আর নারায়ণ রাও কাল তিনবার কলেজে ফোন করেছি। তখন পর্যন্ত আপনি হাসপাতাল থেকে ফেরেন নি। পরে বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু আপনি ছিলেন না। রাজারাও আসার পর আমি আটকে গেলাম।

রাজারাও—গর্ভপাতের পূর্বলক্ষণ এর আগে তিনবার হয়ে গেছে। আবার যাতে না হয় তার জন্য 'বাইবর্ণ, 'অশোক' এইসব দিচ্ছি। আপনি এখানে রয়েছেন। দেখাশুনো করবেন। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

শ্যামসুন্দরী সে সময় এম-বি-বি-এস এর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী।

"তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। ওষুধ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভাববার কিছুই নেই। আপনি কী বলেন?" রাজারাও প্রশ্ন করল।

শ্যামসুন্দরী—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখব। পরমেশ্বর মূর্তিমশাই আগে কিছুই বলেন নি।"

রাজারাও—লজ্জায় বোধহয়।

শ্যামসুন্দরী—তাই হবে।

রোহিণী পরমেশ্বর মূর্তির দিকে নির্নিমেষ নয়নে দেখছিল। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে সে বলল, "শুনেছি, দাদার অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হয়েছে। বড়ই দুঃখের কথা।"

রাজারাও—আগে তিনটি গেছে। শিশুদের জন্য পরমেশ্বর প্রাণ দিতে পারে। তাদের পেলে এ আর নারায়ণ রাও আর কিছু চায় না। শিশুদের সঙ্গে ওরাও শিশু হয়ে যায়।

রোহিণী—আমরা জানি ওঁর মনটা খুবই নরম।

পরমেশ্বর—নারায়ণ রাওয়ের মন হচ্ছে গোলাপজলের মতো।

রাজারাও—প্রয়োজনে কিন্তু 'বজ্রাদপি-কঠোরাণি' হয়ে ওঠে।

—নারায়ণ রাও আর তুই একই ধরণের।

পরমেশ্বর—আর তুই কি এই বুঝলি?

নটরাজন—জিজ্ঞেস করুন ডাক্তার সাহেব কী বলেন? দরকারমত খুব শক্ত হয়, এই তো? কী পরমেশ্বর মূর্তি এই কথাই তো বলছ?

পরমেশ্বর—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ।

নলিনী দেবী—বলুন যে ওঁর হৃদয় পাথরের মতো।

রাজারাও—নারায়ণ রাওয়ের কাছে পরমেশ্বর হচ্ছে জনসনের কাছে 'বসওয়েলের' সামিল।

পরমেশ্বর—নিদেন পক্ষে তেমনই নাম ডাক হবে। কী বল ডাক্তার?

রাজারাও—তা তো বটেই, আলবত!

নলিনী—বলুন। কবিমশাই!

সরলা—মাঝে মাঝে ছবি আঁকার উল্লেখটাও করবেন।

নটরাজন—বাঃ, বেশ, বেশ।

পরমেশ্বর—গতবার আমরা যখন বোম্বাই গিয়েছিলাম নারায়ণ রাও তখন একজন সরকারী কর্মচারীকে রেলে কাটা পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

নলিনী—সে কী!

পরমেশ্বর—শোনো, সায় দাও কিন্তু ঘাবড়ে যেয়ো না! আমি না হয় নারায়ণ রাওয়ের মতো রূপকথার নায়ক না-ই হলাম, কাহিনীর লেখক তো বটে।

নলিনী—হুঁ!

নটরাজন—আচ্ছা!

পরমেশ্বর—মনমাদ স্টেশনে সেদিন বোম্বাই মেলের প্রতীক্ষায় কয়েক শো লোক দাঁড়িয়েছিল।

নলিনী—হুঁ!

পরম (হেসে)—দুষ্টু মেয়ে! আমরা নাসিক যাচ্ছিলাম। গাড়ি এসে গেল। পুরো থামে নি, তখনো চলছে। সেই অবস্থায় বোম্বাইয়ের মহাত্মাটি

লাফিয়ে গাড়ির হাতল ধরতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। ফলে গাড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝখানের ফাঁকটাতে পড়ে গেলেন।

—নলিনী—ওরে বাব্বা ! তারপর !

পরমেশ্বর—আর একটু হলেই দু-টুকরো হয়ে যেতেন। ঝুঁকে পড়ে নারায়ণ রাও চীৎকার করে উঠল—'দেয়ালের গা ঘেঁসে পড়ে থাকো, নড়োচড়ো না। লোকটা পারল না। গাড়ীর তলায় চলে গেল। একখানি পা পিষে গুঁড়িয়ে দিয়ে গাড়িটা চলে গেল। লোকটি জ্ঞান হারাল। শত শত লোক তাকে ঘিরে দাঁড়াল কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এল না।

নলিনী—আরে !

পরমেশ্বর—নারায়ণ রাও ঝুঁকে পড়ে ছ ফুট লম্বা দশাসই চেহারার সেই লোকটিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর তুলে নিল। তারপর তৎক্ষণাৎ তাকে সেকেণ্ড ক্লাসের ওয়েটিং রুমে নিয়ে গিয়ে রক্তবন্ধ করার জন্য পা টাকে জোরে চেপে ধরে রইল। আমি পেছন পেছন ওষুধের শিশি, জল, তুলো আর পট্টী নিয়ে দৌড়েছিলাম। জিনিসগুলো আমাদের কাছেই ছিল কিনা।

নলিনী (মৃদু হেসে)—মাঝখান থেকে আপনি নিজেকেও বীর বানিয়ে নিয়েছেন।

পরমেশ্বর (মৃদু হেসে)—কী আর করা যায়? ওষুধ আর জল দিয়ে সমস্ত কাটা জায়গাটা ধুয়ে ফেলল, পকেট থেকে ছুরি বার করে তার জুতো দুটো কেটে ফেলল। তারপর টিঞ্চার আইডিন লাগাতে লাগাতেই ডাক্তার এসে পড়ল।

১৮। আন্ধ্রদের আড়ম্বর

নলিনী—আমার দিদির চেয়ে ভাল ফার্স্ট-এড্ আপনারা দিলেন। পরে…

পরমেশ্বর—পরে আর কী হবে? আমরা আমাদের ঠিকানা দিয়ে চলে গেলাম। বোম্বাইয়ের সেই কর্মচারীটির চিঠি কালই পেলাম।

রাজারাও—তোমাদের নারায়ণ রাওয়ের বীরত্বের আর কী কী কাহিনী আছে বলো দেখি।

শ্যামসুন্দরী—ডাক্তার দাদা, শুনেছি নারায়ণ রাও নাকি খুব ভালো সাঁতারু?

রাজারাও—পরমেশ্বরও।

পরমেশ্বর—নারায়ণ রাও ভালো সাঁতারু। রাজোলের কাছাকাছি একদিন ঘাট পার হয়ে একটা নৌকো আসছিল। খুব জোরে হাওয়া বইছিল। মস্ত মস্ত ঢেউ উঠছিল গোদাবরীতে। নরসাপুর থেকে স্টীমারে এসে আমি আর নারায়ণ রাও ঘাটে নামছিলাম। হঠাৎ একটা গোলমাল কানে এল। চারদিকে চাইলাম। দেখলাম নৌকোটা ডুবছে। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ রাও লাফিয়ে জলে পড়ল। পেছনে যে নৌকোটা আসছিল তার ওপর সে এক সঙ্গে দু-তিন জনকে তুলে দিতে লাগল। দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তীরে এনে পেটে চাপ দিয়ে তাদের জ্ঞান ফেরানো হল। ততক্ষণে ডাক্তারও এসে পড়ল।

রাজারাও—সেই সময়ই সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, না?

পরমেশ্বর—দিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা সে মাঝিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। বীরত্বের বহু কাজ তার আছে।

পরমেশ্বর—কলকাতায় আমরা একদিন হাঁটছিলাম। এমন সময় একটা গোরা সাইকেল চড়ে যেতে গিয়ে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। 'এই ব্যাটা পাগল, তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেব' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। নারায়ণ রাও হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা হাত তুলতেই সে তার হাতটাকে মুড়ে ধরে, "মিছিমিছি হাত তুলো না। দোষ তোমার আর অন্যের রোয়াব নিচ্ছ?" বলে তাকে দূরে ঠেলে দিল, পর্বত-প্রমাণ লোকটা ভিজে বেড়াল বনে গেল। তারপর সাইকেলে চড়ে পালিয়ে গেল। ব্যাপার দেখে লোকেরা নারায়ণ রাওকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল।

রাজরাও—নাও, নারায়ণ রাও এসে গেছে। আরে, তুই হাজার বছর বাঁচবি, নারান!

নারায়ণ রাও (এগিয়ে আসতে আসতে)—দেরি হয়ে গেল। মাফ

চাইছি। নলিনী সরলা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্তত এক আউন্সও খাবার জল আমাকে দাও তাহলে খুবই বাধিত হই।

রাজারাও—তোর শ্বশুর কী বললেন?

নারায়ণ রাও—দাঁড়া তেষ্টাটা আগে মেটাই।

নলিনী দেবী ভেতর থেকে জল এনে দিল। জল খেয়ে নারায়ণ রাও বসে পড়ল। নারায়ণ রাওকে দেখে মঙ্গপতিরাও বলল, "কাল আমাদের দাদ আসছেন, জানো দাদা? আমাদের মেজ দাদা।"

পরমেশ্বর ও নারায়ণ—আমরা খুবই আনন্দিত।

রাজারাও—সার্জারিতে উনি ছিলেন আমাদের একজন অধ্যাপক।

শ্যামসুন্দরী (নারায়ণ রাওয়ের দিকে চেয়ে)—দাদা, নটরাজন বলছে যে আপনাদের আন্ধ্রের লোকেরা বড্ড চালবাজ। বড় হয়ে অবধি আমি মাদ্রাজে আছি তাই আন্ধ্রের লোকদের নাড়ীনক্ষত্র জানি না। ছোট বেলায় আমরা নিশ্চয়ই তেলুগু দেশে ছিলাম।

নারায়ণ রাও—আপনি যদি আমাদের দেশে একবার আসতে পারেন তাহলে মনে হয় ভাল হবে। আমার বাড়ি কোত্তপেট। আমাদের অতিথি হয়ে আসুন। দেশের কায়দা-কানুন, রীতি-রেওয়াজ সবই সহজে জানতে পারবেন।

নলিনী—নটরাজন অন্ধ্রের মাটিকে ময়লা করে দিয়েছে। আপনি তার জবাব দিচ্ছেন না কেন?

পরমেশ্বর—আমাদের আন্ধ্রবাসীদের মধ্যে উৎসাহের আধিক্য আছে। সুযোগ এল তো হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে গেল। একটু থিতিয়ে যেতেই দেখা যাবে ধারেকাছে আর কেউ নেই।

রাজারাও—সে উৎসাহটাও বেশি দিন থাকে না।

পরমেশ্বর—কে একজন বলেছেন যে সারাদেশে গ্রন্থাগার থাকা উচিত। দেখতে দেখতে চারিদিকে গ্রন্থাগার গজিয়ে উঠলো। কৃষ্ণদেব রায়ের নামে গ্রন্থাগার, বসুরায়, গোমতী, রামমোহন, মোহন দাস, তিলক প্রভৃতির নামে গ্রন্থাগার খোলা হল। এখন খোঁজ নাও, দেখবে তার মধ্যে বড়জোর চার-পাঁচটি ঠিকমতো চলছে। কতকগুলো নামে মাত্র টিকে আছে আর ঝগড়া-ঝাঁটি করে। কতকগুলো উঠে গেছে।

নারায়ণ রাও—রোজ দুটি করে পত্রিকা জন্মায় চারটি করে মরে। এক সময় বীমা কোম্পানীও এইভাবে গজাত আর উঠে যেত।

পরমেশ্বর—বন্দরে মিষ্টির কারখানা, রাজমহেন্দ্রবরমে কাগজকল, এলোরে জুটমিল, কত কোম্পানীরই না সৃষ্টি হল। তার মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই।

রাজারাও—১৯২০তে জায়গায় জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হল। এখন মরি বাঁচি করে কেবল 'শারদা নিকেতন'ই রয়ে গেছে। আচ্ছা নারায়ণ রাও, বন্দরের জাতীয় কলেজ কোনোমতে চলছে, না?

নারায়ণ—আশ্রমগুলির মধ্যে পল্লেপাড়ু আশ্রমের কী হল? প্রতিষ্ঠাতা দিগুমূর্তি হনুমন্ত রাওয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমটিরও মৃত্যু হল।

শ্যামসুন্দরী—এ কী দাদা, আপনিও আমাদের প্রদেশের নিন্দা করছেন?

নারায়ণ—নিন্দা পূর্ণ মাত্রায় হওয়া দরকার। বলে যা পরম।

পরমেশ্বর—নিন্দাটা তুই পূর্ণ করে দে না? হঠাৎ বহু কোঅপারেটিভ সোসাইটি দেশে গজিয়ে উঠল। আবার বন্ধও হয়ে গেল। বহু লোক দেউলে হয়েছে। কিন্তু তিন টাকা সুদে মাড়োয়ারীর কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া কি তারা বন্ধ করেছে? তা-ও করেনি।

শ্যামসুন্দরী—এর কারণ কী?

নলিনী—আপনারা সবাই সেই সব উকিলের মতো যারা একজনের কাছ থেকে নিয়ে, অন্যের হয়ে সওয়াল করে কেটে পড়ে।

নারায়ণ রাও—দুর্বলচিত্ত, মেরুদণ্ডহীন, অলস এবং আদর্শভ্রষ্ট, অহংকার আকাশছোঁয়া। একজন নয়, সবাই নেতা। গুণীর কোনো আদর নেই।

পরমেশ্বর—সেই জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে আমাদের প্রদেশের গ্রহাধিপতি হচ্ছে মঙ্গল। দেশ না ছাড়লে আমাদের লোকেরা নাম পায় না। বাঙালী, মারাঠী, পঞ্জাবী এবং উত্তর ভারতীয়রা নিজেদের দেশেই বিখ্যাত হয়।

নারায়ণ—আরও একটা কারণ আছে। আগে মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা খুব ছিল। অন্ধ্র হচ্ছে বহু জমিদারের দেশ, তাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ ভালো অবস্থা। বংশধরের কথা না ভেবে নানা ভাবে পয়সা ওড়ানোর অভ্যাস তাদের মধ্যে বেশ খানিকটা রয়েছে। সৎ কাজে দানের মনোভাবও

কয়েকজনের আছে। বাদ বাকী সব হচ্ছে অন্তঃপুরের বাসিন্দা। অন্ধ্রের কাগজকলে একজন জমিদারও যদি টাকার যোগান দিতেন তা হলে এতদিনে যথেষ্ট লাভ হত। বন্দরের সুগার মিলের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যেখানে জমিদারি নেই সেখানে আছে রায়তদারি, সব কে সব সাধারণ কিষাণ। তারা যত কামায় তার চেয়ে বেশি খরচ করে। সেইজন্যেই তারা মাড়োয়ারী মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দেশের সেবা করছে।

পরমেশ্বর—১৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে অন্ধ্র বক্তৃতা সভা হবে। তাতে দেখে নিও বোন, অন্ধ্রবাসীদের কী রকম শৌর্য আর উৎসাহ।

সরলা—এক হপ্তা বাকি আছে।

রোহিণী—আমাদের মঙ্গপতি-ইংরেজিতে কবিতা লেখে। সে কি আসতে পারে?

পরমেশ্বর—নিশ্চয়ই আসতে পারে।

শ্যামসুন্দরী—সভা কি কবিদের নাকি?

পরমেশ্বর—তেলুগুতে বর্তমানে ভাষা নিয়ে দুটি আন্দোলন চালু রয়েছে—একটি সাধুভাষা এবং পূর্ব ধারানুসারী কবিতা নিয়ে আর অপরটি হচ্ছে ব্যবহারিক ভাষায় আধুনিক কবিতা নিয়ে। একে 'ভাব-কবিত্ব' বলা হয়ে থাকে।

নটরাজন—আমার হয়ে পরমেশ্বর মূর্তিই ভাল বক্তৃতা দেবে।

পরমেশ্বর—দাঁড়া না, তামিলদের সম্বন্ধে পরে বলছি। খুশির কারণ নেই। কথা বাড়ানোই তোমাদের অভ্যেস। আমরা আত্ম নিন্দা করছি আর নটরাজন বেশ খুশি হচ্ছে।

রোহিণী—ভাষার ব্যাপারেও কি বিবাদ আছে নাকি?

পরমেশ্বর—তা নয়তো কী? সাধু চলিতের বিবাদ। দেশে এখন কী অবস্থা বলছি। প্রাচীন সব বইই গদ্যে লেখা—ভারত আর ভাগবত। প্রবন্ধ কী কী আছে পরে বলব। তাতে পদ্যের সঙ্গে গদ্যও আছে। ভারতের লেখক নন্নয়ভট্ট কবিদের মধ্যে প্রথম। বাগানু নাসম নামে তাঁর খ্যাতি। সংস্কৃতের অনুসরণে তিনি তেলুগু ভাষায় ব্যাকরণ লিখেছিলেন। অপ্প কবি প্রভৃতি পরে অনেকগুলি ব্যাকরণ লিখেছেন কিন্তু একটু আধটু পরিবর্তনসহ প্রথম ব্যাকরণটিই চালু রইল। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তেলুগু ভাষায় কোনো ভাল

গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। চিন্নয়সূরীকে গদ্যের নন্নয় বলা হয়ে থাকে। তিনি বাল ব্যাকরণ লিখলেন। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ও নীতিচন্দ্রিকায় তিনি প্রাচীন ভাষাই প্রয়োগ করলেন। কবি বীরেশলিঙ্গম, চিলকমূর্তি, লক্ষ্মী নরসিংহ মূর্তিও সেই ভাষাই ব্যবহার করলেন। তাকে বলা হয় সাধুভাষা বা ব্যাকরণযুক্ত ভাষা।

রাজারাও—আরে তুই যে এক নিঃশ্বাসে দিব্যি বক্তৃতা ঝেড়ে গেলি।

পরমেশ্বর—কিন্তু ১৯১৪ নাগাদ একটা আন্দোলন শুরু হল। গুরজাডা আপ্পারাও এবং সংহিলক্ষ্মী নরসিংহ কবি ছিলেন এর পুরোধা। পিডুগু রাম মূর্তি ছিলেন এই আন্দোলনের অর্জুন। এঁদের বক্তব্য কী? পদ্যের কথা বাদ দিন। প্রাচীনকাল থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা যে ভাষায় লিখে এসেছেন সেটাই হচ্ছে আদর্শ। ইংরেজি গদ্য সদা পরিবর্তনশীল। ভালো ঘরানার ভাষার পরিবর্তনই বাঞ্ছনীয়। নয়ত ভাষার প্রগতি রুদ্ধ হয়। ভাষা হবে গতিশীল। ভাষা যেন ব্যক্তি-আত্মা। বহু যুগ স্থায়ী হয়ে সংস্কৃতের মৃত্যু ঘটেছে বলেই তা আমাদের মাথার মণি। বেদের ভাষা আলাদা। পুরাণের ভাষা আলাদা। নাটকেরও বিশেষ ভাষা আছে। আমাদের ব্যবহারিক ভাষাও এইভাবে বদলাচ্ছে। আর সেইজন্য এই ভাষাতেই গদ্য লেখা বাঞ্ছনীয়।

রাজারাও—বেশ, বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হল। তারপর?

পরমেশ্বর—প্রাচীনকালে বই লেখা হত রাজা রাণীকে নায়ক-নায়িকা করে। কালক্রমে শৃঙ্গাররসই প্রাধান্য লাভ করল। তাঁদের লেখা পুরাণ, মহাগ্রন্থ প্রবন্ধ সবই উৎকৃষ্ট। কিন্তু যদি শুধু তারই অনুকরণ করা হয় তবে নতুনত্ব কী হল? ফলে যুবকরা ধরলেন নতুন পথ। এ ব্যাপারে ইংরেজি সাহিত্য যথেষ্ট প্রেরণা যোগাল। এই নতুন কবিতার পথিকৃত হলেন গুরজাডা আপ্পারাও। বোব্বিলী গীতা প্রভৃতি দেখুন কী মাধুর্যপূর্ণ। তাই বলা হয় যে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হোক। আত্মকেন্দ্রিক প্রেম ও ভাবকে অবলম্বন করে যাঁরা লেখেন, প্রাচীন আন্ধ্র ইতিহাসকে আশ্রয় করে যাঁরা লেখেন, এই ধরনের কত কবি আর লেখক আজকাল রয়েছেন।

১৯। আন্ধ্র নব-কবি-সমিতি

পচ্চয়প্পা কলেজের গেটে একটি ইস্তাহার টাঙানো হল। তাতে বড় বড় হরফে লেখা : অন্ধ্রের আধুনিক কবি সম্মেলন। বড় হলঘরটায় মস্ত সুসজ্জিত একটি বেদী তৈরী হয়েছিল। সাজসজ্জার ভার ছিল পুরোপুরি নারায়ণ রাওয়ের ওপর। সভাপতি হলেন বরদরাজ স্বামী। অঞ্জনেয় কবি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ রাও, পরমেশ্বর, রোহিনী দেবী ইত্যাদি হল অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য। একদল ছাত্রকে নিয়ে নারায়ণ রাও কাজে লেগে গিয়েছিল। তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন। নারায়ণ রাও তিনশো টাকা চাঁদা দিয়েছিল। জমিদার দিয়েছিলেন একশো। নাগেশ্বর রাও দুশো আর আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী একশো। উকিল এবং ব্যবসায়ীরাও চাঁদা দিয়েছিল। মোট প্রায় হাজার দুয়েক টাকা সংগ্রহ করে নারায়ণ রাও অভ্যর্থনা সমিতির হাতে তুলে দিয়েছিল। সরলা এবং ভারতী'র লেখক নব্য কবি রামলিঙ্গা রাওকে করা হয়েছিল কোষাধ্যক্ষ।

এই উপলক্ষে চিত্রপ্রদর্শনী, কবিদের আলোকচিত্র এবং নব্য কবিদের প্রকাশিত পুস্তকের ও অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

অর্থাভাবের দরুণ যেসব কবি আসতে অক্ষম তাঁদের যাতায়াতের খরচ সংগ্রহের ভার সে নিজে নিয়ে তাদের জানিয়ে দিল।

নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হল। কর্মসূচীও প্রকাশিত হল। ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে বন্ধুদের দিয়ে নারায়ণ রাও একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও করে ফেলল।

চিত্র প্রদর্শনীর জন্য দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল। শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলাল, কলকাতা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, লক্ষ্ণৌ, থেকে অসিতকুমার হালদার, পাঞ্জাব থেকে বউলরহমান চুগতাই, বরোদা থেকে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহীশূর থেকে বেঙ্কটাপ্পা, বোম্বাই থেকে সোলেমান, আহমেদাবাদ থেকে কানু দেশাই, মণিভূষণ গুপ্ত সুধাংশু চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ; অন্ধ্রের রাজমহেন্দ্রবরম থেকে বেঙ্কটরত্নম মশায়, শ্রীমতী দিগুমূর্তি, বুচ্চি কৃষ্ণায়া, চামকুর ভাষ্যকারুলু,

ভীমোয়েম্ থেকে অঙ্কল সুব্বারায়, গ্রন্থিশেষ রাও মশায়, তজেলুমুর্তি বেঙ্কট সুব্বারায়, গুণ্টুর থেক গুররম্ মল্লয়া, অনিসেট্টি সুব্বারাও, মাদ্রাজ থেকে কাউতা রামমোহন শাস্ত্রী, কেশবরাও, গুজরাত থেকে কাউতা আনন্দমোহন শাস্ত্রী, বিশাখপট্টনম থেকে তলশেট্টি রামারাও, কাকিনাড়া থেকে চামকুর সত্যনারায়ণ, নরসাপুরম্ থেকে বেন্না শেষগিরি রাও, এলুর থেকে চণ্ডুপর্যল বাপিরাজু, রামারাও, পেনঙ্গ থেকে বেঙ্কটরাও এবং আরও বহু তরুণ শিল্পী তাঁদের ছবি পাঠালেন। অন্ধ্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রায়প্রোলু সুব্বাবাও, বিশ্বনাথ দেবলুপল্লি, বেদলু, নণ্ডুলী কাট্টুরী, মাধবপোদ্দি, দুব্বরী, পিঙ্গলী, মুণি মানিক্য, কবিরাজ, মোক্কপাটি, নোরি, নাগেন্দ্র রায়ুলু, চিন্তা, পঞ্চাগনুলু করণম্ গোলবেন্নু, মল্লম্পল্লি, তুম্মল, ভাবরাকু, কবি কোণ্ডল, মল্লাদি, ত্রিপুরারি ভট্‌ল এবং আরও বহু কবি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

পচ্চয়প্পা কলেজে কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সুপ্রসিদ্ধ কবিরা নিজেদের নতুন কবিতা সুন্দরভাবে পড়ে শোনালেন। সন্ধ্যায় গোখেল হলে তাঁদের বক্তৃতা হল। গাইয়েরা গান শোনাল। একদিন কুচিপুড়ি শিল্পিদের ভগবত, একদিন জঙ্গম কথা, দেশীনাটক প্রভৃতি মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সমালোচক এবং কলারসিকরা শিল্প সম্বন্ধে কক্তৃতা দেন নি। শ্যামসুন্দরী আর তার বোনরা একদিন গান করে শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করল। নারায়ণ রাও-ও বেহালা বাজাল। পরমেশ্বর শোনাল নিজের গান। হিন্দু যুবজন সমাজের বাড়িতে অতিথিদের ষোড়শোপচারে ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সভাপতি ভাবগম্ভীর ও শ্রুতিমধুর বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন যে কবিতার সঙ্গে জীবনের যোগ থাকা চাই তার চেয়ে বড় অলংকারের দরকার নেই। কবিতা হবে কবি জীবনের অঙ্গীভূত। গঙ্গার ধারার মতো গতিশীল এবং সমুদ্রতরঙ্গের মতো উদার। তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তাঁর ভাষণ।

অনেকে বললেন, 'ভাবকবিত্ব' হচ্ছে বাজে জিনিস। ভাব ছাড়া আবার কবিতা আছে নাকি? কেউ কেউ বললেন, ভাবের অর্থ 'মানে' নয়। রসস্বরূপ ভাবই প্রকৃত ভাব। কথাটির মানে হচ্ছে, হৃদয়, মন। ভাব বলতে তাই বুঝতে হবে। কবিহৃদয়ের প্রতিচ্ছবির কবিতাই হচ্ছে 'ভাবকবিতা'। সকলেই বললেন ভাবকবিতা হচ্ছে প্রধানত ব্যক্তিগত, সাবজেকটিভ কবিতা।

দুজন বললেন, 'ভাগবত' এবং 'ভারতের' কোনটিই পরিপূর্ণরূপে কবিতা নয়। কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত থেকে তেলুগুতে অনুবাদ করলেই কবিতা হয় না।

তাঁদের এই মতবাদকে খণ্ডন করে অন্যেরা বললেন, "আত্ম-প্রশংসার স্বাধীনতা আমাদের আছে কিন্তু 'ভারত' এবং 'ভাগবত'কে আমাদের পূজা করা উচিত।" সিদ্ধান্ত হল যে গান লেখা যেতে পারে, গানও কবিতা। তারপর প্রশ্ন উঠল ভাষা নিয়ে। অনেকে পুঁথিপত্র হাজির করে বললেন যে ব্যাকরণ-সিদ্ধ ঐতিহ্য-সম্মত ভাষাই কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চলিত ভাষাই গদ্যের পক্ষে উপযুক্ত।

পরমেশ্বরের বক্তব্য ছিল—ভাষা প্রগতিশীল। সে যেন মানুষ। ভাষারও তিনটি পর্যায়, জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু। পৃথিবীতে কত ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, প্রচলন হয়েছে এবং লয় হয়েছে। শিল্প প্রভৃতির মধ্যে যেমন কতকগুলি লুপ্ত ধাতুর সন্ধান মেলে, ঠিক সেই ভাবেই বহু মৃত ভাষার ধ্বংসাবশেষ আমরা পেয়ে থাকি। সংস্কৃতের দিকেই তাকান, হাজার হাজার বছর সে বেঁচে ছিল। আজও সে আমাদের কাছে এক পরম মূল্যবান বস্তু। অনুরূপ আরও কয়েকটি ভাষা হচ্ছে ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি। আপনারা যখন ব্যাকরণের সৃষ্টি করেন, তখনই তার প্রগতি বন্ধ হয়। সেই জন্যই সংস্কৃত থেকে এল প্রাকৃত। তাকে আবার ব্যাকরণে বাঁধতেই সৃষ্টি হলো পালির। নিয়মের নিগড়ে পড়ে সে-ই আবার আত্মপ্রকাশ করল বাঙলা, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার মধ্য দিয়ে। সেইজন্য আমি বলি যে তেলুগুকে বাঁধবেন না। ইতিমধ্যেই সাধু ও চলতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে ব্যবধানও বেড়ে চলেছে যেমন তেমন করে আমরা একটি সেতুবন্ধের ব্যাপারে সফল হয়েছি। সেতুর নাগালের বাইরে কিন্তু নতুন ভাষা জন্ম নিচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন সংস্কৃতের মতো হলে তেলুগুর মূল্য আরো বাড়বে কিন্তু দৈবভাষা সংস্কৃতের পরিণতির সঙ্গে তার পরিণতির সমীকরণ ঠিক নয়।

কয়েকজন বললেন ব্যবহারিক ভাষাই কাব্যের ভাষা। অনেকের মতে গদ্যকাব্যের ভাষা হবে চলিত। কাব্যের লক্ষণগুলি কিন্তু অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। ভাষা যা-ই হোক, মূল কথা হচ্ছে যে তা কাব্যের অনুকূল কিনা। এই প্রস্তাবই গৃহীত হল।

চিত্র প্রদর্শনীতে নারায়ণ রাও চিত্রকলা সম্বন্ধে বলল—

"শিল্প হচ্ছে আনন্দের রূপ। ব্যক্তির আনন্দ কলায় মূর্ত হয়। মূর্ত শিল্পে মানুষের আনন্দের আংশিক অভিব্যক্তি অনুচিত। পূর্ণপ্রতিনিধিত্ব তাকে করতে হবে। আনন্দের উৎপত্তি হয় কী ভাবে? সৃষ্টি যখন শ্রুতিরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমরা আনন্দ লাভ করি। এ হচ্ছে দিব্য পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই শ্রুতি প্রকৃতিতে বহুরূপে রয়েছে। রঙের সঙ্গে রং, স্বরের সঙ্গে স্বর, বস্তুর সঙ্গে বস্তু, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় এবং জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিত হয়েই 'শ্রুতির' জন্ম দেয়।

"জগতে মানুষের জীবন ভিন্ন ভিন্ন সমতলে থাকে। প্রত্যেকে তার ভাব বা ভাবনা অনুসারে আনন্দ লাভ করে।

"পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলেই সেই আনন্দকে ব্যক্ত করার অধিকারী হওয়া যায়। আর ব্যক্ত করার সামর্থ্য যাদের থাকে না তারা অন্যের অভিব্যক্তিতে আনন্দ লাভ করে।

"ব্যক্ত যিনি করেন তিনিই হলেন স্রষ্টা, সৃষ্টি দেখে যিনি আনন্দ লাভ করেন তিনি হলেন শিল্প-রসিক।

"সংগীতপিপাসু জলপ্রপাতের কলধ্বনির মধ্যেও সুরের রণন খুঁজে পায়। হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। জলপ্রপাতে ধ্বনির মধ্যেই সে তার সংগীত রচনা করে। আর আমরা সেই সংগীত শুনে আনন্দ লাভ করি।

"একটি পাহাড়। পাহাড়ের পাশ দিয়ে বইছে মহানদী। আকাশটা নীল। ধূসর সান্ধ্য মেঘ তার উপরে ভাসমান। ধরুন, একজন চিত্রকর এই দৃশ্যটি দেখলেন। তিনি আনন্দিত হলেন। সেই আনন্দকে তিনি একটি পাহাড় মহানদী আর মেঘ এঁকে ব্যক্ত করলেন। প্রকৃতিতে যদি কোন কিছুর ঘাটতি থেকে থাকে শিল্পী তখন তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। এসব দেখে আমরা আনন্দিত হই। কবিও তাই করেন।

"আপনারা কিন্তু ভাববেন না যে আমরা প্রকৃতির অনুকরণ করছি। তা নয়। প্রকৃতির দৃশ্য দেখে আমরা আনন্দিত হচ্ছি। ওই হচ্ছে আমাদের 'শ্রুতি'—স্বভাবের একটি অঙ্গ। তার মধ্যে বহু তদ্ভব ও তৎসম শব্দ দেখা যায়। আর এইভাবেই একটি চিত্রও জন্মলাভ করে।

"শিল্পের বিষয়বস্তু কী শুধু প্রকৃতিই? এ বিষয়েও ভুল চিন্তা থাকা সম্ভব। মনে করুন, কুকুরের ঘেউ ঘেউ এক টানা শুনে আনন্দিত হচ্ছেন কিন্তু

আপনার ওই আনন্দ খুবই নিকৃষ্ট ধরনের। কুকুরের ডাক থেকে ‘অপশ্রুতি’কে অপসৃত করে তাকে সংগীত করে তোলা যায়।”

এইভাবে নারায়ণ রাও তার তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিল। সে বলেছিল, আনন্দ চার রকমের। ভৌতিক, মানসিক, হৃদয়গত এবং পারলৌকিক। সর্বাঙ্গসুন্দর রমণীর দেহ চিত্রনে শারীরিক আনন্দের উৎপত্তি হয়। লতা ফল ফুলের চিত্রণে মন তুষ্ট হয়। সমস্ত কল্পনাই এই রকমের। করুণা, নিদারুণ দুঃখ প্রভৃতির চিত্রণ মনকে আকৃষ্ট করে। ভগবান, মহাত্মা, অবতার, জীবনী, কাহিনী, কর্মযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতি হল পারলৌকিক। এরা আত্মার আনন্দের উৎস।

২০। ক্লিষ্ট সমস্যা

সম্মেলন শেষ হল। কার্যসূচী সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করল। ‘আন্ধ্র’ ‘হিন্দু’ ‘স্বরাজ্য’ এবং ‘ভারতীতে’ ‘চিত্র প্রদর্শনী’ ‘কবিসম্মেলন’ ‘বোব্বিলী-কথা’ ‘ভাগবতম্’, নাটক প্রভৃতি সম্বন্ধে যথোচিত টিকা-টিপ্পনী বেরুল।

শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য একটি, পৌরাণিক চিত্রের জন্য একটি এবং মানবজীবন বিষয়ক ছবির জন্য একটি ; মোট এই তিনটি পুরস্কার দেওয়া হল। প্রথমটির জন্য দুশো এবং অপর দুটির জন্য একশো করে টাকা দেওয়া হল। অন্ধ্র চিত্রকরদের মধ্যে দুজনকে একশো একশো করে মোট দুশো টাকা দেওয়া হল। চলতি বছরে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের লেখক পেলেন পাঁচশো টাকা।

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ এবং গীতগ্রন্থের রচয়িতারা প্রত্যেকে দুশো টাকা করে পেলেন। দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রুপার থালা, পদক, পাত্র প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল। নতুন কবিদের ছবি সহ এক একটি করে রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নারায়ণ রাও করেছিল।

নাটক থেকে আয় হয়েছিল ১৯০০ টাকা। খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির জন্যে দুশো টাকা খরচ হয়ে গেল। গাড়ি ভাড়ার ৩০০, ছাপানোর ১৫০, ফটো

প্রভৃতির ৩৫০ এবং হরিকথা, পাঠক, বোব্বিলী গায়কদের যাতায়াতের জন্য ৪০০ টাকা খরচ হল। সম্মেলনের মোট ব্যয় দাঁড়াল দু হাজার টাকা। আরও কয়েক জন কবির যাতায়াত বাবদ তিনশো টাকা নারায়ণ রাও নিজের পকেট থেকে দিল।

প্রদর্শনী থেকে লাভ হয়েছিল ২২৫ টাকা। টাকা পয়সা কিছু বাঁচল না। লোকে বলল এমন সুন্দর সম্মেলন কোথাও কখনো হয় নি।

একটা না একটা কোন কাজ খুঁজে বের করে নারায়ণ রাও তার মনের ব্যথা ভুলতে চেষ্টা করত। দিন কয়েক আগে খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে শারদাকে কোত্তাপেট পাঠাবার জন্য সুব্বারায় লিখেছিলেন। জমিদারও রাজী হলেন। কোত্তাপেট থেকে শারদাকে মাদ্রাজে আনার জন্য নারায়ণকে বলা হল। কারণ শারদার পরীক্ষার আর দেরি নেই, তাকে পড়াবার ভারটাও নারায়ণকেই নিতে হবে। সে মাদ্রাজে থাকবে এবং রাজমহেন্দ্রবরমে গিয়ে ১৯২৯ সালের পরীক্ষাটা দেবে। তার বাবাই তাঁকে সেখানে নিয়ে যাবেন।

তার সঙ্গে নারায়ণ কী করে থাকবে? পড়াবেই বা কী করে? সে-ও কি এসবের জন্য প্রস্তুত? বাপের কথা বোধ হয় ফেলতে পারে নি। এত সৌভাগ্য কি হবে? শ্বশুরমশাইয়েরই খেয়াল বোধ হয় এসব। দুজনের অবস্থা জেনেই তিনি এসব করছেন না তো? শ্বশুর মশাই কেন আমাকে এত ভালবাসেন? তিনি দেবতুল্য মানুষ।

আর সে সুন্দরীই বা কেন এমন করল? মন তার ভেঙে যায় নি তো? কী বিশ্রী আমার মন? ভারত-নারীর পবিত্রতায় সন্দেহ করা আমার মতো তুচ্ছ মানুষের পক্ষে অশোভন। আমার অন্তরাত্মা তার পূতচরিত্রের স্তব পাঠ করত। থাকৃগে আমার প্রেমমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কি কখনও আমায় ভালবাসবে না?

তার মনোবেদনার কারণ না হয়ে কি আমি থাকতে পারব? এই সমুদ্রের ধারে আমরা কি সেই ভাবে থাকতে পারব?

"তোমার আমার মিলন হলে
ফুলের মালা গেঁথে,
কাটব আমরা সাঁতার
তুমি এসো—তুমি এসো।"

আমরা পরস্পর কি প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারব? চিন্তা তার চোখ দুটিকে অশ্রুসজল করে তুলল। 'প্রেমহীন মানুষ পশুরও অধম' বিবেকানন্দ কি একথা বলেন নি? 'অবৈধ প্রেমের মানুষও ভক্ত হতে পারে'—বিবেকানন্দ বলেছিলেন।

"সকাম প্রেমেরও গুণ আছে। এই প্রেমই শেষে ঈশ্বরপ্রেমে পরিণতি লাভ করে।" নারায়ণ রাও ভাবল:

"যাই হোক, বৌ কি আমার সঙ্গে থাকতে চায় না? সুযোগ যখন রয়েছে আমিই বা তখন হিমালয় বা হৃষিকেশ গিয়ে সদগুরুর সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে তপস্যারত হই না কেন? ক্ষণিকের আতিথ্য এবং নীচজীবন কি ছাড়তে পারি না? বাতাসের চেয়েও হাল্কা করে পাথরকে উড়িয়ে দেবার মতোই আমাদের এই জীবনধারণ। আমি কি এতই ভাগ্যবান? দুঃখময় আমার জীবনে আশার আলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে পথে এগিয়ে যাবার সাহস আমার নেই। ভক্তের ভগবান রামচন্দ্র, এখন তুমিই আমার আশ্রয়।"

পরমেশ্বর মূর্তি ইতিমধ্যে এসে পড়ল। তার বৌ রুক্মিণীর খবর ভাল। তা হলেও যতক্ষণ সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হচ্ছে ততদিন তাদের দুজনকে নারায়ণ রাও তার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করতে বলল।

—পরমেশ্বর, জানুয়ারিতে শারদাকে আমি এখানে আনছি।

—বেশ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

নারায়ণ রাও শারদাকে যতখানি ভালবাসে শারদা যে নারায়ণ রাওকে ততখানি ভালবাসে না এবং এর জন্য নারায়ণ রাও যে খুব কষ্টে আছে সে কথা পরমেশ্বরের অজানা ছিল না। "আচ্ছা, রুক্মিণী আমায় যতটা চায় আমি কি তাকে ততখানি চাই?" পরমেশ্বর অবশ্য নিজেকে সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র বলেও দাবি করে না। সুন্দরী নারী বহুক্ষেত্রেই তার মনোবিকারের কারণ হয়ে পড়েছে।

রুক্মিণী কুৎসিত নয়, আবার খুব সুন্দরীও নয়। স্বামীর রাগের কারণও সে হয় না, সবদিক বাঁচিয়ে সংসারটাকে ভালভাবেই চালায়। সে কৃপণ নয়, আয়ের তুলনায় স্বামীকে সে ভালই খাওয়ায়। ঘরের কাজে সে পটু, প্রতি মাসে হাত খরচের জন্য দশ পনেরো টাকা স্বামীকে দেয়। সেভিংস ব্যাঙ্কেও মাসে মাসে দশ পনেরো টাকা জমায়। কাছে থাকলে বৌকেই পরমেশ্বর

মূর্তির ভাল লাগে। সূর্যকান্তমের সঙ্গে রুক্মিণীর খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। "বৌদি, তোমার বাচ্চা হলে আমায় নিতে দেবে তো? আমিই তাকে চান করাব। দিদির বাচ্চাকে আমিই তো খাওয়াতাম। পরমেশ্বরদা আর আমার ছোটদা ছোট ছেলেপিলে কেন এত ভালবাসে?"

এসব শুনে রুক্মিণীর আনন্দের সীমা থাকত না। খুশির আবেগে সূর্যকান্তমকে সে বুকে জড়িয়ে ধরত।

পরমেশ্বর মূর্তি যে ঘনিষ্ঠ মহলের দুটি মেয়ের সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে মেলামেশা করে একথা তার বৌ জেনে ফেলল। রুক্মিণী মনে মনে বড় কষ্ট পেল। এটা পরমেশ্বরেরও অজ্ঞাত রইল না। বৌয়ের পা দুটিকে সে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল।

সত্যিসত্যিই দুতিন বার সে একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই মেয়ের স্বামী একটু একরোখা ধরনের। সে তাকে ঘৃণা করত। ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করে কোনো মতে সে স্বামীর ঘর করত। ছেলেবেলায় সে পরমেশ্বর মূর্তিকে ভালবাসত। মেয়েটি সুন্দরী। সেইজন্যেই পরমেশ্বরের মতিভ্রম হয়েছিল।

কিন্তু সৌন্দর্যপিপাসাই পরমেশ্বরকে স্খলনের পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে দিত না। সুন্দরী নারী না হলে তার মনোবিকার ঘটত না। আবার শুধু সুন্দর হলেই চলবেনা, সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া চাই। নিখুঁত। ফলে স্থূল জাগতিক আনন্দ সে একমাত্র তার স্ত্রীর কাছ থেকেই প্রয়োজনমত পেতে পারত। ভোগের আনন্দে ডুবে যাবার ভয়ে পরনারীর সঙ্গ সে ছেড়ে দিয়েছিল।

ভালবাসার সুযোগ পেয়ে রোহিণী দেবীকে সে মন দিয়ে বসল। রোহিণীও পরমেশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিল। তার কথায় সে পুলকিত হয়ে উঠত। তার আকাঙ্ক্ষার ঠিকানা সে পেয়ে গিয়েছিল। মনে মনে সে শঙ্কিত হল। পরমেশ্বরের মধ্যে সে তন্ময় হয়ে গেল। একজন মহাপ্রাণ মানুষ তাকে ভালবাসে এই ভেবে মনে আনন্দ তার ধরে না। সুযোগ পেলেই রোহিণী তার সঙ্গে নির্জনে মিলিত হত। দিদি হাসপাতালে চলে গেলে নারায়ণ রাওকে ছেড়ে সে তার কাছে চলে যেত।

কিন্তু ধর্মভীরুতা রোহিণীর মধ্যে ছিল। পরমেশ্বর বিবাহিত। বৌ নিয়ে সুখে ঘর করছে। তাই সে ঠিক করেছিল যে সে তাকে সীমা ছাড়াতে

দেবে না। নিষ্পাপ মন নিয়ে সে তাকে ভালবাসতে লাগল। ঘনিষ্ঠতা বাড়লে সীমারেখা যে মিলিয়ে যাবে এ ভয় তার ছিল না।

তার মনোভাব বুঝে পরমেশ্বরও সতর্ক থাকত।

২১। গল্পসল্প

সমুদ্রের ধারে নারায়ণ রাও, পরমেশ্বর মূর্তি, শ্যামসুন্দরী দেবী এবং রোহিণী দেবী কবিসম্মেলন নিয়ে আলোচনা করছিল।

আধুনিক তরুণ কবিদের মধ্যে আরও স্বাতন্ত্র্য দেখানোর মতো বহু কবি আছে 'ভারতী'তে প্রকাশিত চারটি লেখার মধ্য দিয়ে একজন সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন যে অন্ধ্রের আধুনিক কবিতা নীরস প্রেমপূর্ণ। রঙ্গমঞ্চের নারী আর কবিতার নারী নাকি এক। তিনি বলেছেন, বিগত কবিসম্মেলনের মতো অনুষ্ঠান আরও হওয়া দরকার। লেখার যোগ্য হাজার হাজার বিষয় থাকতেও কবিরা অজ্ঞতার জন্যই শুধু নারীদের নিয়ে কবিতা লেখেন, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। নারায়ণ রাও ওই সমালোচকের সঙ্গে একমত নয়। পরমেশ্বর তার যুক্তি খণ্ডন করে বলল, "বিষয় হিসেবে প্রেম খুবই ভাল। যে প্রেম আজ তুমি তোমার প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করছ সেই জিনিসই ভগবৎ প্রেমে পরিবর্তিত হবে। চিন্তামণির প্রেমের ফলস্বরূপই লীলাশোক মহাভক্ত হয়েছিলেন।"

শ্যামসুন্দরীকে দেখে নারায়ণ রাও মৃদু হেসে বলল, "বোন, সমগ্র সৃষ্টিটাই ভগবানের রূপ নয় কি? এ অবস্থায় করুণা প্রভৃতি রসের দ্বারা জীবনকে পবিত্র করে তোলার চেয়ে প্রেম নিয়ে অপ্রয়োজনীয় গান রচনা করা কি মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক নয়? মনে তোমার যদি প্রেমের উদাত্ত আহ্বানই থাকে তবে লেখো না দু-চারটে মহাকাব্য, ভুখা-নাঙ্গা গরিব গোলাম আর চামার চণ্ডালের জীবন নিয়ে করুণ রসের কবিতা লেখো। যদি কোনো বস্তু মানুষকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে তা হলে তা হচ্ছে কবিতা।"

শ্যামসুন্দরী দুজনের মতবৈষম্যের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটানোর জন্যই

বলল—"জগতে প্রেম হচ্ছে সেরা জিনিস। সংসারের পক্ষেও তা যেমন উত্তম কাব্যের পক্ষেও তা-ই। নর-নারীর সম্পর্ক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়েই আসে।"

"কাব্যও কি এমনই জিনিস যে যা কিছু লেখো সেটা সুন্দর হওয়া চাই, তাই না দাদা? কী বল পরমেশ্বর?"—বলে সে হেসে ফেলল।

নারায়ণ রাওয়ের মনে কোনো দ্বিধা এলে শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে আলোচনা করে সে সেটাকে বিশদভাবে বুঝে নেয়।

সে হাসতে হাসতে পরমেশ্বরকে বলল, "নর-নারীর মধ্যে প্রীতির উৎপত্তি স্বাভাবিক। তাকে আমরা আমাদের জীবনে স্বাভাবিক করে নিই। সেইজন্য আজকাল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসা হওয়াটাই যেন অস্বাভাবিক।"

আলোচনাটা রুশ দেশের প্রসঙ্গে চলে গেল। "প্রকৃত প্রজাতন্ত্র হচ্ছে বলশেভিজম্। সম্পদ সকলের সমান হতে হবে। অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ সরকারের। জনসাধারণ নিজের নিজের পেশা অনুসারে কাজ করবে। তাদের যথাযোগ্য বেতন টাকায় না দিয়ে টিকিটের রূপে দিতে হবে। ওই টিকিট গুলির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পাওয়া যাবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে খাদ্যসামগ্রী বেশি নেই, তাহলেও সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটায় একটা সমতা আনা যেতে পারে।" নারায়ণ রাও বলল।

পরমেশ্বর—মনের উৎসাহে কাজ করতে পারব না, কারণ খাওয়াটাই কেবল পাওয়া যাবে। বড় বড় কাজে প্রেরণা আসবে কোথা থেকে?

নারায়ণ রাও—কেন আসবে না? কী বোন? তুমিই বলো? ইদানীং তুমি তো বলশেভিজম্ সম্বন্ধে বহু বই পড়েছ।

শ্যামসুন্দরী—বড় কাজের লোকেদের বেশি টিকিট দেওয়া হবে। ইংলণ্ড প্রভৃতির মতো অভিজাত দেশেও কি জ্ঞানীগুণীরা শুধুমাত্র অর্থের আশায় মহৎ কাজ করে থাকেন? তাঁদের উৎসাহ হচ্ছে স্বাভাবিক। খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাও থাকে। রুশদেশে সে সব এখন কি কিছু কম আছে?

নারায়ণ—বেশ বলেছ।

পরমেশ্বর—কিন্তু বোন, একটা কথা চিন্তা করো। কোনো না কোনো সময় বলশেভিজম্ ধ্বংস হবে। স্বার্থ হচ্ছে মানুষের স্বভাবের দোষ। ফলে লুকিয়ে চুরিয়েও মানুষ অর্থসঞ্চয় করবে। এ ধরনের বহু কেস রুশ দেশে ধরা পড়েছে।

শ্যামসুন্দরী—তাই যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে দেশের সম্পদ ভাগ হওয়া ভালো।

নারায়ণ—যৌথ পরিবারের মতো!

পরমেশ্বর—আরে বাঃ, পৃথিবীকে জয়েন্ট ফ্যামিলি করবে? বলশেভিজম্ একটি দুটি দেশে থাকাই যথেষ্ট। সারা পৃথিবীকে এক রাজ্য হতে হবে?

শ্যামসুন্দরী—কিন্তু স্তালিন, ট্রটস্কি প্রমুখ বলেন যে সমগ্র বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। সমস্ত সম্পদ একত্র করে জনসংখ্যা অনুসারে ভাগ করা হবে। কোন্ দেশে কত সম্পদ সৃষ্টি হয় তার হিসেব করা, প্রয়োজনমত উৎপাদন করা এবং সবকিছু সমস্ত দেশগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া! এইভাবেই সমস্ত শস্য ভাগ করা হবে। খনিজ দ্রব্যও ভাগ করে দেওয়া হবে। সব শাস্ত্রজ্ঞানে থাকবে সকল দেশের সমান অধিকার।

নারায়ণ—ভগবানকে জানার জন্যেও সকলকে সমান অধিকার দেওয়া উচিত।

পরমেশ্বর—তোমাদের দুজনের স্বপ্ন খুব চমৎকার। তাহলে সাদা চামড়ার লোকরা কালা আদমীদের তাদের কাছে আসতে দেবে? চীন-জাপানে যুদ্ধ হবে না?

শ্যামসুন্দরী—দাদা, আপনি কী যে বলেন! পৃথিবীতে বলশেভিজমের প্রচার হতে বহু যুগ লেগে যাবে। ধনিকদের হাতে যতদিন শক্তি থাকবে তারা তাদের অধিকার ছাড়বে না ঠিক। কিন্তু পৃথিবীতে সংখ্যায় কারা বেশি? কুলি-মজুররা নয়? গরিবরা এক হলে ধনিক বণিকরা কী করবে?"

রোহিণী—বন্দুকের সামনে আমাদের দেশের তেত্রিশ কোটি মানুষ কী করছে?

শ্যামসুন্দরী—পৃথিবীতে বন্দুক ধরনেওয়ালারা সব গরিব। রুশদেশে তারা যখন জেগে উঠল বণিক আর জমিদারদের রাজত্ব তখনই খতম হল।

পরমেশ্বর—অর্থের কী গুণ বলছি, শোনো। ধনীরা পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে দেশেরও বহু উপকার করে। তাদের জন্যই দুনিয়ার সব জিনিস তৈরি হয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানিতে এই রকমই হচ্ছে। লোহা তেল প্রভৃতি জিনিসের সম্রাট, রাজাধিরাজ—এইসব হবার ফলেই জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে।"

শ্যামসুন্দরী—তোমার যুক্তি ভুল দাদা।

নারায়ণ, "১৯১৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হল, সারা পৃথিবী জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে বলে মনে হল। কিন্তু আমেরিকানরা সোনা এনে এনে ইউরোপে ছড়িয়ে দিল। ফলে সেখানকার যুদ্ধশ্রান্ত লোকরা ভাবল 'আমাদের অবস্থা ভালই।' কিন্তু সেই ভাল অবস্থার আসল রূপটা কী ছিল? আমেরিকা ধার দেওয়া বন্ধ করল। কোটিপতিদের কোটি শূন্যে মিলিয়ে গেল। ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা এল। তখন মনে হল বুঝি ব্যবসায়ীরা সব দেউলে হয়ে যাবে। যাই হোক, কুলিমজুররা এগিয়ে এসে শাসনক্ষমতা হাতে নিতে গেল ইটালি, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। কিন্তু কুলিরা এখনও সাফল্য লাভ করে নি। কোটিপতি এবং অর্থবান লোকরা একতাবদ্ধ হতে আরম্ভ করল। ফ্যাসিবাদের নীতি অনুসারে একনায়কত্বের শাসন তারা চালু করল। এখন থেকে সব দেশের অবস্থাই দাঁড়াবে এইরকম।

"পৃথিবীতে বাস্তবিক কোন্ জিনিসের অভাব আছে? এদিকটা একটু ভেবে দেখো! প্রয়োজনমত জিনিসপত্র তৈরি হচ্ছে ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারটা যদি সুষ্ঠুভাবে হয় তাহলে সমস্ত মানুষই স্বচ্ছন্দে তাদের খিদে মেটাতে পারে কিন্তু কোটি কোটি মানুষ দুমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে। ঠিকমত ভাগবাঁটোয়ারার ব্যবস্থা নেই বলেই এই ঘাটতি। পুঁজিপতিদের দ্বারা এ কাজ কোনো কালেই হবে না।"

শ্যামসুন্দরী—কয়েক কোটি মজুর বেকার রয়েছে। এদের অন্নসংস্থান হবে কী করে?

রোহিণী—আমাদের অন্ধ্রে জমিদার-রায়তদার সম্পর্কও তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

পরমেশ্বর—হ্যাঁ, বোন, কিন্তু সব জমিদারই কি খারাপ? কিছু দয়াশীল জমিদার কি নেই?

নারায়ণ—১৯০৮ সালের আগে জোর জবরদস্তি করে চাষীদের কাছ থেকে বেশি বেশি খাজনার কথা লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি এমন বহু জায়গার কথা জানি যেখানে তিরিশ টাকা করে খাজনা। হাজার হাজার কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেছে। আমার শাশুড়ীর এক ভাইপো জমিদার। তার জমিদারি হচ্ছে খারাপের চেয়েও খারাপ। খাজনা দিতে না পারার দরুণ কত

চাষী জেলে পচছে। অনেকের জমি বিক্রি হয়ে গেছে। রায়তওয়ারি গ্রামের অবস্থাও এর চেয়ে কিছু ভাল নয়। এই সমস্ত জমিদারদের পূর্ব-পুরুষদের সময় অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না।

পরমেশ্বর—ফসল কম হওয়ার জন্য টাকাপয়সার অভাব হলে খাজনা কম নেয় না কেন? জমিদার প্রজার কাছে পিতার মতো, তাঁরা কিন্তু নিজের পিতৃত্বকে পৈশাচিকতায় বদলে ফেলছেন।

রোহিণী—কৃষকদের জন্য প্রাণ দিতে পারেন এমন জমিদারও অনেক আছেন। তাদের মঙ্গলকে তাঁরা নিজেদের মঙ্গল বলে মনে করেন। আমার বাবার এই ধরনের এক বন্ধু আছেন।

পরমেশ্বর—আর নারায়ণ রাও এর শ্বশুরমশাই? তাঁর জমিদারি দেখলেও মনে আনন্দ হয়। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন। গরিব চাষীদের ওপর সেখানে অত্যাচার হয় না। সার্ভে করা হয়েছে। সরকারী কৃষকদের মতো কখনো কখনো তাদের অধিকারপত্রও দেওয়া হয়। কর্মচারীরা যাতে ঘুষ না নেয় তার দিকেও নারায়ণ রাওয়ের শ্বশুরের নজর আছে। তাঁকে প্রণাম জানায় না এমন চাষী তাঁর জমিদারিতে নেই।

শ্যামসুন্দরী—হ্যাঁ, শোনো নারায়ণদা, তুমি কি বৌদিকে দেখাবে না? দাদা বলে যে তিনি খুব সুন্দরী

পরমেশ্বর—খ্রীষ্টমাসের পর তিনি এখানে থাকবার জন্য আসবেন।

রোহিণী—আচ্ছা। দাদা, আগে বল নি কেন?

নারায়ণ—বলব বলব করছি এমন সময় পরম বলে ফেলল।

এর মধ্যে মঙ্গপতি রাও সেখানে এল। নারায়ণ রাওকে দেখে একটু মৃদু হেসে সে একদিকে চলে গেল।

মঙ্গপতি রাও বলত, "গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ হচ্ছে মেয়েছেলেদের আন্দোলন। শক্তিহীন আমরা, ওই অহিংস আন্দোলনের চক্রে আরও অক্ষম হয়ে পড়বো।" এই ছিল ছেলেটির বক্তব্য "অনেক বুদ্ধিমান ছেলে আছে। সঠিক পথ দেখান, বোমা তৈরি করব। রিভলবার চালাব, যুদ্ধ করে দেশ জয় করব।" তারা বলে।

"সঠিক রাস্তার অভাবে এরা ভুল পথে যাচ্ছে। আপনি ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রের

খবরই শুনছেন। মহাত্মাজীর চিন্তার খবর এরা কী করে জানবে? এর মনকে ধীরে ধীরে বদলাতে হবে। তা না হলে একদিন রাত্রে কোথাও চলে যাবে। যদি ফাঁসিতে চড়ার জন্যও তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না।" নারায়ণ রাও বলল।

বাড়ি গিয়ে সে তার এক শিল্পী বন্ধুর একটি ছবি বার করে দেখল।

হাজার হাজার নরনারী দানবিকতায় মেতে উঠেছে। নারী শিশুরা পদদলিত হয়ে পিষে মরছে মহাশক্তির মতো যন্ত্র চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এই ধরণের ছবিকেও শিল্পী কী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এঁকেছে।

বর্ণ, রেখা, পরিমিতিবোধ সমস্ত শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সঙ্গে লীন হয়ে গেছে।

শিল্পী বাস্তবিক প্রতিভাবান। একটি রেখার আঁচড়ে এবং একটি মাত্র রঙের দ্বারা সে কতখানি চিত্রায়িত করেছে। ছবিটির মধ্যে এমন একটি গভীরতা প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধি যার নাগাল পায় না।

ছবিটিকে সে একাগ্রতার সঙ্গে দেখতে লাগল। অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে ছবিটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে স্থাণু হয়ে রইল।

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

১। স্বামীই গুরু

খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে নারায়ণ রাও সস্ত্রীক মাদ্রাজ এল। সে মইলাপুরের বাসা ছেড়ে একশো টাকা ভাড়ায় একটা বড় বাড়ি নিল। বাড়িটার চারিদিকে বাগান ছিল।

পরমেশ্বরের বৌ-এর প্রসবের ব্যবস্থা সে মাদ্রাজেই করে দিয়েছিল। মাদ্রাজবাস শুরু করার সময়ই সে রান্নার কাজে গুণ্টুরের এক নিয়োগী ব্রাহ্মণীকে আনিয়ে নিয়েছিল। আগে সে পূর্ব গোদাবরী জেলার জনৈক সরকারী কর্মচারীর বাড়িতে কাজ করেছিল। মনটা বেশ ভাল। মাসিক পনেরো টাকা মাইনে আর বছরে চারখানি কাপড় দেবার শর্তে নারায়ণ রাও তাকে রেখেছিল। ভাল দিন দেখে খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে শারদাকে আনবার জন্য সূর্যকান্তম্ আর সুব্বারায় গেলেন। জমিদার তাকে অলংকার আসবাব পত্র থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য জিনিস দিলেন। মাদ্রাজ পাঠাবার জন্য বহু জিনিস রাজমহেন্দ্রবরমেও রাখা হয়েছিল।

লঞ্চ এবং মোটরে তারা কোত্তাপেট পৌঁছলেন। স্ত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণ রাওয়ের হৃৎস্পন্দনও বেড়ে গেল। রাত্রে ঘরে ঢুকতেই সে মধুর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইল। পত্নী কিন্তু ভাবলেশহীন।

নিরুৎসাহ নারায়ণ রাও চুপচাপ পালঙ্কের কোলে আশ্রয় নিল।

শারদার মাদ্রাজ আসার দিন থেকেই সে চিন্তা করতে লাগল কীভাবে তার সঙ্গে কথা বলা যায় আর কেমন করেই বা তাকে পড়ানো সম্ভব হতে পারে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। নিজে পড়ানো দূরে থাক, শারদা আর সূর্য-কান্তমকে পড়াবার জন্য সে হিন্দু উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভাস্কর মূর্তি শাস্ত্রীকে নিযুক্ত করল। দুজনেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোক এই ছিল তার কামনা।

শ্যামসুন্দরী দেবী তার বোনকে নিয়ে নারায়ণ রাওয়ের বাড়ি দেখতে এল। নানারকম ফলফুলুরি আর বৌ-এর জন্য শাড়ি সিঁদুর প্রভৃতি তারা সঙ্গে এনেছিল।

সূর্যকান্তম আগেও শ্যামসুন্দরীর বাড়ি গেছে। দুজনের ভাবও হয়ে গিয়েছিল। কখনো সে তাকে শ্যামাদি, আবার কখনো বা 'ডাক্তারদি' বলে ডাকত। "আমরা সবসুদ্ধ আট ভাইবোন"—সে বলত, শ্যামসুন্দরীর মাকে বলত মাসিমা।

নারায়ণ রাওয়ের চার বোনের জন্মদিনে, কিম্বা অন্য কোনো অছিলায় প্রায়ই নানা রকমের উপহার তাদের দিত।

ওদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক যে কী শারদা তা ঠিক বুঝতে পারে নি। ওদের দেখে সে একটু নাক সিঁটকাল। শ্যামসুন্দরী ভাবল শারদা লাজুক। তাই সে তাকে 'শারদা বৌদি' 'ছোটবৌদি' প্রভৃতি সম্বোধনে ঘনিষ্ঠভাবে ডাকতে আরম্ভ করল।

"কী বৌদি, মা ভাল আছেন তো?"—নলিনী প্রশ্ন করল।

শারদা উত্তর দিল, "হ্যাঁ আছেন।"

সস্নেহ কথাবার্তার পর তারা সব চলে গেল।

মাদ্রাজে স্বামীর জীবন শারদার কাছে বিচিত্র বলে মনে হত। সকালে সে ডনবৈঠক দেয়, মুগুর ভাঁজে। ব্যায়ামের ঘণ্টা খানেক পরে ঠাণ্ডাজলে স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে, খদ্দরের পোশাকে সজ্জিত হয়ে মুখে জলন্ত সিগারেট নিয়ে পড়ার ঘরে বসে। ওখানে সে আপীলের কাগজ পত্র তৈরী করে। কয়েকজন ধনী লোকের কেস শ্বশুরমশাই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দাদা, শ্রীনিবাস রাও আর বাবাও প্রায়ই আপীল পাঠান। সব সময়ই নারায়ণ রাওয়ের প্রচুর কাজ থাকে। আপীলের জন্য যেসব মক্কেলরা আসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গাড়ি নিয়ে সিনিয়ার উকিলের ওখানে চলে যায়। দশটার সময় ফিরে খেয়ে নেয়। তারপর প্রথামত পোশাক পরে সোজা আদালতে চলে যায়।

কয়েক মাসের মধ্যেই নারায়ণ রাও নির্দিষ্ট লোকদের কাছ থেকেই মাসে দুশো টাকার মতো রোজগার করত। বড় বড় মামলায় কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে সিনিয়র উকিলের কাছ থেকেও একশো দেড়শো টাকা এসে যেত।

আদালতের কাজ সেরে সে বাড়ি ফিরত। সূর্যকান্তমকে ঘণ্টাখানেক পড়াত। তারপর স্নানাদি সেরে বেশবাস করতে করতে কোনো না কোনো

বন্ধুর আবির্ভাব হত। হয় তাদের সঙ্গে নয়তো একলাই গাড়ী নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়ত সে। পরমেশ্বর মূর্তি এলে তার সঙ্গে থাকত। বহুবার সূর্যকান্তম্ আর শারদাকে গাড়ী নিয়ে বেরুতে বলে নিজে পায়ে হেঁটে সমুদ্রের ধারে-বেড়াতে চলে যেত। পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে এলে তৃতীয়বার স্নান করার অভ্যাস তার ছিল।

শারদার মাদ্রাজ আসার দশদিন পরেই জমিদারমশাই মেয়েকে দেখতে এলেন। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় তিনি শারদাকে বলে দিয়েছিলেন যে জামাই সেরা বিদ্বানদের চেয়েও বুদ্ধিমান এবং সে নিজে তাকে পড়াবে। সেইজন্য জমিদার জামাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শিক্ষক রাখলে কেন? তুমি পড়ালেই তো ভাল হত।"

—আমি সময় পাই না। তবে সময় পেলেই পড়িয়ে থাকি।" কথাটা বলে মনে বড় কষ্ট হল।

একদিন নারায়ণ রাও সূর্যকান্তমকে বলল, "তোর বৌদিকেও পড়তে আসতে বল!" সূর্যকান্তম শারদাকে ডেকে আনল।

শারদা শ্বশুরবাড়ি যেতে অনিচ্ছুক ছিল। যাবার সময় তার খুব দুঃখ হয়েছিল। বাবার কথা সে কখনো অমান্য করে নি। তার ভাই কেশবচন্দ্র যখন বলল "যা, জামাইবাবুকে নয়তো নিয়ে আয়।" কী জানি কী ভেবে চোখ দুটো তখন তার ছলছল করে উঠেছিল। মায়ের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। পিসির মনটাও ভারি হয়ে উঠেছিল। জমিদার কাছে ডেকে বলেছিলেন, "ওরে মা, মেয়েরা জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ঘরের মানুষ হয়ে যায়। তুই লেখাপড়া শিখেছিস। তোকে এসব আর কী বলব, যা মা তুই মাদ্রাজে থাক গিয়ে! আমি তোর শ্বশুরকে বলে দিয়েছি। আনন্দরাও আর তার বৌ ছেলেমেয়েরা ওখানে আছে। বোনকেও লিখে দিচ্ছি সে যাতে তোকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে।"

একদিন না একদিন শ্বশুরবাড়ি যে যেতেই হবে তা সে-ও জানত। স্বামীর সঙ্গে না থাকার কথা সে কোনোদিন ভাবেনি। স্বামী যদি কাছে না আসে তা হলেই যথেষ্ট। সে স্বামীর কাছে গেলে স্বামী যদি ভালবাসা দেখায় তা হলে সে বাঁচবে কী করে? ওয়েলসের একটা উপন্যাস সে পড়েছিল। নায়িকা তাতে নিজের জীবন প্রেমের জন্য উৎসর্গ করেছিল। সে নিজে কি

তাহলে কাউকে ভালবাসে? জগন্মোহন রাওয়ের সঙ্গে সে প্রেমে পড়ে নি তো? এটা খুব পরিষ্কার কথা যে জগন্মোহন রাও তাকে একসময় খুবই ভালবেসে ছিল। প্রেমের মানে কী? পুরুষকে দেখলে বা তার কথা শুনলে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া তো? সে কি কারো সঙ্গে এভাবে প্রেম করেছে? জগন্মোহন রাওয়ের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। তাকে খুশি করার আপ্রাণ চেষ্টা করত মা বাপ ভাইয়ের প্রতি তার কি ওই ভাবটা নেই? আসল কথা হল এই যে সে কোনো পুরুষকেই চায় না। স্বামী শিক্ষিত। গাঁইয়া নয়। কার্যতঃ সে অন্যের কোনো ব্যাপারে নাক গলায় না। সে দয়ালু। যে তাকে দেখে সেই প্রশংসা করে। কিন্তু সেইজন্য সে কি তার কাছে ভালবাসা—যা সে দিতে অনিচ্ছুক, চাইবে? অশৈশব পালিত বাগান আর গোদাবরীর মুক্ত বাতাসের কাছ থেকে এবার সে বিদায় নেবে। আদরের ভাইও আর অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করবে না। এইসব চাকর বাকর বন্ধুবান্ধব সব পেছনে পড়ে থাকবে। কী থাকবে? শিক্ষিত লোকরাও কি এই ভাবেই চিন্তা করে?

শ্বশুরবাড়িতে শারদা মাত্র দশদিন ছিল। তারপর তাকে মাদ্রাজে যেতে হল। স্বামীর সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে সে এল। সকলেই তাকে ভালবাসে। পথে সব রকম সুবিধাই ছিল। কোনো ব্যাপারে, কোনো কারণেই নারায়ণ রাও তার কষ্ট হতে দেয়নি।

তার স্বামী তাকে ডাকছে একথা সূর্যকান্তম এসে বলতেই তার হৃদয়-স্পন্দন যেন কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। সে আশ্চর্য হল। নারায়ণ রাওয়ের কাছে গিয়ে দোতলায় একটি ঘরে সে সূর্যকান্তমের পাশে বসে পড়ল। নারায়ণ রাও তাকে পড়াতে আরম্ভ করল।

কোথা দিয়ে যেন একটা ঘণ্টা কেটে গেল। শারদা তন্ময় হয়ে গেল। সুধাকণ্ঠ নারায়ণ রাও তাকে এমন অমৃত পান করাল যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। বুঝিয়ে দেবার পর নারায়ণ রাও শারদাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। প্রথম প্রশ্নের উত্তর ভয়ে দিতে পারল না। ভয় একটু কমতেই সব প্রশ্নের উত্তর সে দিল।

"এইবার যেতে পারো!"—ছুটি দিয়ে নারায়ণ রাও নীচে চলে গেল।

এমন পড়ার অভিজ্ঞতা শারদার কখনও হয় নি। পাঠ্য বিষয় সে খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিল। নারায়ণ রাও বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়িয়েছিল। এর আগে কেউ এত ভাল করে বুঝিয়ে পড়ায় নি।

—দেখলে বৌদি, দাদা কত সুন্দর পড়ায়। পরীক্ষায় আমি নিশ্চয় পাশ করব। আমার আর তোমার পরীক্ষা এক সময়ই হবে।

—সুরী, পড়া এবার আমিও খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছি।' শারদার মন সেদিন আনন্দে ভরপুর ছিল। সে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বুঝতে দিলে চলবে না যে নারায়ণ রাও তার বৌকে ভালবাসে। সবকিছু যথারীতি চলতে থাকুক। প্রাণের প্রতিমা ঐ মেয়েটির জন্যই যে তার জীবন, একথা সে কী করে প্রকাশ করে? আর বলার প্রয়োজনই বা কী?

এই প্রেমিক মানুষটিকে দেখেই শারদা ভীত হয়েছিল? এর মধ্যে কী রয়েছে যা তাকে এভাবে টানছে? সৌন্দর্য হতে পারে। শ্যামসুন্দরীর সৌন্দর্য শারদার চেয়ে কম নয়। মনটা তার শারদার চেয়ে ভাল, সে ভাবুক। সে সুশিক্ষিতা। সে যদি কারো সঙ্গে প্রেম করতে চায় তাহলে আত্মসমর্পণ না করে তার উপায় থাকে না। তবু সে তো তার মধ্যে এইরকম প্রেমের আবেগ সৃষ্টি করতে পারে নি। তা হলে শারদার মধ্যে কী আছে?

শারদা মাদ্রাজে আসার পর থেকেই শ্যামসুন্দরীর কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। "ওদের দুজনের সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ? কেন শারদা ওর বৌ হয়েছে?" কী এক সৌভাগ্যের ফলে সে হয়েছে পত্নী আর শ্যামসুন্দরী বান্ধবীই থেকে গেছে। কলেজে এসে শ্যামসুন্দরী একটা চেয়ারে বসে ছিল। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিনরাত পড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে। পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে পড়ত আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নারায়ণ রাওকে দেখত।

নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা তার কী করে হল তা সে নিজেই ভেবে পায় না। সে নারায়ণ রাওয়ের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে নি তো। যদি তা হয়ই, তাতেই বা কী? তার মতো পরিপূর্ণ একটি মানুষের প্রেমে পড়ার চেয়ে দামী জিনিস জগতে আর কী থাকতে পারে? সেই পরাধীন অন্তর থেকে ভালবেসে আনন্দ লাভ করার সুযোগ তার নেই। এ কথাই সে ভাবতে থাকে।

শৈশব থেকেই শ্যামসুন্দরীর ভাবুক মন। সে যেন ভক্ত। মানুষের সেবার জন্যই সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সরোজিনী দেবী আর কস্তুরীবাইয়ের মতো দেশের জন্য জীবন দেবার আকাঙ্ক্ষা তারও ছিল। সময় পেলেই সে নিজেও চরখায় সুতো কাটত বোনদেরও সঙ্গে নিত।

ডান হাতটি বুকের ওপর রেখে চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে সে ভেবেই চলেছিল।

স্বামীই শারদার গুরু হলেন। তার পড়ানোর পদ্ধতির কথা স্মরণ করে পুলকিত শারদা চোখ বুঁজে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবনার কত মধুর তরঙ্গ তাকে কোন্ এক স্বপ্নলোকের দিকে নিয়ে চলল।

২। বাবলী

রুক্মিণীর প্রসবকাল ঘনিয়ে এল, মাস পুরো হয়ে এলো দেখে নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর রাজারাওকে নিয়ে এল। পরিচিতা এবং অভিজ্ঞ একটি ইউরোপীয় নার্সকে রাজারাও নিযুক্ত করল। সবরকম সুব্যবস্থা করে শ্যাম-সুন্দরীকে প্রয়োজনমত সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে সে ফিরে গেল।

রুক্মিণী একটি কন্যার জন্ম দিল। পরমেশ্বর মূর্তিমন আনন্দে ভরে উঠল। মেয়েটি বেঁচে থাকলেই তার জীবন সার্থক। শিশুদের সে যত ভালবাসত ভগবানও তাকে সন্তানহীন রেখে তত কষ্ট দিয়ে এসেছেন।

"আমাকে বাঁচানোর জন্যই কি তুমি পায়ে হেঁটে এসেছ ?
আমার মা, ও মা—
বনজনয়না, হিমগিরি তনয়া, জননী আমার !
নীল-জ্যোতি যে আজ বিশ্বে প্রকাশমান।"

বাৎসল্যরসস্রাবী একটি শাক্ত পদের কয়েককলি সে গেয়ে উঠল। মেয়ে বেশ সতেজ, মোটাসোটা।

"পরমেশ্বর, তোর মেয়ে মলয়মারুত রাগে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। মনে হয় খুব জোর গাইয়ে হবে। ঠিক তোরই মতো। জন্মক্ষণটাও ভালো। কোনো খুঁত নেই"—নারায়ণ রাও বলল।

মেয়েটিকে দেখে শারদা খুব খুশী হল। "রুক্মিণীদি, ভগবান আপনার মেয়েকে কী সুন্দর গাল দিয়েছেন।"

"আমার বোনঝির গাল সইয়ের মত," সুরী বলল।

"ও ভাই, এর কী নাম রাখবে? বড্ড দুষ্টু মনে হচ্ছে।" নারায়ণ রাওকে দেখে তার বড় মাসির মেয়ে রুক্সারম্মা বলল।

"বাবলী নাম রাখুন," রুক্মিণী পাশ ফিরতে ফিরতে বলল।

দশদিন পর রুক্মিণীকে স্নান করানো হল। মেয়েটি দিনে দিনে বাড়তে লাগল। রোহিণী তার জন্য ছোট ছোট জ্যাকেট সেলাই করিয়ে এনেছিল। রুপোর চামচ আর ঘটিও উপহার দেওয়া হল।

রোহিণী এলেই রুক্মিণীর মনটা বিগড়ে যায়। তার স্বামী হয়ত বা তার সঙ্গে প্রেম করছে, এই সন্দেহ তার মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। রোহিণী তার চেয়েও সুন্দরী। কানাঘুষার মধ্য দিয়ে সে জানতে পেরেছিল যে মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামী প্রায়ই কথাবার্তা বলে থাকে। শ্যামসুন্দরী আর নারায়ণ রাও যে পরস্পরের বন্ধু একথাও সে শুনেছিল। তাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহও সে করত না। সে জানত যে তার জন্য নারায়ণ নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারে। হৃদয়টা ছিল তার প্রেমময় এবং যে কোনো নারীর উপলক্ষ্যে তা উচ্ছলিত হয়ে উঠতে পারে।

স্বামীর প্রেমে একাধিপত্য করার উপযুক্ত সৌন্দর্য যে তার নেই তা সে বুঝত। তার স্বামী যে দু-একবার পথভ্রষ্ট হয়েছে তা-ও তার অজানা ছিল না। কিন্তু সে কাউকে কিছু বলে নি। মনে মনে দু হপ্তা যন্ত্রণা সয়েছে। পরমেশ্বর তা লক্ষ্য করেছিল। অগ্নিসাক্ষী করে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল তা ভঙ্গ হওয়ায় সে অনুতপ্ত হয়েছিল। সবকিছু তার কাছে অন্ধকার মনে হয়েছিল। সেইজন্য সে পত্নীর পা ধরে চোখের জল ফেলেছিল।

তবু সে দু-হপ্তা যন্ত্রণা ভোগ করল। আহারে নিদ্রায় সবকাজে অনুতপ্ত পরমেশ্বরকে সে দেখতে পেল। স্বামীর ভালবাসা তার মনোকষ্টকে দূর করল। একদিন সে স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, "প্রতিজ্ঞা করো যে এমন কাজ আর করবে না।" ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে পরমেশ্বর প্রতিজ্ঞা করল। "রুকু, সত্যিই আমার মধ্যে দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। আমি মনের দিক থেকে দুর্বল। যাই হোক, এই ধরনের ভুল আমি দুবার করেছি। আমি বলি না

যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সত্যিই সৎ চরিত্রা। যে নিয়মের ফলে তুমি আর আমি স্বামী-স্ত্রী হয়েছি সেই নিয়মেরই দোষ। কী করি বল? আমার মতো মানুষের জন্ম হচ্ছে পরিবেশকে কলুষিত করার জন্য। তোমার পবিত্র জীবনে আমি একটা কলঙ্কের মত।" তার চোখ দুটি অশ্রুতে টলটল করে উঠল।

স্বামীর দুঃখ রুক্মিণী সইতে পারল না। বাঁধভাঙা নদীর মতো তার করুণা-ধারা উপচে উঠল। সে স্বামীর গললগ্ন হল। সেদিন থেকে দুটি শিশুর মতো তারা প্রেমপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছিল। এইসব কথা সিনেমার ছবির মতো এক এক করে রুক্মিণীর মনের সামনে দিয়ে গেল ভেসে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে নিজেকে সামলে নিল। মেয়ের সম্বন্ধে রোহিণী সরলা আর নলিনীর সব প্রশ্নের উত্তরই সে হাসিমুখে দিয়ে চলল। মেয়েটিকে সূর্যকান্তম্ সব সময় কোলে নিয়ে থাকত। "বৌদি, একে আমার পায়ের উপর শুইয়ে দাও। তুমি নাইয়ে দাও। আমি মুছিয়ে দিচ্ছি। দেখো, কেমন হাসছে।" এই রকম কিছু বলে সে আনন্দের স্রোতে ভাসত।

রুক্মিণী—মেসো ভাবছে মাসি কবে এসে পড়বে। তাই বুঝতে পেরে ও হেসে ফেলেছে।

সূরী—বৌদি ঠিক আমার মায়ের মতো।

রুক্মিণী—তীরটি ছাড়লে তো!

সবাই হেসে ওঠে। শারদা স্তব্ধ হয়ে গেল। তার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। স্বামীর প্রতি সূরীর কত প্রেম। সর্বদা স্বামীর পথ চেয়ে আছে। সব সময় তাকে চিঠি লেখে। সূরী তার ঘরে স্বামীর ফটো সাজিয়ে রেখেছে। চন্দনের বাক্সে তার চিঠিগুলো কত যত্নে সে তুলে রেখেছে। সেগুলো বের করে কতবার তাকে পড়তে দেখেছে শারদা।

নিজেদের বাড়িতেই সে পরমেশ্বর মূর্তি আর তার স্ত্রীকে আনন্দময় জীবন যাপন করতে দেখেছি। যে শারদা আগে ভাবত যে জমিদার স্বামীস্ত্রীর মধ্যেই কেবল দাম্পত্য প্রেম থাকা সম্ভব, এদের দেখে সেই শারদাই জানতে পারল অন্যান্য পরিবারের মধ্যে এমন প্রেম থাকে, যা জমিদারের বাড়িতে সম্ভবই নয়। শারদা যে দিন মাদ্রাজ এল তারপরের দিন আনন্দরাও এবং তাঁর পত্নী প্রমীলা দেবী তার কুশল জানার জন্য মোটরে এলেন। শারদার

দেহে প্রাণ এল। প্রমীলা দেবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেললেন। তিনি তাকে বললেন, "মা, বাপের ভুলের জন্য তোকে দুর্ভোগ পোহাতেই হবে।"

শারদার মনে তৎক্ষণাৎ "কী দুর্ভোগ ভুগছি?" এই প্রশ্নের উদয় হল। মৃদু হেসে সে বলল, "কী দুর্ভোগ?" নারায়ণ রাওয়ের বিয়ের পর দুবছর কেটে গেছে। কিন্তু একবারও আনন্দ রাওয়ের বাড়িতে যায়নি। সবচেয়ে বেশি আয়ের তেলুগু উকিলদের মধ্যে আনন্দরাও ছিলেন অগ্রগণ্য। তবু তিনি নারায়ণ রাওকে কোর্টেও ডাকেননি আর বাড়িতেও না। নারায়ণ রাও তাঁকে অহঙ্কারী বলে বুঝে নিয়েছিল। শ্বশুর কিলচপাকে এলে তাঁর সঙ্গে নারায়ণ রাওয়ের কাছে আসতেন তিনি, নিজের মামাকে নিমন্ত্রণ করতেন কিন্তু নারায়ণ রাওকে কিছু বলতেন না। জমিদার ভাবতেন যে আনন্দ রাও জামাইকে নিমন্ত্রণ করে থাকে। নারায়ণ রাও আর আনন্দ রাওয়ের আসল ব্যাপার তাঁর অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল। নারায়ণ রাও মাদ্রাজ আসার পরও আনন্দরাও তাকে দেখতে আসেন নি। হাইকোর্টে সে অন্য উকিলদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেও তাঁর সঙ্গে করত না। সে যে লক্ষ্মী সুন্দর প্রসাদের জামাই, এল-এল-বি পাশ করেছে প্রথম হয়ে, অর্থশালী এবং বুদ্ধিমান, 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখে, গান জানে, আবার ছবি আঁকতেও পারে এইসব কথা জেনে তামিল, কন্নড এবং মালয়ালী উকিলরাও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়েছিল। উকিলসভায় সে উপস্থিত থাকলে কোনো ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হলেই লোকে তারই কাছে যেত। তার বুদ্ধির কদর উকিল মহলে ছিল।

আনন্দ রাও এসব দেখছিলেন। আশ্চর্যের তাঁর সীমা ছিল না। যতবড় উকিলই তিনি হোন না কেন, অহঙ্কারের দুর্গভেদ করে কে তাঁর কাছে যাবে? ফলে উকিলদের মধ্যে নারায়ণ রাওয়ের আধিপত্য দেখে তিনি আশ্চর্য হতেন।

আনন্দ রাওয়ের আজ খেয়াল হয়েছে যে নারায়ণ রাওয়ের ওখানে যেতে হবে। মামাতো বোনকে তার স্বামীর বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

৩। প্রকৃত পুরুষ

১৯৩৬ সালে রামচন্দ্র রাও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হল। বি. এস-সি কোর্স তিন বছরের। তাতে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হবার ছমাস পরে বিশ্ববিদ্যালয় এম. এস-সি ডিগ্রি দিয়ে থাকে। তারজন্য একটি পরীক্ষা দিতে হয়। এতে প্রবন্ধ লিখতে হয়। রামচন্দ্র রাও ১৯২৫ থেকে মনোযোগসহকারে ওই প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছিল। এরই মধ্যে সে তিন বছর ধরে হার্ভার্ড আর ম্যাসাচুসেষ্ট রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যুৎ-শক্তি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে আসছিল। আমেরিকায় এই ধরনের বিদ্যালয় অনেক আছে। বিদ্যুৎ শক্তি সম্বন্ধে ঐ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার যথেষ্ট সুনাম এবং সম্মান আছে। লিওনোরাও ওখানে পড়ত। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এডিসন।

রামচন্দ্র রাওয়ের প্রতিভা দেখে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাকে সব রকম সুবিধাই দিয়েছিলেন। উল্লিখিত বিদ্যায় পারদর্শী হতে পাঁচ বছর লাগে। বি. এ. তে যার গণিত ছিল কিংবা যে রসায়নশাস্ত্রের ছাত্র তাকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি করা হত। উত্তীর্ণদের বি. এ. ই. ডিগ্রী দেওয়া হত। দু বছরের পরীক্ষায় রামচন্দ্র রাও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। লিওনোরার সেটা ছিল প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা। প্রবাসে স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ ঘটলে একটা আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। অন্ধ্রবাসীর সঙ্গে যদি বাঙালীরই দেখা হয় তবু তাদের মধ্যে এমনই ঘনিষ্ঠতা জমে উঠবে যা একসঙ্গে বেড়ে ওটা সুহৃদদের মধ্যেও সম্ভব নয়। জার্মানি অস্ট্রেলিয়া অথবা অন্য কোথাও যখন দুজন ভারতীয় মিলিত হয় তখন্ তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায়।

নারায়ণ রাওয়ের মতো বহু ভারতীয় হার্ভার্ড, বার্কলি, নিউইয়র্ক, কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। গুজরাতী ব্যবসায়ীও অনেক ছিল। রাজনৈতিক কারণে বহুলোক ওখানে যেত। এদের যখন পরস্পরের সঙ্গে দেখা হত সেই মুহূর্তেই একটা আত্মীয়তার সৃষ্টি হত।

এমন বহু ছাত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র রাওয়ের পরিচয় ছিল যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঐ দেশে গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকা এবং ভারতের

মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। তাদের মধ্যে আবার অনেকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউই ওয়াকিবহাল ছিল না। গন্দার সিং এবং প্রাণকান্ত বোস নামধারী এই রকম দুজন ছাত্র ছিল। এরা দুজন পড়াশুনা শেষ করে কিছুদিন সেখানে থাকার পর ফেব্রুয়ারিতে ভারতবর্ষে ফিরল। এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনল। তাদের তিন বছরের কারাদণ্ড হল।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে লেখা রামচন্দ্র রাওয়ের চিঠি নারায়ণ রাও পেল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
ফ্রেব্রুয়ারি ১৯২৯

তোর চিঠি পেয়েছি। মনটা তোর খুবই পরিষ্কার। এই তিন বছর একমাত্র তুই-ই আমাকে সাহস জুগিয়েছিস। প্রতি সপ্তাহে তোর চিঠি পাবার আগ্রহ, ভোজনবিলাসীর সুখাদ্যের আগ্রহের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিঠির উত্তর আমিই দেরি করে পাঠাই। আমার টাকার দরকার হলেই তুই পাঠিয়ে দিস। তোর জন্যই কোটিপতির দেশ এই আমেরিকায় আমি আমেরিকানদের মতো থাকার সুযোগ পেয়েছি। এম. এস-সি ডিগ্রা অবশ্যই পাবো ডি-ই-ই ও। তবু শেখার অনেক কিছু বাকি রইল। এই ডিগ্রীগুলি আমাকে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সবে মাত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমার মনে হয় ওখানেই অধ্যাপকের পদ পাব। আমার ধারণার বিরোধিতা কোরো না। টাকা রোজগারের এ পদ আমি মোটেই চাই না; আমি বুভুক্ষুও নই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি বিদ্যুৎ-শক্তি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান চালাতে চাই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা যদি না মেলে তাহলে আমার ইচ্ছা এই যে তুমি চেষ্টা করে অন্তত বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-পরিশোধনশালায় স্থান করে দিও।

সূরীকে লেখাপড়া শিখিয়ে তুমি যে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পাঠাচ্ছ একথা জেনে বড়ই আনন্দিত হলাম। ও যদি পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে বলাই বাহুল্য যে আমেরিকা থেকে আমি তার জন্যে সুন্দর একটি উপহার নিয়ে যাব। আমি ওকে চিঠি দিচ্ছি। আমি এখনো শারদাকে দেখিনি।

ওরা একসঙ্গে পড়ছে জেনে খুশি হলাম। সুরী ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত শিখছে জেনে আমার আনন্দের সীমা নেই।

জুলাই মাসে আমি ইংলণ্ড হয়ে ভারতের পথে রওনা হব। বোম্বাই থেকে কলম্বো পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে বাড়ি পৌঁছব। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুমাস লেগে যাবে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইটালি ঘুরে নেব। কোনো জিনিসের দরকার হলে টেলিগ্রাম কোরো।

তোমার প্রিয়

রামচন্দ্র রাও

বিদ্যুৎ-শক্তি সম্পর্কিত পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। রামচন্দ্র রাও উত্তীর্ণ হল। ডিগ্রীটা ভারতবর্ষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করে আমেরিকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নেবার জন্যে সে বেরিয়ে পড়ল।

রামচন্দ্র আমেরিকা ছাড়ছে দেখে লিওনোরা খুবই দুঃখিত হল। এতকাল সে রামচন্দ্র রাওয়ের কাছেই ছিল। মেয়েটি তাকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে নায়েগারা নিয়ে গেল। পথে একটি নির্জন পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য তারা গাড়ি থামাল।

—রামচন্দ্র, আবার কবে দেখা হবে? তুমি আবার আমেরিকায় আসবে, না আমি ভারতে যাব? তা না হলে আমি হয়তো তোমাকে ভুলেই যাব।

—এ কী নারা, এতটা বিচলিত হয়ো না! তোমার মতো সংযমী মেয়ে আমাদের দেশে প্রায় দেখাই যায় না। তাদের কথা শুধু গল্পের মধ্যেই পাওয়া যায়।

—আমার জীবন নাটকে কেন তুমি একটি চরিত্র হতে গেলে?

—এসে সত্যিই খুব ভাল হয়নি কী? সে তো আমার সৌভাগ্য।

—তুমি এখানে তিন বছর রইলে, আর এই তিন বছর আমার ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তুমি যা করেছ সে যে কত আনন্দের কথা সে আর কী বলব।

—লি, তুমি অমন কেঁপে কেঁপে উঠছ কেন?

—বন্ধু রাম, মহাত্মার নেতৃত্বে ভারত নবজাগরণের বাণী শোনাবে, তোমার এই কথা আমায় প্রাণে সজীবতা এনে দিয়েছে। যত ভাবি ততই যেন মনে

হয় যে ভারত এবং আমেরিকার ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই বিশ্বের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ভারত পুরুষে, এদেশের প্রকৃতিতে, এই দুইয়ের সম্মিলনে বিশ্বে নব চেতনার সঞ্চার হবে।

—লিওনোরা, আজ তোমাকে বিধাতাপ্রেরিত অপ্সরা বলে মনে হচ্ছে। মুখে তোমার স্বর্গীয় দ্যুতি।

সহাস্য বদনে লিওনোরা রামচন্দ্রের পাশে গিয়ে বসল। তার মুখে সে যেন কোন দেবলোকের হাসির সাক্ষাৎ পেল। হাতদুটি দিয়ে রামচন্দ্রের গলদেশ বেষ্টন করল। সে রোমাঞ্চিত হল।

—আমাদের খৃশ্চানদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা তাঁর—উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। হেমেস্ যেমন বলেছেন, মহাত্মা সত্যিই খ্রীষ্টের অবতার। ভগবদ্গীতার বাণী আর পাহাড়ে দেওয়া খ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।

—আমার লিয়ো, আজ পর্যন্ত আমি স্বদেশের গ্রন্থরত্নগুলিকে পড়ে উঠতে পারিনি। প্রথম যেদিন জাহাজে তোমার সঙ্গে দেখা হল সেই দিনই আমার মনে হল যে ভারত আমেরিকা মিলিত হয়ে জগৎকে পথ দেখাতে পারে। ইংলণ্ড এতদিন ভারত শাসন করেও ভারতের মর্মবাণীকে উপলব্ধি করতে পারে নি। ইংরেজ শাসন আমাদের পক্ষে লাভজনক হয়েছে; তাদের আগমনের মধ্যে দিয়ে ভগবান আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছেন।

—আমার প্রিয়তম রামচন্দ্র, সর্বদোষ মুক্ত জীবনই সত্য। এই সত্য পালনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরদর্শন হবে না। এই সত্যব্রত পালনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে প্রেম। আমাকে তুমি রাধাকৃষ্ণনের বই, বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং গান্ধীজীর জীবনচরিত পড়িয়েছ। মানবসেবাই আমার কাছে পরম পবিত্র ও মোক্ষ পথ মনে হয়েছে।

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এল। চোখদুটি অশ্রুসজল। মুখে প্রেমের দীপ্তি। আমেরিকার নামকরা ডাক্তারের সেই কন্যাটি তার বক্ষ লগ্ন হয়ে বলল:

"তুমি আমার গুরু। এপর্যন্ত আমি ব্রহ্মচারিণী ব্রত নিয়ে মানবকল্যাণের কাজে লেগে থাকতে চাইছিলাম। এ জ্বালার প্রেম আমায় ছাড়তে হবে। প্রিয়তম, একবার আমার দিকে তাকাও! সূচনা আর সমাপ্তির আনন্দ

আমাকে দাও। তোমার সঙ্গে আমাকে একাত্ম হতে দাও!" তার অস্ফুট কথাগুলি সন্ধ্যার পরিবেশে মিলিয়ে গেল।

রামচন্দ্র যেন নিস্পন্দ হয়ে গেল। পরক্ষণেই তার শরীর চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের বন্ধনকে সে শিথিল করে দিল।

"প্রভু, তুমি কি আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করবে না।"

দুঃখে তার শরীর যেন অসহ্য জ্বালায় জ্বলছিল। চোখে তার অশ্রুর বন্যা।

"অপূর্ণ কামনায় আমার হৃদয় কি জ্বলতেই থাকবে? তুমি কি আমায় সেবার অনুমতি দেবে না? প্রিয়তম, তুমি কি আমার এই সুন্দর জীবনকে বিয়োগান্ত করে দেবে? তুমি আমার প্রাণের মানুষ হয়ে গেছ।"

রামচন্দ্রের মন গলে গেল। এর মধ্যে কি এত প্রেম? সে কি পাপ করছে না?

লিওনোরা তার আলিঙ্গনকে দৃঢ়তর করল। হৃদয়ে হৃদয়ে সেতুবন্ধন করে মুখ তুলে সে তার মুখে একটি চুম্বন এঁকে দিল।

পুলকে দুজনে শিহরিত হল।

সন্ধ্যার সেই অরুণিমায়, পাখিদের কাকলির মধ্যে সান্ধ্যতারকা খচিত আকাশের নীচে প্রকৃতির সেই রঙ্গভূমিতে বিচিত্র প্রেমের একটি দৃশ্য উন্মোচিত হল।

৪। স্নেহের পবিত্রতা

জমিদার এসে পরীক্ষার জন্য শারদাকে রাজমহেন্দ্রবরম্ নিয়ে গেলেন।

মাদ্রাজ বাসের সময় পড়াশুনার প্রসঙ্গ ছাড়া স্বামীর সঙ্গে শারদা কোন অন্যকথা বলে নি। নারায়ণ রাও-ও শারদাকে অন্য কথা বলে নি। অধ্যাপকরা ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে পড়িয়ে থাকেন সে-ও ঠিক সেই ভাবেই পড়িয়েছিল। শারদা আর সে যদি তাদের প্রেমের তরীকে সেই আনন্দস্রোতে ভাসিয়ে দিত তাহলে না জানি কোন্ কূলে গিয়ে ভিড়ত।

শারদা দেখে নিয়েছিল যে সকলেই নারায়ণ রাওকে স্নেহ এবং শ্রদ্ধার

দৃষ্টিতে দেখে। নারায়ণ রাও যে সুপুরুষ এবং শিক্ষিত, মেয়েরা যে তাকে ঘিরে থাকে, এ-ও সে প্রত্যক্ষ করেছিল। সে যে কেন ঐ পুরুষপ্রবরকে ভালবাসেনি একথা ভেবে মাঝে মাঝে সে বিস্মিত হত। প্রতিদিন নতুন নতুন পড়ার অপেক্ষায় সে থাকত। তার মধুর কণ্ঠস্বরে সে যেন গা ভাসিয়ে দিত।

সুযোগ মত নারায়ণ রাও সূর্যকান্তম এবং শারদাকে জ্ঞাতব্য সাংসারিক বিষয়গুলিও বুঝিয়ে দিত। ফেব্রুয়ারি শেষ হবার আগেই সমস্ত পাঠ্য তাদের আয়ত্তে এসে গেল। পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর কী ভাবে লিখতে হয় তা-ও সে বুঝিয়ে দিল। শত শত প্রশ্নোত্তর সে তাদের দিয়ে করাল।

সে একদিন শারদাকে পড়াচ্ছিল। নিজের পড়া তৈরি করার জন্য সূর্যকান্তম অন্য ঘরে চলে গেল। নারায়ণ রাও তার অনিন্দ্য কণ্ঠে ইংরেজিতে বলতে লাগল,

"শেক্সপীয়র বড় বড় নাটক রচনা করেছেন। উন্নতস্তরে যাদের অবস্থান নয়, পার্থিব এই গুণগুলি তাদের বিষাদমগ্ন করে। এই মূল্যবান বিষয়ে তিনি লিখেছেন, গুণ দুই প্রকার, উন্নত ও নীচ। নিম্নগুণ সম্পন্নরা ধ্বংস হয়ে যায়। এই সার্বজনীন সত্যটির সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। নিশ্চেষ্ট ভালমানুষি যে আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়, তা তিনি তাঁর বিয়োগান্ত নাটক হ্যামলেটের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। হ্যামলেট ভালো লোক। কাকাই যে তার পিতার ঘাতক একথা ভালভাবে না জেনে সে কী করে তাকে দণ্ড দেয়? এই সন্দেহ তার মনে আসা মাত্রই অক্ষমতা তাকে এসে অধিকার করল। ওথেলো সকলকে বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাসই যখন তার পত্নীর ক্ষেত্রে অবিশ্বাস হয়ে দাঁড়াল তখন কেসিওর উপর তার সন্দেহ এবং স্ত্রীর প্রতি ক্রোধ হল। শেষ পর্যন্ত তাকে এবং পত্নীকে মরতে হল। যতবড় সদ্‌গুণসম্পন্নই হোক না কেন, অহংকারী হলে মানুষের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, এত বড় বিখ্যাত নাট্যকারের নাটকও পূর্ণতা পায় নি। পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিল্প কী রূপ মহৎ আনন্দ দেয়? ভারতীয় নাট্যকারদের মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে। কালিদাসের নাটকের কথাই ধরা যাক। এই নাটকগুলির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে দেহমন প্রাণ এবং জগৎকে দেখানো হয়েছে। দুষ্মন্ত হলেন মহারাজা আর শকুন্তলা হল বনকন্যা।

শকুন্তলাকে স্মরণ রাখা দুষ্মন্তের উচিত ছিল। কিন্তু সে ভুলে গেল। পার্থিব সুখের স্বল্প স্বাদের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হওয়া আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর। দুর্বাসা শাপ দিলেন, "ঋষিকন্যা, তুমি তোমার কর্মফলকে ভুলো না।" "আর্যরা বিষয়বাসনার জন্য জন্মগ্রহণ করে না। সেবার জন্যই তাদের জন্ম। আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই তারা বেঁচে থাকে। সেইজন্য মেনকা শকুন্তলাকে নিয়ে গিয়ে কণ্বমুণির আশ্রমে রেখে এসেছিল। আর্য ঐতিহ্য অনুসারে পুত্রের জন্ম হচ্ছে নরকের বাধা অপসারণের জন্য। পিতৃঋণ শোধের জন্য একটিমাত্র পুত্রই যথেষ্ট। দ্বিতীয় অংশে স্বর্গে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন হল। দুষ্মন্ত সে সময় রাজর্ষি এবং শকুন্তলা যোগিনী। বানপ্রস্থ আশ্রমে তাঁরা দুজন সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ময় হয়ে গেলেন।

এই হচ্ছে ভারতীয়দের আদর্শ। কবিতায়, কথায়, অলংকারে এবং জীবনের প্রকাশে কালিদাস ও শেক্সপীয়র কেউ কারো থেকে কম নয়। কিন্তু কালিদাসের মাধুর্য, গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য শেক্সপীয়রের মধ্যে নেই। কালিদাস যদি হন গৌরীশঙ্কর তাহলে শেক্সপীয়র হচ্ছেন ধবলগিরি।"

সবটা বুঝতে না পারলেও স্বামীকে এইভাবে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে দেখে বিস্ফারিত চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধের মতো একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। দিবাশেষের আলোকরশ্মি ঘরের মধ্যে উঁকি মারছিল। পশ্চিম আকাশের রক্তাভ আলো জানালা দিয়ে শারদাকে দেখছিল, প্রেমের জন্য আরাধ্য দেবী বুঝি বা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বলে নারায়ণ রাওয়ের মনে হল।

হঠাৎ যেন একটা উল্কাপাত হল। শারদার মুখটা যেন শ্যামসুন্দরীর মুখের রূপ নিল। তার মনে হল শ্যামসুন্দরী তার সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন। মিষ্টি হেসে সে হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এসে তার উপর ঝুঁকে পড়ল নিঃশ্বাস তার সুঘ্রাণ রক্ত তার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সারা দেহে আগুন ছুটল ওর ঠোঁট দুটি এসে যেন তার ঠোঁটের সঙ্গে মিলিত হল। আর সে যেন তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল। অনন্য অনুভূতির আবেশে সে শয়নকক্ষে চলে গেল।

নিজেকে তার ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের মতো মনে হল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে

বিছানায় গা এলিয়ে দিল। চোখ ছুটি তার লাল হয়ে উঠেছিল। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল।

এ কী কল্পনায়ও কি এই মেয়েটির সতীত্ব নষ্ট হতে পারে? এ যে পাপ, মহা নিন্দনীয় জিনিস সামনে যখন স্ত্রী বসে তখন অন্য নারীর প্রতি আমার মন গেল কেন? নিজস্ত্রীর অনুরাগী হওয়া আমার কি বাঞ্ছনীয় নয়? আমার ইন্দ্রিয়লিপ্সাই কি আমাকে এমন বিচলিত করে তুলল।

ওকে শ্যামসুন্দরী বলে কল্পনা করার মূলে রয়েছে আমার মনের কালিমা।

শ্যামসুন্দরীর চরিত্র ভাল। সেইজন্য সে তাকে স্নেহ করে। পুরুষের দিক থেকে স্নেহ কি পাপ? পুরুষের থেকে অনুচিত? পুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহের সম্পর্ক যখন নিন্দনীয় নয় নারীপুরুষের স্নেহ সম্পর্ক তখন কী ভাবে অপবিত্র হতে পারে? অর্থপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও যদি পুরুষের মধ্যে ভালবাসার কারণ হয় তাহলে সেটা তো খুবই নিম্নস্তরের। নারী এবং পুরুষের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক আরো নিম্নস্তরের হওয়ার কারণ আছে। স্নেহ বস্তুটি পবিত্র বলে গণ্য স্নেহহীন পুরুষ মূর্খ, সে শ্মশানের গাছের মতো। বন্ধুদের মধ্যে যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে হচ্ছে সমুদ্র।

তাহলে নারীপুরুষের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে না কেন? সম্পর্কটা যত ভালই হোক না কেন এবং নারী যত নির্মল হৃদয়েরই হোক না কেন কানা ঘুষো হবেই। লোকে বাঁকা চেখে তাদের দেখে থাকে।

তরুণ তরুণীদের মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয় কেন? শ্যামসুন্দরীর প্রতি আমার মনোভাব কি পবিত্র? আমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে কি যা পবিত্রতার গোত্রে পড়ে না?

৫। বিচিত্রমোহ

গত ছমাস রাজেশ্বর আর পুষ্পশীলা দারুণ মেজাজে ঘুরে বেরিয়েছে রাজ মহেন্দ্রবরম্ থেকে হায়দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে বোম্বাই। তারা সেকেণ্ড ক্লাসেই ভ্রমণ করত আর এমন

কামরা সংগ্রহ করত যাতে মাত্র দুজন যাত্রীর আসন থাকে। এর জন্য অবশ্য স্টেশন মাস্টার এবং গার্ড দুজনকেই দুটাকা দুটাকা করে দিতে হত।

ওরা অজন্তাও দেখতে গিয়েছিল। ডাক বাংলোগুলিই ছিল ওদের আশ্রয়স্থল। রাজেশ্বর চাইত পুষ্পশীলা সব সময় তার সামনেই থাকুক। সব সময়ই ওরা প্রেমানন্দে ডুবে থাকত। ছটা মাস, পুষ্পশীলার মনে হল, একটি মুহূর্তের মতো কেটে গেল। রাজেশ্বর রাও আপ্রাণ চেষ্টায় তার যত্ন-আত্তি করল, সে যেন তার কাছে মহারানী। তার সব দাবি রাজেশ্বর পূরণ করত। ছ মাস ভ্রমণ করে তারা আবার হায়দ্রাবাদ এল। রাজেশ্বর সেখানে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল।

রাজেশ্বরের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় সেখানে ইঞ্জিনীয়ার ছিল। রাজেশ্বরকে সে 'নিজাম সাগরে' দেড়শো টাকা মাসিক বেতনে সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি পাইয়ে দিল। চাকরির গ্রেড আড়াইশো টাকা পর্যন্ত। প্রতিবছর দশটাকা বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা ছিল।

পুষ্পশীলা নিরামিষাশী সুতরাং রাজেশ্বরও মাংস প্রভৃতি ছেড়ে দিয়েছিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে পত্নীকেই অনুসরণ করে চলতে লাগল। সে-ও নিজেকে 'কাপু' নাইডু কন্যা মনে করতে লাগল। ইঞ্জিনীয়ারের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় তারা বাস করতে লাগল।

সুব্বিয়া শাস্ত্রী পাগলের মতো হয়ে গেল। 'স্বাধীন-প্রেম-সংঘকে' সে প্রাণ-ভরে গালাগাল দিল। রাগে সে আগুন হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীকে একেবারে গিলে ফেলতে চাইত সে। রাজেশ্বর রাওয়ের বাড়িতে গিয়ে সে তার বুড়ি মাকে গালাগাল দিয়ে এল। তার চাকরেরাও তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দিল। বাড়ি ফিরে বৌয়ের জিনিসপত্র দেখে দুঃখে সে কেঁদে ফেলল। জগতে কাকেই বা বিশ্বাস করা যায়? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, পুরুষের বিয়ে করাই অনুচিত। পরনারীকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা কী প্রচণ্ড ভুল? আর এপর্যন্ত সে নিজে যা করে এসেছে? সে সবই ছিল সাময়িক। এই বা কী ভয়ংকর অন্যায়। মোকর্দমা করে এই পিশাচকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু তার এমনিতেই খারাপ অবস্থা, মোকর্দমা করলে আরও খারাপ হয়ে যাবে। মেয়েছেলেদের জন্যই জগতে যত গোলযোগ।

গলি দিয়ে যারা যেত সুব্বিয়া শাস্ত্রীর মনে হত তারা তাকে বিদ্রূপ করছে। আইন আদালত করলে ওরা তার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে আরও হাসবে। বাঁচা তখন আরও দুরূহ হয়ে পড়বে।

রাজেশ্বর রাও যে জমিদারের জামাই নারায়ণ রাওয়ের বন্ধু একথা সে জানত। মাদ্রাজে গিয়ে তার সাহায্য চাওয়া কি ঠিক হবে?

এই কথাটা মনে আসতে সেদিন রাত্রেই সে মাদ্রাজের পথে রওনা হল। সে সোজা গিয়ে নারায়ণ রাওয়ের বাড়িতে উঠল। সেখানে তাকে না পেয়ে হোটেলে জিনিসপত্র রেখে, স্নান-খাওয়া সেরে আবার নারায়ণ রাওয়ের ওখানে গেল। নারায়ণ রাও তখন খেতে বসেছে। নারায়ণ রাও আসতেই সুব্বিয়া শাস্ত্রী উঠে তাকে নমস্কার করল। সুব্বিয়া শাস্ত্রী নারায়ণ রাওয়ের পূর্বপরিচিত। সে যে কোন্ কাজে এসেছে তা-ও সে জানত। "সুব্বিয়া শাস্ত্রী মশাই, নমস্কার, আসুন, বসুন।"—সে বলল।

সুব্বিয়া শাস্ত্রীর চোখে জল এসে গেল। নারায়ণ রাও-ও বিব্রত বোধ করল।

—শাস্ত্রীজি, আপনি যে কাজে এসেছেন তা আমার জানা আছে। শুনলাম ওরা আবার হায়দ্রাবাদে ফিরেছে। ওখানে কী একটা কাজও পেয়েছে। আপনি যদি চান তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে আজই আমি হায়দ্রাবাদে যেতে রাজী আছি। আগেও আমি যাবার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু সে সময় ওরা এদিক-ওদিক চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আপনিও চলুন, হায়দ্রাবাদে থাকবেন। ভগবান আমাদের চেষ্টা সফল করবেন।

—বেশ, আমি তো শেষ হয়ে গেছি। এই ছমাসে আমি যে দুর্গতি ভোগ করেছি, কোনো শত্রুও যেন তা না করে। মানসম্মান নিয়ে বেঁচে ছিলাম। এখন লোকে আমায় ঠাট্টা করে। কতবার ভেবেছি গোদাবরীতে ডুবে মরি অথবা বিষ খাই।

—অ্যাঁ তাই নাকি?

—প্রশংসার আশায় সৎ কাজ করা এবং নিন্দার ফলে খারাপ কাজ করা ঠিক নয়। লোকে কি আমার সম্মান বাঁচায়? হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটকে নাট্যকাররা এই ধরনের ভাবকে অভিব্যক্ত করে কী অন্যায় করেছেন? আমরা ভালো করার জন্যই ভাল কাজ করি, প্রশংসার জন্য নয়। হায় ভারতমাতা,

আমরা তোমায় কলঙ্কিত করছি। আমাদের ভালমন্দ কাজগুলিই সমাজের বিচারের মাপকাঠি নয় কি? ভাল বলেই করি না, মন্দ বলে করা বন্ধ রাখি না, এই যদি হয় তাহলে হরিশ্চন্দ্র কি লোকের প্রশংসার কাঙাল হয়ে সত্যের পথে অবিচল ছিলেন? সেইজন্যই কি তাঁর ব্রত উদযাপন?—নারায়ণ রাও ভাবছিল।

সেদিন রাত্রে বিজয়ওয়াড়া হয়ে তারা হায়দ্রাবাদ গেল। হায়দ্রাবাদ থেকে গেল নিজাম-সাগর। ডাকবাংলোর কিছু দূরে সুব্বিয়া শাস্ত্রী থেমে গেল। নারায়ণ রাও রাজেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

পনেরো দিন হয়ে গেল রাজেশ্বর রাও কাজে লেগেছে। অফিসার, কর্মচারী এবং চাকর বাকর সকলের সঙ্গেই তার ব্যবহার খুব ভাল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সকলের সম্মানভাজন হয়ে পড়েছে। রাজেশ্বর রাওয়ের একজন মুসলিম সহকর্মী ছিল। ছেলেটি এক নবাব ঘরানার। নিজামের রাজত্বে তার বাপের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। হায়দ্রাবাদেই সে শিক্ষালাভ করেছিল। তারই সুপারিশে রাজেশ্বরের চাকরি হয়েছিল। রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল। রাজেশ্বর ছিল 'মুক্তপ্রেম সমিতির' প্রকৃত সদস্য। কাজ উদ্ধারের জন্য সে ঐ সঙ্ঘের সদস্য হয়নি। তাকে চায় না এমন কোনো স্ত্রীলোকের ওপর সে জোর জবরদস্তি করেনি।

কোন মেয়েকে হয়তো তার ভাল লাগল। একমাসের মধ্যে মেয়েটির দিক থেকে যদি কোনো সাড়া না পাওয়া যেত তাহলে সে তার আশা অনায়াসে ত্যাগ করতো। তার নিজের বিবাহিত স্ত্রীও যদি অন্য কোনো পুরুষকে চায় তাহলে সে তার ইচ্ছা পূরণ করবে বলে স্থির করেছিল।

পুষ্পশীলাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদ আসামাত্রই সে সুব্বিয়া শাস্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই চিঠিটি ডাকে দিয়েছিল—

"মহোদয়,

আমরা এক অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানের সভ্য। এই সঙ্ঘের নিয়ম মেনে চলার শপথ আমরা গ্রহণ করেছি। সঙ্ঘের আদর্শ হচ্ছে নিম্নরূপ—

১। যেহেতু নারীজাতি যুগ যুগ ধরে দাসত্বের জীবন যাপন করছে সুতরাং পুরুষের হস্তগত সমস্ত অধিকারই তাদের পেতে হবে।

২। বিবাহের প্রথা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে তাকে সমাজের দাসে

পরিণত করে। এই প্রথাটি নারীজাতিকে দাসত্বে বাঁধবার জন্য পুরুষরাই সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এই বিবাহপ্রথাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

৩। এই আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের গুরু তিরুপতি রাও দৈনন্দিন জীবনে পালনের জন্য কয়েকটি নিয়ম করে দিয়েছেন। (ক) যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন; তাকে এই সঙ্ঘের সদস্য করার চেষ্টা করতে হবে।

(খ) বিবাহের পর স্বামীস্ত্রীকে মিলেমেশে থাকতে হবে।

(গ) বিবাহিত পুরুষদের তাদের পত্নীদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী থাকার অনুমতি এবং সুযোগ দিতে হবে।

এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করুন, এই আমার প্রার্থনা।

আপনার স্ত্রী পুষ্পশীলাকে আমি ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে। সেইজন্য এই প্রেমকে সার্থক করার জন্য আমরা দুজন দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। আপনি আপনার শপথের কথা স্মরণ করুন। যে দিন থেকে পুষ্পশীলা আমায় আর ভালবাসবে না, সেই দিনই সে আপনার কাছে ফিরে যাবে। পুষ্পশীলাও এই মতকে সমর্থন করে। সেইজন্য সেও এই চিঠিতে স্বাক্ষর দিচ্ছে।

আপনার বন্ধু
রাজেশ্বর রাও

এই চিঠি আমার ইচ্ছানুযায়ী লেখা হয়েছে। ইতি—পুষ্পশীলা।"

চিঠিটি পেয়ে সুব্বিয়া শাস্ত্রী কপাল চাপড়েছিল। সেইসব কথা স্মরণ করে শাস্ত্রীমশাই ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছেন ইতিমধ্যে নারায়ণ জেনে এল যে রাজেশ্বর রাও বাড়ি নেই, কাজে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে নারায়ণ রাও রাজেশ্বরের কর্মস্থলে গিয়ে হাজির।

তাকে দেখে রাজেশ্বর রাও বিস্মিত হল। ঘেমে নেয়ে উঠল সে। ছুটে নারায়ণ রাওয়ের কাছে এসে তাকে সে জাপটে ধরল। "হ্যাঁরে, নারায়ণ, তুই কেন এলি? ব্যাপার কী? কেন এলি? কী করে এলি? আয়, আয়, আমার বাড়িতে গিয়েছিলি? কে ছিল?"

—গিয়েছিলাম। সেখানে একজন বেশ ধোপদুরস্ত মুসলিম যুবক ছিল।

সে আর একটি সুন্দরী মেয়ে, বোধহয় পুষ্পশীলা, একটা সোফায় বসে ছিল। হাসতে হাসতে সে এসে জানাল যে তুই এখানে এসেছিস। আরে ভাই, বাংলো থেকে এ জায়গাটা ঠিক দুমাইল হবে।

৬। রোগের ওষুধ আয়ুর নয়

সুরম্যা অসুখে পড়ল। প্রসবের সময় যে রোগটী হয়েছিল সেটা সারে নি। শুকিয়ে সে দড়ি হয়ে গেল। মুখে রুচি নেই। সর্বদা মাথার যন্ত্রণা আর অল্প অল্প জ্বর।

বৌ বাপের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুনে রাজারাও চিকিৎসার জন্য সেখানে গেল। টনিক প্রভৃতি দেওয়া হল। ক্ষয়রোগে ধরল না তো?. খুব সতর্কতার সঙ্গে সে তার শরীরটা পরীক্ষা করল। রোগ কিন্তু বেড়েই চলল।

ম্যালেরিয়া হয়ে থাকবে ভেবে বৌকে সে কুইনিন দিল। জ্বর রোজ ১০০ থেকে ১০৩ পর্যন্ত ওঠে নামে। সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হল শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে। আত্মীয়স্বজনেরা আসতে লাগল। অসুখ বাড়তির দিকে। রাজারাও দুজন বেশ নামকরা ডাক্তার বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে এল। তারা দেখেশুনে ভেবেচিন্তে ওষুধ দিল। বইপত্র পড়ে তিনজনে পরামর্শ করে ওষুধ ঠিক করা হত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসা গেল যে টাইফয়েড্ নয়। রক্ত, মল, থুথুও পরীক্ষা করানো হল। ফুসফুসে কিছুটা দোষ ছিল। উপযুক্ত ওষুধ পড়ল। কিছুটা উপকার হল। নাড়ীর গতি কিন্তু ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। পেটে ভিজে কাপড়ের পটি দেওয়া হল।

মাঝে অন্য যেসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর হল কিন্তু জ্বর গেল না।

রাজা রাওয়ের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিল। সে তার পত্নীর হাত দেখে হঠাৎ রাজারাওকে প্রশ্ন করল, "কী করবে ভাবছ?"

রাজারাও বলল, "কী আর বলব, আজ আর কালকের মেয়াদ। অসুখের ওষুধ আছে। কিন্তু আয়ুর নেই। একথা এইবার আমি বুঝতে পারছি।" সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল!

রাজারাও, শিশু সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে সুরম্মাদেবী দিব্যধামে চলে গেল। স্ত্রীর বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা নেই দেখে রাজারাও নারায়ণ রাওকে টেলিগ্রাম করেছিল।

নারায়ণ রাও তখনো হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরে নি। পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে হায়দ্রাবাদে টেলিগ্রাম পাঠাল এবং নিজেও অমলাপুরম্ চলে গেল। পরমেশ্বরের পৌঁছানোর চার ঘণ্টা পর সুরম্মার দেহ তার পার্থিব উষ্ণতা হারাল।

তার বাপ, মা, ভাইবোন এবং রাজারাওয়ের বাপ মা এসেছিলেন। সমস্ত বাড়িটা আত্মীয়স্বজনে ভর্তি। রাজারাও নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

কোত্তাপেট থেকে সুব্বারায় এবং জানকাম্মা এসেছিলেন, শ্রীরাম মূর্তি তো সর্বদা ওখানেই থাকতেন।

মৃত্যুর আগে স্বামীকে কাছে ডেকে সুরম্মা বলল, "ছেলেপিলেদের জানিয়ে দরকার নেই। আবার বিয়ে কোরো।" সে চোখ দুটো মুদ্রিত করে আবার খুলল। মুখে তখন তার স্বর্গীয় দীপ্তি ঝলমল করছিল। ঠোঁটের কোনে হাসি নিয়ে সে পাশেই শ্বশুরকে ভগবদ্‌গীতা পাঠরত দেখতে পেল। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে সে তার প্রাণকে বন্ধনমুক্ত করল।

বাপমা তার মৃত দেহের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

"মা তুই স্বর্গের দেবী। তোর সেবার কথা আমরা কী করে ভুলব। তোর সাহায্যে আমরা মুক্তি পাব ভেবেছিলাম। সবার সুখের তুই-ই ছিলি মূল।"

"আমাদের মত অভাগাদের কপালে তুমি রইলে না!"

রাজারাওয়ের মা বুকে করাঘাত করে বললেন। রাজারাওয়ের দুটি মেয়ে ছিল। একটির বয়স ছ বছর। অপরটি নবজাত। এদের দুজনের মাঝে আর একটি মেয়ে জন্মে মারা যায়।

রাজা রাও নিজের দুঃখকে দমন করল।

দু দিন পরে নারায়ণ রাও এসে পৌঁছল। রাজারাওকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল। রাজারাওয়ের ডাক্তার বন্ধুরা বিদায় নিয়েছিল। নারায়ণ রাও, রাজারাও আর পরমেশ্বর মূর্তি ছিল।

রাজারাওয়ের চোখের জলে বুক ভেসে গেল। নারায়ণ রাও তাকে প্রবোধ দিতে লাগল।

—আমার জীবনের সেরা বস্তু শেষ হয়ে গেল, নারায়ণ!

—তুই পাগল নাকি! শেষ হয়েছে কোথায়? দেহ ছেড়ে চলে গেছে এইতো। এর কারণ সে ছিল শ্রেষ্ঠা নারী।

—খুবই বুঝি, কিন্তু মন মানে না।

—হাজার হোক আমরা মানুষ তো! এই মানবজন্মেই আমরা যত কিছু দেখছি শুনছি, এই জন্মেই আমাদের তয়ে যেতে হবে। এতখানি অসুস্থ কী করে হয়ে পড়ল? শুনলাম ডাক্তার অঞ্জনেয়ুলু এবং ডাক্তার নাগরাজও এসেছিলেন। এমন কী অসুখ থাকতে পারে যা তোমাদের অজানা। যাই হোক, দুর্ভাগ্য আমাদের। তা না হলে এই অদ্ভুত রোগ হবে কেন। এ কী পরম, চোখের জল মুছে ফেল্। তুই আর রাজারাও দুর্বল মনের লোক। তোদের কাঁদতে দেখে অন্যরাও স্থির থাকতে পারছে না।

—কেঁদো না। মনে হচ্ছে যেন কালই দেখেছ। সেবার তুই ধন্বন্তরির মতো বাঁচিয়ে তুলেছিলি। তার মতো সরল সাদাসিধে মেয়ে খুব কমই দেখেছি।

—নারায়ণ, দরজার কাছে ঐ যে মেয়েটি বসে আছে ও আমাদের বাড়িতে কাজ করে। আমার মেয়ের একটা সোনার বেড়াল ও একদিন যখন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ওরই এক সহকর্মী ধরে ফেলে। আমি পুলিসে দিতে যেতেই বৌ বলল—

'তুমি কি গান্ধীজির উপদেশ ভুলে গেলে? যাকগে, ওকে ছেড়ে দাও! ওকে বকো-ঝকো কিন্তু পুলিশে দিও না।' সে আমাকে বুঝিয়ে দিল। একটি মেয়ের অসুখ আমি সারিয়েছিলাম। তার স্বামী পুলিশের লোক। চুরির খবর পেয়ে সে দৌড়ে আমার বাড়ি এল! চুরির অপরাধে মেয়েটির বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি সে আমার কাছে চাইল। কিন্তু আমার স্ত্রী রাজী হল না। সেইদিন থেকে মেয়েটি না জানি কেমন করে বিশ্বস্ত হয়ে উঠল। আর সে চুরি করে না।"

—সুরম্মা সম্বন্ধে তুমি আর কী বলবে? আমি কি তাকে জানতাম না। সে মা-বোনের চেয়েও আমাকে বেশী মানত।

রাজারাও তার মনের কথা বন্ধুদের বলতে থাকল, "আমি দর্শন পড়ায় মগ্ন থাকতাম, ডাক্তারী পেশায় নিজেকে ভুলে যেতাম। ঘরে কী আছে আর কীইবা নেই সে সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। কত আত্মীয়-স্বজন আসত। সুরম্মা ছিল প্রকৃত সুশীলা। আমার মনের খবর সে রাখত। সে আমাকে বড় ভালবাসত কিন্তু একদিনের জন্যও আমি প্রাণ খুলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি নি।

"আমি তাকে নিজের ঔরসজাত সন্তানদের মা হবার ব্যাপারেই কাজে লাগিয়েছি কিন্তু মন খুলে কোনোদিন তার সঙ্গে আলাপ.আলোচনা করি নি। প্রতিবেশী মেয়েদের সে পতি ভক্তির কথা বলত। ভাগবত ছিল তার কণ্ঠস্থ। সে যে সুকণ্ঠী গায়িকা ছিল এ খবর আমিও জানতাম না।" মুখ নীচু করে রাজারাও বলল।

কথায় কথায় তারা দার্শনিক তত্ত্বে এসে পড়ল। জীব এবং পরমাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হল। বেদে আছে দুই পুরুষ। সাংখ্যে অনন্ত। এক প্রকৃতি আছে, উপনিষদে একমাত্র ব্রহ্ম আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মানুষ তিন ধরনের,—নাস্তিক, অনেকেশ্বর বাদী, একেশ্বরবাদী। কৃষ্ণ এই তিন দলের বক্তব্যের সমর্থন করে দেখিয়েছেন। সাংখ্য দ্বৈতবাদ থেকে আরও এগিয়ে গেছে। সৃষ্টির কারণ নির্দেশ সাংখ্য কী ভাবে করে? বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে দুটি জিনিস—পুরুষ ও প্রকৃতি।

সাংখ্যের পর যোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলল। পতঞ্জলি উল্লিখিত যোগ গীতায় নেই। গীতার বহু বছর পরে পতঞ্জলি এসেছেন। যোগ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রথাগত ভাবে প্রচলিত ছিল পতঞ্জলি তাকে সূত্রবদ্ধ করলেন। গীতায় উল্লিখিত যোগ শত শত বছর আগেকার ঋষিদের সৃষ্টি।

তারপর কথা হল উপনিষদ সম্পর্কে। গীতায় কীভাবে এই সমস্তের সমন্বয় ঘটল সে বিষয়েও আলোচনা হল।

সাংখ্যবাদীরা পুরুষ প্রকৃতি, ত্রিগুণজনিত, চতুর্বিংশ তত্ত্ব থেকে শুরু করে উপনিষদোক্ত ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলে এদের সমন্বয় ঘটিয়ে পুরুষোত্তম পরব্রহ্মবাদের সিদ্ধান্তে এসেছে। ক্ষর ব্রহ্ম হচ্ছে প্রকৃতি এবং অক্ষর ব্রহ্ম হল পুরুষ। ক্ষর ব্রহ্ম অক্ষর ব্রহ্মেরই স্বরূপ।

৭। প্রেমের উদ্দেশ

পরীক্ষায় সূর্যকান্তম্ ভালই লিখেছিল। নারায়ণ রাও নিশ্চিত ছিল যে সে পাশ করবে। রাজা রাওয়ের ওখান থেকে নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর মাদ্রাজ ফিরে এল। শারদার পরীক্ষাও যে ভাল হয়েছে সে খবর জমিদার জামাইকে দিয়েছিলেন। পথে নারায়ণ রাও পরমেশ্বরকে রাজেশ্বর সম্বন্ধে সব কথা বলল।

—রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে সারাদিন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। তার দৃষ্টিতে দেখলে সে যা করেছে তার মধ্যে কোনো ভুল পাওয়া যায় না। সে বলে, 'তোমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে আমার বিশ্বাস নেই। পুষ্পশীলা আমাকে ভালবাসে এবং আমি তাকে ভালবাসি। সে যখন আর আমায় ভাল বাসবে না, তখন সে যেখানে খুশি যেতে পারবে। তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। তোর ধর্ম আমি চাইনে। তোর ধর্ম, তোর অহিংসা, তোর সত্যপথ আমার সহ্য হয় না। ও সব আমি জানিও না। তুই গিয়ে পুষ্পশীলাকে উপদেশ দে। তার মন যদি বদলায়, তাহলে তুই তাকে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর ওখানে পৌঁছে দিস। কিন্তু আমি পরিষ্কার তোকে বলছি যে পুষ্পশীলা আমায় ভালবাসে। একথা আমি বলি না যে সে চিরকালই আমাকে ভালবাসবে। প্রেম তোমার ব্রহ্মের মতো নিত্য নয়।' সে আমাকে এই কথা বলল। মেয়েটির সঙ্গেও আমি এ প্রসঙ্গে কথা বলেছি। সব কিছু শোনার পর হাসতে হাসতে সে বলল। নারায়ণরাওমশাই, নাইডুমশাই আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে থাকেন কিন্তু আপনি বুড়োদের মতো কথা কেন বলছেন! একথা শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

—রাজেশ্বরকে তুই কী বলেছিলি?

—কী বললাম? তোমার পেশায় সকল সৃষ্টিকে পরব্রহ্মে লয় করে দেওয়াই মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। সেইজন্য এক সঙ্গে যদি সকলের মোক্ষ লাভ হয় তাহলেও কোনো আপত্তি নেই। আমরা না পারি, সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার। অর্থাৎ কাজটা নিবৃত্তির জন্য না প্রবৃত্তির জন্য। যার অর্থ হচ্ছে মোক্ষ মার্গ অনুসরণ করতে গিয়ে আনন্দ লাভ। তোর কাজটা কোন শ্রেণীতে পড়ে?

"এখন আমি কি আনন্দ লাভ করছি না ?" সে বলল।

"এভাবে কী তোমার চিন্তা করা উচিত ? যা-ই করি না কেন সে সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। কারণ তার ফল সারাজীবন আমাদের ভুগতে হবে।" কী ভাবে উপকার হচ্ছে এবং অপকারই বা হচ্ছে কী ভাবে, সেসব দেখতে হবে। আমি বললাম।

"এখন এই মেয়েটি এবং তোমার কথাই ধর। এর স্বামী যদি নালিশ করে তাহলে দু-তিন বছর জেল খাটতে হবে তোমাকে।"

"তুই তোর অহিংসার ব্রত পালন করতে গিয়ে জেল খেটেছিস। তাহলে আর উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে আমি যদি জেল খাটি তাতে ভুলটা কোথায় ?"

"আমরা যা করি তার সবটাই যে দোষ মুক্ত সে কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের কাজগুলি নির্দোষ হোক এ চেষ্টা তো আমাদের থাকা উচিত। এইভাবে যা কিছুই তুই করিস না কেন, দেখা দরকার, তার ফলে কমপক্ষে অন্য কারো ক্ষতি না হয়।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সমাজ যাকে দোষ বলে তাকে দূর করার চেষ্টা যখন আমরা করি তখন আরও কতকগুলি উপকারের সৃষ্টি হয়। তোর অহিংসা ব্রতের ফলে অনেকের ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে তোরা কি অহিংসা ছেড়ে দিবি ?" সে প্রশ্ন করল।

"এতদূর যখন এলে তখন আমার প্রশ্ন জগতে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কী ?"

সে বলল "সন্তোষ" !

"পূর্ণ সন্তোষ কী কোন নারীঘটিত ব্যাপারে পাওয়া সম্ভব ?"

—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, "এখন অবশ্য নয়, তবে আমাদের পদ্ধতি অবলম্বন করে ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে।"

"লিণ্ডসে অথবা হ্যাবলক এলিসের বই পড়েছিস, না পড়িস নি ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ও সমস্ত পড়ার পর তুমি কী একথা বলতে পার যে এখানে নরনারী তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাচ্ছে না ? আমেরিকায় যত কদর্যতাই থাক না কেন সেগুলোকে দূর করার জন্যে লিণ্ডসে-প্রদর্শিত পথ ঠিক নয়।"—সে বলল।

"শেলী প্রভৃতি তোর পদ্ধতি অনুসরণ করে হতাশার মধ্যে মৃত্যু বরণ করেছিল। প্রকৃতিবিদ্ তার অনুসন্ধানের পথে পর ব্রহ্মের কাছাকাছি গিয়ে

থেমে যায়। যে সমস্ত উপকরণ প্রাকৃতিক ঘটনার সন্ধানে চলে, তারা পর-ব্রহ্মের সন্ধান পায় না। প্রকৃতির পথ থেকে পারলৌকিক পথ দর্শনীয় নয়।" আমি বললাম।

মাথা নীচু করে সে শুনে গেল। মেয়েটি কাছেই ছিল। সে বলল, "এখন আমি স্ত্রী-র মতই জীবন যাপন করছি। আপনি যাই বলুন, কোনো লাভ হবে না।"

"বেশ আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন।" বলে আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। রাজেশ্বরকে আমি জানালাম যে মেয়েটির স্বামীও আমার সঙ্গে এসেছে। সে বলল, "তাহলে তাকেও বলে দাও যে যদি পারে তাহলে সে তার স্ত্রীর মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়ে যাক্!"

আমার হাসি পেল। এমন সময় তোর ভয়ংকর টেলিগ্রামটা পেলাম।"

মাদ্রাজে বাড়িতে এসে নারায়ণ রাও দেখল সূর্য, শ্যামসুন্দরী আর তার বোনরা বসে রয়েছে। রাজারাওয়ের স্ত্রীর মৃত্যুর খবর সে তাদের জানাল। তার গুণাবলীর উল্লেখও সে করল। শ্যামসুন্দরী হঠাৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

"দাদা, ভাল লোক বেশী দিন বাঁচে না।"

"হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে যে জগতের খারাপ দিকটা ভালকে দূর করে দেয়। সাধারণভাবে এটাই চোখে পড়ে। ভালোর জন্যেই কিন্তু খারাপ সীমাহীন হতে পারেনি। খারাপ যদি ক্রমশ বাড়তেই থাকত এতদিনে তাহলে প্রলয় হয়ে যেত। প্রকৃতিই আমাদের এই সব শিক্ষা দেয়। ধ্বংসের ক্ষমতা খনিজতেলে আছে, আগুনেও আছে, আর বিদ্যুৎ শক্তিতেও আছে। তারা যদি নিজের নিজের সীমা অতিক্রম করে, তবে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই ভাবেই, মানুষ তার দানবীয় শক্তিকে দমন করে তার শুভশক্তির জোরেই। সুতরাং মন্দ যে ভালকে দূর করে দিচ্ছে একথা আমরা বলি কী করে!"

"তা তো ঠিক, দাদা!"

পরমেশ্বর, "নারায়ণ, একটা কথা ভেবে দেখ! এই যে ভাল মন্দ এরা একই প্রকৃতিতে গিয়ে মিলছে নাকি? দুটি বোনের মতো? এদের মধ্যে একটি যদি আমাদের মুক্তির কারণ হয় তবে অপরটি নয় কেন?"

নারায়ণ, "তুমি কি জান না যে আমাকে জিজ্ঞেস করছ? প্রকৃতির মায়ার ফলেই পুরুষ দেহাত্মার ভ্রমে পড়ে, অহংকারের জন্য নিজেকে অক্ষর মনে করে এবং প্রকৃত অক্ষর পুরুষোত্তমকে বুঝতে পারে না। ওই পুরুষ এবং ওই প্রকৃতি তো পরব্রহ্মেরই স্বরূপ। সেই জন্য প্রাকৃতিক গুণগুলি থেকে উদ্ভূত ভাল মন্দের মধ্য থেকেই পুরুষের নিজেকে অক্ষর ভেবে নেওয়ার কারণের সৃষ্টি হয়েছে।"

রুক্মিণী আর তার ছোট্ট মেয়েটি ভালই ছিল। মেয়েটি ছিল পরমেশ্বরের চোখের মণি। তার উদ্দেশ্যে সে বহু গান রচনা করে ফেলেছিল। আর সে গুলো শোনার জন্য রোহিণী খুব আগ্রহ প্রকাশ করত।

—দেখ নারায়ণ, নরনারীকে পরস্পরের আদর্শের অনুকূল হতে হবে। তারা একে অপরের প্রেরণার উৎসস্বরূপ। দান্তের যেমন বিয়েত্রিচে, কীট্সের ফ্যানি, নেপোলিয়নের যোসেফাইন, কৃষ্ণের রাধা, পাণ্ডবদের দ্রৌপদী, রামের সীতা, কালিদাসের যেমন তার গৃহিণী আর লীলা শকনের চিন্তামণি।"—পরমেশ্বর একদিন বলল।

—তুই যা বলেছিস তা খুব সত্যি কথা, কিন্তু কেন বলছিস বল্ তো?

—রোহিণীর সঙ্গে সৌহার্দ্য হবার পর থেকে কত গানই না আমি লিখেছি। ছবিও এঁকেছি। এত শক্তি আমার মধ্যে যে কোথা থেকে এল বুঝতে পারি না।

—হ্যাঁ, আমিও বেশ আশ্চর্য হয়েছি। সেই জন্যই কি তুমি আর রোহিণী নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে থাক?

—রোহিণীকে আমি ছবি আঁকতে শেখাচ্ছি। ছবিগুলো আমি সবাইকে দেখাতে বলি। সে কিন্তু বলে, সম্পূর্ণ ছবি যখন নিজেই আঁকতে পারবে তখনই শুধু দেখাবে। অর্থাৎ এমন ছবি আঁকবে যাতে আমি তাতে হাত লাগাতে না পারি। চারটি ছবি করেছে। প্রথম তিনটির ওপর আমায় তুলি চালাতে হয়েছে। তাতে আমার কারিগরিই বেশী। ও এখন যেটা এঁকেছে তার মধ্যে ওর স্বকীয়তাই বেশী। আমি কেবল কয়েকটা রেখা টেনে দিয়েছি। বাদবাকি সবটাই ওর নিজের সৃষ্টি। ছবি আঁকায় ও মনে হচ্ছে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে।

—আরে দুষ্টু, একথা তুই এতদিন গোপন করেছিস?

—কী, আমি যে ওকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছি সে কথা তোকে বলি নি!

—ওযে এত ভাল আঁকতে শিখেছে তা জানলে ছবিগুলো দেখে কত আনন্দ পেতাম। আজ সন্ধ্যেয় চল ওর ওখানে গিয়ে ছবিগুলো দেখে আসি। শ্যামসুন্দরী বোধ হয় ছবি আঁকতে পারে না।

—ছবি আঁকে না বটে কিন্তু তেলুগু কবিতা লিখছে। তেলুগু ভাষাজ্ঞান যদিও তার বেশী নয় তবু কী জানি কোথা থেকে কবিতায় আবির্ভাব হল। আর লেখার মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য আছে। সংগীতের রহস্য আমি তাকে বলে দিয়েছি। সংস্কৃতও বেশ শিখেছে। তোকে শোনাবার কথা প্রায়ই চিন্তা করে।

৮। অগাধে

নারায়ণ রাওয়ের মন থেকে আন্তরিক প্রেম ক্রমশ বিলীয়মান হচ্ছিল। বিদ্যুৎশক্তি শোনা যায় দু'ধরনের হয় এবং তারা পরস্পরের বিপরীত। দুটির মিলনের ফল হল বিদ্যুৎ প্রবাহ। মানুষের ভালবাসাও হচ্ছে এইরকম। অনুরাগে যদি অনুরাগ যুক্ত না হয় তাহলে প্রেম আর থাকে না। এই জিনিস কখনো কখনো মানুষকে নিদারুণভাবে আহত করে।

শারদার মনে প্রেমের জাগরণ কবে ঘটবে সেই কথাই নারায়ণ রাও ভাবছিল। ইংরেজী রূপকথায় স্লিপিং বিউটি জেগে উঠেছিল চুম্বনে। সে চুম্বন কি তার জীবনে অনুপস্থিত? তবে সে কি সেই রাজকুমার নয়? ভাবতে থাকে সে। নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে বহুবার সে ঐ নারীকে একাত্ম করে নিতে চেয়েছে। কিন্তু অপর পক্ষের নিষ্প্রাণতায় তার উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে।

শ্যামসুন্দরী খুবই বুদ্ধিমতী। সে কর্মযোগিনী। চিকিৎসাবিদ্যার মাধ্যমে অসুস্থ নারায়ণ রাওয়ের সেবা করতে চায়। তার পেশা থেকে যা কিছু পাওয়া যায় সবই সে দেশের কল্যাণে লাগাতে চায়। পরমেশ্বরের কাছে সে গান লেখা শিখছে। নবনীর মত নরম তার হৃদয়। প্রেমময়ী সে। চিকিৎসাবিদ্যা থেকে কীভাবে জীবিকা নির্বাহ হবে এই উদ্দেশ্যে একবার

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। "শল্যচিকিৎসা তুমি কি করতে পারবে?" সে বলেছিল—"বজ্রাদপি, কঠোরানি, মৃদুনি কুসুমাদপি।" এমন মেয়ে দেশের ঐশ্বর্য নয়ত কী? এই কথা ভাবতে ভাবতে সে একদিন পরমেশ্বরকে নিয়ে শ্যামসুন্দরীর ওখানে গিয়ে পড়ল। সে তখন পরীক্ষার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিল। ওদের আসতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে আনন্দিত মনে চেয়ারগুলো সাজাতে লাগল। ওদের সঙ্গে সেও বসল। পরমেশ্বর রোহিণীর খোঁজে ভেতরে গেল।

মিনিট পনেরো দুজনে চুপচাপ বসে রইল। শ্যামার অন্তরের শ্রদ্ধা যেন নারায়ণ রাও আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আনতমুখে কি জানি কোন্ চিন্তায় তারা মগ্ন ছিল। আলতো সমুদ্রের হাওয়া বইছিল। আকাশের তারাগুলি সৌন্দর্যের শিশির ঝরাচ্ছিল।

মাথা তুলে নারায়ণ রাও হঠাৎ বলল, "বোন, পরমেশ্বর বলছিল যে তুমি গান লেখা শিখে ফেলেছ। একটা গান শোনাবে!"

"ও কী বলছ ভাই? পরমেশ্বরদা বড় দুষ্টু। আমার গান আবার গান নাকি?"

"গাও, আমার সামনে আবার লজ্জা কিসের?"

"গাইব, কিন্তু তুমি কিছু বোলো না। তোমার মতো মানুষের সামনে গান করা খুবই সাহসের কাজ।"

"আমি কি মারধোর করি নাকি?"

"কে জানে কী করে বস?"

"গাও। তোমার গলার আওয়াজই গান।"

"বৌদির মতো মিষ্টি গলা কি কারো আছে?"

"তাতে লাভ কী?"

"এ কী বলছ?"

—না, কিছু না। শ্যামা গাও! কণ্ঠস্বর তার কেমন যেন ভারি শোনাল। শ্যামসুন্দরী বলে ফেলল, "দাদা, তোমার আত্মা পরম পবিত্র।" সে ভাবতে লাগল।

নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে শারদার হয়তো মিল হয়নি। এই যুবকটি ভাবপূর্ণ হৃদয় এবং নির্বিকার মন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শারদা কি একে

ভালবাসে না? হ্যাঁ, সে যেন মেঘের মধ্য দিয়ে জ্যোৎস্নার রেখা দেখতে পেল। শারদার ব্যাপারটা তার বোধগম্য হল। সে নারায়ণ রাওকে ভালবাসে না।

"কেন ভালবাসল না? শারদাও কি নির্বোধ? তার মনের কথা কোনো মতেই সে কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না। শারদা, তুমি হতভাগী। সত্যিই কি তোমার এত কঠিন প্রাণ? তোমার সৌন্দর্য কী নিষ্প্রাণ? মনে কি তোমার প্রেম নেই? তুমি কি মরুভূমি! হায়রে বিষাদ! কী বিচিত্র নাটক।" মনে তার এইসব প্রশ্ন আনাগোনা করতে লাগল। করুণায় তার মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। চোখদুটি ছলছল করে উঠল। নিজেকে ভুলে গিয়ে সে নারায়ণ রাওয়ের কাছে গেল।

তার মাথাটা সে বুকের কাছে টেনে নিল। দুটি দেহে শিহরণ জাগল। রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আপনহারা নারায়ণ রাও বাহুর বাঁধনে শ্যামসুন্দরীকে বেঁধে ফেলল। নারায়ণ রাওয়ের মুখ নিজের দিকে নামিয়ে ধরে শ্যামসুন্দরী একটি চুম্বন এঁকে দিল। নারায়ণ রাও নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তার মনে হল যে সে শারদার আলিঙ্গনের বাঁধনেই বাঁধা পড়েছে!

তার আলিঙ্গন সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেল। সে যেন ঘুম থেকে উঠল। আড়মোড়া ভেঙে অস্ফুট স্বরে কী যেন বলল, তারপরই দ্রুত পদে নীচে নেমে গেল। কোথায় যে সে যাচ্ছে সে খেয়াল তখন তার ছিল না। হাত মুখের ঘাম রুমালে মুছে সোজা সে সমুদ্রতীরে গিয়ে পড়ল।

হতাশাব্যঞ্জক একটা অব্যয় তার মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে এল। মাথায় হাত দিয়ে সে বালির ওপর শুয়ে পড়ল।

—এ কী? আমি এ কী পাপ করলাম? এর কারণ কী? ওর সঙ্গে কি আমার প্রেমের সম্পর্ক? আমি ওকে নিজের বোন বলে মনে করি। ও আমার পঞ্চম বোন, রক্তের সম্বন্ধ না থাকলে নিষ্কলঙ্ক ভালবাসাও কামের দ্বারা কলঙ্কিত হতে পারে।

অবিবাহিত অবস্থায় দু-তিনটি মেয়ে তাকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু সে ছিল ক্ষণিকের মোহ। পরে সে ধরণের কামনা আর তার মনে ঠাঁই পায়নি। "এই যে কামনা, এ কী তুচ্ছ জিনিস! তাই যদি হয় তা হলে ঋষিদের পুত্র লাভ কী করে হয়েছিল? এ ধরনের বাসনার জাগরণ কি পাপ? পাপই

যদি হয় তাহলে স্ত্রীকে দেখেও এ ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া অনুচিত। শ্যামসুন্দরী যে তার প্রতি প্রেমাসক্ত এ খবর তার জানা ছিল না। পাশ্চাত্য রীতিতে ভাইবোনের মধ্যে চুমুর আদান-প্রদান প্রচলিত। এ দেশে সে রীতি নাইবা থাকল। কিন্তু তার চুমুতে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তা না হলে আমি অমন উত্তেজিত হয়ে পড়লাম কেন? সেইবা তাহলে আবিষ্ট হয়ে পড়ল কেন? রাজেশ্বরের আচরণই কি ঠিক? ছিঃ, তাই কি হয়?

তার আচরণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়মুখীন। তাই তার ধর্মও কলঙ্কিত। এ দোষ কি পুরুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে! নারীর মধ্যে আগুন আছে। আর সে আগুন কোনো-না-কোনো সময় পুরুষের মধ্যে দাহ সৃষ্টি করে। পবিত্র প্রেম নাকি আনন্দময়, তাও হয়তো বা দুঃখদায়ক।

অন্তরে অন্তরে সে জ্বলে যাচ্ছিল। দৃষ্টি তার ছিল সমুদ্রের দিকে কিন্তু ঢেউগুলো তার চোখে পড়ছিল না। সে ভালবাসলে কী হবে, তার স্ত্রী তাকে ভালবাসে না। ও এমনই মেয়ে যে ভালবাসতে প্রস্তুত কিন্তু তাকে ভালবাসায় মানা। মানুষের জীবনে প্রেমের গুরুত্ব কেনই বা এত বেশি? এইসব সে ভাবতে লাগল।

ওর মুখের দিকে চাইব কেন? আচ্ছা না তাকানোটাও কি কাপুরুষতা নয়? কী করা যায়? দেহটা যেন তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দ্রুততালে ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তার মনের কান্না সমুদ্রের গর্জনের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। সাগরবেলায় শুয়ে সে ছটফট করতে থাকল, তার কাছে জগৎ যেন অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। আপন মনে বকবক করতে করতে নারায়ণ রাও চলে যেতেই শ্যামসুন্দরীও বাস্তব জগতে ফিরে এল। সেও কেঁপে উঠল। ঘটনাটার কথা ভাবতেও তার ভয় করছিল। চোখ বেয়ে টস টস করে জলের বিন্দুগুলি আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। এমন কাজ সে কেন করল যাতে তার মনে আঘাত লাগল। এরকম কল্পনাও তো সে কোনো দিন করে নি। 'সে এত মুখচোরা কেন? সে কেন অমন বিব্রত বোধ করল? কী এমন ভুল সে করেছিল। দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে চরিত্রে কী তার কলঙ্কের কালি লেগেছে? আলিঙ্গনের ফলে সে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সে তাকে চুম্বন করেছিল। এ কেমন? ভারতীয় মেয়েরা কি এমন করে থাকে? শিশুদের চুম্বন কি ভাল লাগে না? তার চুম্বনও

সেইরকমই ছিল। তার আলিঙ্গনের গাঢ়তা কেমন ছিল ? ভয়ার্ত মানুষেরই মতো।'

অনেক ভেবেও সে নিজের কোনো অপরাধ খুঁজে পেল না। 'আমি কি পুরুষের সঙ্গে নারীসুলভ আচরণ করেছি ? আমার মধ্যে নারীত্ব অনুপস্থিত। মেডিকেল কলেজে যেদিন ভর্তি হয়েছি নারীত্ব সে দিনই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। কোনো পুরুষ এ পর্যন্ত আমার উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। নারায়ণ রাওয়ের মনটা পরিষ্কার। আমি তাকে ভালবাসি পবিত্র মন নিয়েই। এর মধ্যে ভুল কোন্‌খানে ? হতে পারে যে এই ভালবাসার মধ্যে কিছুটা দৈহিক আনন্দ এসে পড়েছে। কিন্তু নোংরা মন নিয়ে আমি তার প্রতি অনুরাগ দেখাচ্ছি না। জানি না তার মনে কী আছে, তবে তার আলিঙ্গনে রয়েছে অসাধারণ মাধুর্য। কী জানি আমার অনুরাগের মধ্যেই বা কী আছে ? সে সময় আমার কী যেন হয়ে গিয়েছিল।

আচ্ছা, এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ আমার দেহটাকেই যদি চেয়ে বসে তাহলে ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা কি আমাকে করতেই হবে ? তা যদি না করি তবে কি আমার চরিত্রে কলঙ্কের দাগ লাগবে ? কেন ? কোন মহর্ষি যদি সুস্বাদু কিছু চান তবে বস্তুটির পবিত্রতা সত্যিই কি ক্ষুণ্ণ হবে ?

কী জানি কী হয় না হয় ?

আমি কি তার পবিত্রতা নষ্ট করেছি ? না। ভালবাসার জন্য সে ছটফট করছিল। আমার দয়া হল। আর এই দয়াই আমার মধ্যে নারীসুলভ ভালবাসার জন্ম দিল। এক মুহূর্তের জন্য দুজনে আনন্দসাগরে ডুবে রইলাম। কেবল এইটুকুর জন্য কোনো দোষ হয় না।

৯। ধর্ম

নারায়ণ রাও তার কাছ থেকে ফেরার আগেই পুষ্পশীলার মন হয়তো পালটেছে বলে রাজেশ্বর রাওয়ের সন্দেহ হতে শুরু করেছিল। ইঞ্জিনীয়ার মুসলিম যুবকটি হরদম রাজেশ্বর রাওয়ের বাড়ি যাতায়াত আরম্ভ করেছিল। রাজেশ্বর রাও পুষ্পশীলাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিল। সে তাকে বাধা

দেয় নি। নিজেদের সমিতির আদর্শ সে পুষ্পশীলাকে জানিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল, "যাকে খুশি তুমি ভালবাসতে পার। যতক্ষণ তুমি আমাকে চাও ততক্ষণ আমার কাছে থাকো! আর অন্য কাউকে যদি তোমার মন চায় তাহলে নিঃসংকোচে তার কাছে যেতে পার।"

পুষ্পশীলা ছিল চঞ্চলা। প্রজাপতির মতো। রাজেশ্বর রাওয়ের প্রতি তার অনুরাগ ফিকে হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে মুসলিম যুবকটি রাজেশ্বর রাওয়ের ওখানে আসতে শুরু করল। রাজেশ্বর রাওই তার সঙ্গে পুষ্পশীলার পরিচয় করিয়ে দিল।

পুষ্পশীলা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারত। যুবকটি তার সঙ্গে ঐ ভাষাতেই কথা বলত। রাজেশ্বর রাওয়ের অনুপস্থিতিতে সে তার বাড়িতে আসত। সে একদিন পুষ্পশীলার হাত ধরে ফেলল। পুষ্পশীলা প্রতিবাদ করল না, হাসল। দিনকতক পরে পিছন দিক থেকে এসে সে তাকে আলিঙ্গনে বাঁধল। তার বাহুপাশে পুষ্পশীলা পুলকিত হয়ে উঠল। তারপর তারা দুজনে ভেতর বাড়ির নির্জনতায় চলে গেল। ওদের দুজনের সম্বন্ধের কথা রাজেশ্বর রাওয়ের অজানা রইল না। রাজেশ্বরের মনে ঈর্ষা জন্মলাভ করল। ঈর্ষার ভাবটা প্রথম প্রথম সে বুঝতে পারত না। শুধু কেমন যেন একটা কষ্ট সে অনুভব করত।

ওই সময়টাতেই নারায়ণ রাও এসেছিল। নারায়ণ এসে অনেক কিছু বলেছিল। গান্ধীজীর উপদেশের কথা বলেছিল। আর্যদের সময় পুত্রার্থেই স্ত্রীর প্রযোজন ছিল। তাতে কি কোনো ভুল ছিল? না, সময়ও তো পরিবর্তনশীল।

"পরধন এবং পরস্ত্রী লিপ্সা তো হিংসারই সামিল। সেইজন্যই তো অন্যায়।" নারায়ণ রাও বলেছিল, "অহিংসা এবং সত্যের পথে তার চলা উচিত। বহু মুক্তিপথের সন্ধান সমাজ করেছে। কিন্তু কোন পথই সত্য ও অহিংসার প্রতিকূল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেই জন্যই ধনীদের উচিত নিজেদের সম্পদ সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া। যদি তাদের মধ্যে এ আদর্শ না থাকে তা হলে দু'দশ জনকে মেরে ফেলা ঠিক নয়। পাপ। প্রকৃত কর্মযোগী হয়ে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তোমাকে পরিবর্তন আনতে হবে। নারীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা। স্ত্রীর পক্ষে ঔচিত্যের সীমা অতিক্রম করে যেমন পুরুষকে

কামনা করা উচিত নয় পুরুষের পক্ষেও ঠিক তেমনি ভাবে নারীকে চাওয়াই মোক্ষমার্গের প্রতিবন্ধক। ইন্দ্রিয় লালসার জালে এ জিনিস মানুষকে আবদ্ধ করে। বিবাহের প্রথাটির এই জন্যেই চালু হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে প্রেম বাদ দিয়েই বিবাহ করা হোক। যদি তার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে তার সংশোধন করো। কিন্তু নিজের বাসনার দ্বারা চালিত হয়ো না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই স্বাধীনতা, সর্বনাশের জন্য নয়।"

এই ভাবে নারায়ণ রাও তাকে বুঝিয়েছিল। এই কি সত্য? আধ্যাত্মিকতা বলে যে কোনো বস্তু আছে একথা সে বিশ্বাস করত না। এই জন্মের পর আত্মা কি আবার জন্ম গ্রহণ করবে? আত্মাকে অনাদি অনন্ত হিসাবে বর্ণনা করা তার ধারণায় কবিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

কতজন কতভাবে তার সঙ্গে তর্ক করেছে তবু তার ধারণা বদলায় নি। আজ কিন্তু তার মন সন্দেহের দোলায় দুলছে। আমার ধারণা এবং গুরুর আদর্শ হয়তো ভুল। গুরুদেবের মতবাদের অনুরূপ চার্বাকের মতবাদও পূর্বে প্রচলিত ছিল। গ্রীস এবং রোমের পতনের সময়ও এই ধরনের মত প্রচলিত ছিল। নারায়ণ রাও বলেছিল। কোনটা সত্য, সেটা না এটা? এই সব ভাবতে ভাবতে রাজেশ্বররাও একদিন বাড়ি ফিরল। চাকর জানাল যে সেই মুসলিম যুবকটির সঙ্গে পুষ্পশীলা ভিতরে আছে। সে এগুতে পারল না। রাগে সে বাইরে কোথাও চলে গেল। পা দুটো যে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল তা সে নিজেও সেদিন বুঝতে পারে নি।

মনে যে তার ঈর্ষা জেগেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতদিনে তার চোখ ফুটল। নারী যে স্বভাবতই চঞ্চল চিত্ত একথা পুষ্পশীলা তাকে বুঝিয়ে দিল।

মনটা তার জ্বলতে লাগল। যখন সে মুক্ত প্রেম সঙ্ঘে প্রথম প্রথম যেতে শুরু করেছিল তখন অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সে মিশত। সেই মেয়েরা তাকে ছেড়ে অন্যের কাছে গেলে কিন্তু তার মনে এই রকম ভাবান্তর আসে নি। আজই বা কেন ঈর্ষা দেখা দিচ্ছে?

রাজেশ্বররাও একদিন পুষ্পশীলার কাছে গেল।

—পুষ্পা, তোমার ভালবাসা কি আমাকে ছেড়েছে?

—ছিঃ ছিঃ রাজা। এ কী বলছ? তুমি আমার প্রিয়তম, তোমাকে ছাড়া আর কারো কথা আমি চিন্তাও করি না; আমি তোমার দাসী।

—যা বললে তা মুখের কথা, না মনের? সেটা ভুল। সে জন্যে আমি জিগ্যেস করছি না। আসল কথাটা বলো। অবান্তর কথায় লাভ কী? আমাদের দুজনের সম্পর্কটা তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুধু এই জন্যই। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কিন্তু একরত্তিও কমেনি।

—তোমার ভালবাসার ক্ষেত্রেও তো আগে হরদম বদলাত।

—ভালবাসার উপযুক্ত মেয়ে এখনো আমি পাই নি।

—আপনি সেইভাবেই চিন্তা করেন না কেন! আমিও এখন আমার প্রেমের যোগ্য পুরুষ পাই নি।

—হ্যাঁ, সেই জন্যই তো আমি জিগ্যেস করছি যে তোমার মন বদলেছে কিনা।

—তা আমি কি করে বলি!

—সে কী রকম, তুমি বলতে পারো না? এখন তুমি সম্মানসূচক ডাক আরম্ভ করেছ। মনে হচ্ছে, মন তোমার পালটেছে।

—সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা কি আমার দিক থেকে গর্হিত? আপনি যে আমার স্বামীর তুল্য।

—বাঃ, যেহেতু তুমি আমাকে স্বামীর তুল্য বলছ, আমিও কি তোমায় 'আপনি' বলে সম্বোধন করব?

—কেন, আপনি কি আমায় ভালবাসেন না? পুষ্পশীলা উঠে এসে রাজেশ্বর রাওয়ের গললগ্ন হল।

"তুমি এমনিতেই সন্দেহপ্রবণ। আজে বাজে সন্দেহ করো না।" সে তার কানে কানে বলল। তারপর দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা শুরু করল।

দিন চারেক পরের কথা। রাজেশ্বর রাও সেদিনে বাগানে ফুলের কেয়ারি তৈরি করছিল। দিনটা ছিল শুক্রবার। ছুটির দিন। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছিল। বাংলোর চারদিকে শুধু পাখিদের কাকলি শোনা যাচ্ছিল।

রাজেশ্বর যে বাগানে কাজ করছে সে কথা পুষ্পশীলার খেয়াল ছিল না। তার ধারণা ছিল যে সে দীঘির ধারে বেড়াতে গেছে। সুশ্রী মুসলিম যুবকটি

রাজেশ্বরের বাড়িতে এসে পুষ্পশীলার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সবকিছু ভুলে গিয়ে পুষ্পশীলা সোফায় বসেই তার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে শুরু করল। ঠিক সেই সময় রাজেশ্বর রাও পেছনের দরজা দিয়ে বাগান থেকে এল।

সামনের দৃশ্য তাকে নির্বাক নিস্পন্দ করে দিল। পুষ্পশীলা এবং মুসলিম যুবকটি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। রাজেশ্বর রাও আগুন হয়ে উঠছিল। মুসলিম যুবকটির গালে সে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিল। মারের প্রচণ্ডতায় সে চেয়ারের উপর গিয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আস্তিন গুটিয়ে সেও ঘুষি চালাতে প্রস্তুত হল। রাজেশ্বর তাকে থামিয়ে দিল। ঘামের ধারা হাত দিয়ে মুছে সে বলল, "মাফ করবেন, আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। তার কারণ সম্বন্ধেও আপনি নিজেই সাক্ষী। আপনি বাড়ি চলে যান!"

পুষ্পশীলা বিবর্ণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ডান দিকের গালটা ডান হাতে চেপে ধরে মুসলিম যুবক বলল, "আমি এখানে থেকে চলে গেলে আপনি হয়তো একে মেরেই বসবেন।"

—হুঁ! তাই যদি তোর ভয় হয় তা হলে একে তুই নিয়ে যা!

পুষ্পশীলা—আপনি চলে যান!

যুবকটি একবার পুষ্পশীলার দিকে এবং একবার রাজেশ্বর রাওয়ের দিকে চাইল। তারপর সে বলল, "এ তো তোমার নয়, আমায় দিয়ে দাও। আমি যাই, আমি একে নিকে করে নেব।"

রাজেশ্বর—কী পুষ্পা, তুমিও কি তাই চাও?

"হলেই হবে।" সে বলল।

রাজেশ্বর—তাই যদি হয় তবে আমার কোনো আপত্তি নেই।

পুষ্পশীলা—"আমি যাব না। আপনি যান!" ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবকটি চলে গেল।

ওরদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজেশ্বর রাও বলল, "পুষ্পা তুই আজ আমার চোখ খুলে দিলি। আমি কৃতজ্ঞ!" তারপর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় সে বেরিয়ে গেল। আর পুষ্পশীলা অচৈতন্যের মতো চেয়ারের ওপর পড়ে গেল।

জাজ্বল্যমান সে আদর্শ আজ তার কাছে সংশয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এবার সে কোন্ আদর্শের জন্য সমাজের বিরুদ্ধে লড়বে। "যুগ যুগ ধরে নারী

নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যে পুরুষকে স্বামী বা রক্ষক বলে মেনে নিয়ে বাস করছে। কিন্তু তাতে সে পুরুষের গোলাম হয়ে যায়নি।"—নারায়ণ রাওয়ের এই কথাই বোধ হয় ঠিক।

চিন্তায় চিন্তায় রাজেশ্বর রাও জর্জরিত হল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তার। তীক্ষ্ণাগ্র হাজার কাঁটার ওপর যেন তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তার স্থির সিদ্ধান্তের ভিত আজ নড়ে গেছে। তার মনের স্বচ্ছ আকাশ দুশ্চিন্তার মেঘে ছেয়ে গেছে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ঈর্ষাহীন পৌরুষ প্রভৃতি সবই তার কাছে অর্থহীন বলে বোধ হল। পুষ্পশীলার স্বামীকে লেখা চিঠিটা এখন তাকেই ব্যঙ্গ করছে। আমার সঙ্গে পুষ্পশীলার স্বামীর এখন আর তফাত কোথায়?

পশুর মতো আমি ওই মুসলিম যুবকটিকে কেন মারলাম? ভগবান কী রকম? আমি আস্তিক নই তবে কেন ঈশ্বরের কথা আমার মনে পড়ল? নারায়ণ রাও আমাকে কেন উপদেশ দিল? সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সবই কি ভুলে ভরা?

আমার মধ্যে ঈর্ষা জেগে উঠেছে। হায়রে, কোনো পথই আজ আর আমার সামনে খোলা নেই। পুষ্পশীলা যদি আমার কাছ থেকে চলে যায় তাহলে আমি কি বাঁচতে পারব? আমার পুষ্পশীলা! আমি তোমায় কী ভালোই না বেসেছি। মুসলিম ছোকরাকে আমি খুন করে ফেলব ভেবেছিলাম। নারায়ণ রাওয়ের কথামত আমিই কি পুষ্পশীলার জীবন বরবাদ করে দিলাম?

ওগো পুষ্পশীলা, ওগো পুষ্পশীলা আমিই কি তোমার সব কষ্টের কারণ? আমার জন্যই কি তোমার এই অধোগতি! না, না, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। কতকগুলো কথা তার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল। শরীরটা যেন তার দুমড়ে কুঁচকে যাচ্ছে। হায়, সে কথাটা সে মন থেকে মুছে ফেলল। সে অহেতুক উদ্বেগ দেখাচ্ছে না তো? আর কোনো পথ নেই। এই, একমাত্র পথ। 'জন্ম তোর বৃথা। বৃথা।' নারায়ণ রাও, পরমেশ্বর, রাজা-রাও এরা দেবতুল্য। 'সন্ধ্যার দিকে নারায়ণ রাওয়ের কাছে কি একবার যাব?' অর্ধেক রাত্রে সে অনেকগুলি চিঠি লিখে ফেলল।

তিনটে প্রায় বাজল।

ধীর পায়ে সে সেই ঘরে এল যেখানে পুষ্পশীলা ঘুমচ্ছিল। সিটিয়ে যাওয়া ফুলের মতো পালঙ্কের উপর সে পড়েছিল।

পুষ্পশীলাকে সে একবার আলিঙ্গন করল। ঘুমের ঘোরে সেও তাকে বুকে বাঁধল।

চোখে তার জল ভরে এল। তাকে পেছনে ফেলে 'পুরুষরাই মেয়েদের দুঃখের মূল।' এই কথা বিড বিড করে বলতে বলতে সে নিজের ঘরে ফিরল। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সে একটা পুরিয়া মুখে ফেলে দিল। তারপর জল খেতে গিয়ে গ্লাসটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। তার হাত কাঁপছিল।

১০। শল্য চিকিৎসা

কোত্তাপেট,

১০ঘ, ২০-৪-২৯

তটবর্তী নারায়ণ

অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, মাদ্রাজ

তোমার বাবার ব্রণ—কাল সকালে মেলে আনা হচ্ছে—রঙ্গচারীর সঙ্গে অপারেশনের ব্যবস্থা করো—স্টেশনে মোটর পাঠিও—ভয় নেহ

রামারাও।

এই টেলিগ্রামটি নারায়ণ রাও হাইকোর্টে পেল। নারায়ণ রাওয়ের মাথা ঘুরে গেল। এ ব্রণটা প্রকৃত পক্ষে কী? ভয়ের কিছু নেই টেলিগ্রামে লিখেছে। দেরি না করে সে ডাঃ রঙ্গচারীর বাড়ি গেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলল। টেলিগ্রাম দেখে তিনি বললেন, "আপনি তাঁকে সোজা আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন। সব ঠিক করে রাখব। অনেক ব্রণই বিপজ্জনক হয়। আবার অনেকগুলিতে কোনো বিপদ থাকে না।" বিপদের কথা নারায়ণ রাও জানতে চাওয়ায় তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন। অপারেশনের পর দু চার দিন যদি তাঁকে থাকতে হয় তাহলে সুব্বারায় মশাইকে তাঁর ওখানে রেখে যে নারায়ণ নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারে সে কথাও ডাঃ রঙ্গচারী বললেন।

পরের দিন সকালে সূর্যকান্তম্ আর নারায়ণ রাও গাড়িতে করে সেণ্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে হাজির হল। দুতিনটি ট্যাক্সি ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। মেল এল। সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করা হয়েছিল। শ্রীরামমূর্তি, রাজারাও লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞ নারায়ণশাস্ত্রী, বেঙ্কায়াম্মা, রমনম্পা, জানকাম্মা, লক্ষ্মীপতির মা শেষম্মা, লক্ষ্মীনরসম্মা এঁরা সুব্বারায়ের সঙ্গে এসেছিলেন।

সুব্বারায়র বাঁ হাতে পট্টি বাঁধা ছিল। তাঁর মুখের ভাব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে দারুণ যন্ত্রণাকে তিনি চেপে রেখেছেন। ছোট ছেলেকে দেখে যন্ত্রণা মাখা মৃদু হাসি মুখে নিয়ে শ্রীরামমূর্তির কাঁধে ভর দিয়ে তিনি নেমে এলেন। নারায়ণ বাও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "বাবা, কেমন বোধ করছ ?"

"যন্ত্রণা রয়েছে, তবে ও কিছু না। এই নাও মুরীও এসে গেছে। কিছু হয় নি রে বেটা! ছোট্ট একটা ফোড়া বেরিয়েছে।" সুব্বারায় বললেন!

পরীক্ষা করে ডাঃ রঙ্গচারী অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। কড়ে আঙুলে একটা তিল ছিল। ওই তিলেব উপব একটা ফুসকুড়ি বেরিয়েছিল। দিন দশেক আগে সেটাই বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও শুরু হয়। হাতটা ক্রমে ফুলে উঠল। সুব্বারায় বলতেন, খাদ্যে তাঁর রুচি নেই। তিনি বড় ছেলের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন শ্রীরামমূর্তি বাজারাওকে ডেকে আনলেন। দেখেশুনে রাজারাও বলল, "মূত্র প্রভৃতির মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে, এটা এক ধরনের বিপজ্জনক ব্রণ।" এ ব্রণ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। এবং ক্রমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং কোন কোন জায়গায় জমেও যায়। এইভাবে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। আঙুলটা হয়তো কাটতেও হতে পারে। মাদ্রাজের ডাঃ রঙ্গচারীর কাছে যাওয়াই ঠিক হবে।" রাজারাও শ্রীরামমূর্তিকে এই পরামর্শ দিল। সে খাবার জন্য এবং লাগাবার কিছু ওষুধও দিয়েছিল। সেই দিনের মেলেই তারা মাদ্রাজের পথে যাত্রা করেছিল এবং নারায়ণ রাওকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল।

রাজারাওয়ের মতো রঙ্গচারীরও আঙুলটা কেটে ফেলাই ঠিক করলেন, সুব্বারায় বললেন যে, ক্লোরোফর্মে তাঁর দরকার নেই। ডাঃ রঙ্গচারী

নিপুণ চিকিৎসক। কয়েকটি ওষুধের সাহায্যে অসাড় করে আঙুলটাকে কেটে দিলেন। ব্রণের ছড়িয়ে পড়া বন্ধ হল। রক্তপ্রবাহ যাতে বন্ধ থাকে তার ব্যবস্থাও করা হল।

সুব্বারায় সারাদিন সেখানেই থাকলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় মোটরে তিনি নারায়ণ রাওয়ের বাড়ি গেলেন।

রঙ্গচারী এসে দৈনিক মলমপট্টী লাগিয়ে যেতেন।

চারদিন পর থেকে তার সহকারী আসতে লাগলেন। খাবার ওষুধ ডাঃ রঙ্গচারী দিচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন দিন-পনেরো বাদে সুব্বারায় স্বগ্রামে ফিরে যেতে পারবেন।

জমিদার শারদাকে নিয়ে সুব্বাবায়কে দেখতে এলেন। সুব্বারায় হাসি-মুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

জমিদার—শুনলাম মেরুপর্বতে বজ্রপাত হয়েছে।

সুব্বারায়—বজ্র! ছোট্ট একটা আঙুল কেটে নিয়ে গেল।

জমিদার—অমৃত নিয়ে গরুড় উড়ে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দেবার জন্য ইন্দ্র বজ্র হানলেন, গরুড়ের একটা পালক খসে পড়ল। আপনি অমৃত নিয়ে যাচ্ছিলেন না তো?

সুব্বারায়—সে যাই হোক, ইন্দ্রকে দেখা গেল। আপনারা সব পুরাণও জানেন যে?

জমিদার—কেন? এ রকম মার মারছেন কেন? পুরাণ জানায় আমার তো মানা নেই।

সুব্বারায়—জমিদার মানুষ, আইনসভায় সদস্য, পুরাণ পড়ার মতো অবসর হয়তো নাও থাকতে পারে, তাই বললাম।

জমিদার—আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিরা সদস্য হতে বললেন তাই হলাম। আমি তো আপনাদেরই প্রতিনিধি। আমি জমিদার আর আপনি হচ্ছেন জমিদারদের জমিদার।

সুব্বারায়—যাই হোক, কথায় আপনিই বড়।

জমিদার—না, আপনিই।

সুব্বারায়—কিন্তু আপনি আপনার জামাইয়ের থেকে কমতি যান।

জমিদার—আপনার ছেলের বয়স মনে হচ্ছে ১৫ বছর। আপনাকে

আপনার বড় ছেলের দাদা এবং আমার চেয়ে ২০ বছরের ছোট বলে মনে হয়।

সুব্বারায়—শুনেছি জ্ঞানী লোকেরা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়।

জমিদার—যেমন যোগীদের যৌবন ফিরে আসে।

দুই বুড়োতে অনেক কথাবার্তা হল।

রাজারাও অমলাপুরম যেতে চাইল কিন্তু নারায়ণ রাও তাকে বাধা দিল। সে দিন পরমেশ্বর লক্ষ্মীপতি রাজারাও সালম এবং এক ক্ষত্রিয় বন্ধু রাঘব রাজু সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেল। রাঘবরাজু আলমকে বলল "ক্ষমতা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের আমরা সে তুলনায় কী এমন? নারায়ণ রাওয়ের বাবাকে দেখ, ক্লোরোফর্ম না নিয়েই তিনি আঙুল কাটিয়ে ফেললেন। তুমি আমি কি পারব? আমাদের সে ক্ষমতা আছে! সে সাহস আছে?"

আলম্—কেন ভাই? তুই এক মস্ত বড় ক্ষত্রিয়, তলোয়ার নেই, কলম ধরেছ।

পরমেশ্বর—জনাব যখন উকিল হতে পারেন, ক্ষত্রিয়ের তখন কলম ধরায় দোষ কোন্খানে?

আলম্—আল্লা, আল্লা এ-ও কবি। নবাব হলে একে আমি ভরা দরবারে দশ ঘা বেত লাগাতাম।

পরমেশ্বর—নবাবদের দরবারে আমরা যাব কেন? আমাদের কি রাজা নেই? শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজেশ্বর রাঘব রায়লমজীর দরবারে যাব।

রাঘবরাজু—একটি অক্ষরের জন্য লক্ষ দান দেবেন। আরে নারায়ণ রাও মন্ত্রী, আমার কোষাগার থেকে এই কবিকে দশ পয়সা দান করে দাও।

আলম্—ওরে রাজারাও উজীর। এই কবিকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শোভাযাত্রা বের করো—বের করো থ্রি-ক্যাসল্স্।

নারায়ণ—হুঁকো গুড়গুড় করার কোন দরকার নেই। এই নে আমার কাছে 'স্টেট এক্সপ্রেস' রয়েছে।

রাঘবরাজু—ওহে নারায়ণ রাও, অহিংসাবাদীরাও সিগারেট খেতে পারে? তুই আর তোর অহিংসা, উকিলে আর অহিংস-সিগারেটের বেশ মিল আছে।

পরমেশ্বর—গাঁইয়া কোথাকার, আমরা কী জানি, তুই বুঝতে পারবি। ধোঁয়া যাতে না লাগে, তারি জন্যে সা-রে-গা-মা।

আলম—এটা বোধহয় কবিতা ?

বালির উপর সবাই বসে ছিল। রাজারাও মাথা নিচু করে একটু আলাদা বসেছিল। কিছু একটা সে ভাবছিল। আলম রাজারাওয়ের কাছে গিয়ে বলল, "রাজা তোর বন্ধুদের মন তোর জন্য ভারাক্রান্ত। তোর দুঃখ দেখে পাষাণও গলে যায়। আমাদের মধ্যে তোর মনটাই সবচেয়ে শক্ত !"

রাজারাওয়ের চোখ থেকে জলের ফোঁটাগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল।

১১। পরিবর্তন

নারায়ণ রাওয়ের বাবার অপারেশনের সময় শ্যামসুন্দরীও সেখানে ছিল। পরে নারায়ণ রাওয়ের কাছে গিয়ে সে বলেছিল, "দাদা, তোমার বাবা ঠিক ভীষ্মের মতো। যেমন তাঁর শক্তি, তেমনি সাহস। আর শরীরও কেমন ? তোমাদের দুজনের সমান তিনি একলা। তাঁর দেহ তোমাদের চেয়ে শক্ত এবং সুগঠিত। তার মুখ দেখে মনে করার উপায় ছিল না যে তিনি যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। আমার খুব আশ্চর্য লেগেছে। তাঁর পদ সেবার অধিকার পেলে আমি বর্তে যাই। উনি আমার বাবা। ওঁর কষ্টে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ।" তার চোখে জল টলটল করে উঠল।

তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে নারায়ণ বলল, "তুমি প্রেমময়ী।" সে নিজের গাড়িতে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

শ্যামসুন্দরীর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে রাজারাও খুব সাহায্য করেছিল।

কলেজ ছাড়ার পরে বছরখানেক সে নানা জায়গায় প্র্যাকটিস করেছে। শেষে অমলাপুরমে এসেছে। তার ছোঁয়ায় সব কিছুই সোনা হয়ে যেত। রোগীর অবস্থা এবং রোগ নির্ণয়ে রাজা রাওয়ের দেরি হত না। এ লাইনে আসার প্রথম দিন থেকেই সে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাল ভাল বই পড়ত। তার চিন্তাধারাও ছিল স্বচ্ছ। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে অথবা ব্রহ্মবিদ্যার কারণে রাজা রাওয়ের মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় শক্তি বা ইনটিউশন এসে গিয়েছিল। সেইজন্যই সে চক্ষের নিমেষে রোগ ধরে ফেলত। ওষুধও দিত নির্ভুল। অমলাপুরম্ আর তার আশপাশের লোকরা বলত, "আয়ু যদি

থাকে তবে তাঁর হাতে রোগী বাঁচবেই। কী ভাল ডাক্তার! ওঁর হাতে জাদু আছে।

রাজারাও তার পিতার এবং নারায়ণ রাওয়ের সাহায্যে তিন হাজার টাকা জোগাড় করে ডাক্তারি শুরু করল। অমলাপুরমে একটা বড় বাড়ি সে ভাড়া করল, সেটাকে প্রয়োজনমত অদলবদল করে নিল। ওষুধপত্রের জন্য একটি, ভাঁড়ার হিসাবে একটি, রোগীদের জন্য একটি, বিশ্রামের জন্য একটি এবং বৈঠকখানা হিসেবে একটি, এই মোট পাঁচটি ব্যবহারযোগ্য ঘর তার কাজে লাগাল। এ ছাড়াও দুটি ঘরের একটিকে সে অপারেশন থিয়েটার এবং অপরটিকে ল্যাবরেটরি করেছিল।

ভ্রমণ সাঙ্গ করে নারায়ণ রাও অমলাপুরমে আসার পর ডাক্তারখানাটা আরও সুন্দর এবং সুষ্ঠু করে তোলায় সেও অনেক সাহায্য করল। রোগীদের ঘরটি সুসজ্জিত হয়ে উঠল নানা রকমের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নরনারীর ছবিতে।

নারায়ণ রাও অনেকগুলি ভারতীয় চিত্রের সাহায্যে রাজারাওয়ের ঘরটিকে অলংকৃত করল। চিকিৎসালয়ের জায়গায় উপনিষদ, যোগসূত্র, এবং ভগবদ্গীতার বাণী টাঙিয়ে দেওয়া হল। রোগীদের বসার ঘরে সাধারণ রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা রকম লেখা প্ল্যাকার্ড লাগান হয়েছিল। মহীশূর চন্দন-কাঠ অথবা অন্য কিছুর ওপর খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের নানা ভঙ্গীতে কতকগুলি মূর্তি মাদ্রাজ থেকে পাঠিয়ে দেবার জন্য রাজারাও নারায়ণ রাওকে লিখেছিল। নারায়ণ রাওয়ের পাঠানো সেই মূর্তিগুলিকে সে চিকিৎসালয়ের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল। "দেহের মনের এবং আত্মার চিকিৎসক হবার জন্যই আমি এসব রেখেছি। দ্বিতীয় আর তৃতীয় প্রশ্ন তো আমার নিজেরই জন্য।"—সে প্রায়ই তার বন্ধুদের একথা বলত।

ডাক্তারখানার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধ, তা সে যত দামই হোক না কেন, সে আনিয়ে রেখেছিল। তাড়াতাড়ির সময় টেলিগ্রাম করে মাদ্রাজ থেকে ওষুধ আনিয়ে নেওয়া তার পোষাত না।

"রাজারাওয়ের হাসপাতালে যে সব ওষুধ পাওয়া যায় কাকিনাড়া শহরের হাসপাতালেও তা পাওয়া যায় না।" গ্রামের লোকেরা সব সময় বলত।

গ্রামে ঘোরার জন্য একখানা মোটর সাইকেলও সে কিনেছিল। যেখানে

সেখানে যাবার জন্য তার কাছে দুটি বাক্স, আর একটি খদ্দরের থলি থাকত। থলিটা খুবই ছোট। লম্বায় আট আঙুল। তার মধ্যে দুটি ভাঁজ ছিল। যার একটিতে থাকত স্টেথোস্কোপ, আয়ুর্বেদীয় বড়ি এবং পরমেশ্বরের কাছ থেকে উপহার পাওয়া হাতির দাঁতের একটি কৌটা আর দ্বিতীয়টিতে থাকত সিরিঞ্জ প্রভৃতি।

বড় বাক্সদুটিতে ছোট খাটো একটি হাসপাতালই যেন ভরা ছিল। বিশেষ বিশেষ ওষুধ, অপারেশনের কিছু উপকরণ এবং বহু রকমের পাউডার ইত্যাদি ওর মধ্যে ছিল। প্রথম মাসে রাজারাওয়ের রোজগার হয়েছিল শ'দুয়েক টাকা। দ্বিতীয় মাসে সেটা দাঁড়াল চার শোয় এবং তৃতীয় মাস থেকে আয়ের অঙ্ক পাঁচশোয় উঠল। নারায়ণ রাওয়ের হাজার টাকার ধার সে শোধ করে দিল।

ও অঞ্চলে তার নাম ছড়িয়ে পডতে লাগল। চিকিৎসার জন্য লোকে তাকে নানা জায়গায় নিয়ে যেতে লাগল।

এরই মধ্যে কোথা থেকে মৃত্যু এল। শিশু দুটি হয়ে পড়ল মাতৃহীন।

ঠিকমত ভালবাসতেও সে যখন শেখেনি সেই সময় ঘরে বৌ এসেছিল। বার বার বিবেকানন্দের বই পডে এবং জ্ঞানানন্দের বক্তৃতা শুনেই বা কী লাভ তার হয়েছে? তাঁদের দর্শন তার মনে গেঁথে যায় নি।

রামমোহন রায়ের উপদেশ আর বীরেশলিঙ্গমের নির্দেশের মধ্যে কি সামাজিক সত্যের সন্ধান মেলে? তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কি অতি অল্প বয়সে ঘর করতে এসেই নষ্ট হল?

বৌটি ছিল তার গোমাতার মতো। প্রেমময়ী। আচ্ছা, সে কি তাকে জেনেছিল! সে যে তার সন্তানদের গর্ভধারিণী মাত্র—এই কথাটাই সে জেনেছিল। "হে ঈশ্বর, আমি কী করব? এ কী পরীক্ষা? তুমি আমায় যাচাই করতে চাও? ছোটবেলা থেকেই আমি অভাগা। আমার স্ত্রীকেও আমি সেইজন্যই বাঁচাতে পারলাম না। আমার সন্তানদের আমি মাতৃহীন করে দিয়েছি।"—রাজারাও এই কথাই ভাবত।

বন্ধুরা চাইত সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করুক। রাজারাও তাদের বলল, "আপনারা সে চেষ্টা করবেন না, বাইরে থেকে দেখলে তাকে আগের মতোই মনে হত। কিন্তু এখন তার আর নাটক ভাল লাগে না, গানের নামে

-পেটের ব্যথা শুরু হয়। কবিতার কথায় তার কান কটকট করে, শিল্পের নাম শুনলে সে পালিয়ে বাঁচে।

তার কষ্টের কথা জিগ্যেস করলে সে উলটো প্রশ্ন করত, "কার কষ্ট? আত্মার?"

পরমেশ্বর রাজারাওকে বলত একেবারে হতভাগা। কচিৎ কখনো সে সিনেমায় যেত বন্ধুদের সঙ্গে। আর সংগীত সম্মেলনে যদি বা যেত তাও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।

সেই রাজারাওয়ের কান্নায় আজকাল পরমেশ্বরও কেঁদে ফেলে। পুরাণ পড়তে পড়তে রাজারাও তন্ময় হয়ে যায়। রোগী যদি নিজে থেকে ফি দেয় তবে নেয় নতুবা নয়।

সে নিজের অন্তর খুঁজে দেখল। কৃষ্ণলীলার মূর্তিগুলির প্রকৃত অর্থ আজ সে অনুভব করতে পারল। ভগবদ্গীতায় পুরুষোত্তমের তত্ত্ব তার কাছে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে।

"হে কৃষ্ণ আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ভক্তিহীনের হৃদয়ে তুমি ভক্তির সঞ্চার করেছ," এই কথা ভেবে, চশমা খুলে চোখ বুজে সে প্রণাম করল।

১২। আত্মহত্যা

"নারায়ণ রাওয়ের ওপর থেকে আমার মন কী করে সরবে?" শ্যামসুন্দরী ঘুরে ঘুরে এই কথাই ভাবতে লাগল। নারায়ণ রাওয়ের প্রতি তার অনুরাগের প্রকৃতি সম্বন্ধেই সে চিন্তা করছিল। সে অনুরাগে কামগন্ধ ছিল না। সে জিনিস তার মনে একবারই মাত্র এসেছিল। কামার্ত মন নিয়ে সেও যদি আজ আসে তা হলে তাকে নিরাশ হতে হবে। সে দিন তার সারা অঙ্গে পুলক লেগেছিল। আজ কিন্তু তাকে স্মরণ করে তার মধ্যে মনোবিকার দেখা যাচ্ছে না। সেই মুহূর্তের আনন্দ তার জীবনপথকে আলোকিত করে দিয়েছে। একথা সে অনুভব করেছে। সে দিন থেকে সমগ্র জগৎ তার কাছে ভাবের সাগরে ডুবে আছে বলে তার মনে হয়েছে। 'আমি সবাইকে ভাল-

বাসি। সবাই আমাকে ভালবাসে। আমি মূর্তিমতী প্রেম। ভালবাসার অধিকার আমার আছে!' এই দিব্য বাণী সর্বদা যেন তার কানে প্রতিধ্বনিত হত। সেদিন থেকে সবাইকে সে ভালবাসে। রাজারাও, এর মধ্যে, সুব্বারায়ের অসুস্থতার সময় এসে ছিল। রাজা রাওয়ের স্ত্রী কি মারা গেছে? সংসারসাগর পার হবার নৌকো তার ভেঙেচুরে গেছে? তার হাতে হাত রেখে চলার জীবনসঙ্গিনীকে সে হারিয়েছে? শুনেছি তার দুটি শিশুসন্তান আছে, তাদের দেখাশুনা কে করবে? রাজারাওকে বিয়ে করার পথে বাধা কোথায়? ছিঃ! এ কেমন চিন্তা। নারায়ণ রাও একদিন তাকে বলেছিল সে দার্শনিক, তার মন কঠিন হয়ে গেছে। সে কি বিয়ে করবে? আহা! বাচ্চাগুলোর কপালে কী আছে কে জানে? সুরমাম্বা যে সৎ চরিত্রা ছিলেন সে কথাও নারায়ণ রাও বলেছিল। তাঁর কথা স্মরণ করে নারায়ণ রাওয়ের চোখে পর্যন্ত জল এসে গিয়েছিল। সব শুনে সূর্যও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। সুরমাম্বা খুবই পতিব্রতা ছিল।

এইসব নানাচিন্তার মধ্যেই শ্যামসুন্দরী পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ রোহিণী খবর দিল যে রাজেশ্বর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

"এ কেমন করে হল? তার মতো আনন্দময় মানুষের বিষ খেয়ে মরার ব্যাপারটা কী রকম?"

নারায়ণ রাও, রাজা রাও, লক্ষ্মী এবং পরমেশ্বর ঠিক সেই সময় এসে পড়ল।

নারায়ণ—রাজেশ্বর রাও বিষ খেয়ে মারা গেছে। আমার কাছে এইমাত্র টেলিগ্রাম এল। তোমার পড়া নষ্ট করছি। আমার কাছে দুটি চিঠি এসেছে। হায়দ্রাবাদ থেকে পুলিশের লোকেরা টেলিগ্রাম করেছে। চিঠি দুটো রাজেশ্বর রাও বিষ খাবার আগে লিখেছিল। তার মধ্যে একটা তোমায় লেখা। সেটা আমি এখনো খুলিনি। আমার মারফতে সে তোমার কাছে লিখেছে।

কাঁপা হাতে শ্যামসুন্দরী চিঠিটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখল। তারপর সে বলতে থাকল, "বন্ধুরা আমার কাছে একমায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। আমি আপনাদের সব বলছি। তিন বছর আগে রাজেশ্বর রাও আমাদের এখানে বন্ধুর মতো এসেছিল। আরেকজন বন্ধু তাকে পরিচয় করিয়ে

দিয়েছিল। সে সব সময় ছবি আঁকা আর গান গাওয়াকে বিদ্রূপ করত। প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত। 'মুক্ত প্রেম' সম্বন্ধে সে একদিন বক্তৃতা করেছিল। তারপর সে বলেছিল, 'আমি তোমায় খুব ভালবাসি। তোমার মধ্যেও যদি আমার প্রতি ভালবাসা থাকে তা হলে আমায় গ্রহণ করো!' আমি কিছু বলতে পারি নি। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছিলাম। 'দূর হ, রাক্ষস! সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মর!' তারপর, আর কোনোদিন আমি তাকে দেখি নি। তোমার কথায় আজ আমি জানতে পারলাম যে সে তোমার বন্ধু। তুমিই এ চিঠি পড়ে সবাইকে শোনাও।"

বাঘিনীর মতো রাগে সে ফুঁসছিল। ঘৃণায় তাকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

খামের মুখটা ছিঁড়ে নারায়ণ রাও চিঠিটা পড়তে শুরু করল—
"শ্যামসুন্দরী দেবী,

নমস্কার! এই নরাধমকে হয়তো এতদিনে আপনি ভুলে গিয়ে থাকবেন। সেদিন আপনার বজ্রগর্জনে ভয় পেয়ে আমি উঠে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আদর্শের সততা সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম, এবং সে আদর্শের কথা আমি আপনাকে বলেও ছিলাম। তারপর, আমি আমার আন্তরিক ইচ্ছার কথা বলে ফেলেছিলাম। কোনো নারীর প্রতি আমার কু-দৃষ্টি ছিল না। এতদিনে আমি বুঝেছি যে ঈশ্বরের প্রকাশ যদি কারো মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছে নারীর মাধ্যমেই। আর শয়তানের অবতার হচ্ছে পুরুষ।

আমার বন্ধুরা জানিয়েছিল যে সেদিনের ওই কথা শুনে আপনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেইজন্য আমার চিঠি লেখার দরকার হল। আমার আদর্শের মধ্যে অসততা ছিল না। আমি নিজে একজন নগণ্য মানুষ। আমার মুখ আর মন আলাদা কথা বলে না। সে জন্য আমার মনে ভালবাসার উদ্রেক হবার সঙ্গে সঙ্গে তা আমি জানিয়েছিলাম। সেদিন থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে আগ্রহী। কিন্তু সেরকম কোনো সুযোগ আসে নি। আমার চিন্তাধারার যথার্থতা সম্বন্ধে আজ আমার মনে দ্বিধা জেগেছে। তাই, আমি পৃথিবীর মায়া কাটাতে যাচ্ছি, এ বিষয়ে নারায়ণ

রাওয়ের চিঠিতে লিখেছি। আপনি যদি আমায় ক্ষমা করেন তবে আমার আত্মা—অবশ্য সেরকম কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রকৃতই যদি থেকে থাকে—শান্তি লাভ করবে। নমস্কার।

রাজেশ্বর।"

চিঠির ভাষা শুনে সকলেই যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। শ্যামসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে নারায়ণ রাও বলল, "তার আত্মার হয়ে আমি তাকে ক্ষমা করার জন্য তোমায় অনুরোধ করছি।"

শ্যামসুন্দরীর চোখ ছলছল করে উঠল। "আমার মনে সে ঐরকম ধারণার সৃষ্টি করেছিল বলেই তার আত্মাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হল। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

বন্ধুরা সব নীরবে এগিয়ে এল। রোহিণীদেবী কাছে এসে জিগ্যেস করল, "নারানদা, রাজেশ্বর রাও কি বিষ খেয়ে মরেছে?"

—হ্যাঁ!

—কেন?

—এ চিঠিটা পড় তার পর বলছি।

চিঠিটা নিয়ে রোহিণী পড়তে আরম্ভ করল।

"প্রিয় ভাই আমার, পাপিষ্ঠ আমি, বিদায় নিচ্ছি। আমায় বহু দূরে যেতে হবে, না এখানেই বাঁধা থাকতে হবে তা জানি না। কিন্তু এ পর্যন্ত আমি আনন্দের সঙ্গেই বেঁচেছি। যোদ্ধা অভিমন্যুর মতোই আমি এ জীবনকে ত্যাগ করছি। না, ত্যাগ করছি না, শেষ করছি। কেন? সে যাই হোক, তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না।

পুষ্পশীলা সব ভ্রমরকেই তার মধু বিলিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ নামটি রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারই বা কী করার আছে? আমিই তার জীবনের নোঙর তুলে দিয়েছি।

ভ্রমরের কাছে সে হচ্ছে ফুলের মতো। তা দেখে আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগছিল। এটা যে আমার পক্ষে অনুচিত সে কথা আমি নিজেকে কত বুঝিয়েছি। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। আমাদের সমিতির চিন্তাধারার বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার নিজের চিন্তাধারা। আমার আদর্শ সবই অর্থহীন হয়ে গেছে।

যাই হোক, তোমার সব কথাই আমি ভেবে দেখেছি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। হয়তো বা তোমার কথাই ঠিক, এরকম মনোভাবও আমার মধ্যে এসেছে। সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। বিদ্বেষ বেড়েই গেল! পুষ্পশীলা অন্য একজনের সঙ্গে চলে গেল এবং অন্তর্জ্বালায় আমি জ্বলতে থাকলাম। এ যদি হয় তাহলে?

পুষ্পশীলাকে না ভালবেসে তো আমি থাকতে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি। সে আমায় ছেড়ে চলে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব? আমার প্রতি তার মনোভাবের উষ্ণতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। ধরা গেল যে আমি তাকে বাদ দিয়েই থাকলাম। তাহলে জীবনের অর্থই বা কী রইল? আরও জন্ম আছে। বেশ! আবার জন্মাব। তখন অন্তত আমার মনের এই ঝঞ্ঝা আর আগুন হয়তো শান্ত হবে। আমি সত্যকে খুঁজে পাব।

না, যে জীবনকে আমি এত আনন্দে কাটিয়েছি তা যদি এখনই শেষ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য দুঃখিত হব কেন?

তুমি, পরমেশ্বর, রাজা, আলম্, সত্যম্, রাঘব এরা আমাকে ভীষণ ভালবেসেছ।

আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

আমি ধীরস্থিরভাবে, নির্ভয়ে নিজের জীবনকে শেষ করে দিচ্ছি।

চিঠিটা সবাইকে দেখিও। আমি তোমাদের আলিঙ্গন জানাচ্ছি।

নমস্কার।

রাজেশ্বর।

পুনশ্চ—আমার মাকে একটু প্রবোধ দিও। বুড়ো মানুষ। রাজেশ্বর।"

রোহিণী চিঠি পড়া শেষ করল।

নারায়ণ—কাপুরুষ নয়, সঠিক পথ সে খুঁজে পায় নি। আমার কথাগুলোও যে তার মৃত্যুর অন্যতম কারণ, একথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। কী প্রাণ ছিল তার!

রাজারাও—এ সব কথা কেন বলছ, নারায়ণ?

পরমেশ্বর—কী আর বলব, কার মন কখন কোন্ দিকে যায় কে জানে?

১৩। বেদান্ত বোধ

শারদা মাদ্রাজে তার শ্বশুরবাড়িতে ক্রমে ক্রমে মিলেমিশে গেল। বৌদির সঙ্গে সূর্য খুব অন্তর দিয়ে কথা বলত। মুখে তার সব সময় 'বৌদি' ডাকটি লেগেই থাকত। শারদা একলা গিয়ে কোথাও বসলেই সে গিয়ে গল্প জুড়ে দিত।

প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসে শারদা সূর্যকান্তমের সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলত না। মাদ্রাজ আসার পর তাদের বন্ধুত্ব আরও জমে উঠেছিল।

এখন শারদা শাশুড়ী আর ননদদের সঙ্গে কথা বলে। কোনো প্রয়োজনে শ্বশুর সূর্যকান্তম্‌কে ডাকলে সে গিয়ে জিজ্ঞেস করে "কী চাই?" সুব্বারায় বলেন, "তুমি কেন কষ্ট করবে মা?" তৎক্ষণাৎ সে সূর্যকান্তম্‌কে ডেকে আনে।

এই পরিবর্তন তার মধ্যে কীভাবে এল, কেন যে সে শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, তা সে নিজেই জানে না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে না বলেও দু-একবার সে ভেবেছে কিন্তু কথা যেন আপনি আপনিই বেরিয়ে যেত। ভালবাসা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। এটা তার বাবার প্রভাব। শ্বশুরবাড়িতে একটু পরিচিত হতেই স্বভাব তার ক্রিয়া শুরু করে দিল।

শারদা চুল বাঁধা শিখে ফেলেছিল। ছেলেপিলেদের খাওয়ানোও সে রপ্ত করে নিয়েছিল।

বোন তার স্বামীর কাছে এসেছে এবং স্বামী তার বাপের চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজ এসেছে জেনে সন্তানদের নিয়ে শকুন্তলা অনন্তপুরম থেকে মাদ্রাজ এল। মাদ্রাজে পিসতুতো ভাইয়েদের ওখানে সে উঠল।

নারায়ণ রাওকে শ্রদ্ধা করতে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও তার বেড়ে গেল। জগমোহনের বিয়ের পর সে যখন স্বামীর কাছে গেল তখন থেকে স্বামী রাগ দেখালেও সে কিছু বলত না। সেইদিন থেকেই স্বামীর পরিচর্যায় সমস্ত ভার সে নিজের হাতে তুলে নিল। স্নানের জন্য সে জল রাখত। পরার কাপড় গুছিয়ে এগিয়ে দিত।

স্বামীর কাজে চাকরবাকরদের হাত লাগাতে দিত না। বৌয়ের এই

পরিবর্তনে বিশ্বেশ্বর রাও খুব নম্র হয়ে উঠেছিল। গার্হস্থ্যের সব ব্যাপারেই শকুন্তলা বেশ মনোযোগ দিল। স্বামীর ভাল বিছানা ছিল না। রায়েলসীমার ভাল তুলো দিয়ে সে গদি বানিয়ে দিল। খদ্দরের নানা রঙের চাদর কিনল। স্বামীর পালঙ্কে বড় একটা মশারি লাগিয়ে দিল। খাওয়ার পর নিজে পান সেজে দিতে লাগল। এসব দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বিশ্বেশ্বর রাও জিজ্ঞাসা করল, "এ কী, এত ভক্তি কবে থেকে এল? কিছু মতলব আছে নাকি?" ইঁটের জবাব পাথরে দিতে অভ্যস্ত যে শকুন্তলা, সে কিন্তু কোনো জবাব না দিয়েই চলে গেল! তারপর জানা গেল সে পোয়াতি।

আনন্দরাওয়ের গাড়িতে করে শকুন্তলা তার ছেলেদের নিয়ে নারায়ণ রাওয়ের বাড়িতে এল। শারদা খুশী হল, সুব্বারায়কে সে দেখতে এসেছে জেনে জানকম্মা খুবই আনন্দিত হলেন। আসার সঙ্গে সঙ্গেই বোনকে নিয়ে সে সুব্বারায়ের ঘরে গেল। তাঁকে প্রশ্ন করল, "আপনার অবস্থা কেমন?" শকুন্তলাকে চিনতে পেরে সুব্বারায় বললেন "মা বস, শারদা বস!" শারদা আর আর শকুন্তলা সেখানেই সোফার উপর বসে পড়ল। "বাবা লিখে ছিলেন যে আপনি অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য এখানে এসেছেন! বোনও লিখেছিল যে আপনার অপারেশন হয়ে গেছে এবং অবস্থা ভালর দিকে। চিঠি পাওয়া মাত্র ওঁকে বলে চলে এসেছি। ঘা শুকিয়ে এসেছে মনে হয়?

—আঙুলটা কেটে ফেলা হয়েছে, মা।

—কেন?

—আঙুলে একটা ফোড়া হয়েছিল। সেটা প্রায় পচে গিয়েছিল। তাই কেটে ফেলা হল।

—কোন্ আঙুলটা?

"বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা। ছেলেপুলেরা এবং আর সবাই ভাল আছে তো! এ দুটি কি তোমার?" সুব্বারায় হাসি মুখে শিশু দুটিকে কাছে ডাকলেন। বড়টিই সুব্বারায়ের কাছে গেল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন "যাও সোনা, খেলা করোগে!"

খাওয়া দাওয়ার পর মেয়েরা সব একসঙ্গে বসে ছিল। বেঙ্কায়াম্মা ইতিমধ্যে দিদিমা হয়েছে। বকবক করা তার স্বভাব। আগ বাড়িয়ে কথা বলে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোয় সে ছিল সিদ্ধহস্ত।

যজ্ঞনারায়ণ শাস্ত্রী বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতিতে পৌরোহিত্য করতেন। বেদও অল্পবিস্তর আয়ত্ত করেছিলেন। সারা গ্রামের যজমানী তাঁর হাতে ছিল। যজ্ঞনারায়ণ শাস্ত্রীর সংসারটা খুবই বড়। তাঁর আশি একর ফসলী জমি ছিল। বাড়িতে তাঁর পাচক না থাকায় মেয়েদেরই রান্নাবান্না করতে হত। বাপের বাড়িতে কোন দিন কাজ করার অভ্যাস বেঙ্কায়াম্মার ছিল না। তাই শ্বশুরবাড়ির বেঙ্কায়াম্মাকে দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত, শারদাকে কাছে ডেকে সে বলল, "দিদিকে ভাল করে আদর যত্ন করছ তো?"

শকুন্তলা—সে কি কথা বৌদি, আমাদের ঘরের মেয়ে আমাদের খাতির করবে, এর মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে?

বেঙ্কায়াম্মা—এই রে ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে। আমাদের ঘরের বৌ হবার পর কি আর তোমাদের ঘরের মেয়ে আছে? ও আসলে আমাদের না তোমাদের এটা তোমার জানা উচিত।

শকুন্তলা—তটবর্তীর লোকেদের সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা যাবে না। আপনার বড়দা উকিল, ছোটদা উকিল আর তাই আপনিও উকিল। আপনার জবাব দিতে আমি অক্ষম।

জানকম্মা—সে কি বৌ, তোমার স্বামী হচ্ছে কালেক্টর। তাঁর সামনেই উকিলদের গিয়ে সওয়াল জবাব করতে হয়। স্বামী কালেক্টর হলে স্ত্রী কি নয়? উকিলরা যতই বকর বকর করুক তারা তার কথাকে ঠেলতে পারে না।

শকুন্তলা—আপনি তো হাইকোর্টের উকিল। বৌদি আর আপনি জোট বাঁধলে কালেক্টরেরও কিছু করার সাধ্য থাকবে না।

সকলে সরবে হেসে উঠল। কাজকর্ম সেরে লক্ষ্মীনরসম্মাও সেখানে এসে বসে পড়ল। "বৌ আমার কী বলছে? আমার বোন হাইকোর্টের উকিল? আমার ভাইতো গভর্নরের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য, অর্থাৎ গভর্নর। তার মানে শকুন্তলাও গভর্নর। এবং গভর্নরের সামনে উকিল কী বলবে?"

শকুন্তলা জোরে হেসে উঠল। "এখানে আমার পক্ষ সমর্থন করার কেউ নেই বলে আমি হার মানছি।" শারদা হাসিমুখে সূর্যকান্তমের সঙ্গে উঠে গিয়ে শাশুড়ী এবং অন্যান্যদের জন্য পান সাজতে বসল।

এর মধ্যে রোহিণী, সরলা এবং নলিনী তাঁদের মায়ের সঙ্গে ভিতরে এল। শ্যামসুন্দরীর পরীক্ষা ছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের এই মেয়েগুলির বাড়িতে আসা লক্ষ্মীনরসম্মা পছন্দ করত না। আইবুড়ো থেকে মেয়েগুলো পড়াশুনো করছে এবং ওদের মা দুবার বিধবা হয়েছে শুনে পর্যন্ত তার ধারণা হয়েছে যে বিশ্বসংসার রসাতলে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নারায়ণ রাও তার জাতিকুল খোয়াচ্ছিল বলে সে মনে করত। শহরে থাকাই বিপজ্জনক।

বড়মাসির কথা বুঝতে পেরে বেঙ্কায়ম্মা তাকে বলল, "দুটো কবিতা বল!" লক্ষ্মীনরসাম্মা মধুকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করল যার ভাবার্থ হচ্ছে—

গুরু শিষ্যকে বলছেন, অন্নের সূক্ষ্ম অংশ মন আর জলের সূক্ষ্ম অংশ হচ্ছে প্রাণ। এই দুয়ের মিলনেই চেতনার সৃষ্টি।

বেঙ্কায়াম্মা—অন্ন থেকে মন কী ভাবে হতে পারে?

লক্ষ্মী—হজম হওয়ার সাতদিনের মধ্যে অন্ন রস হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে বদলে যায় রক্ত, মাংস, অস্থি এবং মজ্জায়। এরা মিলিত হলে তৈরী হয় পিণ্ড। ওই পিণ্ডে মন এবং প্রাণ এসে প্রবেশ করে অন্নের সঙ্গে অষ্টমাংশ আকাশ এবং অষ্টমাংশ বায়ু মিশলে মন তৈরি হয়।

"প্রাণ অষ্টমাংশ, বায়ু অষ্টমাংশ। আমরা যে জল খাই তার মধ্যেও বায়ু আছে।"

"কী ভাবে?"

"নির্গুণ থেকে মূল, প্রকৃতি, তা থেকে তিনটি গুণের উৎপত্তি। তা থেকে আবার মহত্ত্ব, মহত্ত্ব থেকে অহঙ্কার আর অহঙ্কার থেকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চামৃত। এই পঞ্চামৃতদের পরস্পর সম্মিলন থেকেই জগতের সৃষ্টি।"

১৪। অপেরা

লক্ষ্মীপতি আর নারায়ণ রাও সে রাতে সূর্যকান্তম্ এবং শারদাকে নিয়ে এলফিনস্টোনে নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে গেল। পরমেশ্বর, আলম, রাঘবরাজু এবং রাজারাও তাদের সঙ্গে হলের কাছে মিলিত হল। নারায়ণ রাও আগেই দশটাকার টিকেট কেটে রেখেছিল। গদি আঁটা চেয়ারে আগে লক্ষ্মীপতি

তারপর সূর্যকান্তম্ আর শারদা বসল। শারদার পাশের সীটটা নারায়ণ রাওয়ের জন্য ছেড়ে দিয়ে বন্ধুরা বসে পড়ল।

এই ব্যবস্থায় নারায়ণ রাও এবং শারদা উভয়েই খুশি হল। শারদার আনন্দোৎফুল্ল রূপ অন্ধকারে আর কে দেখবে?

নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হল। নৃত্যনাট্য গোছের নাচ। নায়ক-নায়িকা নেচে চলেছে। নায়িকার সঙ্গে দশজন এবং নায়কের সঙ্গে কুড়িজন শিল্পী মঞ্চে উপস্থিত ছিল। বিচিত্রবর্ণের পোশাকে তারা সজ্জিত। "এদের কী অদ্ভুত লাগছে।" লক্ষ্মীপতি বলল।

সবার পোশাক এবং মুদ্রা একই। কাহিনীর নায়ক এসে প্রথমে নৃত্য শুরু করল, অন্যেরা তাকে অনুসরণ করল। সে এগিয়ে এসে গান ধরল।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নৃত্য আর সংগীত সমানে চলল।

পোশাক এবং অলংকার ছিল অতি সুন্দর। নৃত্যশিল্পীদের সৌন্দর্যে দর্শকরা মুগ্ধ হল।

নৃত্যনাট্যটির গল্পাংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। নৃত্যই তার মধ্যে প্রধান। গায়কের কণ্ঠে ছিল রুদ্রসমুদ্রের গাম্ভীর্য। তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চতম পর্দায় উঠছিল। গায়িকাদের কণ্ঠও ছিল জলদ।

নাটক যখন জমে উঠেছে সেই সময় শারদা নিজের অজ্ঞাতেই তার হাতখানি স্বামীর হাতের উপর রাখল। স্পর্শসুখে রোমাঞ্চিত সে তার হাতকে আর সরিয়ে নিতে পারল না। স্বামী বোধহয় খেয়াল করছে না এই ভরসায় হাতটা সে সেখানেই রাখল। প্রেমের আবেশে সে শিহরিত হল। তারপর এক সময় লজ্জায় হাত সরিয়ে নিল।

বিরতির সময় নারায়ণ রাও এবং তার বন্ধুরা বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে এল। নারায়ণ রাও দামী চকোলেট নিয়ে এল। সূর্যকে সেগুলো দেবার জন্য সে শারদার উপর ঝুঁকে পড়েই আবার নিজেকে সামলে নিল।

স্বামীস্ত্রীর দেহে যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। নৃত্যের শেষাংশে শারদার মনে হল, সে যেন নিজেই নৃত্যপরা। আনন্দে সে তন্ময় হয়ে গেল। দর্শনীয় দৃশ্যের কথাও সে ভুলে গেল।

আড়চোখে সে স্বামীকে দেখল। অন্ধকারের মধ্যে মনে হল সে যেন এক

দিব্য পুরুষকে দেখছে। মন তার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সমগ্র বিশ্ব সংগীতে সে ডুবে গেছে বলে তার মনে হল।

নৃত্যনাট্য শেষ হল। সকলে বেরিয়ে এসে যে যার বাড়ির পথ ধরল। পর দিন সন্ধ্যায় নারায়ণ রাওয়ের বাড়িতে সকলে আবার সমবেত হল। রাঘবরাজু আর রাজারাওয়ের যাবার দিন এসে পড়েছিল। রোহিণী, সরলা, নলিনী সহ সব বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হল।' ডাঃ রঙ্গচারী এবং তাঁর সাহায্যকারীদেরও চায়ে ডাকা হয়েছিল। রাত্রেও সকলের খাবার ব্যবস্থা ছিল। আনন্দরাও, নারায়ণ রাওয়ের সিনিয়ার নটরাজ প্রভৃতি এলেন। হাইকোর্টের উকিলরাও এসেছিল। পরীক্ষা থাকায় শ্যামসুন্দরী আসতে পারে নি। খাদ্যসামগ্রী এবং চা প্রভৃতি অভিজাত কায়দায় তৈরি হয়েছিল। পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণেরা গান্ধীটুপি আর সাদা কাপড়ে সজ্জিত ছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি মাদ্রাজের নাগেশ্বর রাওয়ের মতো। অন্ধ্রের গণ্যমান্য লোকদের নারায়ণ রাও নিমন্ত্রণ করেছিল। বড় বড় শেঠরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। নারায়ণ রাও, রাজারাও, পরমেশ্বর, লক্ষ্মীপতি এরাই সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল।

নারায়ণ রাওয়ের বাড়ির লনে ভোজের আয়োজন হয়েছিল। নারায়ণ রাও, যাকে বন্ধুরা 'মালী' খেতাব দিয়েছিল, নিজে নানারকম ফুলগাছ দিয়ে লনটিকে সাজিয়েছিল। গাছে গাছে বিজলি বাতি জ্বালানো হয়েছিল। নারায়ণ রাও আগের দিন শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল। তিনিও এসে গিয়েছিলেন। চায়ের আসর জমল ভালো। সংগীতের আসর বসবার আগে নারায়ণ রাও উঠে বলল, "ভদ্রমহিলা, ও ভদ্রমহোদয়গণ এবং আমার ভাইয়েরা, আমার বাবা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অপারেশনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ডাঃ রঙ্গচারী দক্ষতার সঙ্গে তার কাজ করেছেন। আমি, আমার বাবা এবং বন্ধুরা তাঁর কাছে ঋণী। সে ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁর সাহায্যকারীদের এবং আমার বন্ধু রাজা রাওকে প্রশংসা করার মতো ভাষা আমার নেই। এঁরা এবং আপনারা সকলে স্বাস্থ্য এবং ঐশ্বর্যলাভ করুন এই প্রার্থনাই আমি ভগবানের কাছে জানাচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ডাঃ রঙ্গচারী বললেন, "পিতার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে নারায়ণ রাও আমার প্রশংসা করলেন। আমার মধ্যে কী আছে?

যে কোনো চিকিৎসকই একাজ করতে পারতেন। মজুরির বিনিময়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি। বাকি যা কিছু সবটাই ভগবানের হাতে। সুতরাং তাঁর প্রশংসার উপযুক্ত আমি নই।" সকলে হাততালি দিল।

তারপর সংগীত আরম্ভ হল। শ্রীরামৈয়ার গান এমনই উচ্চস্তরের হল যে সকলে একবাক্যে বলতে লাগল, "অন্ধ্রে এতবড় একজন সংগীত শিল্পী রয়েছেন!"

ইংরেজি ভাষার নৈপুণ্যে নলিনী দেবী সকলকে মুগ্ধ করল। নিজের পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য তার একটা গর্ব ছিল। সে সব সময় ইংরেজিতেই কথা বলত। আলাপ, ব্যবহারের মাধ্যমে সে সবাইকে বিস্মিত করে দিত।

টি-পার্টিতে সবার মাঝে সে তড়বড় করে নারায়ণ রাওয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে গাইল?" নাম লেখা রয়েছে শ্রীরামৈয়ার। "খুব বড় গাইয়ে নাকি?" হাসি মুখে এ কথার উত্তর দিয়ে নারায়ণ তাকে বিদায় করল।

সরলা মিতভাষী এবং লজ্জাশীলা। রোহিণী খুব একটা লাজুক ছিল না। যে কোনো পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা তার ছিল। দুদশজনের প্রশংসা পেলে সে খুশি হত। 'প্রেম' জিনিসটা নলিনীর অজানা ছিল। সে এমন একটি মেয়ে যে তার হাবভাবের মধ্য দিয়ে বলে দেয় যে সে সুন্দর। এরা তিনজন চায়ের আসরে মেয়েদের মধ্যে বসেছিল।

নারায়ণ রাও তাদের খুব আদরযত্ন করল। সুযো·. পেলেই পরমেশ্বর রোহিণীর সঙ্গে কথা বলে নিল। তারা ছাড়াও অন্য অনেক মহিলা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। টি-পার্টির পর নলিনী, সরলা এবং রোহিণী খাবার জন্য নারায়ণ রাওয়ের ওখানে থেকে গেল। তাদের দেখে শ্রীরামমূর্তি আশ্চর্য হয়েছিল। কারণ ছাত্রাবস্থায় রাজমহেন্দ্রবরমে বীরেশলিঙ্গম্ পন্তুলুর উপদেশ সে শুনেছে। সেইজন্য নিজেকে সামলে নিয়ে সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

শ্রীরাম—আপনাদের দিদির পরীক্ষা চলছে, না?

নলিনী—এ কি দাদা, 'আপনি' বলে আমাদের কি সম্মানসূচক সম্বোধন করার কোনো দরকার আছে?"

রোহিণী—আমাদের বৌদিকে নিয়ে এলেন না কেন?

শ্রীরাম—সংসারটা একটু বড়। বাড়িতে কেউ না থাকলে চলবে কেন?

এর মধ্যে আমি দুবার কোত্তাপেট হয়ে এসেছি। অমলাপুরমে দুটি মামলা ছিল, তাও সেরে এসেছি জানবেন।

নলিনী—আবার 'আপনি, আজ্ঞে' আরম্ভ করলেন! এভাবে কথা বললে আমরা আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

শ্রীরাম—মাফ করুন—না না মাফ করো! পরীক্ষা কেমন হল?

নলিনী—আশাকরি পাশ করব। অমলাপুরমে মেয়েদের হাইস্কুল আছে?

শ্রীরাম—নেই, ওখানে পড়বে কে?

নলিনী—কেউ নেই? আশ্চর্য।

রোহিণী—বাঃ নলিনী, মাদ্রাজেই বা কত ছাত্রী আছে?

এর মাঝখানে পরমেশ্বর এসে রোহিণীকে জিজ্ঞেস করল, এলফিনস্টোনের ইংরেজি নাটকটা তুমি দেখেছ?

রোহিণী—না তো! ভাল হয়েছিল? শুনলাম, কাল তোমরা গিয়েছিলে। শারদাবৌদি বলেছে।"

পরমেশ্বর—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। ওরকম নৃত্যনাট্যের কয়েকটা বই আমি দেখেছি। সেগুলো এটার চেয়ে ভাল।

নলিনী—আমাদের বাইজীদের নাচের চেয়েও ভাল?

রাজারাও, নারায়ণ রাও এবং যজ্ঞনারায়নশাস্ত্রী সেখানে এসে পড়ল। লক্ষ্মীনারায়ণ লন খালি করে চেয়ারটেবিলগুলো লরিতে তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে জমিদারও ওখানে ছিলেন। তিনিও সেই হলে এসে বসে গেলেন।

পরমেশ্বর—তুমি কি বাইজীদের নাচকে তামাশা বলে মনে করো? ভোজের পর বেদবল্লীর নাচের ব্যবস্থা ছিল?

নলিনী—তাছাড়া কী? আর দাক্ষিণাত্যের বাইজীদের পোশাকই বা কেমন অদ্ভুত ধরনের। আমি কি দেশ দেখি নি? তারা কি আমার অদেখা?" সে খিল খিল করে হাসতে লাগল।

পরমেশ্বর—এ কী নলিনী! তার মানে, ললিত কলা তুমি বোঝ না।

নারায়ণ—এখন তুই বল্। আমি একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম। নলিনী কেবল মাথাই নেড়েছিল। শ্যামা আর রোহিণী বুঝেছিল।

জমিদার—বীরেশলিঙ্গম্ পন্তলুর কৃপায় ছোটবেলা থেকে ভাগবত এবং

নৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার বিরূপতা আছে। পরমেশ্বর মূর্তি, এ ব্যাপারে তোমার মত কী?

ইতিমধ্যে সুব্বারায় সেখানে এসে গেলেন। তাঁর বসার জন্য চেয়ারের উপর গদি লাগিয়ে দেওয়া হল।

সুব্বারায়—আপনারা কি নাচের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন? তিনি জমিদারকে প্রশ্ন করলেন।

জমিদার (হেসে)—নৃত্যের সৌন্দর্যের বিষয়ে বলার জন্যে আমি পরমেশ্বর মূর্তিকে বলছিলাম।

সুব্বারায়—আমাদের ছেলেবেলায় ভরত শাস্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান দেওয়া হত। নাচের আসরে আমরা বসলে নর্তকীরা ভয় পেত। আমার বাবা সব রকমের কলাবিদ্ ছিলেন। আমার ছোট ছেলেটি ঠিক আমার বাবার মতো হয়েছে। আমরা বাবাকে খুব ভয় করতাম। তিনি যখন গাইতেন তখন পৃথিবী যেন কেঁপে উঠত। পঁচানব্বই বছর বয়সেও তিনি মাঠে যেতেন। নাওয়া ধোয়া সারতেন, তারপর খেয়েদেয়ে রাতদুপুরে যখন ত্যাগরাজের গান ধরতেন তখন গাঁয়ের লোকেরা তাঁর কাছে হাজির থাকত। তিনি ছিলেন ত্যাগরাজের প্রিয় শিষ্য। এ কাহিনী কতদূর সত্য তা আমি জানি না। নারায়ণ তাঁরই মতো গায়। কিন্তু ভাবের সে গভীরতা এখনো ওর মধ্যে আসে নি।

নারায়ণ—তার কারণ হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব

পরমেশ্বর—নাচের বিষয়ে যদি দু-এক কথা বলেন তো বড় ভাল হয়।

জমিদার—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুব্বারায়—“নাটক দু রকমের, নৃত্য আর নৃত্ত। নৃত্য হচ্ছে ভাবপ্রধান এবং নৃত্ত হচ্ছে অলংকারপ্রধান। নৃত্য আবার দুধরণের উগ্রভাবপ্রধান তাণ্ডব আর কোমলভাবের লাস্য।

জমিদার—আমাদের আরও বুঝিয়ে বলুন!

সুব্বারায়, "বলছি। ভক্তির তন্ময়তা, কোপ, রৌদ্র, শৌর্য ও আবেশকে প্রকাশ করে তাণ্ডব। শিবের তাণ্ডব, দেবী কালিকার সংহারতাণ্ডব ভীষ্মকে মারার জন্য চক্রহাতে শ্রীকৃষ্ণের তাণ্ডব, যুদ্ধযাত্রার আগে রাবণের রৌদ্র তাণ্ডব, চৈতন্য, নির্বাত, আদি দেবতাদের তন্ময়তার তাণ্ডব প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে।

"দ্বিতীয়কে আমি বলেছি লাস্য। রাধা, সত্যভামা, কৃষ্ণ প্রভৃতির প্রেম অর্থাৎ কোমল ভাব প্রকাশক নৃত্যই হচ্ছে লাস্য।

"এ বিদ্যা বড়ই মূল্যবান। কবিতায় ভাব প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা চিত্রের হচ্ছে রং, শিল্পের ক্ষেত্রে শিলা এবং সংগীতের বেলায় যেমন ধ্বনি, ঠিক সেই রকম নৃত্যের বেলায় এই মাধ্যম হচ্ছে দেহ। মানুষই এখানে প্রধান বস্তু।—মানুষের সর্ব শক্তিই হচ্ছে এর প্রকাশের মূলে। সাধনার দ্বারা নৃত্যকে যে ব্যক্তি আয়ত্ত করে তাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়।"

জমিদার—ও!

সুব্বারায়—ভাবকে ব্যক্ত করার নামই অভিনয়। শিল্পী তার অঙ্গাভিনয় প্রভৃতির দ্বারা ভাবকে প্রকাশ করে।

জমিদার—নৃত্যের মধ্যে প্রধান জিনিস কী? অভিনয় অথবা নৃত্য?

সুব্বারায়—ভাব বাদ দিয়ে শিল্প হয় না। সেইজন্য ভরতের অর্থ হচ্ছে ভাব, রাগ, তাল। ভরত শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে!

জমিদার—ও!

সুব্বারায়—অভিনয়ের মধ্যে সংগীত থাকা চাই। অর্থাৎ তাতে রাগ এবং তাল থাকতে হবে। পায়ের গতি দ্বারা তাল এবং সংগীতের মাধ্যমে রাগ দেখানো হয়ে থাকে। নৃত্য করতে করতে গান গেয়ে ভাব ব্যক্ত করার নাম 'করণ'। প্রধান প্রধান ভাবগুলিকে নিয়ে করণগুলির নাম দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ভরত ১০৮টি করণ দেখিয়েছেন। কয়েকটি করণ মিলিত হয়ে হয় অঙ্গহার।

জমিদার—আরও বুঝিয়ে বলতে হবে।

সুব্বারায়—ত্যাগরাজের কৃতিকে ধরুন। কৃতি হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ কাব্য। তাতে 'পল্লবি' করণ আছে। অনুপল্লবী আর একটি করণ। এই সবগুলি মিলিয়ে বলা হয় অঙ্গহার। কতকগুলি কৃতি একত্র হয়ে হয় মহাকাব্য। প্রতি অষ্টপদীকে এক-একটি অঙ্গহার মনে করুন। সব অষ্ট-পদীগুলি একত্র করলে হবে মহাকাব্য। এই রকমের একটি কাব্যকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাকে নাট্য মনে করা হয়ে থাকে।

জমিদার—ও!

নলিনী—আচ্ছা, অভিনয় চার রকমের বলা হয়ে থাকে। হাত পা নাড়ার মধ্যেই কি এদের পাওয়া যায়?

সুব্বারায়—হ্যাঁ। অঙ্গাভিনয়ে সারা দেহই হচ্ছে মাধ্যম। তাতে মুখ্যাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতি রয়েছে। হাত, মাথা, চোখ, গলা, পাশ, কোমর এবং পা, এরা হলো মুখ্য অঙ্গ। হাত, কনুই হচ্ছে প্রত্যঙ্গ। চোখের পাতার চুল আর চোখের তারা হচ্ছে উপাঙ্গ। এইভাবে সারা দেহের অঙ্গগুলিকে ধরা যায়। এদের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে ভাবকে ফুটিয়ে তোলার নামই হল অঙ্গাভিনয়। ভরত এবং নন্দিকেশ্বর হলেন এদের স্রষ্টা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও প্রয়োজনীয় রদবদল হয়েছে।

পরমেশ্বর—তা না হলে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রীতি প্রচলিত হল কী করে?

যজ্ঞ—সে সব রীতিগুলি কী?

পরমেশ্বর—কেরলে কথাকলি, উত্তর প্রদেশে কথক, মণিপুরে মনিপুরী প্রভৃতি।

সুব্বারায়—আমি তাদের নৃত্য তো দেখি নি। আগে একরকম বিদুষী সুন্দর শিল্পী অন্ধ্র দেশে ছিল। তাদের নৃত্য ছিল বড়ই মনোহর এবং কলাসমৃদ্ধ। তাদের নৃত্য আমি দেখেছি।

জমিদার—বর্তমানে এই বিদ্যাটি হয় নষ্ট হয়ে গেছে, নয়তো অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় রয়েছে।

সুব্বারায়—আজ্ঞে হাঁ, এ বিদ্যাকে পুনর্জীবিত করা খুবই দরকার। সেই জন্যই নারায়ণ রাওকে বলে আজ আমি বেদবল্লীর নৃত্য করালাম।

নারায়ণ রাওয়ের ব্যবস্থাপনায় সেদিনকার ভোজ উত্তম হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে হলের মধ্যে যে যার স্থানে বসে পড়লেন। যোগ্য বেশভূষায় সজ্জিতা বেদবল্লী অতিথিদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার পিছন পিছন এল তবলচী, বেহালাবাদক, গায়ক প্রভৃতি।

বেদবল্লী সুন্দরী। দাক্ষিণাত্যের বাইজীদের মধ্যে সে ছিল সেরা। নৃত্যে নামকরা পরিবারে তার জন্ম। তার নৃত্য সারা দক্ষিণ দেশে সমাদর লাভ করেছিল। রেশমী পাজামার ওপর সে পরেছিল রেশমী শাড়ি। শাড়িটা ছিল চওড়া পাড়ের উপর জরি দেওয়া। দামী জ্যাকেট আর রত্নখচিত মেখলা লাগিয়ে সে এসেছিল। বহু অলংকারে সে নিজেকে সাজিয়েছিল। দীর্ঘ এবং মুক্ত বেণীর উপর গোঁজা ছিল ফুল। পায়ে বাঁধা ছিল নূপুর।

সকলকে নমস্কার জানিয়ে ভগবান এবং অভ্যাগতদের উদ্দেশে প্রার্থনা করে সে অলসরিপ্প আরম্ভ করল। অনুপম নৃত্যে সে সকলকে আত্মবিস্মৃত করে দিল।

নৃত্য শেষ হতে এক ঘণ্টা লাগল। তারপর সে শ্রী নারায়ণ তীর্থ আদি তালে 'তরঙ্গ' গাইতে লাগল। মুখমণ্ডলে তার গোপনারীসুলভ ভাবের উন্মেষ হল। কৃষ্ণের ধ্যানে সে যেন মগ্ন। সে-ই আবার বালকৃষ্ণ হয়ে তার বাল্যক্রীড়া দেখাল। স্বর্ণময় কণ্ঠ, তার নূপুরধ্বনি বেণুরবের সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সে যেন মেঘের বুকে বিজলীর চমক। তারারা যেন ঝর ঝর করে উঠল আর জ্যোৎস্না যেন উপছে পড়তে লাগল চারদিকে।

তারপর সে ক্ষেত্রেয়ার পদ অভিনয় করল।

"মঞ্চি দিনমু নেড়ে,

মহারাজ গারম্মনিয়ে।"

অর্থাৎ "আজই শুভদিন, মহারাজকে ডেকে আনো।"

দিব্যলীলা-বিনোদগোপালকে ডেকে দেবার জন্য বিরহিণী রাধা তাঁর সখীকে বলছেন। বলেছেন, যে তাঁর সব ত্রুটি তিনি দূর করে দেবেন। অন্য প্রেয়সীদের কথা তিনি মনেই আনবেন না। তার ভাবভঙ্গিমা, নৃত্য এবং অভিনয় দেখে পরমেশ্বর তন্ময় হয়ে গেল। উচ্চারণগত ও অন্যান্য অল্প বিস্তর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তার নৃত্য ছিল অনিন্দ্যসুন্দর।

বালিকাটির দেহভঙ্গিমা নৃত্যের সৌন্দর্যকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। নৃত্যশেষে অতিথি ও বন্ধুবর্গ সকলে বাড়ি ফিরল।

সুব্বারায় সম্পূর্ণ সেরে উঠেছিলেন। তাঁরা সব কোত্তাপেটার দিকে রওনা হলেন। নারায়ণও যাবে ঠিক করল।

কয়েকদিন আগে রাজারাও অমলাপুরম্ চলে গিয়েছিল।

শ্যামসুন্দরীর পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে যে পাশ করবে এ আশা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। হাইকোর্টের ছুটি চলছিল। তাই নারায়ণ রাও স্ত্রী এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাবার সঙ্গে চলে গেল। চারদিন মাদ্রাজে থেকে শকুন্তলা চলে এসেছিল। মাদ্রাজে থাকার সময় সে সব বিষয়ে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে আলোচনা করত। বোনকে দিয়ে তার সেবা করাত। ভালবাসার দৃষ্টিতে সে তাকে দেখত। শারদা কেন যে এত লজ্জা পাচ্ছে তা সে বুঝেই উঠতে পারল না। নাবায়ণ রাওয়েব সঙ্গে কথাবার্তা বলতে অথবা খেলাধূলো করতে সে শারদাকে কোন দিন দেখে নি। ওদের দুজনের মনে কী যে আছে তা সে ভাল কবে জানত পারে নি। একদিন নারায়ণ রাওকে নিজের ঘরে বসতে বলে, শারদাকে সে সেখানে নিয়ে এল। উভয়ে উভয়কে দেখে বিব্রত বোধ করল।

"বোনকে দিয়ে আমি আপনার চুল আঁচড়িয়ে নিতে চাই।"—শকুন্তলা বলল।

মৃদু হেসে নারায়ণ রাও বলল, আমার একটু কাজ আছে।

শকুন্তলা—রাখুন আপনার কাজ! এই অল্প একটু কাজ আমার জন্য করুন।

নারায়ণ—আপনার যা অভিরুচি।

শারদা আনন্দ, ভয় এবং বিস্ময়েব সঙ্গে কম্পমান হাতে তার চুল আঁচড়ে দিল। কোত্তাপেট আসার অল্পদিন পরে নারায়ণ রাও পেদ্দাপুরম থেকে একটা 'তার' পেল। তাতে লেখা ছিল, "আপনার ভগ্নীপতি আপনার বোনকে মারধর করে রাস্তায় বের করে দিয়েছে। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

নারায়ণ রাও সঙ্গে সঙ্গে পেদ্দাপুরম চলে গেল। সেখানে যাবার কারণ সে কাউকে বলল না।

পেদ্দাপুরমের সবকিছুই নারায়ণ রাওয়ের কাছে ভয়াবহ বলে মনে হল।

স্বামী, স্ত্রী, অথবা তাদের মেয়ে কেউই খায়-দায় নি। তার বোন থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। নারায়ণ রাওয়ের অন্তরের অন্তঃস্থল কেঁপে উঠল, দুঃখে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মানুষের দ্বারা কি এ রকম ব্যবহার সম্ভব? এমন মানুষ কি এখনো আছে যারা নারীকে পশুজ্ঞান করে? মানবতাহীন এইসব পুরুষের চৈতন্য কবে হবে কে জানে? গরিবদের প্রতি, নারীদের এবং অপর জাতির প্রতি বন্য ব্যবহার করার লোকের সংখ্যা কোটি কোটি হওয়া সম্ভব কেবল কলি যুগেই। সে যে ভগবান—ভগবানের একটা অংশ একথা মানুষ ভুলে যায় কী করে? বোন আমার পূতচরিত্রা এবং সর্বগুণসম্পন্না। সে তার স্বামীকে দেবতাজ্ঞান করে। এই রকম ভালো মেয়েদেরই বোধ হয় সব রকমের নির্যাতন সহ্য করতে হয়। যেসব মেয়েরা তাদের স্বামীকে ভেড়া বানিয়ে নেয় তাদের জীবন পথে ফুল ছড়ানো থাকে না কী?

ভগ্নীপতির কাছে গিয়ে নারায়ণ রাও বলল, "তোমার ভীমরতি হয়েছে। আমি তোমায় মানুষ বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু তুমি আসলে একটি জানোয়ার। তোমার কিসের এত রাগ? রাগেরও একটা সীমা থাকে। গিয়ে একটা ছোরা নিয়ে ওকে মেরে ফেললেই তো পার? আর তা না হলে বিষ এনে দিচ্ছি, তুমি নিজেই ওর মুখে ঢেলে দাও। এমন বিষ এনে দেব যা'তে ছটপট করে মরে। ওই রকম ভাবে মারলে তবেই না তোমার রাগ পড়বে? আগে রাগটা ঠাণ্ডা হোক, তারপর পস্তাবে। একই পথের দুটি দিক। দেখো, আবার ও জ্ঞান হারাচ্ছে এখন ওর জীবন এইভাবেই কাটবে। ধরে নাও ওর মৃত্যু হয়েছে, এবার খুশি তো?"

আমার বোনের যদি কোনো দোষ থাকে তো বলো। অপরাধ যদি খুব বড় রকমের হয় তাহলে তুমি যা করেছ তাতে আমি সন্তুষ্ট হব।"

নারায়ণ রাওয়ের চোখে জল এসে গেল। সে বলল, "আমায় মাফ করো, এই প্রথমবার আমার চোখে জল এল। রাগের মাথায় জানি না কী বলে ফেললাম। কিন্তু রাগকে দমন করেই বলছি। তোমার পাপের নিবৃত্তিও তোমারই হাতে। তোমার মনকে স্বাভাবিক স্তরে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং নিজের কলঙ্ক দূর করার জন্য আমি এখানে চারদিন উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন করতে চাই।"

নারায়ণ রাও আসার সঙ্গে সঙ্গেই বীরভদ্র সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার ডেকে নারায়ণ রাও সে দিনই বোনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। ভাগনীকে খাওয়ানোর জন্য প্রতিবেশীরা নিয়ে গেল। কয়েকজন খাবার জন্য নারায়ণ রাওকেও ডাকল। কিন্তু সে গেল না! বিকেলে তিনটের সময় সত্যবতীর জ্ঞান আবার ফিরল।

চোখ খুলেই নারায়ণ রাওকে সামনে দেখে সত্যবতীর মনে হল যে সে স্বপ্ন দেখছে। চোখের জল তার উপচে পড়ল।

দুবছর ভগ্নীপতি কিছু করে নি। দুবছর আগে তার বোনের পোয়াতি অবস্থায় তার উপর অত্যাচার করায় শিশুটি এক মাস আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সত্যবতী অনেক কষ্টে বেঁচে উঠল কিন্তু বাচ্চাটা মারা গেল।

এ সব কথাই বীরভদ্রের মনে ছিল। সেই থেকে সে স্ত্রীকে যেন পূজোই করত। এখন আবার সত্যবতীর পাঁচ মাস চলছে। তার সুন্দর মুখ মলিন হয়ে গেছে। আয়ত চোখ দুটি এখন ভয়াবহ মনে হয়। সে এতই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে যক্ষ্মা রোগী বলে বোধ হয়।

নারায়ণ রাও তখন সত্যবতীর বিছানায় বসে ছিল। খুব দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সত্যবতী আস্তে আস্তে উঠে এসে তার কোলে মাথা রেখে বলল, "দাদা!" নারায়ণ রাওয়ের মন ভেঙে গেল। দুঃখ কাকে বলে সে জানত না। চোখে তার কখনো জল আসে নি। ভেতরটা [illegible] জ্বলে যাচ্ছিল। "ওকে বদলাবার দুটি মাত্র পথ আছে, বোন। এক হচ্ছে, বোম্বাইয়ের কেরোতে গান্ধীজির উপবাসের মতো আমিও তোমাদের এখানে যদি উপবাস করি, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে যতদিন পর্যন্ত ও তোমার পায়ে না পড়ে ততদিন ফেরত না পাঠানো। কিন্তু এর কোনোটাই তোমার পছন্দ হবে না। তুমি যা চাইবে তাই করব। আমি মাসের পর মাস উপবাস করতে পারি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করলে কিন্তু আমার মনে প্রয়োজনীয় পবিত্র ভাব আসবে না। আর যদি তুমি খুব কষ্ট পাও এবং তোমার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন আমি কী করব? তাই তোমার বিনা অনুমতিতে আমি কিছু করব না।"

"দাদা, তুমি উপোসও কোরো না আর আমাকে নিয়েও যেয়ো না।

আমি ওঁর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকব। চিরকালের মত চলে যাই তো চলে যাব তা না হলে ওঁকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো ?"

"আহা, কত পতিব্রতা তুমি! অরুন্ধতীর মতো মেয়েরা আবার জন্ম নিয়েছে। রাগ জিনিসটা আমার মধ্যে না আসুক এই আমার প্রার্থনা।" মনে মনে সে ভাবলো। বোনকে জোর করে লেবুর রস খাইয়ে রাজারাওকে টেলিগ্রাম করে বাজার থেকে ফেরার পথে বীরভদ্র রাওকে খাওয়া সেরে হোটেল থেকে বেরুতে দেখল, করুণামাখা মৃদু হাসি উল্কার মতো ক্ষণিকের জন্য তার মুখে খেলে গেল।

১৬। অঙ্কুর

নারায়ণ রাও, সত্যবতী আর কন্যা নাগরত্নম্ রাজারাওয়ের সঙ্গে পরদিন সন্ধ্যায় কোত্তাপেট পৌঁছল। সত্যবতীকে দেখে জানকাম্মা খুবই কষ্ট পেলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, "বাছার আমার কী হাল হয়েছে। আমার কপাল পুড়েছে। সত্যিই আমি তোকে রাক্ষসের মুখে ঠেলে দিয়েছি।" সুব্বী, বেঙ্কায়াম্মা, লক্ষীনরসম্মা, সকলের চোখ সজল হয়ে উঠল।

রাজারাও—কাকীমা, সত্যবতী বোন অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। এতো ভাল নয়। দেখুন হাতও শক্ত হয়ে যাচ্ছে। নারায়ণ, ওকে ভেতরে উঠিয়ে আনো! সুব্বী একঘটি জল নিয়ে এসোতো। তাড়াতাড়ি।"

নারায়ণ রাও সবার আগে জল এনে বোনের মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। রাজারাও তার বাক্স থেকে কী যেন একটা ওষুধ বার করে তার নাকের সামনে ধরল। জ্ঞান ফিরলে সত্যবতীকে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। সুব্বারায় গিয়ে ছোট্ট শিশুর মতো তাকে তুলে নিয়ে ভেতরে পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিলেন। সত্যবতী দুহাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল।

পেদ্দাপুরমে যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে নাগরত্নম্ দাদু ও দিদিমাকে বলল—

"পরদিন মামা বাবাকে হোটেলে খেতে দেখেছেন। বাড়িতে এসে মামা সে কথা বলেছিলেন। কাছারি থেকে বাবা আটটার আগে ফেরেন নি। বাবাকে মামা অনেক বুঝিয়েছেন। বাবা রেগে গিয়ে মামাকে খুব কড়া

কড়া কথা বলেছিলেন। তিনি বাবার গালে চড় মেরেছেন। জামার আস্তিন গুটিয়ে মামা বলেছিলেন, 'দেখো, তোমায় আমি এক্ষুনি শেষ করে দিচ্ছি।' মামাকে দেখে আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। মামাকে খুব বড মনে হচ্ছিল। তুমি যেদিন বাছুরকে মেরেছিল বলে চাকরকে মেরেছিলে, ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছিল।" নারায়ণ রাও সরবে হেসে উঠল। রাজারাও হাসতে লাগল।

সুব্বারায়—কী ব্যাপার, বাবু?

নারায়ণ রাও "কিছু না বাবা, আমি রাগের ভান করেছিলাম মাত্র। রাগিয়ে দিয়ে সব কথা বের করে নেবার জন্য ওরকম করেছিলাম। আর সেও ধরা পডল।

"ওকে বেশ মোটাসোটা লাগল। বাডিতে বৌ বাচ্চা গঙ্গাযাত্রী হলে কী হবে। আমার স্বাস্থ্য চাই, হোটেলে গিয়ে গেলা চাই। বাঃ!

"বৌএর গায়ে হাত তুলতে জান। কী সুন্দর মানুষ তুমি! বয়েস হয়েছে তাতে কী হয়েছে? মানুষ হলে তার মধ্যে কিছুটা দয়ামায়া থাকে। অসুস্থ স্ত্রী কাতরাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই, হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলে।"—এইসব কথা আমি বলেছিলাম, সে সত্যি সত্যি রেগে গেল, "তোমার মুখদর্শন করাও উচিত নয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুমি বিরোধ ডেকে আনছ।"

যেন ভয় পেয়ে গেছি এই রকম ভাব আমি দেখলাম। "কুলটা বোনকে বদমাইশি শেখাতে এসেছ।" সে বলল।

আমি রাগ দেখালাম বললাম—দাঁড়াও, আমি তো... উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।" দু ঘা বসিয়েদিলাম। নাগরত্নম্ চীৎকার করে উঠল। বোন পাশের ঘর থেকে শুনছিল। আমি তাকে আমার মতলবের কথা বলি নি। চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এসে সে আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। আমাকে পেছনে হটিয়ে দিয়ে স্বামীর গলা জডিয়ে ধরে সে বলতে লাগল,—"ছিঃ! তুমি আমার ভাই নও। আমার মঙ্গল সূত্রে তুমি কলঙ্ক দিচ্ছ। রাগ যদি হয়েই থাকে তা হলে আমায় মারো।" বোনের আমার সে মূর্তি দেখার মতো—যেন সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী। আমি তখন তার পা ধরে বললাম, "বোন, আমায় মাফ করো। আমি পাপী। আমি কখনও রাগ করি না। তোর স্বামী তোর সম্বন্ধে খারাপ কথা বলতেই হঠাৎ আমি রেগে গেছি।"

বীরভদ্র কাঁপছিল। আমি তার হাত ধরে বললাম, "আমায় ক্ষমা

করো। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কেন তুমি তোমার বৌকে কুলটা বলতে গেলে। আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম।"

সেই রাত্রেই রাজারাও এসে গেল। সকলের রাগ ক্রমশঃ পড়ে গেল। তারপর কী জানি কী ভাবে সে রাতারাতি স্ত্রীর অনুগত হয়ে পড়ল। স্ত্রী বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে নিজেই নিজেকে দুগালে চড়িয়েছে।

পরীক্ষা করে রাজারাও বলল যে তার মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। এই অজ্ঞান অবস্থা, এ ক্রমে উন্মাদ অবস্থায় পরিণত হবে। এখন হার্টের অসুখ রয়েছে। পরে হয়তো আসবে যক্ষ্মা। সুতরাং মনটাকে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। কোনো কাজকর্ম করা চলবে না। ভাল ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে।

বীরভদ্র সব শুনছিল। রাজারাও সে দিন তাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "বীরভদ্ররাওজী, আমি জানি, আপনি জানেন না। আমার স্ত্রী খুবই পতিব্রতা ছিল। প্রতিবছর সন্তানের জন্ম দিত। পশুর মতো ব্যবহার করে আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি। অমন ভাল বৌ কেউ কি জোটাতে পারবে? বৌ আপনার পতিব্রতা। এই রকম ব্যবহারই যদি আপনি করতে থাকেন তাহলে সে এক বছরও বাঁচবে না। আমি চিকিৎসক বলেই একথা বলছি।

স্ত্রীর উপর আপনি বড় রেগে যান। এত রাগে 'হার্টট্রাবল' দেখা দেয়; মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হতে হয়। আপনাদের মতো মানুষদের পরিণতি আমরা হাসপাতালে অহরহ দেখছি। তাই বলছি। ভাল করে ভেবে দেখুন!"

শ্যালক যাতে মারধোর না করে, স্ত্রীর মৃত্যু না হয় এবং নিজের ওপর কোনো বিপদ এসে না পড়ে, এই তিনটি কারণে সে খুব ঘাবড়ে গেল। দু-তিন মাসের ছুটি নিয়ে সে গাঁয়ের বাড়িতে চলে যাবার কথা ভাবল। রাজারাও তখন তাকে আমার এখানে এসে ওষুধ নিতে বলল। সে রাজী হল। পাঁচ দশ দিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে।

সকালে রাজারাও, নারায়ণ রাও, এবং লক্ষ্মীপতি মাঠের দিকে বেড়াতে গেল।

কোনসীমা যেন অন্ধ্রের মাথার মণি! দুই গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, রত্নপ্রসূ। 'আমুক্ত মাল্যদা'য় কৃষ্ণরায় দক্ষিণের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন।

কোনসীমার সৌন্দর্যকে নিয়ে অন্ধ্রে এ পর্যন্ত একটিও ভাল বই লেখা হয়নি। কিন্তু সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম ব্যক্তিরা যুগ যুগ ধরে কোনসীমায় বসবাস করছেন।

কোনসীমাতে কাঁঠাল-নারাঙ্গী-কলা-নারকেল-আম-সুপুরি প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয় আর কত রকমের ফুল ফোটে। শস্য শ্যামলা এই অঞ্চল। সূর্য একে উত্তাপে দগ্ধ করে না। লু চলে না এখানে। সারা অঞ্চল জুড়ে উদ্যান-উপবন। কোনসীমায় সোনা ফলে। বেল, আম, নারকেল প্রভৃতি ফলের অপর্যাপ্ত ফসল হয় এই কোনসীমায়।

নারকেলের বাগান আছে হাজারে হাজারে আর প্রতি বাগানে আছে সব জাতের নারকেল।

তারা সোজা নারায়ণ রাওয়ের বাগানে গিয়ে হাজির হল। মুখ হাত ধুয়ে স্নান সেরে কাপড় পরল তারা। কৃষাণেরা কাছেই রুইবার জন্য ধান বুনে রেখেছিল। তারা সেখানে গেল।

ধানজমিতে জলসেচের জন্য পুকুর থেকে জল তোলা হচ্ছিল। এক কৃষাণ কন্যা গলা ছেড়ে গাইছিল। ওরা শুনতে লাগল। অন্যরাও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছিল :

অঙ্কুরেতে ঢালো বারি
লক্ষ্মণ তোমার ভাল হোক,
জবর মস্ত কাজলা গোঁফ
মস্ত বড় পাগড়ি আর
গলাভরা গুন গুন গান
দেহটাও মজবুত যার।
অঙ্কুরেতে ঢালো . . .
রুপোর বাড়া বাহু দুটি
চওড়া উঁচু বুকের পাটা
নিকষকালো চিকন বরন
ভয়ে কেমন করে গাটা
অঙ্কুরেতে ঢালো . . .
এসো এবার দুজন মিলে
এই বাগানে ঢালি জল

আকাশছোঁয়া পাহাড় তুমি
আমি নদী ছলোছল।
অঙ্কুরেতে ঢালো . . .

সবাই হাসল। নারায়ণ রাও তার সঙ্গের ছেলেটিকে বলল, আরে ওর মতো গাও, না হলে হেরে যাবে—সেই ছেলে মাথা নেড়ে গান ধরল :

দে দড়ি, নে তোলরে জল
গেয়ে গেয়ে মিষ্টি গান
গানের সঙ্গে গানের মিলে
উপছে উঠবে ফুলের দল
জল ছুটবে নেচে কুঁদে
আনন্দ মুখর হও উছল।
দে দড়ি, . . .
আমার কথা শোন ও সখি
পান কৌড়ি চঞ্চল সুন্দরী,
আমার আসার আশায় চেয়ে থাকো
এলাম আমি যখন তোমার দ্বারে
হঠাৎ আওয়াজ উঠল রিনি ঝিনি
গলায় দোদুল দোলা পিতল হারে,
আমার কথা শোনো . . .
জল অভাবে শুকনো ছিল যারা
এখানকার এই পিপাসু অঙ্কুর
আমি আমার সাথে সাথেই দেখি
অভাব তাদের হয়ে গেল দূর,
আমার কথা শোনো . . .
অঙ্কুর কালো, সখী আমার রাঙা
জল এলে আর আমার আগমনে
অঙ্কুরেরা সবুজ হয়ে ওঠে
ফুলের হাসি সখীর দেহে মনে।
আমার কথা শোনো . . .

দেখ এদের আনন্দ। খায় তো এরা ভাতের মাড। ঘাস বিচুলির ওপর শুয়ে থাকে। কুঁড়েঘরই ওদের প্রাসাদ। আনন্দ কোথায় এই আমাদের মধ্যে? আধ্যাত্মিক আনন্দ হচ্ছে পরমহংসদের জন্য আর জাগতিক আনন্দ কি মাটির মায়ের সন্তানদের জন্য? এরা কবি, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোলে এদের জন্ম। প্রাকৃতিক মাধুর্যের মধ্যে এরা বেঁচে থাকে আর প্রকৃতির আনন্দের মাঝেই এরা লীন হয়ে যায়।

সভ্যতার জ্ঞানে আমাদের কিসের প্রয়োজন? এদের জীবনের তুলনায় আমাদের জীবন অসহনীয়। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নারায়ণ রাও তার বন্ধুদের সঙ্গে চলছিল।

লক্ষ্মীপতি মাথা তুলে বলল, "দেখো এদের কবিতা কী সুন্দর। এর আগে আমি কখনও শুনি নি। এক-এক যুগে এক-এক শ্রেণীব কবিতার আদর। রাজা মহারাজা আর অভিজাতদের কবিতাব যুগ শেষ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে লোককবিতার যুগ।" সকলেই চিন্তার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল।

খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। পেছন দিকের রাস্তা ধরে সবাই বাড়ি ফিরছিল।

সোমৈয়ার মেয়ে এবং তার বোন বাড়ির কাছে এল। সেখানে সোমৈয়ার ছেলে সন্তেয়া এবং ভগ্নিপতি সীতন্না নিজেদের মধ্যে মারপিট করছিল। মেয়েরা চিল্লাচিল্লি করে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল।

জোর কদমে এগিয়ে গিয়ে নারায়ণ রাও তাদের দুজনকে ধাক্কা মেরে আলাদা করে দিল। চোখ দিয়ে তার যেন আগুন ঝরতে লাগল। বজ্রের মতো গর্জে উঠল সে।

"তোমাদের কি কেন কাণ্ডজ্ঞান নেই? তোমরা কি কুকুর নাকি? তোমাদের বেশ ভালরকম ধাঁতানি দিতে হবে।" সিংহের মতো তার ক্রুদ্ধ গর্জনে দুজনের মাথা নিচু হয়ে গেল।

সোমৈয়ার স্ত্রী রামানুজম্মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাবু আজ বাঁচান।

ভগবানের মতো আপনি যদি না এসে পড়তেন তাহলে আজ এরা একে অন্যকে মেরে শেষ করে দিত।”

“কী, হয়েছে কী?”

“সীতন্না তার বৌকে মারছিল, সন্তেয়া এসে বোনকে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজেই লেগে গেল।”—পূর্বীয় কাপু মেয়েটি বলল।

“এই সীতন্না এদের সবার সামনে বলছি শোন। কী অন্যায় তুই করেছিস সে খেয়াল কি তোর আছে? ছিঃ একেবারে নীচ তুই। তুই সোমন্নার জামাই? তুই নিজে একটা বেচাল বদমায়েশ। ঘরের বৌদের নষ্ট করাই হচ্ছে তোর পেশা, তারপর আবার বৌঠেঙানোও আরম্ভ করেছিস? মাথায় যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে এসব বাঁদরামো ছাড়। আর তা না হলে এ গাঁ থেকে দূর হয়ে যা! এরপর তোর সম্বন্ধে একটা কথাও যদি আমার কানে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজে হাতে তোকে গাঁ ছাড়া করাব” সীতন্না লজ্জিত হয়েছে দেখে নারায়ণ রাওয়ের রাগ পড়ল।

“ওরে সীতন্না, এমনভাবে থাক যাতে লোকে বলতে পারে যে তুই অমুকের বাড়ির পেছন দিকে থাকিস। এবার আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। মনটা আমার নরম। সব কথায় আমি আমল যে দিই না এটা তোর জানা আছে। বাবা থাকলে আর রক্ষা থাকত না। আগেও একবার তোকে বৌকে পিটতে দেখেছি। তোর বৌয়ের মতো সুন্দরী এখানে কেউ আছে? তার সঙ্গে আনন্দে ঘর কর। যা!” লজ্জায় সীতন্না মরমে মরে গেল। ‘এই রে ছোট বাবু জেনে ফেলেছেন। বিছে মারতেও যার হাত ওঠে না তিনি আজ কি রাগ রেগেছেন।’—মনে মনে সে পস্তাতে লাগল। রাত্রে খাটিয়ার কাছে বসে শায়িত বৌয়ের পা ধরে সে বলল, “আমায় মাফ কর, না বুঝে আমি অন্যায় করে ফেলেছি। তোমার দিব্যি দিয়ে বলছি, এবার আমি ভাল হয়ে থাকব।” বৌ দেখেশুনে পা গুটিয়ে নিল। তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে সে বলল, “চাঁদ যখন রয়েছে তখন তারার কী দরকার?” অনুতপ্ত স্বামীকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সপ্রেমে সে তার বাহুপাশে ধরা দিল।

বীরভদ্ররাও শ্বশুর বাড়িতে ছিল। ওষুধপত্রের সম্বন্ধে সবকিছু বলে দিয়ে সুযোগ পেলেই সত্যবতীকে দেখে যাবার আশ্বাস দিয়ে রাজা রাও চলে গেল। বীরভদ্ররাওয়ের জন্য ওষুধও সেই আনিয়ে দিচ্ছিল। সেবার ভীষণ লু অর্থাৎ

তাপপ্রবাহ চলছিল। কিন্তু নারায়ণ রাও সামলকোট থেকে খসখস আনিয়ে সব ঘরেই লাগিয়ে দিয়েছিল। ফলে তার বাসায় গরমের খুব উৎপাত ছিল না। রাজমহেন্দ্রবরমের কোত্তাপেট বেশি ঠাণ্ডা জায়গা। জমিদার তার ছেলে বৌ নিয়ে নীলগিরি চলে গিয়েছিলেন। শারদা শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। কোত্তাপেট আসার পর থেকেই সে স্বামীর পা ধোবার জল প্রভৃতি এনে দেওয়া শুরু করেছিল। নাগরত্নম্‌কে সে বলত, "নাগরত্নম্ চাবিটা নিয়ে এসো তো!" সংকেতটা বুঝে সুরী তখন মুচকি হাসি হাসতো। "ছোট মামাকে চাবিটা দিয়ে আয়!" নাগরত্নম্ দৌড়ে চলে যেত। চাবি আর কাপড় নারায়ণ রাওকে দিয়ে বলত, "ছোট মামী দিতে বললেন।" পা ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই নারায়ণ রাও রেশমী কাপড় হাতে নাগরত্নম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত।

"নাগরত্নম্ মামী কি আলমারি খুলে তোমায় কাপড় দিলেন?" নারায়ণ রাও প্রশ্ন করল।

নাগরত্নম্ বলল, "হাঁ"।

পরদিন দুপুরে কোত্তাপেটায় কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগল। নিজের বাড়ির আগুন নিবিয়ে লক্ষ্মীপতি বীরভদ্ররাওয়ের সঙ্গে সে আগুন যে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল সেই দিকে ছুটল।

কিছু লোককে নারায়ণ ঘড়া বালতি আনার নির্দেশ দিয়ে কিছু লোককে বাড়ির ওপরে উঠিয়ে দিল। বাড়িগুলোর ভেতর থেকে জিনিসপত্র টেনে টেনে বার করল। নারায়ণ রাওয়ের নির্দেশে নবযুবক বাহিনী আগুন নেবানোর কাজে লেগে গেল।

বাতাস বইছিল। সারা গাঁ উজাড় হবার ভয় ছিল। নারায়ণ রাওয়ের সতর্কতা আর তৎপরতার ফলে মাত্র কয়েকটি বাড়িকেই আগুনের গ্রাসে পড়তে হল। আগুন অবশেষে নেবানো গেল। আগুনের হাত থেকে যেগুলি বাঁচানো গেল না তাদের মধ্যে বড় কাপুর তালপাতার ছাওয়া চারটি ঘরও ছিল। বড় কাপু একটু পয়সাওয়ালা লোক। টাকা কড়ি কাপড় চোপড় সিন্দুক প্রভৃতি নারায়ণ রাও বার করে দিয়েছিল। ভস্মসাৎ হওয়ার হাত থেকে তাই সেগুলো বেঁচে গিয়েছিল।

এর মধ্যে বড়কাপু হঠাৎ পাগলের মতো কাঁদতে শুরু করে দিল, "বাবু আমার ঘর পুড়ে গেল আলমারিটা ভিতরেই রয়ে গেল। বাবু তার মধ্যে

আমার নোট জমির কাগজপত্র সব কিছু রয়ে গেছে। সব গেল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।"

আগুনের গ্রাসে ঘরটা ধূ ধূ করে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। আগুনের জিভ লকলক করে উঠছিল। চারদিকের উত্তাপ হয়ে উঠেছিল অসহ্য। নারায়ণ একবার নিষ্করুণ আগুনের দিকে আর একবার অসহায় কাপুর দিকে চেয়ে দেখল।

"আলমারি কোথায়?"

"ঘরের ভিতর।"

"দুঘড়া জল নিয়ে এসো!" নারায়ণ রাও চীৎকার করে বলল।

"দুখানা কাপড় জলে ডুবিয়ে আমার মাথায় বেঁধে দাও!"—সে বলল।

"এ কী করছ তুমি?" বীরভদ্ররাও উৎকণ্ঠায় চেঁচিয়ে উঠল।

"নারায়ণ রাও, অত দুঃসাহসী হবে না।" সকলে সমস্বরে বলে উঠল।

বীরভদ্ররাও নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ্মীপতি নারায়ণ রাওকে অনুসরণ করল। দরজার ধারে কাছে সে নারায়ণ রাওকে দেখতে পেল না আগুনের শিখা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়বিমূঢ় সকলে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অগ্নিদাহের শব্দও কী বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেল?

দরজার কাছে পৌঁছে নারায়ণ রাও এক ঘড়া জল মাথায় ঢেলে নিল। তারপর ঘড়াটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলমারির দিকে সবেগে ছুটে গেল।

তার দুঃসাহস দেখে আগুনও তাকে গ্রাস করেনি। অগ্নিশিখার দাপট ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। আগুনের বেড়াজাল আলমারিটাকে ঘিরে ফেলছিল। দ্বিতীয় ঘড়ার জলটা নিজের দেহে ঢেলে দিয়ে আলমারিটাকে টেনে নিয়ে সে দরজার কাছে ফিরে এল।

"না জানি ভেতরে তার কী অবস্থা হচ্ছে। অজ্ঞান হয়ে পড়লো না তো?" —লক্ষ্মীপতি এই কথা ভাবছিল আর ঘড়া ঘড়া জল আনিয়ে দরজার কাছে ঢালছিল। এই অবস্থায় সে নারায়ণ রাওকে আলমারি টেনে আনতে দেখতে পেল। প্রাণপণ চেষ্টায় সে ওটাকে দরজা পর্যন্ত টেনে আনল আর তারপর শেষ শক্তি দিয়ে সে ওটাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিল। খাণ্ডব দাহনে অর্জুনের মতো লঙ্কাকাণ্ডের নায়ক হনুমানের মতো সে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে সে সেখানে পড়ে গেল। আগুনের গরমে কারো যাতে

'লু' না লাগে তার জন্য নারায়ণ রাও তার মাকে দু তিন কলসী কফি তৈরি করে পাঠাতে বলে দিয়েছিল। সেই গরম কফিই অনেকের প্রাণ বাঁচাল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে লক্ষ্মীপতি সম্বন্ধির কোমর জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল। তারপর সে তাকে নিজের কোলে শুইয়ে দিল। চোখ দিয়ে তার জলের ধারা বয়ে যাচ্ছিল। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে একটু কফি সে তার মুখে ঢেলে দিল। মিনিট দশেকের মধ্যে নারায়ণ রাও সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেল। গাড়ির অথবা মানুষের কোনো সাহায্যেরই তার দরকার হল না। সারা গাঁয়ে মুখে মুখে শুধু একটি মাত্র নাম: নারায়ণ রাও। আগুন সম্পূর্ণরূপে নিবিয়ে ফেলার জন্য এবং সকলকে কাজে লাগানোর জন্য বড় কাপুকে বলে নারায়ণ রাও চলে গিয়েছিল।

বীরভদ্রের আশ্চর্যের সীমা ছিল না। "এই মানুষটাই আমার শালা?" মনে মনে সে কেবল এই কথা ভাবছিল। নারায়ণ রাওয়ের প্রতি তার মনে ভালবাসার প্লাবন বয়ে গেল। যা-যা ঘটেছিল লক্ষ্মীপতি বাড়ি ফিরে সব আনুপূর্বিক বর্ণনা করল। শারদার বুকের ভেতরটা ধ্বকধ্বক করতে থাকল। "ঘরের চাল যদি ভেঙে পড়ত তাহলে কী হত? চিরকাল এইসব কাজে ছুটে যাওয়া তার স্বভাব।"—জানকাম্মা বললেন। এরই মধ্যে বড় কাপু আর তার ছেলেরা এসে সুব্বারায় এবং নারায়ণ রাওয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াল। সুব্বারায় সকলের অজ্ঞাতে চোখের জল মুছলেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

"আমাকে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। বলিহারি সাহস আপনার। কী সতর্কতা, আর কী শক্তি। সুব্বারায়মশাই, বাবু আজ আমাদের সকলকে আদর্শ কাজ শেখালেন।" বড় কাপু আবেগের সঙ্গে বলল।

১৮। পরীক্ষা পরিণাম

সে রাত্রে নারায়ণ রাও পালঙ্কে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শারদা আর নারায়ণ রাও আলাদা আলাদা শুত। সকলের অজ্ঞাতেই সে শারদার জন্য আলাদা খাটের ব্যবস্থা করতে সূর্যকে বলেছিল। শারদা নিজের খাটে শুয়ে

ছিল। তাদের খবর কে জানে? সবাই ভাবে লজ্জাবশেই স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। নারায়ণ রাও তাকে দিয়ে চুল ঠিক করিয়ে নেয় না। বৌএর কাছে কিছু চায়ও না। শারদা তার স্বামীর জন্য জলও রাখে না, আর সাবান তোয়ালেও দেয় না। পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও নেই। এ-ও হয়তো এক ধরনের অভিনব দাম্পত্য জীবন, —এই কথাই লোকে ভাবত। আসল ব্যাপারটা সূর্যও ভাল করে জানত না। শকুন্তলা অবশ্য সবকিছুই জানত। প্রথম প্রথম কিছুদিন নারায়ণ রাও দুঃখিত হয়েছিল। তার ভালবাসা তাকে জ্বালিয়েছে। ধীর এবং অচঞ্চল বলেই সে ভুলেও স্ত্রীকে স্পর্শ করেনি।

স্বামী কী চেয়ে বসেন সেটাই ছিল শারদার কাছে দুর্ভাবনা বিশেষ। সেইজন্য ঘর করতে আসার পর সে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাত না। শেষে খুব ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ত। দিন কাটতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ্য বুঝল যে স্বামী তার সদ্‌গুণসম্পন্ন এবং দয়ালুও। সুতরাং নির্ভয়ে স্বামীর সঙ্গে একঘরে সে শুত।

একলা শোয়ার এই ঘটনার কথা পরীক্ষার সময় তার মনেই পড়ে নি। সে যেন তখন অজ্ঞ বালিকা হয়ে পড়েছিল।

হিন্দুরীতিতে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটানো হয়ে থাকে। বধূর বয়স তখন হয়ে থাকে চৌদ্দ-পনেরো বছর। তাদের মধ্যে প্রেমের উদ্বোধন তখনো খুব কমই দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে সে স্বামীর অনুরাগিণী হয়ে পড়ে।

মাদ্রাজে সে স্বামীর গান, বেহালা প্রভৃতির ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে পড়ল। সে বেহালা বাজালে অথবা ভরা গলায় মিষ্টি গান গাইলে আড়াল থেকে শুনে শারদা তন্ময় হয়ে যেত। স্বামীকে সে যে ভালবাসতে শুরু করেছে একথা দু'চারবার তার মনেও হয়েছে। ভাল বাসবে না-ইবা কেন। সকলেই বলে তার স্বামী সুন্দর। সত্যিই সে সুন্দর। আর অসাধারণ বুদ্ধিমান।

সে কাজ আজ নারায়ণ রাও করেছে, তা কি অন্য কারো দ্বারা সম্ভব? স্বামী তার শ্রেষ্ঠ বীর। ঘন কালো লম্বা চুল, বিশাল বুক, আর ভারি কাঁধ তার। দেবতুল্য মনে হয় তাকে। তাকে দেখে শারদার লজ্জা হয়। বোনটি তাকে খুবই ভালবাসে। আর বাবার তো কথাই নেই।

দুর্ঘটনা যদি কিছু ঘটত তাহলে কী হত ? যাই কর একটু ভেবে চিন্তে করো। বাবাকে দিয়ে একথা বলাতে হবে। কী অসাধারণ পরোপকারী এই মানুষটি ? শ্রদ্ধায় মন তার ভরে গেল। দরজায় খিল দিয়ে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে চেয়ে সে যেন পুলকিত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে সে তার কাছে গেল। অনেকক্ষণ ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে সে তাকে দেখল। তার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল। পূর্ণিমার তরঙ্গময় সমুদ্রের মতো তার মন কল্লোলিত হয়ে উঠল। 'এঁর পায়ের কাছে শুই না কেন ? আমার স্বামী। অনেক খুঁজে পেতে বাবা আমাকে এঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।' সে তাকে প্রণাম করল। তার হাসিমাখা বাঁকা ঠোঁট দুটিকে সে লক্ষ্য করল। নিজের কোমল ঠোঁট দুটির কথা সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল। আঃ! দেহমনে যেন তার নেশার ঘোর এসেছে। চোখে দুটি ভারি হয়ে আসছে। শয়নকক্ষে সেই হাল্কা আলোয় ঘুমের ভান করে স্বামীর পবিত্র মুখশ্রীর সুষমা সে পান করতে থাকল। তারপর তার পায়ের কাছে এসে শুয়ে পড়ল সে। পাশের স্পর্শে দেহে তার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'শ্রেষ্ঠ এই মানুষটি—মূর্তিমান এই রত্নটি—শ্রেষ্ঠ এই বীর পুরুষটি আমার স্বামী। ভালবাসায় ভরা মন নিয়ে আমায় বিয়ে করেছেন। আমার ব্যবহারে এ পর্যন্ত কী মূর্খতাই না প্রকাশ পেয়েছে। আমি কি এঁর হাতের স্পর্শ আর আমার হাতে পাব ? আর কি ইনি আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলবেন ! ভাবপূর্ণ ঐ চোখ দুটি মেলে আমার দিয়ে ে ের দেখবেন কি উনি আর ? এঁর আলিঙ্গনের মহিমায় আর কি আমি হারিয়ে যাবার সুযোগ পাব ? কোনো শাস্তিই আমার অপরাধের তুলনায় কঠোর হবে না।' তার ভয় হতে লাগল। 'হাজার পায়ে ধরলেও ইনি আর কি আমায় ক্ষমা করবেন ?'

সবকিছুই নারায়ণ রাও দেখছিল। কাছে এসে শারদা যখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তখন সে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। মনটা তার উথাল পাতাল করে উঠেছিল। 'কী ভাবে একে আমি আলিঙ্গনে বাঁধি ? কী অপরূপ রূপ। এতদিন পরে ও আমাকে আপন করে নিতে আসছে। এর সবটাই স্বপ্নমাত্র নয়তো ? সে দিন আর কতদূরে যখন আমরা দুজন পরস্পরকে চিনে নিয়ে এক হয়ে যাব ?'

নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে শুয়ে সে তার মধুর এই স্বপ্নকে উপভোগ করতে থাকল আর রাত তার সময়ের সীমাকে অতিক্রম করায় প্রয়াসে এগিয়ে চলল।

শারদার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ জানিয়ে জমিদার কুন্নুর থেকে পরের দিন টেলিগ্রাম করলেন। সূর্যকান্তমও ভাল নম্বর পেয়েছিল। নারায়ণ রাওয়ের কাছে আর একটা ভাল খবরও এসে গেল। দুদিন আগেই সে খবর পেয়েছিল রামচন্দ্র রাও চার দিনের মধ্যে কলম্বো পৌছচ্ছে।

দুজোড়া চুড়ি সে আগেই মাদ্রাজে কিনে রেখেছিল, সেটার দাম পাঁচশো টাকা। পরীক্ষায় সফল এই তরুণী দুটির জন্যই তার ওই সওদা। এক জোড়া বোনের আর অন্য জোড়া শারদার। উপহার পেয়ে তাদের আনন্দের সীমা রইল না।

সুব্বারায় সেদিন তাঁর দাস দাসীদের খদ্দরের কাপড় আর ফুলফল বখশিস্ হিসেবে দিলেন। প্রশংসার মধ্যে দিয়ে সকলেই শারদা এবং সূর্যকান্তমের উৎসাহকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। আনন্দের আবেগে সূর্যকান্তম্ শারদাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

"দিন চারেকের মধ্যে তিনি আমেরিকা থেকে আসছেন এখবর শুনেছ ?" শারদা জিজ্ঞেস করল।

"আঃ সবুর কর,—আগেই তুমি চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিলে ?—"

সোমৈয়ার বৌ এসে তার ছেলে আর জামাইয়ের বিবাদের কথা, জামাইয়ের কুকীর্তির কথা এবং ছোটবাবুর উপকারের কথা জানকাম্মাকে জানাল। সীতন্না সেদিন থেকে বদলে গেছে। "নারায়ণ রাওজী হচ্ছেন প্রভুর মত প্রভু।" সে বলল। কথাটা কানে আসতেই আনন্দে শারদার মন নেচে উঠলো।

সেই জন্যই কি বৌ আমাকে স্নেহের চোখে দেখে ?—আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ? বেঙ্কায়াম্মা এবং তার বয়স এক। ছোট বেলায় সে নারায়ণ রাওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

"ছেলেবেলায় আপনার বরকে কেষ্ট ঠাকুরটির মতো মনে হত। সারা গায়ে এত গয়না ছিল যে গৃহকর্ত্রী ভয় পেতো কারো যাতে নজর না লেগে যায়। সবাই ওকে কোলে নিতে চাইত। কিন্তু কারো ধরবার জো ছিল নাকি ? শরীরে জোরও ছিল খুব। একবার আমার একটা গোরুকে যেই না কুকুর

কামড়াতে এসেছে অমনি লেজে মোচড় দিয়ে উনি তাকে ভাগিয়ে দিলেন। এখন ওর বয়স হচ্ছে তিন বছর। কুকুরটাও ছিল ছোটখাট একটা মোষের মতো। ভয়ের চোটে কেঁউ কেঁউ করতে করতে সে পালিয়ে বেঁচেছিল।

উনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বুঝদার লোক।

"ছোটবেলা থেকেই মানুষকে উনি ভালবাসেন। চামারদের পর্যন্ত উনি নানান জিনিস দিতেন। গান্ধীজীর কথা শোনার আগেই উনি বাড়ি থেকে অনেক জিনিস নিয়ে গিয়ে আমাদের এবং অচ্ছুৎদের দিতেন। মনে ওঁর বড় ভক্তি। আমরা যখন খেতাম স্নেহের দৃষ্টিতে উনি তাকিয়ে থাকতেন। ওঁর দয়ার কথা আর কী বলব। আমরা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে এঁর মতন বুদ্ধিমান মানুষ দুনিয়ায় মেলে না।"

"লেখাপড়ায় কেমন ছিলেন?" সে অসংকোচে প্রশ্ন করল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

"ওঁর লেখাপড়া? সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি ভাগ্যবতী। আপনাদের জোড় মিলেছে ভাল। নারায়ণ রাওয়ের একটি বাচ্চা এতদিনে আপনার হওয়া উচিত ছিল। আসছে বছর নিশ্চয়ই হবে।"

"জেলে গিয়েছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই উনি বক্তৃতা দিতেন। এর মধ্যে গান্ধীজী এলেন। আর দেখে কে—বক্তৃতাও খুব বেড়ে গেল। সরকারও সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গেল। উনি জেলে যাবার সময় বহু লোক জমা হয়ে গিয়েছিল। আশপাশের সবাই এসে জড়ো হয়েছিল। উনি যতদিন জেলে ছিলেন জানকাম্মার ততদিন আহার নিদ্রা ছিল না। উনি যখন ছাড়া পেলেন আপনার শাশুড়ী তখন খুব ধূমধামের সঙ্গে পূজোপাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯। বন্দী

এক সপ্তাহ পরে মাদুরা থেকে টেলিগ্রাম এল যে বিপ্লবী মনে করে সরকার রামচন্দ্র রাওকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণ রাও সঙ্গে সঙ্গে মেল ধরে মাদ্রাজ চলে এল। সে দিনই সন্ধ্যায় মাদুরা যাওয়া সম্ভব ছিল। সিনিয়ার

উকিলের সঙ্গে সে পরামর্শ করে নিল। তাঁকে সঙ্গে করে সে প্রাদেশিক পুলিশ প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি বললেন যে রামচন্দ্রের কেসটা বড় জটিল। তার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সরকারের হস্তগত হয়েছে। তিনি নিজেই রামচন্দ্র রাওকে গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছেন। প্রাণকান্ত বোস এবং গুণ্ডারা সিংহের মামলার সঙ্গে তাঁর গ্রেফতারের যে সম্বন্ধ রয়েছে সে কথাও তিনি জানালেন। এরপর সে সোজা নীলগিরি কুনুর গেল। শ্বশুরের সঙ্গে কথাবার্তা হল। শ্বশুরের সঙ্গে উটি যেতে হল। জমিদার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর তাকে নিয়ে পুলিশ প্রধানের কাছে যাওয়া হল। মন্ত্রী এবং জমিদার মশাই রামচন্দ্রের কেসের ব্যাপারে এসেছেন শুনে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন।

"তিনি কি আপনার আত্মীয়, রাজা সাহেব?"—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দেখুন তার কেসের কাগজ পত্র। আমি তাকে দশ দিনের জন্য আটক রেখেছি। এমন কতকগুলি ব্যাপার রয়েছে যার ফলে আমরা তাঁকে সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি।"

জমিদার সব কাগজপত্র পড়লেন। আমেরিকার গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগ সেগুলো পাঠিয়েছিল। আমেরিকায় তিলকের জন্মদিবস উপলক্ষে রামচন্দ্র রাও বক্তৃতা করেছিল। বক্তৃতার কাটিংও ছিল। এবং সে বক্তৃতায় বৈপ্লবিক পন্থার সমর্থনও করা হয়েছিল। এই বিষয়ের উপর 'ভারত সন্দেশ' পত্রিকায় রামচন্দ্র রাও একটি প্রবন্ধও লিখেছিল। সেটাও ছিল। প্রাণকান্ত বোসের সহযোগিতায় সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল প্রভৃতি কথাও ওইসব কাগজে উল্লিখিত হয়েছিল। এই কেসের অ্যাপ্রুভারের মুখ থেকেই এসব কথা জানা গিয়েছিল। ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের অনুমোদন নিয়ে জমিদার অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেলকে ডেকে আনলেন।

রামচন্দ্র রাওয়ের কেস সম্বন্ধে সকলে যুক্তিপরামর্শ করলেন। অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল, মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ কর্মচারীদের জমিদার মশাই বললেন যে রামচন্দ্র রাও খুবই তীক্ষ্ণধী যুবক। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌দের মধ্যে সে অন্যতম। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা তার ছিল। সে বিদেশের এম. এস-সি, ডিগ্রীধারী। অন্ধ্রে এই ডিগ্রী দুর্লভ।

নথিপত্র দেখে অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল বললেন, "এতে দুজন সাক্ষীর

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একজন হচ্ছে আমেরিকান গুপ্তচর পুলিশ এবং অপর ব্যক্তি হচ্ছে অ্যাপ্রুভার। এরা কী বলতে পারে পত্রিকায় তা লিখেছে। দ্বিতীয়জন বলছে যে এরা তিনজন রাত্রে একত্র হয়েছিল। কাগজপত্রের সাক্ষী কাজে লাগবে না। রাত্রে একজন অপর জনকে চিনল কী করে?

প্রাণকান্ত এবং গুণ্ডারা সিংহের ব্যাপার অন্যরকম। এরা দেশে ফিরে বোমা প্রভৃতি তৈরি করেছে। আরও অনেক কিছুই এদের দ্বারা হয়েছে। সুতরাং তারা যে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ কেসের সঙ্গে রামচন্দ্র রাওয়ের কোনো সম্বন্ধ নেই।

মুখ্যমন্ত্রীও বললেন যে রামচন্দ্র রাও নির্দোষ।

পুলিশ কর্মচারী আর কী করতে পারেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে রামচন্দ্র রাওয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। মাদ্রাজ সরকারের বক্তব্যও তাই।

মাদ্রাজের গভর্নর ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের কাজকে সমর্থন করলেন। রামচন্দ্র রাওকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে সরকারের তরফ থেকে রামনাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে টেলিগ্রাম করা হল। জমিদার আনন্দিত মনে মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ প্রধান এবং অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তাঁরা দুজন সেখান থেকে কুন্নুর চলে গেলেন। শাশুড়ী, পত্নী, পিসি এবং অন্যান্য ছোট বড়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণ রাও [illegible]রার পথে রওনা হল। তার ওখানে যাওয়ার সংবাদ সে টেলিগ্রাম করে ভগ্নীপতিকে জানিয়ে দিয়েছিল, রামচন্দ্রের মুক্তির খবরটাও তাতে ছিল।

ইতালিতে জাহাজে চড়ার পর থেকেই রামচন্দ্রের মন স্বদেশ, স্বজন এবং বাড়ির চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল।

এসব সভ্যদেশ যত উন্নতই হক না কেন স্বদেশের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না। "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং মাতরম্‌ বন্দেমাতরম্‌।" ওহো আমাদের দেশে কত নদী, কত জলকেলির যোগ্য স্থান রয়েছে। আমার ভারত-মা আমায় ডাকছেন।

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুম দল শোভিনীং

অরণ্য পর্বত উদ্যান শস্যক্ষেত্র নদী সমুদ্র আর পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ। মা আমার আনন্দে পুলকিত। সুরভিত সুন্দর বিচিত্র বর্ণের পুষ্পে সুশোভিত মায়ের অঙ্গ। হিমালয় হচ্ছে তাঁর শিরোদেশ। ভারতমাতার মুখ কী আনন্দোজ্জ্বল? হায় মা, দুর্দশার তোর সীমা নেই। কিন্তু তোর সন্তান কখনো তোকে ভুলতে পারে?

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজৈ ধৃত খর করবালে!

—এ স্তোত্র ভারতের সব ভাষাতেই পাঠ করা যায়। কতদিন হল এ গান শুনেছি। সুন্দর আর মধুর তেলুগু না শুনে কান আমার নিষ্ক্রিয় প্রায় হয়ে পড়েছে। অন্ধ্রদেশ আমাদের কাছে অবিনশ্বর দেবতারই মতো। জন্মভূমি মা আমার, কবে আমি তোর চিন্তায় তন্ময় হবার সৌভাগ্য লাভ করব? ওগো গোদাবরী, তোমার স্নেহ, আর তোমার ভাবময়তাকে কি আমি কখনও ভুলতে পারি? সুদূর পাপী পাহাড়, তোর দ্বীপ আর তোর জল দেখে কবে আমি আমার চোখ জুড়াব?

কৃষ্ণা, পেন্না কবে তোমাদের দেখা পাব? রাজমহেন্দ্রবরম্ আর কাকিনাড়ার পথের স্পর্শ কবে আমার লাভ হবে?

কোত্তপেটে শ্বশুরবাড়ী আর ছোট বৌ সূর্যকান্তমের কথা তার মনে পড়ল, আহা কত সমঝদার আর কী মিষ্টি মেয়ে। এতদিনে বেশ বড়সড় হয়েছে নিশ্চয়। সবই ভগবানের মায়া। লিওনোরা নিজেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। জাতিভেদে কি মনোভাবেরও বৈষম্য দেখা যায়? আমার প্রাণের ধন সূর্যকান্তম্ এখন কী করছে কে জানে? তার স্বামী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে ফিরে আসছে। নিশ্চয় সে খুব খুশি হয়েছে। পরীক্ষায় কি সে পাশ করেছে? অবশ্যই করে থাকবে। কতক্ষণে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে? আচ্ছা, আমায় দেখে তার মুখের ভাবে কেমন পরিবর্তন আসবে?

নারায়ণ রাওয়ের ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর কতদিন শুনি নি।

মা নিশ্চয় আমার জন্য অনেক কেঁদেছে। পত্নীকে ছাড়া যায় কিন্তু মাকে সন্তান কখনো ভুলতে পারে? মা, এ অভাগা কেন বিদেশে গেল? কাকিনাড়া কখন পৌঁছব? মায়ের পায়ে কখন মাথা রাখব? পূজনীয় পিতৃদেবকে প্রণাম। যতদিন আমি আমেরিকায় ছিলাম, তাঁর চিঠিগুলোর মধ্য দিয়ে

স্নেহ যেন ঝরে পড়ত। ব্যবসায়ী বন্ধুদের মারফত তিনি কতবার খবর পাঠিয়েছেন। শ্বশুরমশাই রাশভারী মানুষ। ভয় বলতে কোন জিনিস তিনি জানেন না। মানুষের সততায় তিনি বিশ্বাসী। তিনি হচ্ছেন বিশাল পর্বতের মতো। কে জানে তিনি কোন্ যুগের বীর। সূর্যকান্তম্ আমায় কী কথা বলবে? বিবাহের দিন যে সূর্যকান্তম্ সুন্দরীকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে এখনকার সূর্যকান্তমের কতখানি তফাত হবে? অনেক পরিবর্তন হয়েছে নিশ্চয়। তার শেষের দিকের ফটো দেখে আমি তো চিনতেই পারি নি। দিন স্থির করার কথা নারায়ণ রাও টেলিগ্রাম মারফত আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। সে আমায় খুবই ভালবাসে। আচ্ছা, নারায়ণ রাও কী করে সকলের প্রেমের আর ভালোবাসার পাত্র হল?

সিলোন এসে গেল। কলম্বোয় জাহাজ থামল। জাহাজে ভারতীয় খাবারের ব্যবস্থা ছিল। ইতালির লোকেরা ভারতীয়দের ভালোবাসে।

জাহাজ থেকে নামার সময় প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রার কথা রামচন্দ্র রাওয়ের মনে পড়ল। লিওনোরা মেয়েটির মন ভালবাসায় কী রকম ভরপুর ছিল। সেই দিনের সন্ধ্যাটি তার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে এক অবিস্মরণীয় আনন্দ। তার মনটা ছিল নির্মল। কিন্তু কেন সে এমন করে আত্ম সমর্পণ করল? অনেক চেষ্টা করেও সে তার সৌন্দর্যে এবং প্রেমে মুগ্ধ না হয়ে পারল না।

সে বলেছিল, "প্রিয়তম রামচন্দ্র আমার, স্ত্রীকে নিয়ে সুখে জীবন কাটাও। আমায় ভুলে যেও। ভারতের প্রতি আমাদের যতখানি ভালোবাসা আছে, তেমন আর কোনো দেশের প্রতি নেই। ভারতবর্ষের কাজে আমার দেশেরই বিজয়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাভারতের একটা শ্লোক শুনিয়ে তুমি একবার তার অর্থ বলে দিয়েছিলে। সেই ভাবেই আমাদের দেশের মতো দেশ তোমাদের সাহায্য করে থাকে।

তোমাদের দেশ হচ্ছে একটি শ্রেষ্ঠ দেশ। পূজনীয় এমনই একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে সৃষ্টি হবে বিশ্বের মুক্তিদায়ী এক মহাশক্তির। ইহুদিরা নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ুক এই উদ্দেশ্যেই কি যীশু জন্মগ্রহণ করেন নি? সেই ভাবেই গান্ধী অথবা অন্য কেউ বিশ্বের মুক্তির জন্য তোমাদের দেশেই আবির্ভূত হবেন।

তার উৎসাহ এবং প্রেম দুইই ছিল অনন্ত। সে নিশ্চয় করে বলেছিল যে সে ভারতে আসবে। আমার পুনর্মিলন উৎসবে উপহার পাঠানোর ইচ্ছা সে প্রকাশ করেছিল। সেই শুভ দিনটির কথা জানিয়ে সে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে। এইসব চিন্তার ভিড়ে সে হারিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় ভাষার কলরব তাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনল। সে রোমাঞ্চিত হল। চোখের জলকে অনেক কষ্টে রোধ করে সে একটি হোটেলে গিয়ে নিরামিষ খাদ্যের অর্ডার দিযে নিজের ঘরে চলে গেল। সেখানে কাপডচোপড় বদলে, খেয়ে দেয়ে সে ট্রেনে করে পোলনার পেঁ ছিল।

২০। রামচন্দ্রের আগমন

পোলনার থেকে স্টিমারে করে ধনুষ্কোটিতে নামতেই আনন্দের আবেগে সে রোমাঞ্চিত হল। ভারতভূমির পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করে এককণা মৃত্তিকা সে তার মুখে ফেলে দিল। অপেক্ষমান একজন গ্রাম্য লোক ভাবল, একি, সাহেব মাটি খেল! এই অবসরে তিনজন পুলিশের লোক—একজন ইন্‌স্পেক্টর আর দুটি কনস্টেব্‌ল তার কাছে এসে প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কী?"

"আমার নাম রামচন্দ্র রাও।"

"পদবী?"

"বুদ্ধস্বরূপ।"

"এই আপনার ওয়ারেণ্ট, আমরা আপনাকে গ্রেফতার করছি।"

ইন্‌স্পেক্টর তার কাঁধে হাত রাখল।

"এই এ কী ব্যাপার!" রামচন্দ্র রাও অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে সে ভাবছিল যে এইবার কী হবে। নির্ভীকভাবে হাসিমুখে সে বলল, "কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন যে আমাকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে?"

"মাপ করবেন। আমি বলতে পারব না। ওপরওয়ালারা জানেন।"

"আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"মাদুরা, ওখানে জেলে রাখা হবে।"

"আমি বাবা মাকে টেলিগ্রাম করতে চাই।"

"মাদুরা থেকে করতে পারবেন।"

পর দিন তারা মাদুরা পেঁছিল। সেখান থেকে রামচন্দ্র শ্যালককে খবর পাঠাল। "আমাকে কেন যেন গ্রেফতার করেছে। আমি কিছু করি নি। আমি সত্যাগ্রহীও নই। তা হলে কারণটা কী? আমি কি বিপ্লবী? তাও তো নই।"—সে ভাবল। আর সেই মুহূর্তেই আমেরিকায় দেওয়া বক্তৃতার কথা তার মনে পড়ল। "উৎসাহের মাথায় কিছু বলে ফেলেছি। ব্যস এই টুকুই মাত্র। শ্যালকও জেলে যায় নি তো? আমিও যদি যাই সেও একরকম দেশ সেবাই হবে। মা, ভারতমাতা, তোমার মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভারতবাসীকে কি কারারুদ্ধ হতে হবে? আমি বিপ্লবের পক্ষপাতীও নই আর ষড়যন্ত্রও করি নি। বিজ্ঞানের সেবার মধ্য দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধিই আমার কাম্য। যাই হোক সবই ভগবানের ইচ্ছা।"

রামচন্দ্ররাও গ্রেফতার হবার চারদিন পর নারায়ণ রাওয়ের পক্ষে মাদুরা পেঁছানো সম্ভব হল। সে কুনুর থেকে মাদুরা পেঁছাবার আগেই টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছিল যে রামচন্দ্র রাওকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হোক এবং গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মচারীর সঙ্গে তাকে মাদ্রাজ পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মুক্তির পর সরকারের বিরুদ্ধে সে যে কোন রকম আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে না, এ আশ্বাস তার পক্ষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। নারায়ণ রাও টেলিগ্রাম করে ডি. এস. পিকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সে আসছে।

মনে মনে শ্বশুর মশাইকে কৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে মাদুরা স্টেশনে নেমে নারায়ণ রাও সোজা ডি. এস. পির ওখানে চলে গেল। এক মুহূর্তের জন্য হলেও নারায়ণ রাও প্রথমে কে যে তার ভগ্নীপতি আর কোন জন যে সরকারী কর্মচারী তা বুঝতে পারেনি। কর্মচারীটি ছিল ইংরেজ। প্রথমে সে তাকেই নমস্কার জানাল এবং তারপর তার ভগ্নীপতিকে।

ডি. এস. পির নির্দেশে একটা চেয়ারে সে বসে পড়ল। রামচন্দ্র রাও নারায়ণ রাওকে বলল, "ইনি আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তার কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। ইনিও গণিতশাস্ত্রে অক্সফোর্ডের বি. এ.। আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে।"

"আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।" এই কথা বলে নারায়ণ রাও তাকে ফুলের মালা এবং রুপোর চারটি পেয়ালা উপহার দিল।

পথেই তাদের সঙ্গে জমিদার পরিবারের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তারা সব মাদ্রাজ পৌঁছল এবং সেখানে জমিদারের বাড়িতেই সকলে আশ্রয় নিল। মাদুরা থেকেই রামচন্দ্রের ছাড়া পাওয়ার খবর কাকিনাড়া কোত্তপেট এবং অমলাপুরমে পাঠানো হয়েছিল। মাদ্রাজে নারায়ণ রাও, রামচন্দ্র রাও এবং পরমেশ্বর বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে আনন্দে দিন কাটাল।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ওরা সব শ্যামসুন্দরীর ওখানে গেল। শ্যামসুন্দরী আর তার বোনেরা রামচন্দ্র রাওকে সসম্মান অভ্যর্থনা জানাল।

সূর্যমের স্বামীকে পেয়ে তারা খুব খুশি হল। সেদিন রাত্রে তারা কাকিনাড়া যেতে চাইল। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের মাথায় একটি মজার পরিকল্পনা খেলে গেল। সেইজন্য তারা পরের দিনটাও মাদ্রাজেই থেকে গেল।

মানুষ হিসেবে রাজারাও খুবই ভাল লোক। শ্যামসুন্দরীও সচ্চরিত্রা মেয়ে। এদের দুজনের বিয়ে হলে কেমন হয়? দুজনেই চিকিৎসক। এবং সেবাই উভয়ের জীবনের লক্ষ্য। শ্যামসুন্দরী কি রাজী হবে? তার মনে কী আছে? আমায় কি ভাইয়ের মতো দেখে? ওই ভ্রাতৃস্নেহই ভাল।

সে দিন করুণাপরবশ হয়ে সে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। পরদিন নারায়ণ রাও শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে দেখা করল। এ প্রস্তাব তাকে দেয় কী করে? "বোন, সব সময় আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখি।"

"সেটা কী?" তার এই প্রশ্ন নারায়ণের কানে ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠলো।

"তুমি দেশসেবা, জনসেবা করতে চাও। শিক্ষা শেষে সবরমতী আশ্রমে গেলে সেবা করার সুযোগ তুমি পাবে, একথা আমায় জানিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, দাদা, মহাত্মাজীর পায়ের তলায় বসে সেবা করার তালিম নিয়ে আমি সেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। আমি কি তার উপযুক্ত, না উপযুক্ত নই?"

"যদি কিছু না মনে করো তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করবো।"

"তুমি যে প্রশ্নই কর'না কেন, আমি কি কোনদিন রুষ্ট হয়েছি?" মনটা যেন তার কেমন করে উঠলো।

—'প্রশ্নটা কী ? কী হতে পারে প্রশ্নটা ?'

—আমাকে আমার স্বপ্নের কথা বলতে দাও ! আমার মনে এতদিন নানা ধরনের চিন্তা এসেছে এবং মিলিয়ে গেছে। চিন্তাগুলো সব অদ্ভুত এবং আনন্দদায়ক। তুমি দেশসেবার ব্যাপারে কৃতসংকল্প। তুমি ব্রহ্মচারিণী। এই রকম পরিস্থিতিতে তোমার দিন কীভাবে যাবে ? যত বৈরাগ্যই থাকুক না কেন এবং তুমি যত নিষ্কামই হও না কেন, সম্মুখযুদ্ধে কামদেবের শিকার মানুষকে হতেই হবে। বুদ্ধ, গান্ধী, এঁরা অবতার পুরুষ। বহু চেষ্টায় এঁরা জয়ী হয়েছেন। সেই জন্যই ভগবদ্‌গীতা কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছে ?"

শ্যামসুন্দরী নির্বাক।

—আমার স্বপ্ন এবং আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে দুটি পবিত্র এবং দেশসেবায় আগ্রহী প্রাণ কেন আলাদা আলাদা থেকে জীবন কাটাবে ? কেন তারা একই পথের পথিক হবে না ? একই আদর্শে বিশ্বাসী স্বামী স্ত্রী তারা হবে না কেন ? ব্রহ্মচারিণী হিসেবে জীবন কাটানো তোমার পক্ষে দারুণ কঠিন। আমরা সবাই মানুষ। কোনো না কোনো সময় বিশেষ কোনো মুহূর্তে হলেও আমরা দেহের দাস হয়ে পড়ি। এই বিচ্যুতিকে রোধ করার জন্যই গার্হস্থ্য আশ্রমের সৃষ্টি হয়েছে। তোমার মতো মেয়ে যদি তোমারই মতো একজন সহযোগী ভাল বন্ধু পায় তাহলে তোমার আদর্শ আরও সহজভাবে সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে।"

শ্যামসুন্দরী প্রথমে কিছু বলল না। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "দাদা, তোমার বক্তব্য দুটি কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করো।"

"তুমি আর রাজারাও তোমাদের জীবনতরণীকে এক করে, এই সংসার-সাগরে, আদর্শের প্রার্থিত দ্বীপের কূলে কেন পৌঁছবে না ? তোমাদের দুজনের লক্ষ্য অভিন্ন। উভয়ের শিক্ষাও একই। দুজনেই মানুষ হিসেবে উত্তম। আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও আগ্রহ আছে।

"তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে। তোমরা দুজনে যদি দেশের কাজে লাগতে পার তাহলে কী ভালোই না হবে। এই স্বপ্নই আমি বারবার দেখেছি। আর এতে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।"

শ্যামসুন্দরী বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল। একটু পরে হাসিমাখা মুখে সে বলল, "দাদা, তুমি বাড়ি যাও ! ভেবেচিন্তে আমি টেলিগ্রাম করে দেব। তোমার

উদারতার সঙ্গে আমি চিরদিন পরিচিত।" নারায়ণ রাও আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তার মাথায় হাত রাখল। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গোদাবরী স্টেশনে রাজারাও লক্ষ্মীপতি, বীরভদ্ররাও, ভীমরাজু, সুব্বারায়, জানকাম্মা, রামচন্দ্র রাওয়ের মা, রামচন্দ্র রাওয়ের বন্ধুরা এবং নগরের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তার গলায় মালা পরিয়ে স্বাগত জানালেন। রামচন্দ্রের চোখে মুখে আনন্দের ছাপ। সকলে সেখান থেকে কাকিনাড়া গেল। কাকিনাড়ায় বন্ধুরা এবং গণ্যমান্য লোকেরা সমর্লকোটেই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হল। তারা শোভাযাত্রা বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। রামচন্দ্র রাও নিষেধ করল। নারায়ণ রাও বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও সকলে মিছিল করে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। ছেলের মুক্তি নারায়ণ রাওয়ের প্রচেষ্টা এবং জমিদার মশাইয়ের সাহায্যের কথা জেনে ভীমরাজু এবং দুর্গমম্মা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। এতদিন তাঁরা জানতেনই না যে তাঁদের ছেলে কারারুদ্ধ হতে হতে বেঁচে গেছে। আনন্দে চোখে তাঁদের জল এসে গেল। প্রবাসী পুত্রের কথা ভেবে ভেবে দুর্গমাম্বা শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছিলেন। আজ কিন্তু হাজার হাতির বল ফিরে পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হচ্ছে। ভীমরাজু আর সুব্বারায় মশাই আরামে সময়টুকু কাটিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র রাওয়ের বধূবরণোৎসবের দিন-ক্ষণ ঠিক করার জন্য আবার পুরোহিতকে ডাকতে হল।

জানকাম্মা দুর্গামাম্বাকে আলিঙ্গন করে দুই মায়ের আনন্দাশ্রুর ধারাসংগম সৃষ্টি করলেন। বৌ পরীক্ষায় পাশ করেছে জেনে রামচন্দ্র রাও খুব আনন্দিত হল। 'এখনও পুরোনো রীতি রেওয়াজ গেল না? তাহলে এর আর অর্থ কী? এ সময় সূরীকে নাকি দেখতে নেই। তার সঙ্গে কথা না বলে কতদিন থাকা যায়? পনেরো দিন কী করে থাকব? ছিঃ, এত পাগল আমি কী করে হলাম? রেঙ্গুন, জাপান আর আমেরিকায় বন্ধুদের চিঠি দেওয়া দরকার। সে সব সময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তাদের জানাতে হবে যে সে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে গেছে। সূরীকে দিয়ে লিয়োনোরাকে ইংরেজিতে চিঠি লেখাতে হবে।

২১। সম্বন্ধ সমাধান

সুরচন্দ্র প্রেমচন্দ্র কোম্পানির লোকেরা মাদ্রাজে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জগন্মোহন রাওকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। কোম্পানির কাছে সে শ' পাঁচেক টাকার বেশি ঋণী ছিল। জগন্মোহনের ঋণ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। চারদিকে তার ধার। বিয়ের জন্য সে বহু জায়গা থেকে টাকা নিয়েছিল। সুরচন্দ্র প্রেমচন্দ্র কোম্পানি থেকে সে হাজার টাকা নিয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচশো টাকা শোধ করে দিলেও বাকি পাঁচশোর জন্য তাদের হয়রান করছিল। তার জমিদারির অবস্থার কথা জেনে তারা সাবধান হল। কোর্টে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তারা ডিগ্রী পেয়ে গেল। জগন্মোহন রাও তখনও বেপরোয়া। শেষে তাকে যখন গ্রেফতার করা হল তখনই সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। লজ্জায় আর আতঙ্কে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিশাখপট্টনম থেকে আগত জয়নার সঙ্গে স্পেনসার হোটেলে দেখা করার জন্য সে জর্জ-টাউন যাচ্ছিল। সে যাচ্ছিল ট্যাক্সিতে। 'রাউণ্ডথানা'য় গাড়িটা দাঁড়াল। অনুসরণকারী গাড়ির আরোহী আদালতের কর্মচারীটি তাকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেণ্ট দেখাল। জগন্মোহন রাও হকচকিয়ে গেল। তার বড় রাগ হল। লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল। দশবিশ জন লোক তাকে ঘিরে জমা হয়ে গিয়েছিল। ট্রিপ্লিকেনে শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে কথা বলে নারায়ণ রাও চিন্তামগ্ন হয়ে নিজের গাড়িতে করে ঐ সময় বাড়ি ফিরছিল। পুলিশের গাড়ির এবং প্রাইভেট গাড়ির ব্যারিকেড্ দেখে ঘটনাটা জানার আগ্রহে সমবেত লোকদের কাছে ব্যাপারটা যে কী জিগেস করল। ধার শোধ না করার অপরাধে একজন জমিদারকে ধরা হয়েছে তারা জানিয়ে দিল। জমিদারটি জগন্মোহন রাও হতে পারে এই অনুমান করে সে গাড়ি থামিয়ে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ নেমে চলে গেল।

কোর্টের কর্মচারীটির কাছে গিয়ে সে কত পাওনা এবং কী ব্যাপার, ভাল করে জেনে নিল। তখন তার কাছে অত নগদ টাকা ছিল না। সে চেক দেবার প্রস্তাব করল। সুরচন্দ্র কোম্পানির লোকেরা চেক নিয়ে তাকে রসিদ দিয়ে দিল। ভিড়ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নির্বাক জগন্মোহন রাও ভাবতে

লাগল, "এই ব্যাটা অমানুষ কী করল? ওরই কি টাকা আছে? আমার নেই? আমাকে অপদস্থ করার জন্যে ওর এই কীর্তি। আমিই তো ধার করেছি, তা না হলে আর আমায় কী করে ধরে? ছাড়িয়ে নিয়ে আমায় অপমান করার সুযোগই বা এ কী ভাবে পায়? এর টাকা কটা আজ যে কোনো উপায়ে যোগাড় করে পাঠিয়ে দিতে হবে। নির্বোধ শুয়োর কোথাকার। সেইজন্যই তো বৌ-এর ভালবাসা কপালে জোটেনি। অনেক কাজে জড়িয়ে পড়েছি বলেই তো আমি যেতে পারি নি। নয়তো শারদা আমারই আলিঙ্গনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। যাক্‌গে, ব্যাটা যেমন আমায় অপমান করেছে, ওর বৌকে হাতের মুঠোয় এনে আমাকে তেমনই তার প্রতিশোধ নিতে হবে। আমার বিয়ের পর থেকে এ বিষয়ে আমি আর আগ্রহ দেখাই নি। কিল্লাকে পিসির বাড়ি গিয়ে কে কোথায় রয়েছে জেনে নিতে হবে। এর মধ্যে একবার লিখেছিলেন যে, কুনুর থেকে সে এখানে আসবে। হ্যাঁ শারদাও যে এখানে আছে সে কথাও জানিয়েছিল। যাই হোক বিশাখপট্টনমে যাবার আগে শারদার সম্বন্ধে জেনে নিতে হবে।

নারায়ণ রাও, রাজারাও, সুব্বারাও আর জানকাম্মা কোত্তপেট গেল। সারা রাস্তা নারায়ণ রাও নানা প্রসঙ্গ চিন্তা করল। রামচন্দ্র রাও ফিরেছে। আদরের বোনটি এতদিনে তার স্বামীর মুখ দেখতে পেল। এইবার আমাকে মাদ্রাজে একলা থাকতে হবে। কোত্তপেট গিয়ে মাদ্রাজের সংসারের খবর কী করে পাওয়া যায়? শারদার প্রেম সুবর্ণমৃগের মতো মরীচিকা মাত্র নয়তো? মনটা তার নরম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এখন আমার করণীয় কী? এ জীবনটা কি নিঃসঙ্গতার মধ্যেই কাটবে?

শারদা কি একবারের জন্যও আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে ভালোবাসার কথা বলেছে? তার আলিঙ্গন, চুম্বন আর দৃষ্টিবিনিময় আমার কপালে আছে কি? এ ভাবে আর কতদিন চলবে? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কি এইভাবেই কাটাতে হবে? বাড়ি ফিরে সে শ্যামসুন্দরীর চিঠি পেল:

"দাদা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি চিন্তা করলাম। তোমার প্রস্তাবের মধ্যে আমি ঈশ্বরের করুণার সন্ধান পেলাম। তুমিই ঈশ্বরের বাণীমূর্তি। আমি তোমার আদেশ পালন করব। তোমার বন্ধুকে আমি কোনোদিন ভালবাসি নি। তোমায় ভালবেসেছি ভাইয়ের মতো। তবু, ডাক্তারবাবু পুরুষ

হিসেবে পূজনীয়। তাঁর সেবায় আমি আমার সব কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত।

তোমার স্নেহের বোন
শ্যামা”

নারায়ণ রাওয়ের আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না। এইবার বাকি রইল রাজারাওকে রাজী করানো। সেদিন সন্ধ্যায় সে রাজারাওকে বাগানে নিয়ে গেল।

“—রাজা, তোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলার আছে। এমন কয়েকটা কথা পাডব যাতে তুই চমকে উঠবি।”

স্ত্রী গত হওয়ার পর থেকে রাজারাও উদাস ধরনের হয়ে গিয়েছিল। জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, এই ছিল তার ধারণা। একজন চিকিৎসকের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতাও বজায় রাখতে পারল না। আত্মীয়বন্ধুদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আবার বিয়ে করতে সে রাজী হয়নি। বাপমাও চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে কাকিনাডা থেকে নিজেদের গ্রাম এবং তারপর ছেলের ওখানে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন প্রাচীনপন্থী।

পুরানো রীতিনীতি রাজারাও আদৌ পছন্দ করত না। সে তার কন্যা দুটির নামকরণ অনুষ্ঠানও করে নি। দ্বিতীয় কন্যার জন্মলাভের পর ‘শান্তি’ও করায় নি। আঁতুড ঘরে গিয়ে সে পোশাক বদলায় না। এসব তার বাপ মার অপছন্দ ছিল। কিন্তু যেহেতু তাদের চোখের সামনে বহু আচার বিচারের পরিবর্তন ঘটেছে তাই তাঁরা ছেলেকে খুশিমত চলতে দিয়েছিলেন।

ছেলের গোঁ-এর কথা জানতেন বলেই তাঁরা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করেননি।

এ সবকিছুই নারায়ণ রাওয়ের জানা ছিল। রাজারাওয়ের সিদ্ধান্তকে পালটাতে একমাত্র নারায়ণ রাও-ই পারত।

‘নারায়ণ রাও’—এই নামটিতেই রাজারাও আনন্দ অনুভব করত। আর রাজারাওয়ের নামের মধ্যে নারায়ণ রাও পেত আনন্দের সন্ধান। দুজনের কাছেই আবার পরমেশ্বর ছিল খুব প্রিয়। পরমেশ্বরও তাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল।

—রাজা, তুই কি যোগী?

—না!

—সংসার ছেড়ে তুই কি সন্ন্যাসী হতে চাস?

—সেটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

—বার্ধক্যে?

—অন্তরাত্মা যখন বলবে তখনই।

—ততদিন পর্যন্ত?

—রোগীর সেবা করতে থাকব।

—শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহাযোগীরা এবং রাধাকৃষ্ণণের মতো জ্ঞানীরা সন্ন্যাস সম্বন্ধে কী বলেছেন?

—পুরোপুরি বৈরাগ্য না আসা পর্যন্ত সন্ন্যাস নিও না।

—সন্ন্যাস না নেওয়া পর্যন্ত তোর কর্তব্য কী? এ ব্যাপারে তোর মন কী বলে?

—পরিশুদ্ধ কর্মযোগের আচরণ করা।

—কর্মযোগের জন্য হৃদয়ের পবিত্রতার প্রয়োজন হয় কি না? তোর চিকিৎসা-বৃত্তির মধ্যে আজকের জগতে অপবিত্র না হয়ে তুই কি থাকতে পারবি?

—থাকতে পারব না?

—বেশ, পারলি না হয়, ধার্মিক গৃহস্থের চিত্তচাঞ্চল্যের কি অবকাশ থাকে না? স্ত্রী জীবিত থাকা পর্যন্ত তুই গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেছিস। তখন কি তোর মন কখনও চঞ্চল হয় নি?

—চঞ্চল যে হয় নি সে কথা বলতে পারি না, তবে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়ে যেত।

—তৃপ্তিলাভ করা সত্ত্বেও এমন অনেকে আছে যাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন বহু সদ্ব্যক্তির নজীর আছে যাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করতে করতে কলঙ্কের পাঁকে ডুবে মরেছেন। যাই হোক, বিজ্ঞতার সঙ্গে সৎপথে চলতে পুরোপুরি বৈরাগ্য লাভই যখন একজন পুরুষের লক্ষ্য তখন এই রকম উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা. এবং মনোবৃত্তি সম্পন্না স্ত্রী যদি মেলে, তাহলে সে তাকে গ্রহণ করবে না কেন? কেন তারা তাদের জীবনকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক-সঙ্গে চলবে না?

—যা বলবে পরিষ্কার বলো, কবিতা কোরো না।

—আচ্ছা, শ্যামসুন্দরীদেবী আর তুই, তোরা দুজনেই চিকিৎসক। সে গুণবতী মেয়ে। মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে গিয়ে সেবার কাজে লাগতে চায়। রোগগ্রস্ত মানুষের সেবাই হচ্ছে তার জীবনের আদর্শ। ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়ে সে জীবনটা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তুই বুদ্ধিমান এবং মহাত্মাজীর উপদেশ পড়েছিস। বিয়ে না করে তুই রোগীদের সেবা করতে পারবি না। উপযুক্ত সময় না এলে সন্ন্যাসও তুই নিতে পারবি না। প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে তুই কি প্রলোভন দেখবি না? শ্যামার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না কেন? বহুদিন থেকে এই কল্পনা আমার মধ্যে সজীব হয়ে রয়েছে। তোদের দুজনের বিয়ে অন্ধ্রদেশের পক্ষে আদর্শস্থানীয় হবে। তোর বাপ মা এ বিয়েতে যে আপত্তি করবেন তা আমি জানি। কিন্তু সাহস করে এ তোকে করতেই হবে।

—নারায়ণ, তুই আমাকে বোধ হয় অন্তরীক্ষবাসী কোনো এক পরম পুরুষ বলে মনে করিস। মন আমার সর্পিল গতিতে চলে। আমি কেন ব্রহ্মচারী রয়েছি? কারণ, স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল কামকে উপলক্ষ করে। আমার ধারণা, তার মৃত্যু ঘটেছে সেই জন্যই। (বলতে বলতে চোখে তার জল এসে গেল) আমি পাপী। এ ধরনের পাপ আমি আর করতে চাই না। কিন্তু আমি ভেবে দেখব। মন যদি আমার রাজী হয় তাহলে বাপমাকেও আমি রাজী করিয়ে নেব। আমার মনেও এমন চিন্তা এসেছে যে শ্যামসুন্দরী দেবী আমার সন্তানদের আদর্শ মা হতে পারে। পরলোকগত সুরম্মা নিশ্চয় সুখী হবে। আমায় ভাবতে দাও! আমরা দুজন একাত্ম বলেই আমাদের দুজনের মনে একই চিন্তার উদয় হয়েছে।"

তার চোখ থেকে অশ্রুর ধারাবর্ষণ শুরু হল। নারায়ণ রাও স্থির থাকতে পারল না।

দুজনের শোক মহানন্দে পরিবর্তিত হয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে গাছের ছায়ায় আর দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেল, মিলিয়ে গেল।

২২। ষড়যন্ত্র

রাজমহেন্দ্রবরমে এসে বরদকামেশ্বরীদেবী ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছিলেন। জমিদার দু-তিনদিন খেয়াল করেন নি। কিন্তু পরে জ্বর একশো তিন চার পর্যন্ত উঠতে লাগল।

দুই মেয়েকে আসার জন্য টেলিগ্রাম করা হল।

নারায়ণ রাও আর শারদা সেই দিনই রাজমহেন্দ্রবরমের পথে যাত্রা করল। বিশ্বেশ্বর এবং শকুন্তলাও এল।

নারায়ণ রাও শাশুড়ীর কাছে গেল। কুশলপ্রশ্ন করে নাড়ী দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল যে জ্বর প্রায় একশো চার হবে। সে কুইনিন খাইয়ে দিল। কমলা লেবুর রস ও বার্লির জল দেওয়া হল।

তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাজমহেন্দ্রবরমে জমিদার মশাইয়ের একজন পুরোনো চিকিৎসক ছিলেন। এম. বি. বি. এস. পাশ করার পর তিনি চাকরি নিয়েছিলেন। চাকরিতে পেনসন হওয়ায় তিনি রাজমহেন্দ্রবরমে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। আগে চিকিৎসক হিসাবে তাঁব নাম ছিল। কিন্তু এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নতুন নতুন বইপত্রও আর তাঁর পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না। বৃদ্ধ ডাক্তারের যাতে কিছুটা সাহায্য হয় তার জন্য নারায়ণ রাও শ্বশুর মহাশয়কে বারবার তাগাদা দিয়ে রাজারাওকে আনিয়ে নিল।

চারদিন ধরে রাজারাও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করল। রোগীকে কুইনিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। বরদকামেশ্বরী দেবীর অজ্ঞাতে আঙুর আর লেবুর রসের সঙ্গে ডিমও মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চারদিন পর জ্বরটা নেমে এল। অমলাপুরম্ যাবার আগে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে, জ্বর একেবারে ছেড়ে গেলে পথ্য দিতে রাজারাও বলে গেল।

বাড়ীতে দাসদাসী আর আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না। কিন্তু শ্বাশুড়ীর বিছানার পাশে দিনরাত নারায়ণ রাওকেই শুশ্রূষারত দেখা যেত। নারায়ণ রাওয়ের ছোঁয়া পেলে রোগিনী সুস্থ বোধ করতেন। তার কণ্ঠস্বর তাঁর কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মতো মিষ্টি লাগত। নারায়ণ রাও সামনে বসে ছিল বলেই তিনি পথ্য খেতে পেরেছিলেন।

জ্বরের ঘোরে নারায়ণ রাওকে তিনি অনেক কটুবাক্য বলেছিলেন। জগন্মোহনের প্রশংসাও তিনি করেছিলেন। শারদার হরণকারী দানব বলেও তিনি নারায়ণ রাওকে অভিহিত করেছিলেন। নারায়ণ রাও হাসিমুখে সবই শুনেছে আর ভেবেছে।

'এই হল তাহলে আসল রহস্য।' এবং তাঁর মাথায় ভিজে নেকড়ার পটি লাগিয়েছে। 'আগেকার দিনের জামাইরা হত এক প্রকৃতির আর আজকের জামাইরা একেবারে অন্য রকম।' এই কথা ভেবে বরদকামেশ্বরী দেবী চোখ বড় বড় করে নারায়ণ রাওয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর আনন্দ হচ্ছিল। কেউ যখন কাছে থাকত না আর জ্বরের তন্দ্রা থেকে তিনি যখন জেগে উঠতেন তখন তিনি হাঁক দিতেন, "নারায়ণ রাও!"

নারায়ণ রাও একদিন জমিদার গৃহিণীর কাছে বসে ছিল। তাঁর গায়ে তখন একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর। দেহ যেন জ্বলে যাচ্ছিল। আতঙ্কিত জমিদার এসে স্ত্রীর পালঙ্কের একপাশে বসলেন। রাজারাও, বলল, "ভয়ের কিছু নেই।"

নারায়ণ রাও খেতে চলে গেল।

বরদকামেশ্বরীদেবী চোখ মেলে জমিদারের দিকে একবার চাইলেন এবং বললেন, "জামাইকে ডেকে দাও।" জমিদার মুখ নিচু করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

সেই মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত কোনো সময়ই তিনি তাকে 'জামাই' বলে ডাকেন নি। এ কি আর বাঁচবে? তাঁর অবস্থা দেখে রাজারাও বলল, "জ্বর আর বাড়বে না। এক হপ্তার মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। ম্যালেরিয়া তো। সবে কুইনিন দেওয়া হয়েছে। তাই রক্তটাও এখন পরীক্ষা করা যাবে না।"

—ঘাম দেওয়া এবং ইঞ্জেকশান দেবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কমে যাওয়া থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ম্যালেরিয়া। অ্যাটেব্রিন ইত্যাদিও খাবার জন্য দিচ্ছি।

ততক্ষণে নারায়ণ রাও এসে শাশুড়ীর পাশে বসে পড়েছে। শাশুড়ী চোখ খুলে তার দিকে দেখলেন। দশ মিনিটে তাঁর জ্বর একশো দুই পর্যন্ত নেমে এলো।

ভীত কেশবচন্দ্র মায়ের কাছে এল। "মা ঠিক হয়ে যাবেন। তুই ভয় পাস না। আট বছরের ছেলের ভয় পেতে নেই।" নারায়ণ রাও তাকে বলল। "তুমি এখানে থাকলে মা নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন।" একথা বলে সে শকুন্তলা, শারদা আর পিসিমা যেখানে বসেছিল সেখানে চলে গেল। শারদাকে সে বলল," দিদি, ছোট জামাইবাবু না থাকলে মা ভাল হবেন না। জামাইবাবুকে তুমি যেন যেতে বল না!" শারদা লজ্জিত হলো। "খুব, সত্যি কথা"—বলে শকুন্তলা তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করল।

শকুন্তলার ছেলে পিলেরা নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। 'মেসো, মেসো', করে তারা বেশ শোরগোল তুলে দিয়েছিল।

জর নেমে যেতেই শাশুড়ী নারায়ণ রাওকে বললেন, "আমি সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকো!" নারায়ণ রাওকে তাই আরও চারদিন থাকতে হল। শাশুড়ী হাঁটাচলা শুরু করতেই সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোত্তপেট রওনা হলো।

পিসির জ্বরের সময় জগন্মোহন রাও তাঁকে দেখতে এল। সে মাঝে মাঝে এসে তাঁর খবর নিয়ে যেত। নিজের বাহুবন্ধনে শারদাকে বাঁধবার চেষ্টা সে অনেক করল। মায়ের অসুখে শারদাকে সে সান্ত্বনা দিত। শকুন্তলা আর জমিদারের সঙ্গে সতর্ক হয়ে কথা বলত। মনে মনে গজরাতে থাকলেও নারায়ণ রাওকে সে বলেছিল, "কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার হিসেবটা চুকিয়ে দেব।"

"সে কী দাদা, আপনাকে কিছু দিতে হবে না। সময়মত আপনার কাছে টাকা ছিল না তাই তারা গোলমাল করেছে। সে কথা আপনি মনেও আনবেন না। আপনি পাঠালেও আমি ফিরিয়ে দেব।" হাসতে হাসতে নারায়ণ রাও বলেছিল।

—আমি বড় আর ও ছোট। গজগজ করতে করতে সে শারদার ঘরে গেল। সে তখন একটা উপন্যাস পড়ছিল।

—কী পড়ছ শারদা?

—লে-মিজারেব্‌ল।

—কী?

—আমি হ্যুগোর বই পড়তে আরম্ভ করেছি।

—হ্যগো বাদ দাও, ড্যুমা আর ওয়েল্‌সের উপন্যাস পড়েছ কি?

ড্যুমার 'মন্টি ক্রিষ্টো' পড়েছি।

ঘরে সাজিয়ে রাখা উপন্যাসগুলোর দিকে সে বেশ একটা সন্ধানী দৃষ্টি দিল। সব কটিই ভালভাবে বাঁধানো এবং প্রত্যেকটির ওপর লেখা 'শারদার জন্য—নারায়ণ।'

নারায়ণ রাওয়ের রুচি আছে।

নারায়ণ রাও চলে যাওয়ার পর জগন্মোহন শারদার মনকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করল। টেলিগ্রাম মারফত কুড়ি টাকা দামের 'ওমর খৈয়ামের বই আনিয়ে সে শারদাকে দিল। উপন্যাসে আর পাশ্চাত্য কবিতার বিষয়ে সে শারদার সঙ্গে সে আলোচনা করত। সে বলত, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত কবিতাগুলোই প্রকৃত কবিতা। নিজের বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ শারদাকে সে একখানা বই দিয়েছিল।

নরনারীর যৌনজীবন সম্বন্ধে তাতে স্পষ্টোক্তি ছিল। বিব্রত বোধ করে শারদা বইটি ফেরত দিয়ে দিল। মনে মনে তার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব এসে গেল।

সারা সপ্তাহের প্রতিটি দিন সে শারদার খোশামোদ করে কাটিয়ে দিল। তাকে ইংরেজি কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ করল। গান সম্বন্ধে বলল, "খানদানী বংশের লোকেরাই সংগীতের সমঝদার হয়ে থাকে। স্বর্ণকার অলংকার বানায় কিন্তু পরি আমরা। মেয়েরা শিখতে পারে বটে কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে নীচু জাতের লোকেদের পক্ষেই এটা শিক্ষণীয়।" একথা শুনে শারদা বেশ রেগে গিয়েছিল।

তারা দুজনে বহু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করল। সংগীত শিক্ষা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সবই তার মধ্যে পড়ে। ওই আলোচনায় জমিদার এবং বিশ্বেশ্বর রাও-ও একবার অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জমিদার—যাই হোক না কেন, অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয় বিজয়ওয়াড়া থেকে বিশাখাপট্টনমে যাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর রাও—বিশ্ববিদ্যালয়কে তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে এতদূর নিয়ে গিয়ে কী লাভ? একথা আমাদের কড়পা, করনুল, বল্লারি, অনন্তপুরম এবং নেলোরের লোকেরা বলছে।

জমিদার—বিশাখপট্টনমের কাছে সমুদ্র আছে, পর্বত আছে। ভবিষ্যতে অন্ধ্রের রাজধানীও বিশাখপট্টনমই হবে। বন্দরও তৈরি হচ্ছে। এমন জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বিশ্বেশ্বর—দেশের একেবারে কোণ ঘেঁসে কেন?

জমিদার—তা কী করা যাবে? কিন্তু অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় খুবই উন্নতি করবে।

পিসিমার জ্বর ছেড়ে যাবার দশ দিন পরে জগন্মোহনের মনোমত সময় এল। জমিদার এবং বিশ্বেশ্বর রাও দু দিন পরে চলে গেলেন। শকুন্তলার প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসছিল। বেশ মাখামাখি করেই শারদা জগন্মোহনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আলাপ আলোচনা করছিল। তাকে আলিঙ্গন আর চুম্বনের মধ্যে দিয়েই জগন্মোহন তার কামনার সার্থকতা পেতে চাইছিল। প্রথমে ও একটু গররাজী মতো হবে, পরে···এই ছিল তার হিসেব।

আহা, মেয়েটি কী সুন্দর। অতুলনীয় সৌন্দর্য। এর আনন্দ আমি যদি ভোগ করতে না পারি, তবে তো আমার জীবনই ব্যর্থ।

সেদিন সন্ধ্যায় সকলের আগে খাওয়ার পাট চুকিয়ে অন্যান্যরা যখন খেতে বসবে, তখন শারদার সঙ্গে একলা দোতলার ঘরে সে থাকার মতলব করল। সেদিন জগন্মোহন তার বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাল। হারমোনিয়মে পাশ্চাত্যে সংগীত বাজাল, গাইল এবং নৃত্য পর্যন্ত করল। শারদার সেদিন যেন সাপের সামনে ব্যাঙের মতো অবস্থা। সন্ধ্যা সাতটার সময় নারায়ণ রাও গাড়ি থেকে নামল।

২৩। পীড়ন

শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার পর নারায়ণ রাও অমলাপুরমে রাজারাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

—নারায়ণ, আমি অনেক ভাবলাম। বাবা মার অমতের আমি পরোয়া করি না। নিজেকে পুরোপুরি ইচ্ছুক বলেই আমার মনে হচ্ছে।

—আরে পাগল, এই ক্ষুদ্র জগতে আমরা যদি ঠিক পথে চলি তাহলে

ইচ্ছাটাও মঙ্গলকরই হয়। যে তোর গৃহিণী হতে যাচ্ছে তাকে কেন্দ্র করে কোনো ইচ্ছা কি কখনো ভুল হতে পারে? বেশ, তাহলে রাজী হলি। তোর প্রতি আমার ভালবাসা এবং সন্তোষ কথায় ব্যক্ত না করে ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে আমার লজ্জা হয়। তা সত্ত্বেও আমি তোকে আয় বুকে জড়িয়ে ধরছি। নারায়ণ রাওয়ের মনে হাজার সমুদ্র যেন নেচে উঠল। অবিলম্বে সে শ্যামসুন্দরীকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখে দিল। তারা দুজনে মিলে রাজারাওয়ের বাবা মাকেও রাজী করাল। বৈদিক রীতিতে বিবাহের অনুষ্ঠান সারার সিদ্ধান্ত হল। এটাও ঠিক হল যে শ্যামসুন্দরী দেবীর পরিবারকে মাদ্রাজে নারায়ণ রাওয়ের বাসায় এনে বিয়ে সেখানেই হবে। কয়েক দিনের চেষ্টায় রাজারাওয়ের বাপমাকে রাজী করানো গেল।

ওকালতি নারায়ণ রাওয়ের মোটেই ভাল লাগছিল না। গোড়াতেই তার ইচ্ছে ছিল না। তার বাবা বললেন, "বাবা, এসব রোজগারের পয়সা কে খাবে? আমি বুড়ে হয়ে গেছি। বাড়িতে কেউ নেই। এখানে এসে তুই যে ভাবে খুশি থাক, সাবধানে থাক, এই আমার ইচ্ছা। দাদাও কাছেই থাকবেন আর আমি রাম নাম জপ করে সময় কাটিয়ে দেব। আমি এখন পুরোপুরি বানপ্রস্থের লোক। দক্ষিণ দিকের বাগানে আমি আর তোমার মা তপস্যা করতে থাকব যতদিন বেঁচে আছি তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব।"

'রামচন্দ্র আর সুরী প্রেমের কল্পলোকে বাস করছে। আমি আর মাদ্রাজে থাকবই বা কেন? যদি কোত্তপেটে একটা বিদ্যালয় খুলে দিই? বাবা দক্ষিণের বাগানে বানপ্রস্থ নিতে চান। চারশো টাকা উপায় এখানে অনায়াসে হতে পারত। বাবা আর দাদার অনুমতি নিশ্চয় পাব।' ব্যাঙ্কে জমা চার লক্ষ টাকা থেকে আশ্রমের জন্য সে পঞ্চাশ হাজার টাকা আলাদা করে রাখতে চাইল। তার আয়ে কি আশ্রম চলবে না বাড়বে না? বাবা হচ্ছেন সর্ব কলাবিদ্ এবং বহু ভাষাবিদ্। তিনিই যদি প্রধান অধ্যাপক হতে পারেন তাহলে ভাল হয়।'

একথা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণ রাও রাজারাও, পরমেশ্বর মূর্তি শ্যামসুন্দরী এবং লক্ষ্মীপতিকে টেলিগ্রাম করে দিল। পরমেশ্বর মূর্তি তার বৌকে আর শ্যামসুন্দরীকে নিয়ে পর দিন খাবার সময়ের মধ্যেই এসে গেল। ওই দিন সন্ধ্যায় রাজারাও আর লক্ষ্মীপতিও এসে পড়ল।

রাজারাও—তোর জন্যেই সব মাটি হবে মনে হচ্ছে।

—তোর কাজ শেষ করার জন্যেই আমি সব সময় পাঁয়তারা করছি। বেশ আছিস! আমি এখানে বিদ্যাদান মহাপুণ্যের উদ্দেশ্যে একটা আশ্রমের পত্তন করতে যাচ্ছি। ভগবানের আরাধনা এবং দেশের সেবাই হবে এর প্রধান লক্ষ্য। পুরুষোত্তমের সঙ্গে একীভূত হওয়ার প্রকৃষ্ট পথ আমরা অনুসরণ করব। আমি আমার পেশা ছেড়ে দিচ্ছি। রাজারাও শ্যামসুন্দরী পরমেশ্বর মূর্তি এবং লক্ষ্মীপতি আজ থেকে এই আশ্রমের আচার্য। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ওষুধগুলি পরীক্ষা করে তাদের দোষগুণ যাচাই করে দেখার ইচ্ছা আমার হচ্ছে।

—আশ্রমের সাংগঠনিক কাজ লক্ষ্মীপতি দেখতে পারবে। পরমেশ্বর হচ্ছে কবি এবং চিত্রকর। আর একজন কবি এবং পণ্ডিতকে কোথাও থেকে ধরে আনব। আমি গান শেখাব। অন্য একজন সংগীতশিক্ষক জোগাড় করে নিতে হবে। নাচ শেখানোর জন্যও একজনকে কাউকে খুঁজতে হবে।

—আমার বাবা হচ্ছেন সর্ববিদ্যা বিশারদ। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি আমাদের গুরুর কাজ করতে পারবেন। বল তোমাদের মত কী?

সকলেই সন্তুষ্ট হল। আশ্রম সম্বন্ধে তারা অনেক পরামর্শ করল।

এইসব আলাপ আলোচনার অবসরে নারায়ণ রাও সবাইকে শ্যামসুন্দরীর সঙ্গে রাজারাওয়ের বিয়ের কথা জানিয়ে দিল। লক্ষ্মীপতি এবং পরমেশ্বর মূর্তি ওদের দুজনকে সানন্দ জানাল।

স্বাভাবিক লজ্জায় শ্যামসুন্দরী মুখ নীচু করে রইল। মঙ্গলাচরণ করে পরমেশ্বর তাদের গায়ে পুষ্পবর্ষণ করল তারপর সবাই নারায়ণ রাওয়ের বাড়ি গেল।

শ্যামসুন্দরী কোত্তপেটে দিন কয়েক থেকে গেল। সূরীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বিদায় নেবার আগে বলল, "তোর আর তোর স্বামীর মিলনোৎসবের শুভদিনে আমি থাকতে পারব না, বোন।"

সবার কাছে বিদায় নিয়ে শ্যামসুন্দরী মাদ্রাজের পথে রওনা হল। রাজমহেন্দ্রবরম্ পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য নারায়ণ রাও, রাজারাও এবং লক্ষ্মীপতি তার সঙ্গে গেল। শাশুড়ীর খবর নেবার জন্য নারায়ণ রাও শ্বশুরবাড়ি গেল। অন্যেরা লক্ষ্মীপতির ওখানে খেতে গেল।

নারায়ণ রাওকে আসতে দেখে জগন্মোহন রাও খুব রেগে গেল। শারদা এখন আর তার সঙ্গে খেতে বসতে পারবে না। জগন্মোহনের সঙ্গে শারদা খেতে বসেছিল। স্বামী এসেছেন দেখে মৃদু হাসিমাখা মুখে উঠে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

জামাইকে পেয়ে শাশুড়ী খুবই আনন্দিত হলেন। জামাইয়ের সঙ্গে শারদা যাতে খেতে বসে তার চেষ্টা তিনি করলেন।

ব্রাহ্মণের দেওয়া জলে স্নান সারা হলে শারদা তাকে তোয়ালে এগিয়ে দিল। তোয়ালে নিতে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, "খাওয়া হয়ে গেছে?" প্রশ্নটা নিক্ষেপ করেই সে একটু লজ্জা বোধ করল। কারণ খুব জরুরী কথা ছাড়া শারদাকে সে কোন প্রশ্ন করত না।

স্বামীকে দেখে শারদার আনন্দের সীমা ছিল না। তোয়ালে নিয়ে সে হাজির হল। কণ্ঠ আর মন আনন্দের আবেগে কল্লোলিত হয়ে উঠল।

—আপনার সঙ্গে বসব? শারদা জিজ্ঞেস করল।

একি সেই শারদা?

—নিশ্চয়, আমাদের জন্য দুজায়গায় খাবার দিতে বলো। শ্যামসুন্দরী এসেছিল, আজ যাচ্ছে। রাজারাওয়ের সঙ্গে শ্যামসুন্দরীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। খাবার পর ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? গাড়ি করে আমি দিয়ে আসব।"

শ্যামদির বিয়ে। ডাক্তার দাদার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। খেয়ে উঠে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

শারদা খুশি হয়ে ভেতরে গেল। নারায়ণ রাও-ও হাসিমুখে তাকে অনুসরণ করল। শকুন্তলার দেওয়া রেশমী বস্ত্রটা সে পরল।

—কোত্তপেটার সবাই ভাল আছে? শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল।

—আছে। শারদা এবং আমার জন্য আলাদা করে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করুন!

সে কী? তার বোনের সম্বন্ধে এভাবে নারায়ণ রাওকে কথা বলতে সে কখনো শোনেনি। শারদা যে স্বামীর প্রতি একটা অনুরাগিণী হবে এ তো সে কোনোদিন কল্পনাও করে নি। শ্রেষ্ঠ এই মানুষটিকে ভাল না বেসে কেউ কি থাকতে পারে? আমার স্বামী এমন হলে আমি কি তাঁর চরণ ছেড়ে এক মুহূর্তও দূরে থাকতে পারতাম।

শারদা আর নারায়ণ রাওকে আলাদা এক জায়গায় খেতে বসানো হল।

পরম আঁর প্রেমের দোলায় শারদা যেন দুলছিল। বিয়ের সময় পর্যন্ত সে স্বামীর থালায় খায় নি। তার এঁটোও সে কোনদিন খায় নি। তার সঙ্গে বসে একই থালায় খাবার তার বাসনা হল। তার মনোভাব বুঝতে পেরে চামচে করে দু-তিন টুকরো আম নিজের পাত থেকে তুলে নারায়ণ রাও তার পাতে দিল। তার দিকে চেয়ে শারদা হেসে ফেলল। তার চোখের দৃষ্টিই যেন আমের টুকবো কটিকে সাগ্রহে গ্রহণ করল। খাওয়া হয়ে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই শারদা তৈরী হয়ে নিল। গাড়িতে উঠে স্বামীর পাশেই বসল। কোনো না কোনো অজুহাতে অঙ্গের স্পর্শে সে আনন্দ লাভ করতে লাগল।

—শ্যামাদি কবে এসেছিল?

—কোত্তপেট এসেছিল পরশু। সেখানেই কথাবার্তা হয়েছে। সূর্য আনন্দে নেচেছে। তুমি বি. এ. আর সূর্য এফ. এ. ক্লাসে একসঙ্গে ভর্তি হয়ে যাও। এই আমার ইচ্ছা।

শ্যামসুন্দরী শারদাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। নারায়ণ রাওয়ের বোনের কাছে গিয়ে প্রশ্ন কবল, “কী আমাদের বাড়ি কখনও যাবে না?”

—কেন শ্যামাদি, তুমি কোনো দিন আমাদের বাড়ি এসেছ?

দুটি গাড়িতে সকলে রাজমহেন্দ্রবরম্ স্টেশনে পৌঁছল।

—নারায়ণ, রাজারাও মাদ্রাজ যাক না কেন, ওখানে থেকে শালা, শালী আর শশুর শাশুড়ীকে নিয়ে আসতে পারে তো?—পরমেশ্বর বলল।

—বেশ বলেছ পরম্। নারায়ণ রাও বলল।

—বহুত আচ্ছা!—লক্ষ্মীপতির সোৎসাহ সমর্থন।

এ যুক্তি সকলেরই মনঃপূত হল।

সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে একটি ক্যুপেতে দুজনকে বসিয়ে দেওয়া হল। শারদার কানে কানে শ্যামসুন্দরী বলল, “স্বামীটি তোমার দেবতুল্য। দিব্যপুরুষ উনি। তুমি সৌভাগ্যবতী। ওঁকে পূজা কোরো।” শারদার গালটা আদর করে সে টিপে দিল। শারদা তার গলা জড়িয়ে বলল, “দিদি, তোমার স্বামীও অসাধারণ মানুষ। তুমি আমার কাছে আসছ জেনে আমার কী আনন্দই না হচ্ছে। শিগ্‌গির এসো। সবাইকে আমার নমস্কার জানিও।”

গাড়ি ছেড়ে দিল। নারায়ণ, পরমেশ্বর এবং শারদা জমিদারের বাড়ি ফিরল। আরেকটা গাড়ি নিয়ে লক্ষ্মীপতি নিজের বাড়ি চলে গেল। জগন্মোহনের মতিভ্রম ঘটেছিল। সে পশুর মধ্যে রসগ্রহণের শক্তি কোথায়? আবেগটাই শুধু তার মধ্যে ছিল। দু-চার গ্রাস মুখে তুলে সে উঠে পড়ল।

তার দেহের আর মনের উত্তাপ বেড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে তার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান ছিল শুধু শারদার মুখ, মাধুর্য আর যৌবন।

ইতিমধ্যে শারদা, নারায়ণ রাও এবং পরমেশ্বর মূর্তি এসে গাড়ি থেকে নামল। স্বামীর সঙ্গে শারদাকে আসতে দেখে জগন্মোহনের রাগ আরও বেড়ে গেল।

শারদা সোজা ভেতরে গিয়ে জুতো খুলে এসে খাবার ঘরে বাবার পাশে বসে পড়ল। তিনি তখন খাচ্ছিলেন। জগন্মোহনকে দেখে তার ভয় করতে লাগল। কাছে সরে আসা স্বামীকে সে আবার দূরে সরিয়ে দেবে না তো? এই কথা ভাবতে ভাবতে সে বাবার কাছেই বসে রইল।

জমিদার (গৃহিণীর উদ্দেশ্যে)—কাকিনাড়ার দুজন বন্ধু জগন্মোহনের কথা বলছিল। কোন কোন ধরনের লোকেরা নাকি ধারের টাকা শোধ করতে পারে নি বলে তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়েছিল। ছোট জামাই টাকা শোধ করে দিয়ে তাকে ছাড়িয়েছে।

—কবে?

—এর আগে সে যখন ওখানে এসেছিল। আমরা তখন ওখানেই ছিলাম। সেইজন্যই নারায়ণ রাও কাউকে বলে নি। মনটা তার কত বড়!

—মোহন আমার এমন হয়ে গেল কী ভাবে কে জানে? কুসংসর্গে পড়েছে হয়তো।

একথা শুনে শারদা আশ্চর্য হলো। স্বামীর কথা মনে পড়তে চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি তাঁকে অপমান করেছি। যে দুঃখ আমি তাঁকে দিয়েছি তা আমি দূর্ করব কী করে? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কী ভাবে?

স্বামীর কথা একের পর এক মনে আসতে লাগল। কেমন যেন বেদনা-মিশ্রিত আনন্দের মৃদু মধুর জ্বালা সে অনুভব করল। ওপরে যাবার জন্য সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

পিশাচ জগন্মোহন শিকারী বিড়ালের মতো সেখানে ওত পেতে বসে ছিল। সিঁড়ি দিয়ে যাবার পথের আলো সে নিবিয়ে দিয়েছিল। পাশের ঘরে অবশ্য আলো ছিল। আর সেও সেখানে লুকিয়েছিল। গায়ে ছিল তার আতরের সুগন্ধ আর দেহে ছিল রেশমের সুন্দর পোশাক। খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে।

দরজার পাশে লুকিয়ে থাকা জগন্মোহনকে সাদা গিরগিটির মতো লাগছিল। অথবা মাকড়সার মতো।

সিঁড়িতে যে এখন শারদা ছাড়া কেউ নেই তা সে জানত। শারদা জানতেও পারল না যে আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সুগন্ধের ফোয়ারা ছুটিয়ে কেউ লুকিয়ে রয়েছে।

তার হৃদয়ে ছিল নারায়ণ আর বাইরে ছিল শিকারী জগন্মোহন।

সে সিঁড়ির কাছে এল। আর শিকারীও এগিয়ে গেল।

"শারদা!"—ডাক এল।

"কে?" শারদার চকিত প্রশ্ন।

"আমি, প্রিয়তমা!"—জগন্মোহন বলল।

সে তার কাঁধের ওপর হাত রাখল। শারদার স্পর্শে দেহ তার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সে উত্তেজিত হল। শারদাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

ভয়ে আর বিস্ময়ে শারদার মুখ দিয়ে কথা সরল না জগন্মোহন তাকে চুমু খাবার চেষ্টা করল। অন্ধকারে চোখদুটো তার আগুনের গোলার মতো ধ্বকধ্বক করছিল। ধাক্কা দিয়ে শারদা তার মুখটা সরিয়ে দিল। হাত ধরে আবার সে তার মুখটা শারদার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল। তার নিশ্বাস শারদাকে স্পর্শ করার আগে তার মধ্যে মহাশক্তির সঞ্চার হল। কম্পিত দেহে সে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁর গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করল। জগন্মোহনের মাথা ঘুরে গেল। পড়তে পড়তে সে অনেক কষ্টে টাল সামলে নিল। সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনমতে সে দাঁড়িয়ে রইল।

চক্ষের পলকে শারদা নিজের ঘরে পলিয়ে গেল।

রাগে অপমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল।

শারদার চড় মারার সময় মশালচি পোলিগাডু সেখানে এসে পড়েছিল। শারদা মোহনবাবুকে কেন মারল তা সে দেখেছিল। চিট্টী ঠাকমার

কাছে গিয়ে সে বলল, "শারদা বেশ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে।" চিট্‌টী ঠাকমা আবার শকুন্তলাকে গিয়ে বলল।

রাগে শকুন্তলা জ্বলে উঠল। সে শারদার কাছে গিয়ে জিগেস করল, "কী হয়েছে বল তো?"

সমস্ত ঘটনা শারদা তাকে বলল। শকুন্তলা মার কাছে গেল। মা তৎক্ষণাৎ জগন্মোহনের ঘরে গেলেন। জগন্মোহনকে গালে হাত বুলোতে দেখে তিনি বললেন, "এ তো ঠিক নয়! তুই আর আমাদের বাড়িতে আসিস না। সকালের গাড়িতেই চলে যা। আমাদের কাউকে বলে যাবারও দরকার নেই।"

ক্রোধে এবং অপমানে জর্জর জগন্মোহন উঠে তাড়াতাড়ি জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ স্টেশনের দিকে যাত্রা করল।

২৪। প্রেমমহাতরঙ্গিনী

সূর্যকান্তমের শুভ মিলনোৎসবের দিন এল।

সুব্বারায়ের সমস্ত বন্ধুবান্ধব এলেন। কোডম্পেট থেকে তটবর্তী বংশের সকলে এসে গেছেন। জমিদারের আত্মীয় কুটুম্বরাও এসেছেন। সুব্বারায়ের বাড়ি অভ্যাগতের সমাগমে উপচে পড়ছে।

দক্ষিণের বাগানের বাংলোটি জমিদার পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। সারাদিন তিনি বাড়ির বড় ঘরে থাকতেন আর রাত্রে বিশ্রাম নিতে যেতেন সেখানে। দিনের বেলায় 'প্রায়শ্চিত্ত' করা হল। রাত্তিরে উৎসব অনুষ্ঠান। সূর্যকান্তম জ্যোৎস্নার মতো ঝলমল করছিল। তাদের দাম্পত্যপ্রেম দিগ্বিদিকে যেন ব্যপ্ত হচ্ছিল। নবদম্পতির গার্হস্থ্যজীবন শুরু হল। শারদার কোমল হৃদয় বিগলিত হল।

গোম্মস্তি পণ্ডু গোরুর বাছুরটা চারদিকে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছিল। নারায়ণ রাও তাকে কোলে তুলে নিল। গোরুটা সবেগে তার দিকে ছুটে এল। 'গো-মহালক্ষ্মীকে শতশত নমস্কার' নারায়ণ রাও মনে মনে ভাবছিল।

গোরুটা নারায়ণ রাওয়ের দিকে ছুটে আসছে দেখে শারদার ভয় হল

বুঝিবা গোরুটা তাকে গুঁতিয়ে দেয়। সেই জন্য সে ছুটে গিয়ে গোরুটা আর নারায়ণ রাওয়ের মাঝামাঝি ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। গোরুটা একদিকে সরে গেলেও শারদার গায়ে অল্প একটু ধাক্কা লাগল। শারদা মাটিতে পড়ে গেল। বাছুরটাকে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে নারায়ণ ছুটে গিয়ে বৌকে পাঁজা করে তুলে নিল। "কোথাও লাগে নি তো?" ভয়ার্ত কণ্ঠে শারদাকে সে জিগেস করল। স্বামীর কোলে উঠে শারদার আনন্দের সীমা রইল না।

"শারদা? শারদা?"—বিহ্বল হয়ে সে ডাকল। শারদার কাছে এ যেন পঞ্চমস্বর।

হাসিমুখে সে চোখ খুলল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সে বলল, "লাগে নি।"

সেই ভাবেই তাকে নিয়ে গিয়ে নারায়ণ রাও বিছানায় শুইয়ে দিল। চল্লাম বলল, "গোরুটা আপনাকে যাতে মেরে না দেয়, আপনাকে বাঁচানোর জন্য শারদা মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।"

পরিতৃপ্তির আনন্দে নারায়ণ রাওয়েব চোখ দুটি বুজে এল। সন্ধ্যায় নারায়ণ রাও নিজের ঘরে এল। ঘরটিকে সুচারুরূপে সাজানো দেখে সে খুব আশ্চর্য হল। এর মধ্যে সূর্যকান্তম্ সেখানে এসে পড়ল।

তারা দুজনে মিলে ঘরটিকে আরও সাজাল, নারায়ণ রাওয়ের আনা ছবি মূর্তি এবং চন্দন কাঠের খেলনাগুলিকে যথাস্থানে রাখা হল। টেবিলের উপর রাখা হল পান, ফুল, ফল ইত্যাদি।

খাবার সময় সুব্বারায় শারদাকে দেখতে পেলেন। 'একে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন? গর্ভশঙ্খে মুক্তা এল নাকি? মেয়েটা এতদিনে তাহলে নারায়ণ রাওয়ের হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছে। বাছারা সুখে থাকুক!' তিনি আশীর্বাদ করলেন। জমিদার মেয়েকে দেখলেন। তার মুখে প্রতিফলিত প্রসন্নতার কারণ তিনিও বুঝতে পারলেন। "শারদা মা আমার যে জামাইকে আমি তোমার জন্যে খুঁজে এনেছি নীতি আর ধর্মকে রক্ষা করে তার সঙ্গে থাকো! ঐ দেখ পরদার পেছনে নারায়ণ রাও দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

রাত এগারোটার সময় নারায়ণ রাও নিজের ঘরে গেল। শারদা পালঙ্কে শুয়ে ছিল।

দ্বিতীয় পালঙ্ক ছিল না। পালঙ্কটি ছিল আকাশগামী বিমানের মতো। বিছানায় শারদা ঘুমাচ্ছিল। দেখবার মতো তার সৌন্দর্য সুষমা। শারদা ঘুমের

ভান্ করছে ভেবে দরজা বন্ধ করে নারায়ণ তার পাশে গিয়ে বসল। শারদা উঠে বসে তার বাহু দুটিকে তার গললগ্ন করল। প্রথম চুম্বনের আবেশে তারা এক হয়ে গেল। তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে শারদা পালঙ্ক থেকে নেমে গিয়ে কিছু ফুল এনে তার পা দুটিকে অঞ্জলি ভরে অর্পণ করল।

'শ্রীরাম পদ' সে গাইল।

সামনে গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের ছবি টাঙানো ছিল।

—দেখো শারদা, পুরাণোক্ত ঐ পুরুষটি কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে গোবর্ধন ধারণ করে রয়েছেন!

—আমার হৃদয়েশ্বরী, আজ আমি ধন্য হলাম। ওই পুরুষোত্তমের ধ্যানে নিরত হয়ে নিজেদের জীবনপথে চলতে চলতে আমরাও একদিন গিরি গোবর্ধনের কাছে পেঁাছে যেতে পারব।"

শারদা—আপনি মালা পরবেন না?

নারায়ণ—মাথা নত তো করেছি!

শারদা—(সহাস্যে) পান খান নি কেন?

নারায়ণ—পান দেবার উপযুক্ত হাতের দর্শন আজই তো সবে পেলাম।

শারদার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল। নারায়ণ রাও তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। ছোট্ট সুন্দর মুখখানি তার বিশাল বক্ষের পটভূমিতে স্থাপিত হল। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি এই নায়ক নায়িকার মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। আকাশের তারারা যেন তাদের আশীর্বাদ জ।-।ল।

বিশাল নীলাম্বর ওই প্রেমিকা তারপর প্রিয়তমকে আচ্ছন্ন করে দিল।

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।

সমাপ্ত